হিন্দু-পত্রিকা।

১৩০৪ সালের সূচীপত্র।

শ্রীশ্রীহরিঃ।

[১৮৪৭ সালের ২০ আইনমতে রেজিষ্ট্রীকৃত।]

হিন্দু-পত্রিকা।

৪র্থ বর্ষ, ৪র্থ খণ্ড, ১ম ও ২য় সংখ্যা, | ১৩০৪ সাল, ১৮১৯ শকাব্দা, | বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ।

মঙ্গলাচরণ।

ওঁ পরমাত্মনে নমঃ। সহ নাববতু। সহ নৌভুনক্তু। সহ বীর্য্যং করবাব হৈ। তেজস্বিনাবধীতমস্তু। মা বিদ্বিষাব হৈ। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

সম্পাদকের নিবেদন।

দেখিতে দেখিতে কালচক্রের অনিবার্য্য আবর্ত্তনে ভবিষ্যৎ বর্ত্তমানের এবং বর্ত্তমান অতীতের গর্ভে লুক্কায়িত হইল। নূতন বর্ত্তমান এবং নূতন ভবিষ্যৎ লইয়া মানবের পুনর্ব্বার কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হইল। কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়া ভিন্ন, ভগবানের প্রবর্ত্তিত সংসারচক্রের আবর্ত্তনের অনুকূলক্রিয়া সম্পন্ন করা ব্যতীত মানবের উপায়ান্তর নাই। যাহা কিছু করিতে হইবে, মানবজীবনেই তাহা করিতে হইবে। মানবদেহই কর্ম্মদেহ। এই জন্য শ্রুতি বলিতেছেন:—

"কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ।"

কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে করিতে শতবর্ষ জীবিত থাকিতে ইচ্ছা কর।

"এবং ত্বয়ি নান্যথেতোঽস্তি ন কর্ম্ম লিপ্যতে নরে[illegible]

নিষ্কামভাবে কর্ত্তব্য সম্পাদন ভিন্ন মুক্তি-লাভের অন্য কোন উপায় নাই, নিষ্কামভাবে কর্ত্তব্য সম্পাদন করিলে, মানবকে কর্ম্মে আবদ্ধ করিতে পারে না।

ভগবান্ কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন,—

"এবং প্রবর্ত্তিতং চক্রং নানুবর্ত্তয়তীহ যঃ।

[illegible] হইতে পারিবে, অনুসরণ না করে, তাহার জীবন পাপপূর্ণ, সে ইন্দ্রিয়ার্থেতেই তৃপ্ত থাকিয়া বৃথা জীবনধারণ করে।

সুতরাং যিনি যে পন্থা অবলম্বন করিয়া ভগবানের সন্নিধানে অগ্রসর হইতে থাকুন না কেন, ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বনী, ভিক্ষু, সকলেরই স্বীয় স্বীয় সামর্থ্য অনুসারে জগতের হিতসাধন করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। যিনি যে ভাবে এই সংসারচক্রের আবর্ত্তনের অনুকূলতা করিতে পারেন, তাঁহার পক্ষে তাহাই কর্ত্তব্য। যাহার যে শক্তি থাকে, সেই শক্তি বিকাশিত করিয়া জগতের হিতকল্পে নিয়োজিত করিতে পারিলে জীবন বৃথায় অতিবাহিত হয় না। কাষ্ঠমার্জ্জার ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র হইয়াও, ভগবান্ রামচন্দ্রের সাগরবন্ধনের সহায়তা করিয়াছিল। মানবের মধ্যে সকলে প্রভূতশক্তিসম্পন্ন না হইলেও, সকলেই সংসারচক্রের আবর্ত্তনের কিছু না কিছু সাহায্য নিশ্চয়ই করিতে পারেন।

হিন্দুপত্রিকাও ক্ষুদ্রশক্তিসম্পন্না হইয়াও হিন্দুসমাজের কিছু না কিছু মঙ্গলসাধন করিতে পারিবে বলিয়াই কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণা। সংসারে আমাদের কেবল কর্ত্তব্যসাধনের অধিকার আছে, ফল ভগবানের হস্তে। তবে যদি গত তিন বৎসরকাল হিন্দুসমাজের কোন এক ব্যক্তিরও হিন্দুপত্রিকা দ্বারা কিঞ্চিন্মাত্রও উপকার হইয়া থাকে, তাহাহইলেই আমরা আমাদিগকে কৃতার্থ মনে করিব। হিন্দুপত্রিকা সমাজের মুখ-পত্রিকার অনুপযুক্তা হইলেও, সমাজের যথেষ্ট অনুগ্রহ প্রাপ্ত হইয়াছে। যে সমুদায় মহাত্মা হিন্দুপত্রিকার উন্নতির জন্য নানাবিধ যত্ন ও চেষ্টা করিয়াছেন, এই নববর্ষের প্রারম্ভে তাঁহাদিগকে আমি হৃদয়ের সহিত ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি এবং আশা করি যে, হিন্দুপত্রিকার প্রতি তাঁহাদের যে অনুগ্রহ আছে, তাহা পূর্ব্ববৎ অব্যাহত থাকিবে। এই স্থলে তাঁহাদিগকে আনন্দের সহিত ইহাও জানাইতেছি যে, গতবৎসরে হিন্দুপত্রিকার গ্রাহকসংখ্যা যেরূপ বৃদ্ধি হইয়াছে, তাহাতে অনতিবিলম্বে হিন্দুপত্রিকার প্রস্তাবিত ব্রহ্মচারী-আশ্রম কার্য্যে পরিণত করা যাইতে পারিবে বলিয়া আমার বিশ্বাস। নববর্ষ হইতে হিন্দু-পত্রিকা সম্বন্ধে যে সমুদায় পরিবর্তন হইল, তাহা বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠে দ্রষ্টব্য।

আমিত্বের প্রসার।

(ব্রাহ্মণ)

মর্ত্ত্যে যদি দেবতা থাকেন, ব্রাহ্মণই সেই দেবতা, এইজন্য ব্রাহ্মণ 'ভূদেব'নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। জগতের হিতের জন্য যিনি আত্মসমর্পণ করেন, জগৎ তাঁহার চরণপ্রান্তে পতিত হইয়া কৃতার্থ হয়, চন্দনজ্ঞানে চরণরেণু দ্বারা দেহ আচ্ছাদিত করিতে ব্যাকুল হয় এবং সুধাজ্ঞানে চরণোদকপানে লোলুপ হয়। তুমি সসাগরা পৃথিবীর রাজা হইতে পার, কুবেরের অপেক্ষা অধিক ধনশালী হইতে পার, কিন্তু তোমাতে পরোপকারবৃত্তি না থাকিলে, জগৎ কখন তোমার নিকট মস্তক অবনত করিবে না। তুমি রাবণের ন্যায় দেবদেবীদিগকে দাসদাসী করিয়া রাখিতে পার, জরাসন্ধের ন্যায় নরপতিগণকে কারারুদ্ধ করিয়া রাখিতে পার, কিন্তু তোমার পরোপকারবৃত্তি না থাকিলে, আমার আমিত্বের প্রসার না হইলে, ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র মানবও তোমার নিকট মস্তক অবনত করিবে না। রম্যহর্ম্ম্যবাসীও পর্ণকুটীর বাসীর পাদযুগল বক্ষে গ্রহণ করিয়া আনন্দে বিহ্বল হইতেছে, মর্ত্ত্যে স্বর্গসুখ অনুভব করিতেছে, আপনাকে দাসানুদাস জ্ঞান করিয়াও তৃপ্ত হইতেছে না, ইহার গূঢ় রহস্য কি? যিনি ষোড়শোপচারে ভোজন করিয়াও তৃপ্ত হন না, তিনি হবিষ্যান্নভোজীর প্রসাদ-প্রয়াসী, ইহার গূঢ় রহস্য কি? রাজাধিরাজ ভিক্ষুকের পদদেশে কেন লুণ্ঠিত, ইহার গূঢ় রহস্য কি?

পাঠক একবার চিন্তা করিয়া দেখুন, ইহার গূঢ় রহস্য কি?

যদি কেহ আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, ভারতবাসী পরাধীন কেন, তাহার উত্তরে আমি বলি, ভারতবাসীদিগের মধ্যে ব্রাহ্মণ লুপ্তপ্রায় হইয়াছে বলিয়া। লক্ষ লক্ষ ভারতবাসী আজ যে

অন্নাভাবে কালগ্রাসে পতিত হইতেছে, লক্ষ লক্ষ ভারতবাসী আজ যে কলেরা, ম্যালেরিয়া, বিউবনিকপ্লেগ আদি রোগদ্বারা আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে, সে নিশ্চয় জানিও, ভারতে ব্রাহ্মণ প্রায় নাই বলিয়া; এক ব্রাহ্মণের অভাবই ভারতের যত কিছু দুর্গতির কারণ। জ্ঞান, বিজ্ঞান, ধন, স্বাস্থ্য সকলই ব্রাহ্মণানুগত ছিল এবং একের অভাবে ভারতে এ সকলেরই অভাব হইয়াছে, যখন ভারতে ব্রাহ্মণ ছিল, তখন ধন, বিদ্যা, বল, আয়ু, স্বাধীনতা এ সবই ছিল বৃক্ষের মূলচ্ছেদ করিলে কি কখন শাখা-পত্র জীবিত থাকিতে পারে? সমাজের জীবনস্বরূপ ব্রাহ্মণ না থাকিলে, সমাজ কি কখন জীবিত থাকিতে পারে? ব্রাহ্মণ অভাবেই সমগ্র হিন্দুসমাজ যেন মৃতপ্রায়। এই মৃতসমাজকে ব্রাহ্মণ ভিন্ন আর কাহারও পুনর্জীবিত করিবার সাধ্য নাই। মৃতসঞ্জীবনীমন্ত্র দ্বারা যদি ব্রাহ্মণ এই মৃত ভারতকে পুনর্জীবিত করিতে পারেন, তবেই ভারত পুনর্ব্বার জাগরিত হইবে, তবেই ভারত পুনর্ব্বার সভ্যসমাজের শীর্ষস্থান অধিকার করিতে পারিবে।

স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণও ব্রাহ্মণের চরণ বক্ষে ধারণ করিয়া আপনাকে পবিত্র মনে করিয়াছেন। ব্রাহ্মণ মর্ত্ত্যে কেবল দেবতা নহেন, তিনি সাক্ষাৎ ব্রহ্ম। ব্রহ্মবিৎ স্বয়ংই ব্রহ্ম। যাঁহার ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার হইয়াছে, যিনি স্বীয় "আমি" তে, বিশ্বের তাবৎ "আমি" দৃষ্টি করেন, যিনি বিশ্বের তাবৎ "আমিতে" স্বীয় "আমি" দৃষ্টি করেন, তিনি যদি মানুবের আরাধ্য না হইবেন, তবে আর আরাধ্য হইবে কে?

মানব যদি তাঁহার পাদোদক পান না করিল, তাঁহার পদরজ শিরে ধারণ না করিল, তবে মানবে আর পশুতে প্রভেদ কি? নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনা হয় না, ব্রাহ্মণই সগুণ ব্রহ্ম, অতএব ব্রাহ্মণই মানবের পূজ্য। ব্রাহ্মণের উচ্চ আদর্শই অনুসরণ করিয়া ব্রহ্মসন্নিধানে গমন করিতে হয়। যখন ভারতে ব্রাহ্মণ ছিল, তখন এই বিধিই প্রচলিত ছিল। ব্রাহ্মণের অভাব হওয়াতেই প্রতিমা অর্চ্চনার নিয়ম প্রচলিত হয় *। হায়! হিন্দুসমাজ! তুমি ব্রাহ্মণের তত্ত্ব না বুঝিয়া, ব্রাহ্মণত্বের ধ্বংস সাধন করিয়া, ইহকাল ও পরকাল দুইকালই হারাইয়াছ। ভেবে দেখ দেখি, তোমার আছে কি? ভেবে দেখ দেখি, তুমি ছিলে কি এবং হইয়াছ কি? ব্রাহ্মণের উচ্চ আদর্শ জীবনের আদর্শ কর, ব্রাহ্মণের প্রদর্শিত পন্থা অবলম্বন কর, দেবতাজ্ঞানে ব্রাহ্মণের চরণ পূজা কর, তোমার দুর্দ্দিন থাকিবে না, অচিরে তুমি পূর্ব্ব-গৌরবে গৌরবান্বিত হইতে পারিবে, অচিরে তুমি পূর্ব্ববৎ জগতের পূজ্য হইতে পারিবে।

মানব মানবের পূজ্য হয় কিসে? তুমি অযুত হস্তীর বল রাখিতে পার, কিন্তু তোমার বল যদি জগতের উপকারে নিয়োজিত না হইল, বরং জগতের পীড়নের জন্যই উহা নিয়োজিত রহিল, তাহাহইলে তোমাকে কে পূজা করিবে? পাশব বলই যদি জগতের পূজার্হ হইত, তাহাহইলে সিংহ, ব্যাঘ্র, হস্তী, গণ্ডার প্রভৃতি দেবতাদিগের সিংহাসন অধিকার করিত। পরোপকারবৃত্তিই পূজ্য হইবার অধিকার প্রদান করে। গগনমণ্ডলে সবিতা হইতে বহু বৃহত্তর জ্যোতিষ্কমণ্ডল আছে, কিন্তু তাহারা সবিতার ন্যায় পূজ্য নহে কেন? সবিতা যেরূপ জগতের কল্যাণে নিযুক্ত, তাহারা তদ্রূপ নহে বলিয়া। সবিতা কখন তোমার নিকট মূল্য চাহেন না, কিন্তু সবিতার পরোপকারবৃত্তি

* দৃষ্ট্বা তেষাং ধিয়ো [illegible] [illegible] প্রতিমাদিষু হবেরর্চ্চা ক্রিয়ায়ৈ কল্পিতা [illegible]

স্মরণ করিয়া, তুমি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাঁহার নিকট মস্তক অবনত কর। মস্তক অবনত করিতে তোমাকে কেহই বাধ্য করে না, কেহই কোন বাহুবল প্রয়োগ করে না।

তুমি বৃহস্পতি অপেক্ষাও শাস্ত্রাভিজ্ঞ হইতে পার, কিন্তু তোমার জ্ঞান যদি জগতের কার্য্যে না আসিল, উহা যদি সংসারচক্রের আবর্ত্তনের অনুকূলতা না করিল, তবে তোমার জ্ঞানের ফল কি হইল? বন্ধ্যা স্ত্রী কি কখন পুত্রবতী পত্নীর স্থান অধিকার করিতে পারে? পত্নী রূপে গুণে বিভূষিতা হইয়াও বন্ধ্যা হইলে, স্বামীর চিত্তের অভাব দূরীভূত হয় না। পুত্রের অভাবে পত্নী পত্নীতুল্য জ্ঞান হয় না। বহু যত্ন পরিবর্দ্ধিত বৃক্ষে যদি ফল না জন্মে, মানব তাহাকে কুঠারদ্বারা ছেদন করিয়া ফেলে। অতএব পরোপকারবৃত্তিই জগতে আদৃত, জগতে পূজ্য হইবার একমাত্র কারণ। তোমার ভাণ্ডারে যদি অক্ষয় ধনও থাকে, আর উহা যদি দীনদুঃখীর দুঃখনিবারণে নিয়োজিত না হইল, তবে তোমার ধনের মূল্য কি? সাগর-গর্ভে, কিম্বা আকরাদিতেও ধন-রত্ন নিহিত আছে; আকরের ধন যদি আকরেই রহিয়া গেল, মানব যদি উহা জগতের ব্যবহারে নিয়োজিত না করিতে পারে, তবে ঐ ধন থাকা না থাকা সমান। আর তোমার ধন যদি পরোপকারে সদাই নিয়োজিত হয়, তবেত কথাই নাই। দরিদ্র দাতাই চিরকালই ধনবান্ কৃপণেরও পূজ্য হইয়া আসিতেছেন। পরোপকারবৃত্তি—আমিত্বের প্রসারই মানবকে মানবের পূজ্য করে। আমিত্বের প্রসারহেতুই মনুষ্য পশুপক্ষী হইতে শ্রেষ্ঠ, পশুপক্ষী বৃক্ষাদি হইতে শ্রেষ্ঠ এবং বৃক্ষাদি প্রস্তরাদি হইতে শ্রেষ্ঠ। আমিত্বের প্রসারহেতুই বৈশ্য শূদ্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, ক্ষত্রিয় বৈশ্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। যে যত আত্ম-পর-ভেদজ্ঞান নষ্ট করিতে পারে, যে যত পরকে আপনজ্ঞান করিতে পারে, যে যত আপনা ভুলিয়া পরের সহিত আপনাকে মিশাইয়া দিতে পারে, যে যত তামসিক 'আমি'কে রাজসিক 'আমি' এবং রাজসিক 'আমি'কে সাত্বিক 'আমি' করিতে পারে, সে ততই পূজ্য হয়। যে আব্রাহ্মণ চণ্ডাল পর্য্যন্ত কাহারও পদ-প্রান্তে পড়িতে কুণ্ঠিত হয় না, যে কখন পরের পূজ্য হইব বলিয়া উচ্চাভিলাষ করে না, যে কখন পূজা না পাইলে উদ্বিগ্নচিত্ত হয় না, পূজা পাইলে যে কখনও উন্মত্তচিত্ত হয় না, তাহার পদপ্রান্তে পড়িতে, তাহার পদরজ শিরে ধারণ করিতে, তাহার পদোদক পান করিতে কাহারও আপত্তি থাকে না।

আবার জিজ্ঞাসা করি, ব্রাহ্মণ যে হিন্দু-সমাজে পূজ্য, দেবতুল্য পূজ্য, পরব্রহ্মতুল্য ভগবানের অবতার শ্রীকৃষ্ণেরও আরাধ্য, তাহার গূঢ় রহস্য কি? পাঠক! ভাবিয়া দেখুন, ইহার কারণ কি। ইহার কারণ, পরোপকারবৃত্তি, ইহার কারণ অহঙ্কার-ধ্বংস, ইহার কারণ সর্ব্বভূতে আত্মদর্শন এবং আত্মাতে সর্ব্বভূত-দর্শন, ইহার কারণ "ব্রহ্মবিদ্ব্রহ্মৈব ভবতি" ইহার কারণ—এক কথায়—আমিত্বের প্রসার।

যিনি ব্রহ্মাণ্ডকেও গোষ্পদ অপেক্ষা তুচ্ছ জ্ঞান করেন, বিশ্বের ধনরাশি লোষ্ট্র অপেক্ষাও অকিঞ্চিৎকর জ্ঞান করেন, যিনি নিজের জন্য কখনও কিছু ভাবেন না, যিনি পর্ণ-কুটীরে বাস করিয়া, হবিষ্যান্নমাত্র গ্রহণ করিয়া, নিজের সুখদুঃখের প্রতি আদৌ কোন লক্ষ্য না করিয়া, বিশ্বহিত-তপস্যায় নিমগ্ন থাকেন, তাঁহাকে যদি ভক্তি-শ্রদ্ধা না করিলে, তবে ভক্তি-শ্রদ্ধা আর করিবে কাহাকে? যাঁহার জীবনের মূল-মন্ত্র এই বিশ্বজীবনের মূলমন্ত্রের সহিত মিশ্রিত

হইয়া গিয়াছে, এই বিশ্বজীবনের সহিত যাঁহার ব্যক্তিগত জীবনের পার্থক্য অপনোদিত হইয়াছে, যাঁহার জীবনের হৃদয়তন্ত্রীর সুর এই বিশ্বের অন্তর্যামীর তন্ত্রীর সুরের সহিত অভেদ হইয়াছে, তাঁহাকে যদি ভক্তি-শ্রদ্ধা না করিলে, তবে ভক্তি-শ্রদ্ধা আর করিবে কাহাকে?

তুমি সাম্যবাদী, তুমি প্রশ্ন করিবে যে ব্রাহ্মণ তোমার শ্রেষ্ঠ কিসে? আচ্ছা, আমি তোমায় বলি, ঐ যে উচ্চশৃঙ্গ গিরিরাজ হিমালয় ভারতবর্ষের উত্তরপ্রান্ত অধিকার করিয়া আছে, উহার সহিত কি অন্যান্য পর্ব্বতের সমকক্ষতা চলে? প্রশস্তবক্ষা পূতসলিলা ভাগীরথীর সহিত অন্যান্য নদীর সমকক্ষতা চলে? অভ্রভেদী সহস্র সহস্র যোজনব্যাপী হিমালয়কে পদচ্যুত করিয়া যদি তোমার আশ্রম-সম্মুখস্থিত উচ্চ বল্মীক-স্তূপকে তাহার স্থানে বসাও, তাহা কি কখন হয়? তীর্থবাহিনী, বাণিজ্যসহায়িনী, ক্ষেত্রোর্ব্বরতাদায়িনী, প্রচণ্ডমার্ত্তণ্ডতাপজনিত তৃষ্ণানিবারিণী, সমগ্র-আর্য্যাবর্ত্তব্যাপিনী, ত্রিতাপনাশিনী, পতিতপাবনী গঙ্গার পদবীতে শৈবালবিশিষ্টা, অস্বাস্থ্য-সলিলা, কোন স্রোতবিরহিতাকে অধিরোহণ করাইলে কি কখন হয়? যাহার ভিতরে চৈতন্যশক্তি যত অধিক পরিমাণে থাকে, সে তত বড় হইবেই হইবে; কিছুতেই তাহার ব্যত্যয় ঘটিবে না। একটি অশ্বত্থবীজ এক স্থানে রোপণ কর, আর একটি নারিকেল উহার নিকটে আর এক স্থানে রোপণ কর। অশ্বত্থবীজ একটি সর্ষপ অপেক্ষাও ক্ষুদ্র এবং ঐ নারিকেল অপেক্ষা লক্ষগুণ ক্ষুদ্র, এখন এই দুই বস্তুর শক্তির বিচার কর। ক্ষুদ্র অশ্বত্থবীজোদ্ভূত বৃক্ষ কাণ্ডশাখাপত্রবিশিষ্ট প্রকাণ্ড অশ্বত্থ বৃক্ষই বা কেন, আর বৃহৎ নারিকেলোদ্ভূত বৃক্ষ কাণ্ডৈকবিশিষ্ট সামান্য নারিকেল বৃক্ষ কেন? উভয় বীজই সমান ভাবে তাপ, জল-বায়ুদ্বারা পরিবর্দ্ধিত হইয়া, একই ক্ষেত্রে এইরূপ বৃহৎ এবং ক্ষুদ্র বৃক্ষের কারণ হয় কেন? নারিকেল যেখানেই রোপণ কর না কেন, উহা অশ্বত্থবীজের ন্যায় শক্তিসম্পন্ন হইবে না। অতএব সিদ্ধান্ত হইল যে, অশ্বত্থবীজের এমন একটি শক্তি আছে, যে উহা ক্ষুদ্র হইলেও উহার মৃত্তিকা-রসাকর্ষণীশক্তি নারিকেলের বীজের শক্তি অপেক্ষা অনেক অধিক এবং ঐ শক্তিদ্বারা সে মৃত্তিকার সারভাগ অধিক পরিমাণে আকর্ষণ করিতে পারে বলিয়া, সে অত বড়; নারিকেল তাহা পারে না বলিয়া সে উহা অপেক্ষা অত ছোট। উপমাস্থল সম্পূর্ণরূপে সদৃশ হইল না, স্বীকার করি। মনুষ্য মনুষ্যে যে ভেদ, তাহা স্বজাতীয় এবং অশ্বত্থবীজে ও নারিকেলবীজে যে ভেদ, তাহা বিজাতীয়; কিন্তু বিজাতীয়শক্তির যেমন ইতরবিশেষ আছে, স্বজাতীয়শক্তিরও তদ্রূপ ইতরবিশেষ আছে। সকল নদীই গঙ্গা নয়, সকল পর্ব্বতই হিমালয় নয়, সকল কবিই কালীদাস নয়, সকল দার্শনিকই কপিল নয়, সেইরূপ সকল মনুষ্য ব্রাহ্মণ নয়, জড়জগৎ যে নিয়মে নিয়মিত, মানব-জগৎ তাহা নহে। জড়জগতের ক্রিয়া নাই, মানবজগতের উন্নতি অবনতি স্বীয় স্বীয় ক্রিয়া সাপেক্ষ। সকল মনুষ্যতেই 'ব্রাহ্মণ' হইবার শক্তিবীজ নিহিত থাকিতে পারে, কিন্তু যাহার সেই শক্তি পরিবর্দ্ধিত হয়, সেই ব্রাহ্মণ হয়, যাহার হয় না, সে 'ব্রাহ্মণ'ও হয় না। সে ইতর মনুষ্য রহিয়া যায়। প্রাগুক্ত উদাহরণ স্মরণ করিয়া দেখ, যেমন নারিকেল বৃক্ষের বীজ অপেক্ষা তাবৎ অশ্বত্থ বৃক্ষের বীজ অধিক শক্তিসম্পন্ন, তেমনি অশ্বত্থ বৃক্ষের বীজসমূহের মধ্যেও শক্তির অল্পাধিক্য আছে। সৃষ্টিই বৈষম্যময়, আরও একটু বিশদ করিয়া বলিতে গেলে, বৈষম্যই সৃষ্টি। ব্রহ্ম "একমেবাদ্বিতীয়ম্" তাঁহাতে

কোন ভেদ নাই; স্বজাতীয়, বিজাতীয় বা স্বগত, কোন ভেদ নাই। তাঁহার হস্তপদাদিজনিত কোন ভেদ নাই। মনে কর, একটি মানুষ একটি মাংসপিণ্ড মাত্র। এস্থলে বলা যায়, ঐ মানুষে স্বগত ভেদ নাই। এক মানুষের সহিত অপর মানুষের যে ভেদ, তাহাকে বলি স্বজাতীয় ভেদ। তোমারও হস্ত, পদ, মুখ, চক্ষু আদি আছে, আমারও ঐ সমুদায়ই আছে, অথচ আমার হস্তপদাদি তোমার হস্তপদাদির ন্যায় নহে। তোমাকে দেখিলেই, আমি যে তুমি নও, তাহা বুঝা যায়। ব্রহ্মে এই স্বজাতীয় ভেদও নাই। অর্থাৎ প্রথমে একটি মানুষকে স্বগত ভেদশূন্য করিয়া কেবল সুগোল মাংসপিণ্ডবৎ কল্পনা কর, তৎপরে তাবৎ মনুষ্যকেই ঐরূপ কল্পনা কর। তাহাহইলে স্বগত ও বিজাতীয় ভেদ-রাহিত্য পাইলে। তৎপরে দেখ, যে মনুষ্যের সহিত পশু, পক্ষী, বৃক্ষ, প্রস্তর এবং উহাদের অন্তর্ভূক্ত বহুবিধ পদার্থের ভেদ আছে। তখন যদি পৃথিবীস্থ তাবৎ পদার্থকেই একটি মাংস-গোলকের ন্যায় জ্ঞান কর, অর্থাৎ বিজাতীয় ভেদও কল্পনাদ্বারা দূরীভূত কর, তাহাহইলে তুমি 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' পাইলে। পাঠককে অবশ্য ইহা বুঝাইতে হইবে না, যে ব্রহ্মপদার্থ মাংস-পিণ্ড নহে। ব্রহ্মের স্বরূপ বর্ণন প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে, ইহা আনুষঙ্গিকভাবে বলা হইতেছে মাত্র। এইক্ষণ ইহাই বুঝাইতে চাই যে, ব্রহ্মে কোন ভেদ বা বৈষম্য নাই। বৈষম্য হয় কিসে? ব্রহ্মের একটি অঘটন-ঘটন-পটীয়সীশক্তি আছে, তাহার নাম মায়া। সৃষ্টির সময়ে, ব্রহ্ম এই মায়াশক্তির বিকাশ করেন। মায়া কিন্তু ব্রহ্ম নহে। এই প্রবন্ধ লিখিবার শক্তি যেমন আমি নহে, তদ্রূপ মায়াও ব্রহ্ম নহে; ইহা ব্রহ্মের শক্তিমাত্র। এই শক্তি ত্রিগুণান্বিতা, ইহা সত্ত্ব-রজ-তমোময়ী। এই মায়ার আর এক নাম প্রকৃতি। এই প্রকৃতি আবার দুইপ্রকার; সত্ত্বের বিশুদ্ধতা থাকিলে, উহা 'মায়া'নামে অভিহিত হইয়া থাকে, কিন্তু সত্ত্বের অবিশুদ্ধতা থাকিলে, উহা 'অবিদ্যা'নামে অভিহিত হয়। বিশুদ্ধ সত্ত্ব-গুণ বা মায়া আশ্রয় করিলে, ব্রহ্ম ঈশ্বরপদে বাচ্য হয়েন এবং অবিশুদ্ধ সত্ত্বগুণ আশ্রয় করিলে, তিনি 'প্রাজ্ঞ' বা জীবাত্মাপদে বাচ্য হয়েন। তম-প্রধান প্রকৃতি হইতে ক্ষিতি, অপ, তেজ, বায়ু ও আকাশের উদ্ভব হয়। অবিশুদ্ধসত্ত্ব বা অবিদ্যা আশ্রয় করিলে, দেব, মানব, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ প্রভৃতি বিবিধ উপাধিবিশিষ্ট জীবাত্মা হয় এবং উপাধিভেদে দেবাত্মা, মানবাত্মা, পাশ-বাত্মা প্রভৃতি নামে বাচ্য হয়।

এইক্ষণ বুঝা উচিত যে, প্রকৃতির বৈষম্য-হেতুই চৈতন্যের আধারের বৈষম্য হয় এবং চৈতন্যের আধারের বৈষম্য হওয়াতেই সর্ব্বত্র চৈতন্যের সমান বিকাশ হয় না। লোষ্ট্রেও যে চৈতন্য, বৃক্ষেও সে চৈতন্য, পশুতেও সেই চৈতন্য এবং তোমাতেও সেই চৈতন্য। কিন্তু উহার বিকাশ সর্ব্বত্র সমান নহে। লোষ্ট্রে সুখ-দুঃখ জ্ঞান নাই; উহা বৃক্ষের ন্যায় মৃত্তিকা হইতে রস গ্রহণ করে না, পরিবর্দ্ধিত হয় না এবং তৎপরে বৃক্ষের ন্যায় শুষ্কত্বও প্রাপ্ত হয় না। বৃক্ষ রস-গ্রহণ করিলেও এবং তাহার ক্ষয়বৃদ্ধি থাকিলেও, তাহার গমনাগমনের শক্তি নাই। তাহার শব্দ করিবার শক্তি, তাহার সুখদুঃখ প্রকাশের শক্তি নাই, ইত্যাদি। একটু উপরে উঠিলেই, কীট-পতঙ্গাদির মধ্যে গমনাগমনশক্তি ইত্যাদি পরি-লক্ষিত হইল; আর একটু উপরে উঠিলেই পশু, পক্ষী প্রভৃতির বিবিধ উচ্চতর শক্তি পরিলক্ষিত হয়। আর একটু উপরে উঠিলেই, মর্ত্ত্যের শ্রেষ্ঠ প্রাজ্ঞ মনুষ্যকে পাইলাম। সকলের মধ্যেই চৈতন্য গূঢ়ভাবে রহিয়াছে, তবে সমানভাবে বিকাশ নাই কেন? প্রকৃতির জন্য। মনে কর

একটি আলোক যেন চৈতন্য। ঐ আলোকে একটি শুভ্র নির্ম্মল কাচের চিম্‌নি দেও। আলোকের উজ্জ্বলতা অব্যাহত থাকিল, বরং পূর্ব্বাপেক্ষা আলোক ভাল হইল। তৎপরে ঐ আলোকে শুভ্র চিম্‌নি না দিয়া, একটি রঞ্জিত অর্থাৎ লাল বা নীল বা পীতবর্ণের একটি কাচের চিম্‌নি লাগাও। এই স্থানে আলোকও লাল, নীল বা পীত হইল, নির্ম্মল শুভ্র আলোক আর থাকিল না। তৎপরে ঐ কাচের চিম্‌নি স্থানে একটি মৃত্তিকা-নির্ম্মিত চিম্‌নি বসাও, আলোকের আর বিকাশ হইল না। মৃত্তিকা ভেদ করিয়া আলোক বাহিরে আসিতে পারিল না। আলোক চৈতন্য বলিয়া কল্পনা করিলে, নির্ম্মল শুভ্র কাচের চিম্‌নিকে সত্ত্বগুণ বলা যায়, রঞ্জিত চিম্‌নিকে রজোগুণ বলা যায় এবং মৃত্তিকার চিম্‌নি বা আবরণকে তমোগুণ বলা যায়। দেহে সত্ত্বগুণ হইলেই, চৈতন্য তাহার মধ্য হইতে প্রকাশ পায়; রজগুণ থাকিলে উহা রঞ্জিতভাবে প্রকাশ পায় এবং তমোগুণ থাকিলে উহা আদৌ প্রকাশ পায় না। সর্ব্বত্রই তিন গুণ আছে, কিন্তু যে গুণ অধিক পরিমাণে থাকে, সেই গুণেরই কার্য্য পরিলক্ষিত হয়। এইরূপ প্রস্তর হইতে মনুষ্যপর্য্যন্ত চৈতন্যবিকাশের তারতম্য হওয়ার কারণ কি, তাহা বুঝা গেল। উহাদের মধ্যে যেখানে তম অধিক, সেখানে বিকাশ নাই; যেখানে তম কমিয়া রজ অধিক হইয়াছে, সেখানেই বিকাশ আরম্ভ হইয়াছে, কিন্তু রঞ্জিতভাবে। রজ কমিয়া যাই সত্ত্বের আধিক্য হইয়াছে, অমনি চৈতন্যের নির্ম্মল বিকাশ আরম্ভ হয়। বৃক্ষাদিতে যেমন তমোগুণই প্রধান এবং সেই জন্য উহাদিগের মধ্য হইতে চৈতন্যের বিকাশ হয় না, কিন্তু ঐ তামসিক বৃক্ষাদিও সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক শ্রেণীতে বিভাগ করা যায়। কিন্তু উহাদের কাহারও কাহারও মধ্যে সত্ত্ব বা রজগুণ কিছু কিছু থাকিলেও উহা এত পরিমাণে থাকে না, যাহা দ্বারা চৈতন্যের বিকাশ হয়। যখন তোমাকে বৈদ্য বলেন যে অমুক ফল খাইও না, উহাতে পিত্ত-বৃদ্ধি হইবে, তখনই বুঝিবে যে ঐ ফলের বৃক্ষে অধিক রজগুণ আছে; যখন বলা যায় অমুক ফল খাইও না, উহাতে শ্লেষ্মা বা কফবৃদ্ধি হইবে, তখনই বুঝিবে যে ঐ ফলের বৃক্ষে তমোগুণ অত্যন্ত অধিক। যখন বলা যায় অমুক ফলে বায়ু-বৃদ্ধি হয়, তখনই বুঝিবে যে উহাতে সত্ত্বাধিক্য আছে। বায়ু, পিত্ত, কফ শরীরান্তর্গত সত্ত্ব, রজ, তম ভিন্ন আর কিছু নহে। লতা, বৃক্ষ এবং পশ্বাদিতে এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন গুণ ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণে আছে বলিয়াই, সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক আহারের ভিন্ন ভিন্ন উপাদান নির্ব্বাচিত হইয়াছে। যাঁহারা বলেন যে, আহারাদির সহিত ধর্ম্মের সংস্রব নাই, তাঁহারা অতি স্থূলদর্শী। শরীরে সত্ত্বগুণের উদ্ভব না হইলে, চৈতন্যের বিকাশ হয় না এবং সত্ত্বগুণের বিকাশ করিতে গেলে, যে সমুদায় দ্রব্য সত্ত্বগুণবিশিষ্ট, তাহা ভোজন করা চাই। কিন্তু কেবল সত্ত্বগুণবিশিষ্ট দ্রব্য ভোজন করিলেই যে মানব সত্ত্বগুণবিশিষ্ট হইতে পারে, তাহা নহে, সে যদি সাত্ত্বিক কার্য্য না করে বা সাত্ত্বিক চিন্তা না করে, তাহাহইলে কেবল সাত্ত্বিক আহারে সাত্ত্বিক হইতে পারে না। তবে ঐ অবস্থাপন্ন ব্যক্তিদের সাত্ত্বিক আহারে কথঞ্চিৎ উপকার নিশ্চয়ই হয়। সাত্ত্বিককার্য্য ও সাত্ত্বিক চিন্তাই সত্ত্বগুণ পরিবর্দ্ধিত করে, সাত্ত্বিক আহারে উহার বিশেষ সাহায্য হয়। অনেক ব্যক্তি মাংসাদি ভক্ষণ করিয়াও অনেক নিরামিষভোজী অপেক্ষা অধিক সাত্ত্বিক হইতে পারেন। অনেক মাংসভোজী গৃহস্থও পরদার স্পর্শ করেন না, কিন্তু নিরামিষভোজী

সন্ন্যাসী (?) কৃষ্ণানন্দ বালিকা বলাৎকারে অপরাধী হইলেন!

সত্ত্ব, রজ ও তমের তারতম্যানুসারে যেরূপ বিশ্বের বৈচিত্র্য সংঘটিত হয়, তদ্রূপ উহাদিগের তারতম্যানুসারে মানবের মধ্যেও বৈচিত্র্য সংঘটিত হয়। অধিক ধন থাকিলে, মানুষ মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হয় না। মূল্যবান রত্নখচিত বস্ত্রাদি এক মানব হইতে অপর মানবকে শ্রেষ্ঠ করে না। পর্ণকুটীরে বা রম্য হর্ম্ম্যে বাস দ্বারা মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতা বা অশ্রেষ্ঠতা নির্ব্বাচিত করা যায় না। গুণের তারতম্যানুসারে মানব শ্রেষ্ঠ বা অশ্রেষ্ঠ হয়। যাহাতে চৈতন্যের অধিক বিকাশ, সে, যাহাতে চৈতন্যের কম বিকাশ, তা হইতে শ্রেষ্ঠ। তাবৎ বিশ্বের মধ্যেও যে নিয়ম, মনুষ্যসম্বন্ধেও সেই নিয়ম। সত্ত্ব রজঅপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, রজতমঅপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; সুতরাং সাত্ত্বিক ব্যক্তি রাজসিক ব্যক্তি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং রাজসিক ব্যক্তি তামসিক ব্যক্তি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। সত্ত্বগুণ থাকিলে, সাত্ত্বিক কার্য্যে স্বাভাবিক প্রবৃত্তি এবং সাত্ত্বিককার্য্য করিতে থাকিলে, সত্ত্বগুণের বৃদ্ধি হয়। সত্ত্বগুণই আদর্শগুণ, কারণ সত্ত্বগুণ না হইলে ভগবানের সাক্ষাৎকার-সম্ভাবনা নাই, সত্ত্বগুণাভাবে ভগবৎ-সত্ত্বার বিশুদ্ধ অনুভূতিই হয় না। এই সত্ত্বগুণাধিকারীকেই 'ব্রাহ্মণ' বলে। এহেন ব্যক্তিকে যদি পূজা না করিবে, এহেন ব্যক্তির চরণ যদি মস্তকে ধারণ না করিবে, তবে আর কাহাকে ভক্তি-শ্রদ্ধা করিবে? ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব এই সত্ত্বগুণে। সত্ত্বগুণের আধিক্যেই তাহার মধ্য হইতে চৈতন্যের বিশুদ্ধ বিকাশ হয়, তিনি চৈতন্যের অনুভূতি হয়, তিনি ব্রহ্মর্ষিৎ হয়েন, তিনি স্বয়ং ব্রহ্ম হয়েন। ব্রাহ্মণ আর জীবন্মুক্ত পুরুষে কোন ভেদ নাই। ইহাকে যদি পূজা না করিবে, তবে পূজা করিবে আর কাহাকে? ব্রাহ্মণের গুণ না থাকিলে কেহ ব্রাহ্মণ হয় না। গলদেশে যজ্ঞসূত্র থাকিলেই কেহ ব্রাহ্মণ হয় না। তাহা যদি হয়, তবে আর ভাবনা কি? আজই সমগ্র মানব সমাজের গলদেশে যজ্ঞসূত্র পরাইয়া, তাহাদের ব্রাহ্মণত্ব সম্পাদন করাইয়া তাহাদের মুক্তির পথ পরিষ্কার করিয়া দেওয়া যায়! এত বেদ, বেদান্ত, পুরাণ, তন্ত্র, ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞানের প্রয়োজন কি? এত শম, দম, তপ, শৌচ, ক্ষান্তি, আর্জ্জব, জ্ঞান, দয়া, সত্য, ব্রহ্মনিষ্ঠা এ সমুদায়ের প্রয়োজন কি? এত যাগ, যজ্ঞ, হোম, পূজা, অর্চ্চনা, ব্রত, নিয়মের প্রয়োজন কি? এত যমনিয়ম আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার ধ্যান, ধারণা, সমাধির প্রয়োজন কি? এক কার্পাসসূত্র যদি এতই গুণবিশিষ্ট, এক কার্পাসসূত্রে যদি এতই সত্ত্বগুণ বিদ্যমান থাকে, তাহা হইলে মনুষ্য কেন, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ এবং এমন কি—বৃক্ষাদিকেও কার্পাসসূত্র ধারণ করাইয়া দিলে, তাহাদেরও মুক্তির পথ পরিষ্কার করিয়া দেওয়া যায়! তবে তুমি যদি বল, আমি কার্পাসসূত্রধারী ব্যক্তিকেই 'ব্রাহ্মণ' এই পারিভাষিক সংজ্ঞা দিলাম, সে পৃথক্ কথা। তুমি যদি বল যে লোহকে স্বর্ণ বলিব, তাহা অনায়াসে পার; কারণ শব্দপ্রয়োগ তোমার আয়ত্বাধীন, কিন্তু বাক্যের দ্বারা বস্তুর অন্যথা সিদ্ধি হয় না। অর্থাৎ স্বর্ণকে লোহ বলিলে, তাহার স্বর্ণত্ব যায় না, কিম্বা লোহকে স্বর্ণ বলিলে, তাহার লোহত্ব যায় না। তদ্রূপ তুমি যে বস্তুকেই কার্পাসসূত্র ধারণ করাও এবং তাহাকে যে সংজ্ঞার দ্বারাই অভিহিত কর, সেই বস্তুর সেই বস্তুত্ব যাইবার নহে। বাক্যের দ্বারা বস্তুর অন্যথা হয় না।

পাঠক, এখন পুনর্ব্বার ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্বের গূঢ় রহস্য কি, তাহা চিন্তা করুন। ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্বের গূঢ় রহস্য তাঁহার আমিত্বের প্রসার,

তাঁহার সাত্ত্বিকতা, তাঁহার পরোপকারবৃত্তি। বিশ্বের বৈচিত্র্য তিনটি শক্তি লইয়া ; ঐ তিনটি শক্তি বিবিধ নামে অভিহিত হইয়া থাকে, যথা,—অ, উ,ম ; ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব ; সত্ত্ব, রজ, তম ; বায়ু, পিত্ত, কফ ; পৌরাণিক ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবও যাহা, সত্ত্ব, রজ, তমও তাহাই। বিশেষ চিন্তা করিয়া দেখিলে দেখিতে পাইবেন, কোন প্রভেদ নাই। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব তিনই আদ্যাশক্তি-সম্ভূত। এই আদ্যাশক্তি ব্রহ্মের শক্তি, মায়া, প্রকৃতি। এই প্রকৃতি ত্রিগুণ-বিশিষ্টা ; এক এক গুণের আশ্রয়কারী চৈতন্যকে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব নামে অভিহিত করা হইয়াছে। একটু চিন্তা করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন যে, এই ত্রিশক্তি সর্ব্বাধারেই আছে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবকে স্রষ্টা, পালক ও সংহারক বলা হইয়া থাকে। প্রত্যেক বস্তুতেই এই তিন শক্তি বিদ্যমান। ঐ যে অশ্বত্থবীজের কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি, ঐ অশ্বত্থবীজের মধ্যেও এই তিনটি শক্তিই পরস্পরের অস্তিত্বের জন্য পরস্পর সাপেক্ষ। একটী না থাকিলে আর দুইটি থাকে না। এই সমুদায় কথা বিশদ্‌ভাবে ব্যাখ্যা করিতে গেলে, প্রবন্ধের কলেবর অনেক বৃদ্ধি হইয়া পড়িবে ; যাহা হউক সংক্ষেপতঃ যতদূর পারি, চেষ্টা করিব। অশ্বত্থবীজের কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ঐ অশ্বত্থবীজ কি করে ? মৃত্তিকায় পতিত হইলেই, ভূমি, বায়ু এবং আলোকাদি হইতে উহা উপাদান সংগ্রহ করিতে থাকে। এইটিই বড় কষ্টের অবস্থা। মনে কর, আমি একটি কবিতা লিখিতেছি, ঐ কবিতা লিখিতে আমার ভিন্ন ভিন্ন ভাব, ভিন্ন ভিন্ন ভাবোপযোগী ভিন্ন ভিন্ন শব্দ সংগ্রহ করিতে হইতেছে ; একবার হয় ত ভাব হইল, শব্দ হইল না, শব্দ হইল ত ভাব হইল না, ইহাকেই রাজসিক অবস্থা বলে, ইহাকেই ক্রিয়ানিষ্পাদনকারী অবস্থা বলে। যে পর্য্যন্ত আমার ভাব শব্দ না হইতেছিল, সে পর্য্যন্ত অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করিতেছিলাম ; ভাব শব্দ জুটিলে, মনে অতুল আনন্দ আসিল ; ইহাই সাত্ত্বিক অবস্থা। অশ্বত্থ-বীজেরও অঙ্কুর উদ্গম যে পর্য্যন্ত না হইয়াছিল, সে পর্য্যন্ত উহার কার্য্যকারী রাজসিক ভাব ছিল, কিন্তু যাই অঙ্কুর উদ্গম হইল, সেই উহার সাত্ত্বিক অবস্থা হইল, বলা যাইতে পারে। তৎপরে যতদিন ঐ বৃক্ষ জীবিত থাকিবে, ততদিন উপর্য্যুপরি উহার রাজসিক ও সাত্ত্বিক অবস্থা হইবে। কিন্তু এই দুই অবস্থা ব্যতীত, উহার আর একটি অবস্থা হইতে পারে। ঐ অবস্থার নাম তামসিক। অঙ্কুরোদ্গমের পূর্ব্বেই উহা ধ্বংস হইয়া গেল। দুইটি বীজ একস্থানে স্থাপন কর, একটীর অঙ্কুর উদ্গম হইল, আর একটির হইল না। যদি বল, তাহ, জল, বায়ু, মৃত্তিকা বা আলোকের বিরুদ্ধ-স্বভাব-ক্রিয়াবশতঃ উহার অঙ্কুরোদ্গম হয় নাই, তাহার উত্তরে বলি, যে যদি তাহা হইল, তবে আর একটির ধ্বংস হইল না কেন ? তাহাহইলেই স্বীকার করিতে হয়, যে ঐ বীজে এমন একটী অবস্থা অধিক পরিমাণে ছিল, যে অবস্থা অপরটিতে ছিল না এবং যে অবস্থার আধিক্যহেতু, জল-বায়ু আদি যাহা একের বর্দ্ধক হইল, তাহা অপরের সংহারক হইল। এই অবস্থাই তামসিক। ঐ অশ্বত্থবীজটিতে তামসিকগুণ অধিক পরিমাণে থাকাতে, উহা বর্দ্ধিত হইয়া অঙ্কুরিত হইতে পারিল না, ধ্বংস হইয়া গেল। যদি বল জল-বায়ু আদিতেই ধ্বংস-শক্তি আছে, তাহাহইলে জল-বায়ু আদি দ্বারা অপর বীজটি পরিবর্দ্ধিত হওয়ায়, ঐ জল-বায়ুতেও ধ্বংসশক্তি ও বর্দ্ধন-শক্তি, এই দুই শক্তি প্রতিপন্ন হইল। যে বস্তুতেই বুঝ, এটুকু নিশ্চয়ই বুঝিতে হইবে, যে

সৃষ্টির মধ্যে যেরূপ সংহারোপযোগিনী একটি শক্তি আছে, সেইরূপ বর্দ্ধনোপযোগিনী একটি শক্তি আছে। ঐ বর্দ্ধনোপযোগিনী শক্তির নাম বিষ্ণুশক্তি বা রজ এবং সংহারোপযোগিনী শক্তির নাম শিবশক্তি বা তম; আর বর্দ্ধনোপযোগিনী শক্তি যখন সংহারোপযোগিনী শক্তিকে পরাভূত করিতে সক্ষম হয় এবং বস্তুর বিকাশ বা প্রকাশ বা সৃষ্টি হয়, তখনই বস্তুর সাত্ত্বিকগুণ প্রতিভাত হয়। উহাই তাহার সাত্ত্বিক অবস্থা। এই বিশ্বের যে দিকে দৃষ্টিপাত কর, সেই দিকেই দেখিবে যে, বিষ্ণু ও শিবের সহিত প্রতিমুহূর্ত্তে বিশাল সংগ্রাম চলিতেছে। এক জন জগৎ ধ্বংস করিবার জন্য উদ্যত, আর এক জন জগৎ বিবর্দ্ধিত করিবার জন্য কটিবদ্ধ। প্রত্যেক অণুতে অণুতে এই তুমুল সংগ্রাম চলিতেছে। এই দুই শক্তি আবার পরস্পর সাপেক্ষ। এক শক্তি না থাকিলে, আর এক শক্তি থাকিতে পারে না। আমার এই কাচের মস্যাধারের অণুর মধ্যেও সংগ্রাম চলিতেছে। অণুগুলিতে তামসিকশক্তি থাকায়, উহারা বিচ্ছিন্ন হইয়া ঐ মস্যাধারের ধ্বংস সাধন করিবার চেষ্টায় আছে, কিন্তু উহাদের মধ্যে যে রাজসিকশক্তি আছে, তাহা আবার উহাদিগকে বিচ্ছিন্ন হইতে দিতেছে না, একত্র করিয়া রাখিতেছে। যখন রাজসিকশক্তির দ্বারা তামসিক ধ্বংসশক্তি পরাভূত হইল, তখন মস্যাধার উৎপন্ন হইল; উহাই মস্যাধারের সাত্ত্বিক অবস্থা। বস্তুর প্রকাশাত্মক অবস্থাই উহার সাত্ত্বিক অবস্থা। কিন্তু এই প্রকাশক সাত্ত্বিক অবস্থার মধ্যেই ঐ দুই শক্তি, অর্থাৎ তামসিক ধ্বংসশক্তি এবং রাজসী রক্ষণ বা বর্দ্ধনশক্তি নিহিত আছে। ঐ মস্যাধার অগ্নিতে উত্তপ্ত কর, উহার ধ্বংসকারী তামসিকশক্তির বৃদ্ধি হইয়া, উহা এখনই ভাঙ্গিয়া যাইবে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, বস্তুর প্রকাশভাবই তাহার সাত্ত্বিকভাব, বিকাশ বা প্রকাশোন্মুখ ভাব রাজসিকভাব, বিকাশ বা প্রকাশের বিঘ্নকারীভাব তামসিকভাব। কার্য্য করিবার যে ইচ্ছা, তাহা রাজসিক, কার্য্য করিতে যে অনিচ্ছা, তাহা তামসিকভাব। রাজসিকশক্তিকে কর্ম্মশক্তি বলা যায়, তামসিকশক্তিকে অকর্ম্মশক্তি বলা যায়। রাজসিকশক্তি দ্বারা বীজ, অঙ্কুর, পত্র, শাখা, ফল, পুষ্পাদি হইতেছে, তামসিকশক্তির দ্বারা আবার উহারা শুষ্ক হইয়া ধ্বংসপ্রাপ্ত হইতেছে। যে পর্য্যন্ত রাজসিকশক্তির প্রবলতা থাকে, সে পর্য্যন্ত বৃক্ষ সজীব, তামসিকশক্তির প্রবলতা হইলেই বৃক্ষ নির্জীব। মৃত্যুকালে সকলেরই কফ, শ্লেষ্মা, শিব বা তমশক্তির অধীন হইতে হয়। এখন দেখ, এই তমশক্তি আছে বলিয়াই এই রজশক্তি। আমার সম্মুখে পুস্তকগুলি বিশৃঙ্খলভাবে রহিয়াছে, আমি উহাদিগকে সুশৃঙ্খলভাবে রাখিলাম, আবার একটি বালক উহা বিশৃঙ্খল করিয়া ফেলিল। বিশৃঙ্খল না থাকিলে শৃঙ্খল কোথায় থাকিত? মৃত্যু আছে বলিয়াই জীবন, দুঃখ আছে বলিয়াই সুখ, শীত আছে বলিয়াই গ্রীষ্ম আছে। সংসারে যদি দুঃখ না থাকিত, তাহাহইলে সুখ বলিয়া কোন জিনিষ থাকিত না। উপরোক্ত মস্যাধারের উদাহরণ লউন। উহার প্রত্যেক অণুতে এমন একটা শক্তি আছে, যাহা অপর অণুর সহিত মিলিত হইয়া, উহার প্রকাশ বা সাত্ত্বিকভাব মস্যাধারে পরিণত হয় এবং উহার প্রত্যেক রেণুতে আর একটি এমন শক্তিও আছে, যে প্রত্যেক রেণু অপর রেণু হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ঐ সাত্ত্বিকভাব পরিণত মস্যাধারের ধ্বংস সাধন করে। পৃথিবীগ্রহ যে সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিতেছে, সে কেবল দুইটি বিরুদ্ধ স্বভাবগতি বা শক্তি আছে বলিয়া।

উহার একটি শক্তিদ্বারা পৃথিবী সূর্য্যের কেন্দ্রাভিমুখে ধাবিত হইতেছে, আর একটি শক্তিদ্বারা বিপরীতদিকে ধাবিত হইতেছে। এই দুই শক্তির বলে, উহা সূর্য্যের মধ্যেও পতিত হইতে পারিতেছে না এবং সূর্য্য ছাড়িয়াও যাইতে পারিতেছে না, সূর্য্যের চারিদিকেই পরিভ্রমণ করিতেছে। মস্তাধারের অণুগুলি তম-শক্তিবলে বিচ্ছিন্ন ছিল বলিয়াই, রজশক্তিবলে উহারা একত্রিত হইয়া মস্তাধারের উৎপত্তি করিয়াছে। শরীরের ক্ষয় আছে বলিয়াই উহার বৃদ্ধি আছে এবং বৃদ্ধি আছে বলিয়াই ক্ষয় আছে। উহার একটি না থাকিলে, আর একটি থাকিতে পারে না। যদি ক্ষয় না থাকে, তাহাহইলে বৃদ্ধির উপলব্ধি কোথায় এবং যদি বৃদ্ধি না থাকে, তাহাহইলে ক্ষয়ের উপলব্ধি কোথায়? বস্তুর ধ্বংস না থাকিলে, উহার অস্তিত্বের উপলব্ধি নাই এবং অস্তিত্ব না থাকিলে, ধ্বংসের উপলব্ধি নাই। বিকর্ষণ না থাকিলে, আকর্ষণ হইবে কেমন করিয়া? চুম্বক লৌহকে আকর্ষণ করে; যদি চুম্বক আর লৌহের মধ্যে একটি বিকর্ষণ-শক্তি না থাকিত, তাহাহইলে আকর্ষণ হইবে কেমন করিয়া? এই লেখনীর অণুগুলি পরস্পর মিলিত, কিন্তু ইহারা অমিলিত অবস্থায় ছিল বলিয়াই মিলিত হইয়াছে; যদি অমিলিত অবস্থায় না থাকিত, তাহাহইলে মিলিত অবস্থাটির উপলব্ধি কোথায়? লেখনীটি চূর্ণ করিয়া ফেল, ঐ দেখ অণুগুলি বিশ্লিষ্ট হইয়া গেল। সুতরাং সত্ত্বের সংস্থাপক রজ ও নাশক তম পরস্পর সাপেক্ষ। প্রকাশের বিঘ্নকারী বা প্রতিকূল ভাব থাকাতেই প্রকাশের অনুকূলভাব আছে। এই জগৎ হরিহরাত্মক। বিষ্ণু ও শিবের মধ্যে কেহ কাহা অপেক্ষা ক্ষুদ্র নহেন। শিবের সংহারশক্তি আছে বলিয়াই, বিষ্ণুর রক্ষাশক্তি। রোগে প্রাণ ধ্বংস হয় বলিয়াই, ঔষধদ্বারা উহা পরিরক্ষিত হয়, এই জন্যই রোগের সময় বিষ্ণু ও মহাদেবের যুদ্ধসংবাদ শ্রবণের ব্যবস্থা। তম ও রজশক্তির সামঞ্জস্যই হরিহরাত্মক বিশ্ব। হরিহরের দ্বন্দ্বই এই দ্বন্দ্বাত্মক বিশ্ব।

সত্ত্বগুণেই প্রকাশ অবস্থা; গীতা বলেন:— 'সত্ত্বং প্রকাশকম্'। রজ ও তমের সংগ্রাম-মধ্যগত সামঞ্জস্যভাবজনিত বস্তুর যে সম্পন্নতা, তাহাই সাত্ত্বিক অবস্থা। রজগুণ "রাগাত্মকং" এবং উহার ফল "কর্ম্ম-সঙ্গ"। যে শক্তিদ্বারা বিশ্ব ক্রিয়াশীল রহিয়াছে, তাহাই রজশক্তি; যে শক্তি দ্বারা বিশ্বের এই ক্রিয়াশীলতার বিঘ্ন ঘটে, উহাই তামসিক অবস্থা। অনেক সময় তামসিক ভাবের সহিত সাত্ত্বিক ভাবের ভ্রম হইতে পারে। গোলাপটি সম্পূর্ণরূপে প্রস্ফুটিত হইয়াছে। এইক্ষণ তাহাতে আর রজশক্তির কোন ক্রিয়া লক্ষিত হইতেছে না। তুমি মনে করিতে পার যে, ওটি উহার তামসিক অবস্থা, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নয়, ক্রিয়ার পূর্ণাবস্থাই সাত্ত্বিক ভাব। ক্রিয়ার পূর্ণাবস্থা অক্রিয়ার ন্যায় কখন কখন পরিলক্ষিত হয়। একটি ঘড়ী খুল, উহার স্প্রিংএর গতি লক্ষ্য কর, হঠাৎ দেখিলে বোধ হইবে যে উহা গতি শূন্য, কিন্তু বস্তুতঃ উহা অত্যন্ত দ্রুতবেগে ঘুরিতেছে। ক্রিয়ার পূর্ণাবস্থা অক্রিয়ার ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে। সমুদায় জগতে যে ত্রিবিধ শক্তির বিকাশ লক্ষিত হয়, মানবের দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, জ্ঞান, কার্য্যাদিতেও ঐ ত্রিবিধ ভাব দৃষ্ট হয়। ফুল্ল ফুল কি আনন্দপ্রদ, উহাই ফুলের সাত্ত্বিক অবস্থা এবং উহার ফল সুখ। সত্ত্বগুণের ফলই সুখ। "সুখসঙ্গেন বধ্নাতি"। ক্রিয়াত্মক রজগুণের ফল দুঃখ। যখন কোন সমস্যা পূরণ করিতে হয়, সেই অবস্থাটি স্মরণ করুন এবং ঐ সমস্যা পূরণ হইলে যে অবস্থা হয়,

তাহাও স্মরণ করুন্। প্রথমটি রাজসিক, দ্বিতীয়টি সাত্বিকভাব। আর যখন কোন বৃদ্ধিই হইতেছে না, চেষ্টাও হইতেছে না, অন্তঃকরণ জড়বৎ রহিয়াছে, সেই অবস্থাটিও চিন্তা করুন্। উহাই তামসিক অবস্থা। সাত্বিক ব্যক্তির সাত্বিক কার্য্য, সাত্বিক আহার-বিহার হইয়া থাকে এবং সত্বগুণোপযোগী কার্য্য, চিন্তা এবং আহারাদির দ্বারা সত্বগুণের উদ্ভব হয়। প্রত্যেক মানবেতেই তিনটি গুণই রহিয়াছে; ইহার যেটি বৃদ্ধি করিতে ইচ্ছা কর, সেইটিই বৃদ্ধি করিতে পার এবং যেটি হ্রাস করিতে ইচ্ছা কর, সেটি হ্রাস করিতে পার।

সাত্বিক চিন্তা, সাত্বিক কার্য্য, সাত্বিক আহার-বিহার দ্বারা সাত্বিক জ্ঞানের উদয়। সাত্বিক জ্ঞান হইলে, সর্ব্বভূতে অব্যয়ভাব অর্থাৎ এক নির্ব্বিকার পরমাত্ম-তত্ব দৃষ্ট হয়, ঐ পরমাত্ম-তত্ব পৃথক্ পৃথক্ দৃষ্ট হইলেও স্বরূপতঃ অবিভক্ত।

'সর্ব্বভূতেষু যেনৈকং ভাবমব্যয়মীক্ষতে।
অবিভক্তং বিভক্তেষু তজ্জ্ঞানং বিদ্ধিসাত্বিকং॥'

গীতা ১৮।২০

যখন সর্ব্বভূতের "আমিতে" আমার "আমি" দেখিতে পাইলাম, যখন আমার "আমিতে" সর্ব্বভূতের "আমি" দেখিতে পাইলাম, তখনই সাত্বিকজ্ঞান হইল। অতএব আমিত্বের প্রসারই সাত্বিকতার কারণ, সাত্বিকতাই ব্রাহ্মণত্বের কারণ। সাত্বিক ব্যক্তির শম, দম, তপ, শৌচাদি সাত্বিকক্রিয়াই স্বভাবজ। এই জন্য ব্রাহ্মণের ঐ সমুদায় ক্রিয়া স্বাভাবিক বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

'শমোদমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জ্জবমেব চ।
জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম্ম স্বভাবজম্॥'

গীতা।

কিন্তু যে ব্যক্তির সাত্বিকগুণ নাই, কিম্বা যে ক্রিয়াদ্বারা সত্বগুণের উদ্ভব হইতে পারে, এমন ক্রিয়াও নাই, তাহার গলদেশে পৃথিবীস্থ তাবৎ কার্পাসসূত্র দিলেও তিনি সাত্বিক হইতে পারিবেন না। আমিত্বের প্রসার দ্বারাই সাত্বিকতা অধিকার করা যায় এবং সাত্বিকতা দ্বারাই ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার লাভ করা যায়। অতএব হে মানব! মানবের এই কর্ম্মদেহ ধারণ করিয়া যদি তুমি ব্রহ্মজ্ঞানে বঞ্চিত থাকিলে, তবে আর তোমার জীবনে ফল কি? ব্রহ্মকে জানিতে পারিলেই দুর্লভ মানবজন্ম সার্থক হয় এবং না জানিতে পারিলেই বৃথা যায়।

'ইহ চেদবেদীদথ সত্যমস্তি ন চেদিহাবেদীন্ মহতীবিনষ্টিঃ। ভূতেষু ভূতেষু বিচিন্ত্য ধীরাঃ প্রেত্যাস্মাল্লোকাদমৃতা ভবন্তি॥'

মানব ব্রহ্মকে জানিতে পারিলেই, তাহার জীবন সফল হয়, ব্রহ্মকে জানিতে না পারিলে, তাহার মহান্ বিনাশ উপস্থিত হয়, অর্থাৎ পুনঃপুনঃ জন্ম-মরণাদির ক্লেশ সহ্য করিতে হয়। এই জন্য ধীর ব্যক্তিরা সর্ব্বভূতে ব্রহ্ম দর্শন করিয়া, ইহলোক হইতে উপরত হইয়া অমরত্ব লাভ করেন। অতএব হে মানব! সর্ব্বভূতে স্বীয় "আমি" প্রসারিত কর, ব্রাহ্মণের উচ্চ আদর্শ হৃদয়মন্দিরে স্থাপন করিয়া উহার দিকে অগ্রসর হও, জীবন বৃথায় যাইবে না। ক্রমশঃ—

কস্যচিদ্‌পরিব্রাজকস্য।

আমিত্বের প্রসার।

কুকুরের স্বর্গারোহণ।

(গল্প নহে, প্রকৃত ঘটনা।)

আমি যে পল্লীতে বাস করিতাম, সেই পল্লীতে একটি কুকুর ছিল। সে কাহারও পালিত নহে, এই জন্য তাহার কোন নাম ছিল না। বালক-বালিকারা তাহাকে ডাকিবার সময় "আতু" বলিয়া ডাকিত; শেষে "আতু"ই তাহার নাম হইয়া দাঁড়াইল। আতু মানুষের, বিশেষঃ বালক-বালিকারই সঙ্গ বড় ভাল বাসিত। আতুকে অন্য কুকুরাদির সহিত প্রায় মিশিতে দেখা যাইত না। আতু যখন মানুষের সঙ্গ না পাইত, তখন এক প্রতিবেশীর ছাদের উপর যাইয়া কার্নিশের উপর শুইয়া থাকিত। ছাদে উঠিবার জন্য বাহিরে একটি সিঁড়ি থাকায়, তাহার এই কার্য্যে কেহ কখন বাধা দিত না। বালক-বালিকা দেখিলেই আতু ছাদ হইতে নামিয়া আসিয়া তাহাদের সহিত খেলা করিত। বালক-বালিকারা আতুর উপর কত সময় কত অত্যাচার করিত, কিন্তু আতু তাহাদিগকে কখনও কামড়ায় নাই বা আঁচড়ায় নাই। কোন কোন দুরন্ত বালক কখন কখন আতুর মুখের মধ্যে হাত প্রবেশ করাইত, কিন্তু আতু কিছুই বলিত না। আতুর গলায় দড়ি বাঁধিয়া কখন তাহারা ভালুক নাচান খেলা খেলিত, কখন তাহার পৃষ্ঠে অশ্বারোহণের ন্যায় আরোহণ করিত এবং উপর্য্যুপরি বেত্রাঘাত করিত, কিন্তু আতু নিঃশব্দে সমুদায় অত্যাচারই সহ্য করিত। যখন বেশী যন্ত্রণা বোধ করিত, তখন আতু মধ্যে মধ্যে চীৎকার করিয়া উঠিত, কিন্তু পালাইবার চেষ্টা করিত না কিম্বা বালকদিগের উপর কখনও কোন অত্যাচার করিত না। আহারাদিতে আতুর বিশেষ আসক্তি ছিল না; আতু বলিয়া ডাক দিয়া, যে যাহা দিত, আতু তাহাই খাইত; কেহ না ডাকিলে, আতু নড়িত না। এইরূপে আতু কাল কাটাইত। আতুর কিন্তু একটি বিশেষ ভয়ের কারণ ছিল। আতু বড় একটা কুকুরদিগের সহিত মিশিত না; কুকুরগণ আতুকে পাইলেই আক্রমণ করিত এবং আতু কখন কখন তাহাদের দন্তাঘাতে বড়ই কষ্ট পাইত। আতুর মাঝে মাঝে এইরূপে বিশেষ কষ্ট পাইতে হইত। আতুর ঘাড়ে ক্ষত হইলে, তাহাতে দুর্গন্ধ হইত; তখন আর তাহার আদর থাকিত না; বালকেরা ঢিল, লাঠি মারিয়া তাহাকে তাড়াইত; আতু অপারগ হইয়া শেষে পল্লী পরিত্যাগ করিয়া কোথায় যাইত, কেহই জানিত না। এইরূপ মাঝে মাঝে তাহার পল্লী পরিত্যাগ করিতে হইত এবং ক্ষত সারিলেই আবার আসিত। একবার এইরূপ অনেক দিন পরে আতু ক্ষত সারিয়া পল্লীতে উপস্থিত। এই সময়ে কুকুরীগণ প্রসব করিয়াছে এবং একটি কুকুরী পাঁচ ছয়টি ছানা রাখিয়া পরোলোক গমন করিয়াছে। দুই তিন দিন বায়, ছানাগুলি না খাইতে পাইয়া মরিবার মত হইল। এই সময় আতু সেই স্থানে উপস্থিত। আতু সেই দিন হইতে নিজে আহার করিয়া ছানাগুলির নিকটে যাইয়া বমন করিতে আরম্ভ করিল এবং ছানাগুলি তাহা উদরস্থ করিয়া জীবিত রহিল! ক্রমে ছানাগুলি বড় হইল এবং নিজেরা আহারের সংস্থান করিতে শিখিল। এস্থলে বলা আবশ্যক, আতুর সহিত ছানাগুলির সন্তান সম্বন্ধ ছিল না। ইতি মধ্যে আতু আবার কয়েকটি কুকুরদ্বারা আক্রান্ত হইল।

দন্তাঘাতে তাহার ঘাড়ে ক্ষত হইল এবং ঐ ক্ষততে অত্যন্ত দুর্গন্ধ হওয়ায়, আতু আল্লার পল্লী পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইল। অনেক দিন পরে আতু উপস্থিত হইল, কিন্তু আতুর ক্ষত এবার সারে নাই।

আতুকে অনেক দিন পরে দেখিয়া, আমি তাহাকে দেখিতে রাস্তার উপর গেলাম। আমি যাইতে না যাইতে আতু রাস্তার উপর পড়িয়া গেল ও সতৃষ্ণনয়নে আমার দিকে চাহিয়া রহিল এবং যেন বলিতে লাগিল, "কুকুরের যে আমিত্বের প্রসার আছে, মানুষের তাহাও নাই, ধিক্ মানুষে! কিন্তু আমার দুঃখের অবসান হইল, আর তোমাদের দ্বারে উপস্থিত হইয়া তাড়িত হইতে হইবে না।" আতু ঊর্দ্ধদিকে দৃষ্টিপাত করিল। আমিও ঐ দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখি—মৃত কুকুরের দেহের উপরে একটি জ্যোতিঃপুঞ্জ! কুকুরের দেহ হইতে আর একটি জ্যোতিঃ বিনির্গত হইয়া উহার সহিত মিশিয়া গেল! আমার মোহনিদ্রা ভঙ্গ হইল।

কস্যচিদ্‌পরিব্রাজকস্য।

আমিত্বের প্রসার।

কোকিলের অভিশাপ।

কে জানে কেন, কোকিলের রব আমায় বড় ভাল লাগিত। কে জানে কেন কোকিলের রব শুনিলে আমার আহার নিদ্রা থাকিত না। কোকিল এক বৃক্ষের শাখায় উপবিষ্ট হইয়া ডাকিয়া অন্যত্র চলিয়া গেল, আমিও কোকিলের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলাম। এইরূপে সারাদিন হয়ত কোকিলেরই অনুসরণ করিতাম। কোকিলের ডাক একবার শুনিয়া পুনর্ব্বার শুনিতে না পাইলে হৃদয়ে যে, অভাব উপলব্ধি হইত, সে অভাব অন্য কিছু দ্বারাই পূরণ হইত না। প্রেমতরঙ্গ হৃদয় কখনও উদ্বেলিত করে নাই, অথচ কোকিলের রব ভাল লাগিত। বিরহ কখনও হৃদয় তাপিত করে নাই, অথচ কোকিলের ডাকে মন কিরূপ ব্যাকুল হইয়া উঠিত। প্রিয়জন ছিল না, অথচ যেন তাহার অভাব হৃদয়ে অনুভব করাইয়া দিত। কোকিলের ধ্বনি ই যে শুধু ভাল লাগিত, তাহা নহে, তাহার রূপও বড়ই প্রীতিকর বোধ হইত। যত দেখিতাম, ততই দেখিতে ইচ্ছা করিত। যে কবি এহেন কোকিলকে কুরূপ বলিয়া বর্ণনা করেন, তাঁহাকে শত ধিক্কার। অপরের যাহাই হউক, আমি কিন্তু কোকিলকে বড়ই সুন্দর দেখিতাম। কোকিল আমার, নতুবা কোকিলকে এত ভালবাসি কেন? কোকিল আমার, নতুবা কোকিলের অভাবে হৃদয় শূন্য বোধ করি কেন? কোকিল আমার, নতুবা কোকিলের অভাবে আমার আমিতে আমি নাই বলিয়া বোধ করি কেন? কোকিল আমারই হইবে, কোকিলকে আমারই করিব, এই পণে এক দিন বৃক্ষে আরোহণ করিলাম, কোকিলকে আমার করিতে। কোকিল আমার হইল না, সে বৃক্ষান্তরে চলিয়া গেল; আমিও বৃক্ষান্তর আরোহণ করিলাম, কোকিলকে আমার করিতে; কোকিল কিন্তু এবারও আমার হইল না, সে আবার বৃক্ষান্তরে চলিয়া গেল। আমি কোকিলকে আমার করিতে কৃতসঙ্কল্প;

কোকিল আমার হইবে না বলিয়া কৃতসঙ্কল্প। কোকিল ও আমাতে, 'আমার করিব', 'আমার হইবে না', এই ভাবে আমিত্ব ও অনামিত্ব এই উভয়ের মধ্যে কিছু দিন তুমুল সংগ্রাম চলিল। অবশেষে কোকিলের পরাজয় হইল, আমার "আমার করিবারই" জয় হইল। ব্যাধের কৌশল-সাহায্যে এক দিন কোকিলকে 'আমার' করিলাম। কোকিলকে আমার করিয়া, আমার গৃহে, আমার পিঞ্জরে, আমার কোকিল আমি রাখিলাম,—আমার কোকিলের ধ্বনি আমি শুনিব, আমার কোকিলের রূপ আমি দেখিব বলিয়া—দিবারাত্রি অবিরাম ভাবে। কোকিল কিন্তু আমার হইয়াও আমার হইল না। কোকিল আমার গৃহে, আমার পিঞ্জরে অনশন-ব্রত ধারণ করিল। কোকিল আর ডাকে না; যে ডাক শুনিতে কোকিলকে আমার করিলাম, সে ডাক আর ডাকে না। যে রূপ দেখিতে কোকিলকে আমার করিলাম, কোকিলের সে রূপ আর রহিল না। কোকিল যথার্থই কুরূপ হইল। এইরূপে এক দিন যায়, দুই দিন যায়, কোকিল কিছুতেই আমার হয় না। কত সাধ্যসাধনা করিলাম, কিছুতেই ডাকে না। কত সুমিষ্ট ফল আনিয়া দিলাম, কিছুই খায় না; চক্ষু মুদিয়া পিঞ্জর মধ্যে সে তার নিজের ভাবেই ভোর হইয়া রহিল! কিছুতেই চোক মেলে না। এইরূপে তিন দিন গেল; চতুর্থ দিন আবার কত বিনয়বাক্য বলিলাম, কত সাধ্য-সাধনা করিলাম, কত সুমিষ্ট ফল দিলাম, কিন্তু সকলই বিফল হইল। তখন মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম, কোকিল সকলের; কোকিলকে কেবল আমার করিবার আমার কি অধিকার আছে? কিন্তু আমিত্ব, অনামিত্ব বা আমিত্বের প্রসারকে পরাভব করিয়া প্রবলই রহিল। কোকিলকে আমারই পিঞ্জরে আমারই করিয়া রাখিলাম বটে, কোকিল কিন্তু আমার হইল না; আমাকে তদবস্থা দেখিয়া কোকিল চক্ষু মেলিয়া তাহার নিকট আসিতে ইঙ্গিত করিল। কোকিল আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছে ভাবিয়া পিঞ্জরের নিকটে গেলাম। কোকিল তখন অস্ফুট ও অস্পষ্ট ক্ষীণ চিঁচিঁ স্বরে আমাকে বলিতে লাগিল "তোমার আমিত্ব অতি প্রবল। আমিত্ব প্রবল থাকিলে, কাহাকেও 'আমার' করা যায় না; সুতরাং তুমিও আমাকে তোমার করিতে পারিলে না। আমি আমার নই, তোমারও নই, আমি এই অনন্ত বিশ্বের; যে আমিত্বের প্রসার করিতে পারে, সেই জগৎকে নিজস্ব করিতে পারে।" আমি কোকিলের কথার উত্তর দিতে উদ্যত, এমন সময়ে কোকিল আমাকে বাধা দিয়া পুনরায় কহিল "তোমার তর্ক, বিচার শুনিতে চাহি না; তুমি আমাকে তোমার করিবার জন্য অসহ্য যন্ত্রণা দিয়াছ, তজ্জন্য তোমাকে এই অভিশাপ দিতেছি যে, তোমাকে আমার ন্যায় চিরগৃহশূন্য হইয়া বিচরণ করিতে হইবে এবং যখন তোমার প্রবল আমিত্বের ধ্বংস করিয়া, আমার ন্যায় জগতের হইয়া জগতের সেবা করিতে পারিবে, তখনই তোমার এই অভিশাপের মোচন হইবে এবং পরম ধাম প্রাপ্তি হইবে।" এই বলিতে বলিতে কোকিলের ক্ষীণকণ্ঠ নীরব হইল, চক্ষু মুদিয়া আসিল; আমার সেই সাধের কোকিল স্বপ্নের মত আমাকে ফেলিয়া চলিয়া গেল।

কস্যচিৎপরিব্রাজকস্য।

মণিরত্নমালা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

মূল—১২।

"কো বা জ্বরঃ প্রাণভৃতাং হি চিন্তা, মূর্খস্তু কো যস্তু বিবেকহীনঃ। কার্য্যা সদা কা শিববিষ্ণুভক্তিঃ কিং জীবনং দোষবিবর্জ্জিতং যৎ॥

৩২। শিষ্য প্রশ্ন করিলেন, প্রাণিগণের জ্বর কি? গুরু উত্তর করিলেন—চিন্তা।

স্বেদাবরোধঃ সন্তাপঃ সর্ব্বাঙ্গগ্রহণং তথা।
যুগপদ্ যত্র রোগে চ স জ্বরো ব্যপদিশ্যতে॥"

যে রোগে এক সময়েই ঘর্ম্মাবরোধ, সন্তাপ ও সর্ব্বশরীর আক্রান্ত হয়, তাহারই নাম জ্বর। "জনকঃ সর্ব্বরোগাণাং দুর্ব্বারো দারুণো জ্বরঃ" জ্বর অতিশয় ভয়ঙ্কর ও দুর্ব্বার এবং ইহা হইতে সমস্ত রোগ উৎপন্ন হয়। চিন্তাদ্বারাও এইরূপ ঘটনা ঘটিয়া থাকে। তাই বলিয়াছেন।

"চিন্তাজ্বরো মনুষ্যাণাং ক্ষুধাং নিদ্রাং বলং হরেৎ।
রূপমুৎসাহবুদ্ধিং শ্রীং জীবিতঞ্চ ন সংশয়ঃ॥"

চিন্তাই মানবগণের জ্বর; ইহা ক্ষুধা, নিদ্রা, বল, রূপ, উৎসাহ, বুদ্ধি, শ্রী ও প্রাণ সমস্তই হরণ করে, তাহাতে সন্দেহ নাই। জ্বর দারুণ রোগ হইলেও চিন্তাজ্বর তদপেক্ষাও অধিকতর ভয়ঙ্কর। কারণ

"জ্বরে ব্যতীতে বড়হে জীর্ণজ্বর ইহোচ্যতে।
অসৌ চিন্তাজ্বরস্তীব্রঃ প্রত্যহং নবতাং ব্রজেৎ॥
সন্তাযুক্তং পুরাবিদ্ভিশ্চিন্তা মূর্ত্তিঃ সুদারুণা।
ন ভৈষজৈর্লঙ্ঘনৈর্ব্বা নৈবান্যৈরুপশাম্যতি॥
চিতা চিন্তা দ্বয়োর্মধ্যে চিন্তানাম গরীয়সী।
চিতা দহতি নির্জ্জীবং চিন্তা প্রাণসমং বপুঃ॥"

সচরাচর যে জ্বর হয়, ছয়দিন অতীত হইলেই তাহাকে জীর্ণজ্বর বলিয়া থাকে; কিন্তু এই চিন্তাজ্বর অতীব ভীষণ, প্রতিদিনই ইহা নূতন আকারে আবির্ভূত হইয়া থাকে, কোনকালেই জীর্ণ হয় না। পুরাবিৎ পণ্ডিতগণ যথার্থই বলিয়াছেন যে ঔষধ, লঙ্ঘন, অথবা তৎসদৃশ অন্যবিধ উপায় কিছুতেই এই সুদারুণ চিন্তার উপশম হয় না। চিতা ও চিন্তা এ উভয়ের মধ্যে চিন্তাই গরীয়সী, যেহেতু চিতা নির্জ্জীবকে দাহ করে, কিন্তু চিন্তা সজীব দেহকে দগ্ধ করিয়া থাকে।

"চিন্তনে নৈধতে চিন্তা স্বিন্ধনেনেব পাবকঃ।
নশ্যত্যচিন্তনেনৈব বিনেন্ধন ইবানলঃ॥"

যেমন শুষ্ককাষ্ঠসংযোগে বহ্নি উদ্দীপিত হয়, সেইরূপ চিন্তাদ্বারাই চিন্তা পরিবর্দ্ধিত হয়। যেরূপ কাষ্ঠের অভাবে বহ্নি নির্ব্বাণ হয়, তদ্রূপ চিন্তার অভাবে চিন্তা বিনষ্ট হয়। অতএব মোক্ষাভিলাষী সাধক "আত্মীয়যোগ-ক্ষেমোপায়-আলোচনাত্মিকা" বিষয়চিন্তা ও সর্ব্ববিধ অসৎ-চিন্তা পরিহার করিয়া, নিত্য শান্তি-সঙ্গ ভগবচ্চরণারবিন্দ চিন্তা করিবেন।

৩৩। মূর্খ কে? যে ব্যক্তি বিবেকহীন, সেই মূর্খ। মূর্খ কে? এই প্রশ্নের উত্তরে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিয়াছিলেন—"মূর্খো দেহাদ্যহং বুদ্ধিঃ" যে ব্যক্তি সৎপদার্থ আত্মাকে বিস্মৃত হইয়া, অসৎপদার্থ দেহাদিতে অহংবুদ্ধি হয়, সেই মনুষ্যই প্রকৃত মূর্খ। "ব্রহ্ম সত্য" এবং "জগৎ মিথ্যা" এইরূপ অবধারণকে বিবেক কহে। এই বিবেক যাঁহার আছে, তিনিই পণ্ডিত; কেবলমাত্র শাস্ত্রজ্ঞ হইলে মনুষ্য পণ্ডিত হয় না। পণ্ডা (আত্মবিষয়াবুদ্ধি) যে ব্যক্তির আছে, অর্থাৎ যিনি আত্মজ্ঞ, তিনিই পণ্ডিত।

৩৪। সর্ব্বদা কি কর্ত্তব্য? শিব এবং বিষ্ণুর প্রতি ভক্তি।

"ন যুজ্যমানয়া ভক্ত্যা ভগবত্যাখিলাত্মনি।
সদৃশোঽস্তি শিবঃ পন্থা যোগিনাং ব্রহ্মসিদ্ধয়ে॥"

(ভাগবত)

অখিল বিশ্বাত্মা ভগবানে (শিবে বা কেশবে) ভক্তিযোগের সমান যোগিগণের ব্রহ্মসিদ্ধির নিমিত্ত শুভজনক পন্থা বা উপায় আর দ্বিতীয় নাই।

ভক্তির স্বরূপ।

(১) সা কস্মৈ পরম প্রেমরূপা, অমৃত-স্বরূপা চ, যল্লব্ধা পুমান্ সিদ্ধো ভবতি, অমৃতো ভবতি, তৃপ্তো ভবতি, অর্থাৎ সেই ভক্তি ঈশ্বরের ঐকান্তিক প্রেমরূপা এবং অমৃতস্বরূপা, যাহা লাভ করিলে মনুষ্য সিদ্ধ, অমৃত এবং তৃপ্ত হইয়া থাকে।

(নারদকৃত ভক্তিসূত্র)

(২) "পূজাদিম্বনুরাগ ইতি পারাশর্য্যঃ"—পরাশরনন্দন মহর্ষি বেদব্যাস বলেন, ভগবানের পূজাদিতে অনুরাগের নাম ভক্তি।

(নারদকৃত ভক্তিসূত্র)

(৩) "কথাদিম্বনুরাগ ইতি গার্গঃ"—গর্গ বলেন ভগবানের গুণানুবাদ শ্রবণে ও কীর্ত্তনে অনুরাগের নাম ভক্তি।

(নারদকৃত ভক্তিসূত্র)

(৪) "সা পরানুরক্তিরীশ্বরে"—ঈশ্বরের প্রতি একান্ত অনুরাগের নাম ভক্তি।

(শাণ্ডিল্যকৃত ভক্তিসূত্র)

(৫) "অনন্য মমতা বিষ্ণৌ মমতা প্রেম-সঙ্গতা। ভক্তিরিত্যুচ্যতে ভীষ্ম-প্রহ্লাদোদ্ধব নারদৈঃ॥"

(নারদপঞ্চরাত্র)

যখন অন্য কোন বিষয়ের প্রতি মমতা না করিয়া একমাত্র ভগবানের প্রতি অন্তঃকরণ একান্ত অনুরক্ত হয়, তখন সেই প্রেমসংযুক্ত ঈশ্বরাসক্তিকে প্রকৃত ভক্তি কহা যায়। ইহা ভীষ্ম, প্রহ্লাদ, উদ্ধব ও নারদাদি ভক্তগণ বলিয়াছেন।

ভক্তির মাহাত্ম্য।

"ত্রিসত্যস্য ভক্তিরেব গরীয়সী" "অন্যস্মাৎ সৌলভ্যং ভক্তৌ" ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান, এই তিন কালেই যিনি সর্ব্বদা সমভাবে সদ্রূপে বিদ্যমান রহিয়াছেন, সেই সত্যস্বরূপ ভগবানের ভক্তিই প্রধান, অর্থাৎ ভগবানকে লাভ করিবার পক্ষে ভক্তিসাধনাই অন্যান্য সকল প্রকার সাধনা অপেক্ষা সহজ, সুগম এবং শ্রেষ্ঠ।

(নারদকৃত ভক্তিসূত্র)

ভক্ত্যেব পূজ্যতে বিষ্ণুর্বাঞ্ছিতার্থ ফলপ্রদঃ।
তস্মাৎ সমস্তলোকানাং ভক্তির্মাতেতি গীয়তে॥

(নারদীয় পুরাণ)

অভীষ্টফলদাতা বিষ্ণু একমাত্র ভক্তি-দ্বারাই আরাধিত হন, এজন্য ভক্তি সর্ব্ব-লোকের মাতা বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হয়।

ভগবান নিজেই বলিয়াছেন :—

"ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ শ্রদ্ধয়াত্মাপ্রিয়ঃ সতাং।
ভক্তিঃ পুনাতিমন্নিষ্ঠাশ্বপাকানপি সম্ভবাৎ॥"

(ভাগবত)

শ্রদ্ধা সহকৃত কেবল এক ভক্তিদ্বারাই আত্মা ও প্রিয় বস্তু যে আমি—সাধুগণের প্রাপ্য হই। আমাতে নিষ্ঠারূপ যে দৃঢ়ভক্তি, তাহা চণ্ডালকেও জাতি-দোষ হইতে পবিত্র করে।

বাসুদেবে ভগবতি-ভক্তিযোগঃ প্রয়োজিতঃ।
জনয়ত্যাশু বৈরাগ্যং জ্ঞানঞ্চ যদহৈতুকং॥

(ভাগবত)

"ভগবান্ বাসুদেবে দাস্য ও সখ্যাদি সহিত ভক্তিযোগ প্রয়োগ করিলে, তৎপ্রভাবে তৎক্ষণাৎ "আমি আমার" ইত্যাকার অভিমানের প্রচার রুদ্ধ হইয়া সংসারে অননুরাগ, সমুদ্ভাবন ও অনুষঙ্গতঃ জ্ঞানের আবির্ভাব সম্পাদন করে।

শুষ্ক তর্কাদি কখনও এই জ্ঞানকে পরাহত করিতে পারে না"।

"ভক্তির্জগিত্রী জ্ঞানস্য ভক্তির্মোক্ষপ্রদায়িনী।"

(অধ্যাত্মরামায়ণ)

ভক্তি হইতেই জ্ঞান জন্মে, ভক্তিদ্বারাই জীব মুক্তিলাভ করে।

সাধক-শ্রেষ্ঠ রামপ্রসাদ সেন বলিয়াছিলেন :—

"সকলের মূল ভক্তি, মুক্তি তার দাসী"

"আমি ভক্তির জোরে কিনতে পারি,
ব্রহ্মময়ীর জমিদারী"।

ভক্তির লক্ষণ।

শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনং।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সৌখ্যমাত্মনিবেদনং।
ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নব লক্ষণা॥

(ভাগবত)

শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য, সৌখ্য ও আত্মনিবেদন ভক্তির এই নয়টী লক্ষণ।

ভক্তি কিরূপে উৎপন্ন হয় ?

ভক্তিস্তু ভগবদ্ভক্তসঙ্গেন পরিজায়তে।

(নারদীয় পুরাণ)

ভগবদ্ভক্তগণের সহবাসে ভক্তি উৎপন্ন হইয়া থাকে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং উদ্ধবকে বলিয়াছিলেন :—

তেষু নিত্যং মহাভাগ মহাভাগেষু সৎকথাঃ।
সম্ভবন্তি হিতা নৃণাং জুষতাং প্রপুনন্ত্যঘং।
তা যে শৃণ্বন্তি গায়ন্তি হ্যনুমোদন্তি চাদৃতাঃ।
মৎপরাঃ শ্রদ্দধানাশ্চ ভক্তিং বিন্দন্তি তে ময়ি॥

(ভাগবত)

ভগবদ্ভক্ত সাধুগণের নিকটে শিষ্ট জনের হিতজনক মদীয় কথন উপস্থিত হয়, তাহা শ্রোতা ভক্তগণের হিতকারী হইয়া পাপ মোচন করে। যে সকল ব্যক্তি আমার প্রতি শ্রদ্ধা-পূর্ব্বক আদরের সহিত সেই সকল কথা শ্রবণ করে বা গান করে কিম্বা তাহাতে অনুমোদন করে, তাহারা আমাতে ভক্তিলাভ করে।

ভক্তিসাধন করিতে হইলে কি কর্ত্তব্য, তাহা, নারদ বলিতেছেন :—

"ভক্তিশাস্ত্রাণি মননীয়ানি তদ্বর্দ্ধককর্ম্মাণ্যপি করণীয়ানি"। "অহিংসা-সত্য-শৌচ-দয়া-আস্তিকতাদি চারিত্র্যাণি পালনীয়ানি"।

(নারদকৃত ভক্তিসূত্র)

"ভক্তি শাস্ত্র (ভাগবতাদি) মনন করিবে, ভক্তি-বর্দ্ধনোপযোগী কর্ম্ম করিবে, অর্থাৎ সাধু-সঙ্গ, তীর্থপর্য্যটন, ভগবৎ কথা শ্রবণ, ভক্তগণের সহিত সদালাপ, ভগবৎসেবা ও গুরু-শুশ্রূষাদি কর্ম্ম করিতে থাকিবে এবং অহিংসা, সত্য, শৌচ, দয়া ও আস্তিকতাদি বিধিবৎ পালন করিবে।"

যাহার উদয় হইলে, অন্য কোন সাধনার প্রয়োজন থাকে না, যাহা লাভ করিলে, জীব পরমানন্দরূপ পীযূষ-পানে বিভোর হয় এবং ইহ-পরলোকের কোন সুখভোগের বাসনা থাকে না এবং যাহাদ্বারা ভবসন্তাপহারী ভব-কাণ্ডারী ভগবানের করুণামৃত লাভ করিয়া জন্মমৃত্যুরূপ সংসার-বন্ধন হইতে বিমুক্ত হইতে পারে, সেই ভক্তির সাধনা করা মুমুক্ষু মাত্রেরই সর্ব্বদা সর্ব্বতোভাবে ও সর্ব্বপ্রযত্নে কর্ত্তব্য।

৩৫। প্রকৃত জীবন কি ? দোষ-পরিশূন্য জীবনই প্রকৃত জীবন।

গরুড়পুরাণেও বলিয়াছেন :—

স জীবতি গুণা যস্য ধর্ম্মো যস্য স জীবতি।
গুণ-ধর্ম্ম বিহীনো যো নিষ্ফলং তস্য জীবনম্॥

যে ব্যক্তি গুণবান্ ও ধার্ম্মিক, তাহারই জীবন সার্থক ; যে ব্যক্তি গুণহীন ও অধার্ম্মিক, তাহার জীবন নিষ্ফল। সাধু-সমাজে এরূপ ব্যক্তি হেয় বলিয়া তাহার জীবনধারণ বিড়ম্বনা মাত্র।

উচ্চবংশোদ্ভব ও ধনসম্পন্ন হইলেও দূষিত চরিত্র অসাধু পুরুষ জগতে আদৃত হয় না।

শুক্রাচার্য্য বলিয়াছেন :—

"কর্ম্মশীলগুণাঃ পূজ্যাস্তথা জাতি কুলে ন হি।
ন জাত্যা ন কুলেনৈব শ্রেষ্ঠত্বং প্রতিপদ্যতে॥"
(শুক্রনীতি)

এ সংসারে লোকে মনুষ্যের সৎকার্য্য, সৎস্বভাব ও সদ্‌গুণেরই পূজা করিয়া থাকে; জাতি এবং বংশের পূজা কেহই করে না এবং জাতি-কুলের দ্বারা কোন ব্যক্তি শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিতে সমর্থ হয় না; অতএব সাধুতা অবলম্বন করাই শ্রেয়স্কর। (ক্রমশঃ)

শ্রীপাঁচকড়ি চট্টোপাধ্যায়।

অবতারতত্ত্ব।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

এই জন্য ভারত রত্ন-প্রসবা নামে খ্যাত। পশুজগতে শারীরিকবলে সিংহ, বুদ্ধিবলে বানর প্রধান। সৃষ্টির প্রারম্ভে স্বাভাবিক নিয়মের ব্যতিক্রমে যখন প্রকৃতির এক এক পৈটা উর্দ্ধে উঠিবার প্রয়োজন হয়, অর্থাৎ নিম্ন ক্ষুদ্র জীব হইতে ক্রমে উচ্চতর বৃহৎ জীব সৃষ্ট হয়, তখন প্রাকৃতিক কর্ম্মের (অর্থাৎ জাগতিক কর্ম্মের স্বাভাবিক যে নিয়ম আছে, তাহার) ব্যতিক্রমী নিয়মানুসারে নব বলের বা নব শক্তির প্রয়োজন হয়, ইহাই দার্শনিকদিগের মত। * বোধ হয়, এই মতবাদ হইতেই মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ অবতার বর্ণিত হইয়াছে। যাহা হউক, নৃসিংহ-অবতার দ্বারা হিরণ্যকশিপু রূপ হিংস্র আসুরীশক্তি দমনপূর্ব্বক নরদেহে প্রহ্লাদ-রূপ মানবাত্মার বিকাশ হউক বা ডারউইনের থিওরী অনুসারে মানবজাতি বানরকুলোদ্ভূতই হউক, অর্থাৎ উহাকে বৈশৃঙ্খলিক নিয়ম (Missinig link) বলা যাউক বা "নর-সিংহ" অবতারই বলা যাউক, তাহা আমাদের এ প্রস্তাবের বিচার্য্য নয়। তবে আর্য্যজাতির ভারতাগমনের পূর্ব্বে ভারতের আদিম বাসী মানব যে রাক্ষস ও বানর নামে অভিহিত হইত, ইহা নিতান্ত কল্পনা নহে। তবে এস্থলে এই কথা উঠিতে পারে যে, যদি ভারতের আদিমবাসী রাক্ষস ও বানরবৎ হয়, তবে আর্য্য-কুলের আদি পুরুষগণ দেবতা হইলেন কেন? ইহার উত্তর এই যে, ইতি-পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে, প্রকৃতির নব বল প্রয়োগহেতু মনুষ্য-দেহের উৎপত্তি বা সৃষ্টির পর প্রকৃতি-দেবী কিছু-কাল স্থিরভাবাপন্না ছিলেন; কিন্তু বহুকাল স্থিরভাবে থাকিতে পারেন নাই। ভারতের আদিমবাসী যে অধিককাল পশুভাবে ছিল বা এখনও পর্য্যন্ত গারো, কুকি প্রভৃতিরা প্রায় সেই ভাবে আছে, ভারতের প্রকৃতিই তাহার একমাত্র কারণ। যেমন মানব-শিশু জন্মিবামাত্র যদি মানব-সংসর্গ না পায় ও অপর্য্যাপ্ত স্বভাবোৎপন্ন ফল, মূল ও পশুপক্ষ্যাদি ভক্ষণদ্বারা উদরপোষণ করিতে পারে, তবে শিশুতে মানবস্বভাব থাকিলেও শিক্ষা-গুরু অভাবে মানসিকচিন্তা ও মনোবৃত্তির পরিচালনা না হওয়ায় নিতান্ত পশুবৎ হইয়া উঠে। মানব-মস্তিষ্ক যে উপাদানে নির্ম্মিতই হউক, উহা যে

* উপরোক্ত মতটী বেদান্তের বিবর্ত্তবাদ এবং পাশ্চাত্য দর্শনোক্ত Evolution theory.

জ্ঞান-জ্যোতিঃ বিকাশোপযোগী, তৎপক্ষে সন্দেহ নাই। কিন্তু প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে অনুশীলন ব্যতীত জ্ঞান-বুদ্ধির কখনই বিকাশ হয় না। ঐ অনুশীলন শিক্ষাসাপেক্ষ; শিক্ষা দুই জাতীয়; অন্তর ও বাহ্য। বাহ্য-শিক্ষা অন্যের দৃষ্টান্ত, অনুকরণ ও গুরু-উপদেশদ্বারা সম্পন্ন হয়। অন্তঃশিক্ষা স্বভাবজাত অভাব ও আবশ্যকতা হইতে লব্ধ হয়। অভাব ও আবশ্যকতা ব্যতীত স্বভাব হইতে শিক্ষালাভ হয় না। যে পরিমাণ অভাব ও আবশ্যকতা, স্বভাবের শিক্ষাও সেই পরিমাণে হয়। এই শিক্ষাতেও অনুকরণ ও দৃষ্টান্তের প্রয়োজন আছে, কিন্তু উহা স্বভাবের অনুকরণ ও দৃষ্টান্ত।

আদিম মানবকুলের শিক্ষাগুরু আকাশ হইতে হস্তপদবিশিষ্ট কোন দেবতা নামিয়া আসেন নাই, অন্ততঃ দার্শনিকগণ ঐরূপ অমানুষিক ব্যাপার স্বীকার করেন না। প্রকৃতিদেবী ক্রমোন্নতির নিয়ম (Evolution theory) অনুসারে নববল প্রয়োগদ্বারা মানবকুল সৃষ্টি করিয়া মানবের জ্ঞান-বুদ্ধিবিকাশের উপযোগী স্বভাবরূপে তাহাদের অন্তরে প্রবিষ্ট হয়েন। * এবং স্বভাবানুযায়ী তাহাদের অভাব ও আবশ্যকতারূপ শিক্ষাগুরু সৃষ্টি করিয়া, তাহাদের দ্বারা ঐ আদিম মানবকুলকে শিক্ষা দেন। ঐ অভাব ও আবশ্যকতা হইতে প্রকৃতিমাতার যে সকল পুত্র অপেক্ষাকৃত অধিক শিক্ষিত হয়, তাহারাই মানবকুলের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাস্বরূপে কনিষ্ঠগণকে শিক্ষা দিয়া থাকেন; † তদ্ভিন্ন আবশ্যকানুসারে প্রকৃতিমাতা কখন কখন পুত্রবিশেষের মধ্যে সর্ব্বজ্ঞান-জ্যোতিঃ বা আংশিক-জ্ঞানজ্যোতিঃরূপ বিকাশিত হইয়া, মানবকুলকে সাময়িক শিক্ষা দিয়াও অন্তর্ধান হন। এই প্রকৃতিই আমাদের, পূর্ব্বোল্লিখিত সর্ব্বজ্ঞান, সর্ব্বন্যায় ও সর্ব্বমঙ্গলময়ের বিশ্বনিয়ম বা আইন। অথবা উহাই স্বয়ং সর্ব্বন্যায় ও মাঙ্গলিক আইন। অভাব ও আবশ্যকতাই মনুষ্যের শিক্ষাগুরু, জ্ঞানের পথপ্রদর্শক ও উন্নতির মূলমন্ত্র। আদিম মানবকুল যখন অজ্ঞানান্ধকারে আবৃত ছিল, তখন ঐ অভাব ও আবশ্যকতা বিদ্যুতের চকিত-আলোকের ন্যায় তাহাদিগকে পথপ্রদর্শন করাইত। সেই আলোকে তাহারা গন্তব্য পথে বিচরণ করিত। ঐ স্বভাবের বিদ্যুৎ-আলোক হইতে তাহারা নানাবিধ জ্ঞানালোকের উপাদান প্রস্তুত ও তদ্দ্বারা আদিত্যবৎ জ্যোতির্ম্ময় জ্ঞানালোকের বিকাশ করিয়া তমোময় মোহান্ধকার নাশ করিয়াছিল, সেই জ্ঞানসূর্য্য কালরূপ মেঘাবরণে বারম্বার আবৃত, মুক্ত ও পুনঃ আবরিত হইয়াছে ও হইতেছে।

ভারতবর্ষ মানবের অভাবরূপ শিক্ষাগুরু নহেন, কিন্তু অভাবরূপ শিক্ষাগুরু কর্তৃক সভ্যতার বর্ণমালা শিক্ষা হইলে, ভারতে আবশ্যকতারূপ দ্বিতীয় শিক্ষাগুরু প্রাপ্ত হওয়া যায়। ঐ প্রথম শিক্ষাগুরুর সহিত দ্বিতীয় শিক্ষাগুরুর

* "যা দেবী সর্ব্বভূতেষু বুদ্ধিরূপেণ সংস্থিতা।"
"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু বৃত্তিরূপেণ সংস্থিতা॥"
ইত্যাদি (চণ্ডী দ্রষ্টব্য)

† পূর্ব্ব কল্পের মহাত্মাগণের উন্নত আত্মা প্রকৃতির নিয়মানুসারে বর্ত্তমান কল্পে মানবদেহধারণ করিয়া, মানবের জ্যেষ্ঠভ্রাতাস্বরূপে মানবকুলকে শিক্ষা দিয়া অন্তর্ধান হন। ঐ সকল মহাত্মাগণই ব্রহ্মের মানসপুত্র। উঁহারা পূর্ব্ব কল্পে মুক্তাত্মাস্বরূপে ব্রহ্মে সংযোজিত রহেন এবং পরকল্পে ব্রহ্মের মহা মন হইতে স্খলিত অণুস্বরূপ মানবদেহে প্রবিষ্ট হন। তদ্ভিন্ন আবশ্যকানুসারে প্রকৃতিমাতা বা সর্ব্বজ্ঞানময় পিতা, পূর্ব্বোক্ত পুত্র বিশেষের মধ্যে যে সর্ব্বজ্ঞান-জ্যোতিঃরূপে বিকাশিত হন, ঐ জ্ঞান-জ্যোতিঃই অবতার। ক্রমে ইহা বিশদ হইবে।

এতাধিক সম্বন্ধ যে, প্রথম শিক্ষাগুরু কর্ত্তৃক বর্ণমালা শিক্ষা হইলেই দ্বিতীয় গুরুর বিকাশ অবশ্যম্ভাবী, এইজন্যই ঐ উভয় শিক্ষক এক ও অভেদ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। এতদ্ভিন্ন উচ্চতম শিক্ষার সমস্ত উপাদান ভারতের হৃদয়ক্ষেত্রে অন্তর্নিহিত থাকায়, প্রথম শিক্ষাগুরুর আবির্ভাব হইলেই ঐ অন্তর্নিহিত উপাদান-রত্ন সকলের সহজেই বিকাশ হইতে থাকে; কিন্তু ভারতমাতা মানবের প্রথমঅভাবরূপ শিক্ষাগুরু না হওয়ায়, আর্য্যগণের সংস্রব ব্যতীত ভারতের আদিমবাসী অনার্য্যগণের বহুকালেও সভ্যতার একটী বর্ণের পূর্ণাবয়ব শিক্ষা হয় নাই; যেহেতু পূর্ব্ববর্ণিত মত মানবের শারীর বৃত্তির পরিতৃপ্তির কোন অভাবই ভারতে না থাকায়, আদিম ভারতবাসীগণ ভারতে প্রথম শিক্ষাগুরু প্রাপ্ত হয় নাই। ঐ আদিম ভারতবাসীগণই অসভ্য বর্ব্বর। কিন্তু এসিয়ার মধ্য ভূ-খণ্ড পাশ্চাত্যমতে কাস্পিয়ান্ হ্রদের পূর্ব্ব দক্ষিণ তীর হইতে বেলুচিস্থান পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগ, কিন্তু প্রাচ্যমতে সুমেরুপর্ব্বত হইতেছে। ঐ স্থানেই আর্য্যগণের আদিম বাসভূমি; উহা ভারতের ন্যায় উৎপাদিকা শক্তিবিশিষ্ট নহে। কিন্তু তাহা বলিয়া প্রকৃতির অননুকূল নহে। ঐ সুমেরুপর্ব্বত বিষুবরেখা হইতে উত্তর কেন্দ্রের (North polo) মধ্যভাগ বিধায় উহা পৃথিবীর স্থানার্দ্ধের মধ্য স্থান বলিয়া গণনীয়।

সুমেরুপর্ব্বত হিন্দুদিগের কাল্পনিক পর্ব্বত নহে। পুরাণরচয়িতৃগণের মোহকরী কল্পনার কূটজাল ভেদ করিয়া দেখিলে অবশ্যই অনুমিত হইবেক যে, ঐ পর্ব্বতটী ভারতে কোন একটী উত্তর প্রদেশে স্থিত; * যেহেতু মৎস্যপুরাণে উহার সীমার বর্ণনা আছে। যথা—

উত্তর	পূর্ব্ব	দক্ষিণ	পশ্চিম
উত্তর কুরু	ভদ্রাশ্ববর্ষ	ভারতবর্ষ	কেতুমান বর্ষ।

প্রকৃতপক্ষে ঐ সুমেরু পর্ব্বত হিমালয়ের উত্তরে অবস্থিত। উত্তর কুরু এখনও পর্য্যন্ত কোন কোন ম্যাপে (Ottor koru) বলিয়া ব্যক্ত আছে। ঐ উত্তরকুরু পাশ্চাত্যমতে রুসিয়ার দক্ষিণভাগকে বলে। পূর্ব্বকালে তিব্বত ও স্বাধীন তাতার ও আফ্‌গানিস্থানের কতকাংশ যে ভারতবর্ষের অন্তর্গত ছিল, তাহা মহাভারতাদি পাঠে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়; বিশেষতঃ কুমারসম্ভব কাব্যে যে গোরূপা পৃথিবীর বৎস হিমালয় পর্ব্বত এবং দোহন-দক্ষ-দোগ্ধৃ সুমেরু বলিয়া বর্ণিত আছে, উহার প্রকৃত অর্থ এই যে, সুমেরু-

---

* উক্ত সুমেরুপর্ব্বত সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতের সহিত মৎস্যপুরাণের কিঞ্চিৎ অনৈক্য দৃষ্ট হয়। শ্রীমদ্ভাগবতানুসারে সুমেরুপর্ব্বত ইলাবৃত বর্ষের মধ্যে অবস্থিত। উক্ত ইলাবৃত বর্ষের দক্ষিণে হরিবর্ষ; তাহার দক্ষিণে হেমকূট বর্ষ, তাহার দক্ষিণে ভারতবর্ষ। ভাগবতের মত সত্য হইলে, পৃথিবী সূর্য্যসিদ্ধান্তানুসারে সমতল সাব্যস্ত হয় এবং উহার অবস্থান উত্তর সমুদ্রের উত্তরে প্রমাণিত হয়। কিন্তু মৎস্যপুরাণানুসারে উক্ত সুমেরুপর্ব্বত এইক্ষণকার আল্টাইপর্ব্বত বলিয়া বোধ হয়। উভয় পুরাণে সুমেরু পর্ব্বতের উত্তর, পূর্ব্ব, পশ্চিম সীমা একই প্রকার, কেবল দক্ষিণ সীমা ভিন্নরূপ; ঐ দক্ষিণসীমা ভিন্নরূপ হওয়াতে উত্তরকুরুদেশ লইয়াও বিরোধ উপস্থিত হইতেছে। ভাগবতানুসারে কুরুবর্ষ এমেরিকা বলিয়া প্রতীয়মান হয়, কিন্তু মৎস্যপুরাণানুসারে রুসিয়া সাব্যস্ত হয়। যাহা হউক ঐ বিরোধ ভঞ্জন করিতে হইলে, ভৌগোলিক তত্ত্ব ও জ্যোতিষের মীমাংসা করিতে হয় এবং বর্ত্তমান পাশ্চাত্য ভূগোল ও জ্যোতিষের অপ্রমাণত্ব ব্যতীত ভাগবতের মত গ্রহণ করা যায় না। যদিও পাশ্চাত্য জ্যোতিষ ও ভূগোলের দোষ প্রমাণ ও আর্য্যদিগের ভূতত্ত্ব ও জ্যোতিষ নির্দ্দোষ, ইহা প্রমাণ করা যাইতে পারে, তথাচ ঐ প্রমাণ প্রত্যক্ষ না হওয়ায়, আমরা ঐ দুরূহ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করিয়া, মৎস্যপুরাণানুসারে সুমেরুপর্ব্বতকে আল্টাইপর্ব্বত সাব্যস্ত করিতে বাধ্য হইলমা।

বাসীগণই সুমেরু পর্ব্বত হইতে হিমালয়ে আগমন-পূর্ব্বক পৃথিবীকে দোহন আরম্ভ করিয়াছিল। পূর্ব্বকালে হিমালয় হইতে আল্টাই পর্ব্বতপর্য্যন্ত সমগ্র পার্ব্বতীয় প্রদেশকে অথবা আল্টাই পর্ব্বতকে সুমেরু পর্ব্বত বলিত, যাহা হউক, ঐ সুমেরু পর্ব্বত যে রুসিয়ার দক্ষিণে এবং হিমালয়ের উত্তরে স্থিত আছে, তাহার আর সন্দেহ নাই। ঐ সুমেরু পর্ব্বত পৃথিবীর নাতিউষ্ণ-মণ্ডল, অর্থাৎ সমমণ্ডলের (Temparate zone) অন্তর্গত, ঐ স্থানের প্রকৃতি পৃথিবীর সমস্ত প্রকৃতির সারসংগ্রহ স্বরূপ। উক্ত সুমেরুপর্ব্বতই পূর্ব্বোক্ত পঞ্চদশসূত্রের অন্তর্গত। জগতের সমগ্র প্রকৃতির সহিত সুমেরুবাসীদিগের প্রথম সংঘর্ষণ হয় এবং সমগ্র প্রকৃতির সারসংগ্রহরূপ অভিজ্ঞতার কিঞ্চিৎ আভাস ঐ সুমেরুবাসীর অন্তরে প্রবিষ্ট হয়। উহাদিগের অন্তরেই অভাব ও আবশ্যকতার বোধ প্রথম পরিস্ফুট হয়। অতএব ঐ সুমেরু পর্ব্বতই মানবের প্রথম শিক্ষাগুরু। আর্য্যগণ ঐ সুমেরু পর্ব্বতে সভ্যতার প্রথম বর্ণমালা শিক্ষা করিয়াছিলেন। ঐ স্থানবাসীগণ পূর্ব্বোক্তমত জ্ঞান ও সভ্যতার বর্ণমালা শিক্ষা করিয়া যে দেশে আগমন করিয়াছেন, সেই দেশের পশুবৎ অসভ্য মানবগণকে জয় করিয়া, সেই দেশের প্রকৃতি অনুযায়ী জ্ঞান ও সভ্যতার বিস্তার করিয়াছেন। এই জাতিই আদিম আর্য্যজাতি। এই হিন্দু, মুসলমান; পারসী, গ্রীক, রোমান এবং বর্ত্তমান ইউরোপবাসী উক্ত আদিম আর্য্যজাতির ভিন্ন ভিন্ন শাখা প্রশাখা। ঐ সমস্ত জাতির আদিকুল সুমেরুবাসী প্রাচীন আর্য্যজাতি। আর্য্যজাতিই প্রকৃতির ঘোর কঠোরতা ও অনুকূলতা উভয়ের মধ্যে পতিত হইয়া, ঐ উভয় অবস্থার সংঘর্ষণে আদিম মানবকুলের মধ্যে এক পৈঠা উর্দ্ধে উঠিয়াছিলেন। সংক্ষেপতঃ ঐ আর্য্যজাতি আদিম বাসস্থানেই সামান্যভাবে পারিবারিক বন্ধন, সমাজ-সংস্থাপনের সূত্রপাত, পশুপালন, কুটীর-নির্ম্মাণ, সামান্য শিল্প, নৌ-গমনাগমন, হলচালনদ্বারা সামান্য কৃষিকার্য্য, খড়্গ, তীর, ধনুদ্বারা যুদ্ধ, উদ্ভিদের সামান্য গুণাগুণদ্বারা ঔষধ প্রস্তুত শিক্ষা করিয়াছিলেন। আকাশে ভিন্ন ভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তির অদ্ভুত ব্যাপার দর্শনে প্রাকৃতিক উপাসনা এই জাতির মধ্যে প্রথম প্রচলিত হয়। ঐ প্রাকৃতিক উপাসনা হইতে তৎপরবর্ত্তীকালে আধ্যাত্মিকশক্তির বিকাশ ও প্রকৃত আত্মোপসনার সূত্রপাত হয়। ক্রমে ইঁহাদিগের বংশ-বৃদ্ধিসহকারে স্বদেশে জীবিকা নির্ব্বাহ না হওয়ায়, ইঁহারাই ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়-ভুক্ত হইয়া, দক্ষিণ ও উত্তর-পশ্চিমাভিমুখে গমন করিয়া, উত্তর-পশ্চিমে গ্রীক্, রোম ও দক্ষিণে ভারতবর্ষে সাম্রাজ্য সংস্থাপন করিয়াছিলেন; কিন্তু এক দিনে সাম্রাজ্য সংস্থাপিত হয় নাই। ঐ সাম্রাজ্য সংস্থাপনের পূর্ব্বে ইঁহাদিগকে অনেক ক্লেশভোগ করিতে হইয়াছিল। যাহা-হউক, পাশ্চাত্য গ্রীক্-রোমের সহিত আমাদের বর্ত্তমান আলোচনার কোন সংস্রব নাই; আমাদের এক সম্প্রদায় ভাতৃবর্গকে আমরা পাশ্চাত্য-দেশে পাঠাইয়া, তাঁহাদের নিকট হইতে এবং তাহাদের পরবর্ত্তী পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকদিগের নিকট হইতে বিদায় লইতে বাধ্য হইলাম। আমরা পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকদিগের পন্থানুসরণে কেবলমাত্র দেবাসুরের যুদ্ধের অবতারণা করিয়া, তাঁহাদের প্রদর্শিত পথ ও পাশ্চাত্য ঐতিহাসিক সংস্রব এককালীন ত্যাগ করিয়া, আমাদের প্রকৃত জাতীয় পন্থানুসরণ করিতে বাধ্য হইব। ইহাদ্বারা স্থানে স্থানে অনেক স্বদেশীয় ইংরাজী-শিক্ষিত ভ্রাতার বিরাগভাজন হইতে পারি, তাহা বলিয়া আমরা সত্য হইতে বিচ্যুত হইতে পারিব না।

এইক্ষণে আপাততঃ পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকদিগের পন্থাবলম্বনে আমরা স্বীকার করিতে বাধ্য হইলাম যে, আবস্তিকদিগের ও হিন্দুদিগের আদিপুরুষ একত্রে হিমালয় পর্য্যন্ত আগমন করেন। এইরূপে তথায় তাঁহাদিগের কিছুকাল অবস্থিতির পর তাঁহাদিগের পরস্পরের মধ্যে বিবাদের সূত্রপাত হয়; ঐ বিবাদ যে সোমরস বা সোমযজ্ঞ লইয়াই প্রথম সূত্রপাত হইয়াছিল, তাহা আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে স্বীকার করিতে বাধ্য আছি। কিন্তু ঐ সোমরস অর্থে সামান্য উদ্ভিদ বা সামান্য মাদক নহে। ঐ সোমরসই যোগের প্রধান উপাদান ও আধ্যাত্মিকশক্তির বিকাশক। উহাই পুরাণোক্ত দেবাসুরের দ্বন্দ্বের বিষয়ীভূত সুধা, সুরা বা অমৃত। ঐ সোমরস পান বা সোমযজ্ঞানুষ্ঠানদ্বারা আমাদিগের প্রাচীনতম পূর্ব্বপুরুষগণ 'সুর'পদে উন্নীত হইয়াছিলেন; ঐ সোমরস বা সোমযজ্ঞের অভাবে মুসলমান ও পারসীকদিগের পূর্ব্বপুরুষ আবস্তিকগণ 'অসুর'নামে আখ্যাত এবং সুরদিগের মহাশক্তির নিকট বিধ্বস্ত ও ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইয়াছিলেন। পরিশেষে সেই অনন্ত জ্ঞান, ক্ষুদ্র সুর-সমাজে বামনরূপে বিকাশিত হইয়া, কারণ, সূক্ষ্ম, স্থূল, ত্রিলোক এবং ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান, ত্রিকালব্যাপী আধ্যাত্মিক জ্ঞানরূপ ত্রিপাদদ্বারা অসুররূপ জড়শক্তি বা জড়শক্তির নেতা আবস্তিকদিগের পূর্ব্বপুরুষ বলিরাজকে এককালীন বিতাড়িত করিয়া, দেবাসুর যুদ্ধের উপসংহার করিয়া ও সুরলোকে পূর্ণজ্ঞান জ্যোতিঃ বিস্তারপূর্ব্বক অন্তর্ধান হইলে, ঐ সুরগণের বংশধরগণ ধীরে ধীরে পঞ্জাবের ব্রহ্মাবর্ত্ত প্রদেশে আগমন করেন এবং তথায় আর্য্যপিতামহগণ, শ্রীরাগ, বসন্ত, ভৈরব, পঞ্চম, মেঘ, মোল্লার, এই ষড়রাগ; মালবশ্রী, বিভাস, ভৈরবী, মোল্লারী, কামদী, তড়ী, ইমন, পূরবী, হাম্বির, খাম্বাজ, ঝিঁঝিট ও বাগেশ্রী প্রভৃতি ছত্রিশরাগিণী, এই সিদ্ধ রাগরাগিণী সংযোগে বেদ গান করিয়া জগৎকে স্তম্ভিত করিয়াছিলেন, ঐ আর্য্য পিতৃগণ, তাঁহাদিগের হিমালয়বাসকালে মহাশক্তি-মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া, সূর্য্য, অগ্নি, বায়ু, বরুণ, ইন্দ্র ও বসু প্রভৃতি বিশ্বদেবতত্ত্ব এবং পরা, জ্ঞান, ইচ্ছা, ক্রিয়া, কুণ্ডলিনী ও মাতৃকাশক্তি হৃদয়ে উদ্দীপন ও বিনিয়োগদ্বারা আয়ত্বাধীন করিয়াছিলেন।* তাঁহারা অন্তর্জ্জগতে প্রবেশপূর্ব্বক গায়ত্রীরূপিণী পরাশক্তিকে অন্তরের অন্তরতম গূঢ়প্রদেশ হইতে আহ্বান করিয়া, অধ্যাত্মরাজ্যে বিচরণপূর্ব্বক দেবনাম ধারণ করিয়া সশরীরে স্বর্গভোগ করিয়াছিলেন।* যেমন জড়দেহের মধ্যে মন ও বুদ্ধি ও সদ্বৃত্তি সকল আছে, সেইরূপ অনন্ত জড়জগতের অভ্যন্তরেও সমষ্টি-মহৎ বা মহাপ্রজ্ঞা আছে। সূর্য্য, অগ্নি, বায়ু, বরুণ, ইন্দ্র ও বসু প্রভৃতি দৃশ্যতঃ জড়শক্তি হইলেও, অভ্যন্তরে পূর্ব্বোক্ত মহাজ্যোতির্ম্ময় আধ্যাত্মিক শক্তি আছে, ঐ জ্যোতিই 'দিব' এবং ঐ

* ইন্দ্র (আকাশীয় তড়িন্ময় ইথার) সূর্য্য, অগ্নি, বায়ু, বরুণ বিশ্বদেব (তৈজস, বায়বীয়, জলীয়, পার্থিব, মহাভূত) জড়শক্তি বটে, কিন্তু উহারাই মানবের প্রাণ, ইন্দ্রিয় ও মানসিক শক্তিতে পরিণত হইয়াছে। উহারাই অন্তর্চৈতন্য বা চিৎশক্তি-যোগে আধ্যাত্মিক জ্যোতির্ম্ময় দেবতা। সমস্ত পদার্থের অভ্যন্তরে যে ঐশীশক্তি আছে, তাহার সমষ্টি সূক্ষ্ম অবস্থাই হিরণ্যগর্ভ ও প্রত্যেক ব্যষ্টিভূতের অভ্যন্তরে সূক্ষ্ম জ্যোতির্ম্ময়ই দেবতা। বেদান্তদর্শন ২ অ, ৪ পাঃ ১৪ হইতে ১৯ সূত্র দ্রষ্টব্য— ঐ বেদান্ত দর্শনের ২ অঃ ৪ পাদের ১৯ সূত্রে স্পষ্ট প্রকাশ আছে, যে অন্তর ও বাহ্য জগতের সৎশক্তি ও প্রাণাদিই দেবতা এবং কুশক্তি-কুবৃত্তিই অসুর। এই কুবৃত্তি রূপ অসুর জয়ার্থে দেবময় প্রাণাদি ইন্দ্রিয়ের নিয়োগ-বর্ণনা শ্রুতিতেও আছে। উপরোক্ত ১৯ সূত্রের ভাষ্য দ্রষ্টব্য।

জ্যোতির্ম্ময় অধ্যাত্মিকশক্তিই দেবতা। আধ্যাত্মিকশক্তি সাধনদ্বারা ঐ দৈবীশক্তির সহিত মানব-শক্তির মিলন হইলে, মানবের দেব-সাক্ষাৎ বা সশরীরে স্বর্গভোগ হয়। চক্ষু তৈজস জড় পদার্থ, ঐ চক্ষুর সহিত বাহ্য জড়জগতেরই সম্বন্ধ, কিন্তু সাধনদ্বারা আধ্যাত্মিক জ্যোতির্ম্ময় চক্ষু প্রস্ফুটিত হইলে ঐ আধ্যাত্মিকশক্তির মিলন হইতে পারে। দেবগণ যে জড়শক্তি নহে, আধ্যাত্মিক জ্যোতির্ম্ময়, তাহা বেদান্তদর্শনের ৫২১ পৃষ্ঠা হইতে ৫৩৪ পৃষ্ঠাপর্য্যন্ত শাঙ্কর ভাষ্যে পরিষ্কার মীমাংসা আছে; বেদান্তদর্শনের ১ম অধ্যায়ের ৩য় পাদ ৩৩ সূত্র ও ২য় অধ্যায়ের ৪র্থ পাদের ১৪ হইতে ১৯ সূত্রের ভাষ্য দ্রষ্টব্য।

এইক্ষণ পাঠক মহাশয়গণ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, যে জড়োপাসক হলধারী আর্য্যগণ মধ্য-এসিয়া হইতে প্রকৃতির বর্ণমালা মাত্র শিক্ষা করিয়া হিমালয়পর্য্যন্ত আগমনপূর্ব্বক তাঁহাদের মধ্যে এক সম্প্রদায় হঠাৎ এরূপ আধ্যাত্মিকজ্ঞান ও শক্তিসম্পন্ন কি প্রকারে হইলেন? আর তাঁহাদের সহযোগী ভ্রাতৃগণই বা ঐ প্রকার শক্তিসম্পন্ন হইতে পারিলেন না কেন? এই প্রশ্নের উত্তর দিবার পূর্ব্বে পাঠক মহাশয়গণের কয়েকটী বিষয়ে মনোযোগ আবশ্যক।

১। হিমালয় সমগ্র রত্নের খনি; এই রত্ন অর্থে কেবল মণি-মাণিক্য-স্বর্ণাদি নহে। আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিকশক্তি বিকাশক বিবিধ ধাতু, বৃক্ষ, লতা, গুল্ম প্রভৃতি উদ্ভিদ, প্রস্রবণ, হ্রদ, নদী, তেজ, জ্যোতি, মেঘ, বায়ু ও হিমাণী প্রভৃতি সমস্ত প্রাকৃতিক বস্তু ঐ রত্নমধ্যে পরিগণিত; তাহার মধ্যে পূর্ব্বোক্ত সোমরস একটী রত্নবিশেষ। হিমালয় ঐ সকল রত্নের আকর বলিয়াই পরাশক্তির জনক। ভৌতিক, শারীরিক, মানসিক সর্ব্বপ্রকার তেজ এবং জ্যোতিঃ ঐ পরাশক্তির অন্তর্গত। জ্ঞান, ইচ্ছা, ক্রিয়া, কুণ্ডলিনী ও মাতৃকা, এই পঞ্চাদ্যাশক্তি উহার এক একটী অঙ্গ; তড়িৎ, ম্যাগ্নেট্ ও আকর্ষণ প্রভৃতি উহার এক একটী বিকাশ; ঐ পরাশক্তিই ভর্গ, ভর্গ হইতেই মানবের বুদ্ধি প্রেরিত হয়।

২। প্রকৃতির সহিত সংঘর্ষণে মানবের জ্ঞান ও বুদ্ধির বিকাশ হয়। পূর্ব্বে প্রমাণিত হইয়াছে, ঐ প্রকৃতি-দেবী পূর্ণাবয়বের সহিত হিমালয় ও কৈলাসে অবস্থান করেন। ঐ হিমালয় ও কৈলাস তাঁহার পিতৃ ও পতিগৃহ। সুরদিগের মধ্যে কোন মহাযোগী পরাশক্তিকে আয়ত্তাধীন ও জীবত্ব শিবত্বে পরিণত করিয়া কৈলাস পর্ব্বতে * অবস্থান ও ব্রহ্মজ্ঞানে মগ্ন ছিলেন, তাহার আর সন্দেহ নাই।

৩। ধাতু ও উদ্ভিদ বিশেষের সহিত মানবের শরীর ও মনের এরূপ অত্যাশ্চর্য্য সম্বন্ধ ও মানব-মনের উপর তাহাদের এরূপ অত্যাশ্চর্য্য প্রভুত্ব আছে যে, যাহার ফল আমরা কল্পনায়ও আনিতে পারি না। উদ্ভিদ ধাতু ও তৈজস পদার্থের গুণসমূহ প্রায় পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণ অধিকাংশ অবগত নহেন। ঐ সম্বন্ধে আমরাও অসভ্য বনমানুষের ন্যায়, ঐ বিষয়ের কিঞ্চিৎ আভাস দুই একটী পাশ্চাত্য পণ্ডিতের গ্রন্থেও পাওয়া যায়। পাঠক! বুলার লিটন প্রণীত জাননী ও কমিংরেস্ (Zanony and coming race) গ্রন্থদ্বয় পাঠ করিয়াছেন কি? যদি পাঠ করিয়া থাকেন, তবে আমাদিগের এই বাক্যের সত্যতা কথঞ্চিৎ বুঝিবেন। যদি ঐ গ্রন্থদ্বয় পাঠ না করিয়া থাকেন বা

* কৈলাসপর্ব্বত আমাদের মতে কিন্নর গিরি নহে, হিমালয়ের উচ্চ শৃঙ্গ ধবলাগিরিই হরপার্ব্বতীর বিলাসভূমি কৈলাসপর্ব্বত।

পাঠের কষ্ট স্বীকার না করেন, তাহাহইলে সংস্কৃত দার্শনিক মীমাংসা ১ম ভাগ শিক্ষাতত্ত্ব খানি পাঠ করিলেও উহার আভাস পাইবেন।

৪। হিমালয়ের অনেক প্রদেশ এই উনবিংশ শতাব্দীতেও পাশ্চাত্য বীরগণের দুরধিগম্য। হিমালয়ের কয়েকটী শিখরদেশে বিশেষ বিশেষ মহাত্মা ও মহর্ষি ভিন্ন কাহারও উত্থানের ও প্রবেশের ক্ষমতা নাই।

৫। হিমালয়ের কোন কোন প্রদেশবাসী মহাত্মাকর্ত্তৃক প্রদত্ত সামান্য বৃক্ষ-পত্রের রস বা উদ্ভিদ বিশেষদ্বারা কুষ্ঠাদি অচিকিৎস্য রোগ মুক্তির ও ঐ মহাত্মাদিগের অমানুষীশক্তির বিষয় শ্রুত হওয়া যায়। ঐ হিমালয়ের অপর প্রান্তবাসী তিব্বতের বিশেষ বিশেষ লামার অদ্ভুত ক্ষমতার বিষয় আমাদের বর্ত্তমান শিক্ষা-গুরু ইংরাজের মুখে অনেকে বোধ হয় শুনিয়াছেন।

৬। আমাদিগের প্রাচীন পিতামহগণ হিমালয়প্রদেশে অল্পকাল বাস করিয়া পূর্ব্বোক্ত শক্তিবিশিষ্ট হন নাই এবং সকলেই যে ঐ শক্তি-বিশিষ্ট হইয়াছিলেন, তাহা নয়। পাশ্চাত্য ইতিহাসে প্রাপ্ত হওয়া যায় যে, বরুণ, মিত্র, ইন্দ্র প্রভৃতি কয়েকটী দেবতার ন্যায় দেবতা আবস্তীক, গ্রীক ও ল্যাটিনদিগের মধ্যেও প্রচলিত ছিল; এমন কি, উহাদিগের নামেরও অনেক সাদৃশ্য আছে এবং উভয় জাতির ঐ দেবতাদিগের নাম একই মূল ধাতু হইতে উৎপন্ন, তদ্ভিন্ন অবেস্তা ও ঋগ্বেদের অতি প্রাচীনতম দুই একটী সূক্তে অসুর-পূজা ও অসুরের গুণানুবাদ বর্ণিত আছে। এমন কি, ঐ সূক্তে বরুণ দেবতাই প্রধান দেবতা মধ্যে পরিগণিত ও অসুর নামে অভিহিত ছিলেন। দেব শব্দ তৎকালে প্রচলিত ছিল না। ইহাদ্বারা হিন্দু ও আবস্তিকদিগের প্রাচীনতম পূর্ব্ব-পুরুষগণ অসুর-পূজক ছিলেন, অর্থাৎ অসুরই দেবতা স্থানীয় ছিল, প্রতীয়মান হইতেছে। কিন্তু তৎপর ঐ ঋগ্বেদের সূক্তে অসুরদিগের বহু নিন্দাবাদ এবং সুর বা দেব-গণের উপাসনা ও প্রশংসা বহুল স্থানে আছে। আবার অবস্তা গ্রন্থে সুর বা দেবগণের নিন্দা-বাদ ও অসুর-পূজাপদ্ধতি প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই বর্ণনা আমাদের উপরোক্ত মতেরই সম্পূর্ণ পোষক। যেহেতু অতি পূর্ব্বকালে মিত্র, ইন্দ্র ও বরুণ প্রভৃতি নামধারী জড়শক্তির গুণানু-বাদই প্রকৃত উপাসনা ছিল, তৎপরে ঐ হিমালয়বাসী পূর্ব্ব-পুরুষগণের হিমালয়ের কোন অগম্য শিখর-প্রদেশে সোমরস প্রমুখ মহারত্ন সমূহ আবিষ্কার ও তাহার প্রয়োগদ্বারা মানস-শক্তি ক্রমে প্রস্ফুটিত ও অন্তর্জ্ঞান বিকাশিত হইলে, ঐ জড়শক্তির ও পঞ্চতন্মাত্রের সূক্ষ্ম গুণের সহিত মানবের অন্তঃশক্তির সম্বন্ধ নির্ণয় ও অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান আবিষ্কারপূর্ব্বক তাঁহারাই ঐ বাহ্য ও অন্তঃশক্তি আয়ত্বাধীন করিয়াছিলেন। তাঁহারাই স্বীয় শরীরস্থ ও বাহ্যজগতস্থ পঞ্চ মহাভূত ও পঞ্চ মহাভূতের সূক্ষ্ম-পঞ্চতন্মাত্র, অন্তরস্থ মন ও বুদ্ধি প্রভৃতি পরস্পর সংশ্লেষণ-বিশ্লেষণদ্বারা এক একটী আধ্যাত্মিকশক্তির বিকাশ করিয়া * ঐ অসুর উপাধিধারী অলৌকিক মিত্র, ইন্দ্র ও বরুণ প্রভৃতি জড়শক্তির আসনে আধ্যাত্মিক জ্যোতিঃ বা তেজঃস্বরূপ ও তত্ত্বজ্ঞানের বিষয়ীভূত দেবোপাধিধারী ইন্দ্র, বায়ু, বরুণ, সূর্য্য ও মিত্র প্রভৃতি বিশ্বদেবগণকে উপ-বেশন করাইয়া, তাঁহাদের সাধনাদ্বারা আধ্যাত্মিক ও বৈষয়িক কার্য্য সম্পাদন করিতেন। পূর্ব্বোক্ত সোমসুরা হইতে সুর এবং জ্যোতিঃ বা দিব

* পাঠক একবার বেদ ও তন্ত্রোক্ত ভূতশুদ্ধি, আসন, ধ্যান ও প্রাণায়ামের কার্য্য-পদ্ধতি দেখিলে, উপরোক্ত বর্ণনা যে কাল্পনিক নহে, তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারিবেন।

হইতে দেব শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছিল। ইতিপূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে, ঐ সম্প্রদায়স্থ সকলেই আধ্যাত্মিকশক্তিসম্পন্ন হন নাই, কিন্তু যাঁহারা ঐ সুরদিগের মতাবলম্বী হইয়া তাঁহাদিগের দলভুক্ত ছিলেন, তাঁহারা ঐ সুর-সম্প্রদায়ভুক্ত ও সুর নামে অভিহিত হইয়াছিলেন; আর যাঁহারা ঐ শক্তিসম্পন্ন হইতে না পারিয়া পূর্ব্ব ধর্ম্ম প্রবল রাখিয়া সুরা বা সুর বিদ্বেষী ছিলেন, তাঁহারাই স্বীয় দেবতার উপাধি অনুসারে অসুর নাম ধারণ করিয়াছিলেন। তৎকালে নবাবিষ্কৃত সোমরস অসুর উপাধিধারী জড়শক্তির উপাসনার প্রতিকূলতা ব্যঞ্জক বিধায় উহা সুরা নামে অভিহিত হইয়াছিল। ঐ সুরা বা অমৃত আবিষ্কার হইতে অসুরগণের শেষ পরাভবের কাল পর্য্যন্ত দেবযুগ বা সত্যযুগ গণনীয়। ইহাই মানবকুলে জ্ঞান-জ্যোতির প্রথম বিকাশ বা প্রথম অবতার। কিন্তু পশুকুল হইতে মানবকুলের প্রথম উৎপত্তি (নরসিংহ মূর্ত্তি) প্রথম অবতার ধরিলে, পূর্ব্বোক্ত বামনাবতার মনুষ্যকুলে দ্বিতীয় অবতাররূপে পরিগণিত। আর প্রথম জীব-সৃষ্টিরূপ মৎস্য অবতার ধরিলে, উহা পঞ্চমাবতারে পরিগণিত হয়। * যাহা হউক, ঐ পাশ্ববাবতার আমাদের আলোচ্যবিষয় নহে, সুতরাং তাহা পরিত্যজ্য। বামন অবতার হইতেই প্রকৃত প্রস্তাবে আমাদের আলোচনা আরম্ভ। যাহা হউক আমরা ঐ বামন 'অবতারের তাৎপর্য্য সংক্ষেপে বিবৃত করিয়া, উপরোক্ত অবতার এবং দেবযুগ বা সত্যযুগ পরিত্যাগ করিতে ও সুরদিগের অসুরনাশিনী-করালবদনী-কালী মূর্ত্তির নিকট হইতে বিদায় লইতে বাধ্য হইলাম। কিন্তু এস্থলে বলা আবশ্যক যে, অসুরগণ তত্ত্বজ্ঞানসম্পন্ন না হইলেও, তাহাদের মধ্যে কোন কোন সম্প্রদায় ঘোর ঐন্দ্রজালিক (Black magician) ছিল। ইন্দ্রজাল আধ্যাত্মিকশক্তির নিতান্ত নিকৃষ্টাঙ্গ; ঐ ঐন্দ্রজালিক সম্প্রদায়ের মধ্যে এক দল যে কৈলাসবাসী আর্য্য গুরুর বশীভূত হইয়া, প্রকৃতি মাতার এবং পূর্ব্বোক্ত ব্রহ্মজ্ঞ পিতার প্রসাদে যে বহু ধনসঞ্চয়পূর্ব্বক অতীব সুখসমৃদ্ধি সম্ভোগ করিয়াছিলেন, ইহা অযৌক্তিক নহে। আর যাঁহারা

* মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ ও নৃসিংহ অবতার আদৌ ঐতিহাসিক ভিত্তির উপর স্থাপন করা যাইতে পারে না; যেহেতু মানব সৃষ্টির পূর্ব্বে কখন ইতিহাস থাকিতে পারে না; তবে ঐ চারিটী অবতারদ্বারা বিবর্ত্তবাদের (Evolution theory র) আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়; তজ্জন্য উহা অবিজ্ঞানমূলক নহে। বামন অবতার সম্পূর্ণ ইতিহাসমূলক না হইলেও এবং ঐ অবতারটী রূপক ধরিলেও উহা সভ্যতার ইতিহাসের মূলভিত্তি। যদি সেই সর্ব্বজ্ঞানময়ের জ্ঞানজ্যোতি বিকাশই অবতার হয়, তবে উহা বিশেষ কোন মানবে বিকাশিত হউক বা বিশেষ কোন মানবসমাজে বিকাশিত হউক, মূল উদ্দেশ্য এক ও বৈজ্ঞানিকহেতুও এক। পৃথিবী জলময় অবস্থায় মৎস্যের ন্যায় জলচর জীবের এবং কর্দ্দমাবস্থায় কূর্ম্মের ন্যায় জীবের ও কঠিন মৃত্তিকায় শূকরাদির ন্যায় পাশবদেহের বিকাশ সম্ভব। পশুর চরম উন্নতিই সিংহ; জলচর, কর্দ্দমচর ও স্থলচর প্রভৃতি এক এক শ্রেণীর জীবাকারে চৈতন্যের ক্রম বিকাশই এক একটি অবতার গণনীয়। প্রথমে যখন মানবদেহের বিকাশ হইয়াছিল, তখন অর্দ্ধ পাশবাকার ও অর্দ্ধ মানবাকারের বিকাশ অসম্ভব নহে; ঐ দেহের উত্তমাঙ্গরূপ মানব-মস্তিষ্কে যে প্রথম জ্ঞানজ্যোতির বিকাশ হইয়াছিল, তদ্দারা অজ্ঞান ও হিংস্রভাবাপন্ন আসুরীভাব নষ্ট হইয়া মানব-চৈতন্যের বিকাশ হইয়াছিল। ঐ মানব-চৈতন্য ক্রমে পরিস্ফুট ও ক্ষুদ্র মানবদেহে সর্ব্বময় ত্রিলোকব্যাপী পরম জ্ঞানজ্যোতিঃ বিকাশিত হইয়া, রজস্তমোময় অসুররাজকে দমন করিয়া সাত্ত্বিক দেবভাবের বিস্তারই সম্ভব। ত্রিলোকব্যাপী পরম জ্ঞানজ্যোতিঃ কোন ক্ষুদ্র মানব বিশেষেই বিকাশিত হউক বা ক্ষুদ্র সুরসমাজেই বিকাশিত হউক, উহাই অবতার। পূর্ব্ববর্ণিতমত ব্যক্তিবিশেষে বিকাশিত হইয়া, তথায় সমাজের শিক্ষা ও সমাজে জ্ঞানজ্যোতিঃ প্রতিবিম্বিত হওয়াই সম্ভব।

সুরগণের বশীভূত না হইয়া, সুরগণের নিকট পরাজিত ও বিতাড়িত হইয়া আরব, পারস্য ও বেলুচিস্থান-প্রদেশে বাস করিয়াছিলেন, তাঁহারা কিছুকাল নিস্তব্ধ থাকার পর, তাঁহাদের বংশধরগণ যে মধ্যে মধ্যে ভারতাক্রমণ করিতেন, পুরাণাদিতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়; উঁহারাই তৎকালে দৈত্য নামে অভিহিত হইত।

পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে দোলার গতির ন্যায় ঊর্দ্ধ হইতে নিম্নগমন বা উন্নতির পর অবনতি একটী প্রাকৃতিক নিয়ম। * এই সনাতন প্রাকৃতিক নিয়ম যে ভারতে অধিক প্রয়োজ্য, তাহা পূর্ব্বে বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে। স্বভাবের নিয়ম এই যে, প্রয়োজনাভাবে কোন ক্রিয়ারই যথাযথ অনুশীলন হয় না এবং অনুশীলনাভাবে ক্রিয়াশক্তি ক্রমে হ্রাস হয়। আমাদের বর্ণিত দেবযুগের পর বা দেবাসুরের যুদ্ধের পর হিমালয়বাসী পূর্ব্ব পিতামহগণের আর প্রতিদ্বন্দী না থাকায়, উদ্যম ও উৎসাহ ক্রমেই মন্দীভূত হইয়া আসিতেছিল। যাঁহারা প্রকৃত-পক্ষে আধ্যাত্মিক-শক্তিসম্পন্ন ছিলেন, তাঁহারা পরম-জ্ঞান ও পরমানন্দলাভের নিমিত্ত পার্থিব সুখস্বচ্ছন্দতার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া, ধ্যান, ধারণা সমাধি রূপ সেই পরম জ্ঞানানন্দ হইতে ক্ষণমাত্র বিচ্যুত হইতে ইচ্ছা করিতেন না; কিন্তু তাঁহাদের বংশধরগণ ও অবশিষ্ট জনগণের মধ্যে যাঁহাদের জ্ঞান, বুদ্ধি ও ক্ষমতা অধিক পরিমাণে বিকাশিত হইয়াছিল, তাঁহারাই সমাজের নেতা ও তদবশিষ্ট সমস্ত জনগণ পূর্ব্বোক্ত মত শ্রমজীবীরূপে পরিগণিত ছিল। যদিও তৎকালের সমাজের নেতাগণের মধ্যে পূর্ব্বোক্ত সোমযাগ প্রভৃতি কঠোর ক্রিয়ানুষ্ঠান ও আধ্যাত্মিক ক্রিয়ানুশীলনের কিঞ্চিৎ হ্রাস হইয়াছিল, তথাচ পূর্ব্বোল্লিখিত বিশেষ বিশেষ আধ্যাত্মিক-জ্ঞান ও শক্তিসম্পন্ন মহাত্মাগণের পুত্র পৌত্রাদি বংশধরগণের মধ্যে ঐ সকল কঠোর যাগাদি ক্রিয়ানুষ্ঠান বা আধ্যাত্মিক-শক্তির একেবারে লোপ হয় নাই। পূর্ব্বোক্ত "ডিনামিক্‌লয়ের" "প্রিন্‌সিপাল" যে সমাজগতি সম্বন্ধেও প্রয়োজ্য, এই সনাতন প্রাকৃতিক নিয়মটী পাঠকগণ ভুলিবেন না। তদ্ভিন্ন প্রকৃতির বংশানুগত সাংক্রামিক নিয়ম (Hereditary law) এস্থলে প্রয়োজ্য, প্রকৃতির বিপরীত-শক্তি-সংঘর্ষণে উহা হ্রাস হইলেও এককালে নষ্ট হয় না।

যাহা হউক ঐ হিমালয়বাসী পূর্ব্ব পিতামহগণ কিয়ৎকাল তথায় নির্ব্বিঘ্নে বসবাস ও প্রকৃতির সুখস্বাচ্ছন্দ্য উপভোগ করিয়াছিলেন; তদনন্তর তাঁহাদের বংশবৃদ্ধিরূপ স্রোতের অতীব প্রবলতাহেতু অধিবাসীর সংখ্যা দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হওয়ায়, তাঁহারা দক্ষিণাভিমুখী হইয়া হিমালয়ের নিম্নে সমতল ভূমি সকল অধিকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ঐ স্থানেই তাঁহাদের আবার নূতন শত্রুর সম্মুখীন হইতে হয়; এই শত্রুই ভারতের আদিম অসভ্য অধিবাসী। ইহারা আর্য্যগণকর্তৃক দস্যু, রাক্ষস, পিশাচ প্রভৃতি বিবিধ নামে অভিহিত হইয়াছিল। ইহারা ঘোর অসভ্য হইলেও শারীরিক বলে আর্য্যগণ হইতে ন্যূন ছিল না; যেহেতু ইহাদের হিংস্র পাশবোদ্যম ইতিপূর্ব্বে ক্ষয় না হওয়ায়, ইহারা

* পূর্ব্ববর্ণিতমত দোলা একই রেখায় অবস্থিত থাকিয়া, একটি নির্দ্দিষ্ট মণ্ডলাকার-বৃত্ত পরিভ্রমণকালে দোলা ক্রমে অধোভাগে নামিয়া ঐ মণ্ডলাকার-বৃত্ত ঘুরিতে ঘুরিতে পুনরূর্দ্ধে উত্থিত হয় এবং যে স্থান হইতে নামিয়াছিল, তথায় পৌছিয়া তাহার মূল মেরুদণ্ডের ন্যায় পূর্ব্বোক্ত বংশদণ্ডসহ এক রেখা ঊর্দ্ধে উত্থিত হইয়া দোলার গতি পুনঃ নিম্নদিগে হয়, উহাই দোলার অধ-ঊর্দ্ধ গমন বা অবনতির পর উন্নতি। কল্পপত্রিকায় উহার বিশদ বর্ণনা আছে, তাহা দ্রষ্টব্য।

সিংহ ব্যাঘ্রাপেক্ষাও ভয়ঙ্কর হিংস্র জীব ছিল। অবশ্যই হিমালয়ের যে সকল দুরধিগম্য অধিত্যকা দেবভূমি বা সুরদিগের বাসভূমি ছিল, তথায় ইহাদের গতি বিধির ক্ষমতা অতি অল্পই ছিল। এই জন্য দেবযুগে ইহাদিগের সহিত সুরগণের প্রায় সাক্ষাৎ হয় নাই। আর্য্য পিতামহগণ পূর্ব্বোক্ত অধিত্যকা হইতে অবতরণ করিলে, পার্ব্বত্য নিবিড় বনাকীর্ণ প্রদেশে ইহাদিগের সহিত তাঁহাদের প্রথম সাক্ষাৎ হয়। ইহাদের ভীষণতম মূর্ত্তির বর্ণনা বেদ ও পুরাণাদিতে, বিশেষতঃ বাল্মীকীর অমৃত-নিস্যন্দিনী-লেখনী-নির্গত রামায়ণে বিশদরূপে বর্ণিত আছে। যদি শিক্ষিত পাঠকগণ ঐ সকল পুস্তক পড়িবার ক্লেশ স্বীকার করিতে না চাহেন, তবে মাননীয় বাবু রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের প্রণীত ইংরাজী ভাষায় লিখিত ভারতের প্রাচীন সভ্যতার ইতিহাসের প্রথমভাগের বৈদিককাল (Vadic age) পাঠ করিলেও তাহাদের অবস্থা বুঝিতে পারিবেন। এমন কি, তাহাদের মধ্যে কোন কোন সম্প্রদায়ের মনুষ্যোচিত ভাষা পর্য্যন্ত ছিল না! এই দুর্দ্ধর্ষ দুর্দ্দমনীয় অসভ্যজাতিকে পরাজয়-পূর্ব্বক ভারতাধিকারের নিমিত্ত আর্য্য পিতামহগণের বল ও বীর্য্য পুনরুত্তেজিত ও ভীষণ হইতে ভীষণতর হইয়াছিল। একপক্ষে উহাদিগকে যুদ্ধে পরাজয়পূর্ব্বক দেশাধিকার, পক্ষান্তরে বনাকীর্ণ ভূমি সকল পরিষ্কার করিয়া কৃষি-বাণিজ্যের বিস্তার একান্ত আবশ্যক হইয়াছিল। ঐ সকল আবশ্যকতা সত্বেও সমাজে আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক সর্ব্বপ্রকার জ্ঞানানুশীলন যে একান্ত আবশ্যক এবং ঐ সকল জ্ঞানানুশীলন ব্যতীত সমাজের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি অসম্ভব, ইহা আর্য্য পিতামহগণ বিশেষরূপে বুঝিয়াছিলেন; তন্নিবন্ধন তাঁহাদের কার্য্য-বিভাগ নিতান্ত প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিয়াছিল। ঐ কার্য্য-বিভাগ হইতেই সমাজ-বিভাগ হয়। ঐ সমাজ-বিভাগই জাতি-বিভাগের প্রধান সূত্র; কিন্তু ঐ জাতি-বিভাগ তাঁহাদের ইচ্ছামত কাল্পনিক বিভাগ নহে। উহা বেদোক্তমত ঈশ্বর-সৃষ্ট, তাহার আর সন্দেহ নাই। পূর্ব্বোক্ত আধ্যাত্মিকজ্ঞান ও শক্তিসম্পন্ন মহাত্মা বা মহর্ষিগণ ঈশ্বর-প্রেরিত ত্রিলোক ও ত্রিকাল-ব্যাপী আত্মজ্ঞান-জ্যোতিঃদ্বারা মানবের অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া, প্রথমতঃ মনের শুক্ল, রক্ত, পীত ও কৃষ্ণ বর্ণ নির্দ্দেশ ও তদনুসারে চারিশ্রেণীতে কার্য্য ভাগ করিয়াছিলেন। শুক্ল বিশুদ্ধ সত্ব, রক্ত বিশুদ্ধ রজঃ, * পীত রজস্তম-মিশ্রিত, † কৃষ্ণ তমোগুণ বলিয়া তত্বশাস্ত্রে বর্ণিত আছে। উক্ত চারিজাতির কার্য্য ও সমাজ-বিভাগ পূর্ব্বোল্লিখিত তৃতীয়সূত্রে পরিষ্কার ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

বলা আবশ্যক যে, এই বিভাগের পূর্ব্বে আর্য্য পিতামহগণের হিমালয়বাসকালে প্রাকৃতিক বিভাগানুসারে তাঁহারাও যে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত ছিলেন, তাহার আভাস পূর্ব্বে দেওয়া হইয়াছে। অতএব সেই অসুরজেতা প্রথম শ্রেণীস্থ জনগণের বংশধরগণ যে বংশানুগত সাংক্রামিক ও প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে অবস্থা-ভেদে বিশুদ্ধ শুক্ল ও বিশুদ্ধ রক্তবর্ণের বা বিশুদ্ধ সত্ব-রজ-গুণের অধিকারী ছিলেন, ইহা অস্বাভাবিক নহে। পূর্ব্বোক্ত তৃতীয় সূত্রোল্লিখিত প্রথম দুই শ্রেণী যথাক্রমে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় উপাধি ধারণ করেন। শেষোক্ত শ্রেণী তৎকালে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হন নাই; ঐ শেষোক্ত শ্রেণীই শ্রমজীবী বৈশ্য ছিলেন। যেহেতু তমোগুণার্থে জ্ঞানাবরণীশক্তি বা অজ্ঞানতা বুঝায়; কিন্তু তৎ-

* কোন কোন মতে সত্বমিশ্রিত রজোগুণ বলিয়া বর্ণিত আছে।

† পীতবর্ণ যে রক্ত ও কৃষ্ণবর্ণ সংমিশ্রিত, তাহা বোধ হয় অনেকেই অবগত আছেন।

কালে আর্য্যসমাজে শ্রমজীবীগণও এককালে অজ্ঞান বা অসভ্য ছিল না। তদনন্তর আর্য্যদিগের নিকট আদিম অধিবাসী অধিকাংশ দস্যুগণ পরাজিত ও বশীভূত হইয়া, আর্য্য-সমাজে শ্রমজীবীর অঙ্গীভূত হওয়ায়, তাহাদের অন্তরের প্রাকৃতিক বর্ণ বা গুণানুসারে কৃষ্ণবর্ণ বা তমোগুণ নির্ণীত হইয়া ছিল; তদনুসারে তাহারা দাস বা শূদ্রজাতিতে পরিগণিত হইয়াছিল। অনেকে বলেন যে, আর্য্যগণ পরাজিত জাতিকে নিতান্ত নিপীড়ন ও তাহাদিগকে ঘৃণাচক্ষে দৃষ্টি করিতেন; তাহাদিগের নিমিত্ত দণ্ডবিধি ও কার্য্যবিধি আইন অতীব কঠোর ও আর্য্যদিগের দণ্ড ও কার্য্যবিধি আইন হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ ছিল; এমন কি, আর্য্যগণ তাহাদিগকে উচ্চ-শিক্ষার বা তত্ত্ব-জ্ঞানার্জ্জনের অধিকার পর্য্যন্ত দেন নাই; পরন্ত তাহাদিগকে নিতান্ত দাসত্বশৃঙ্খলে বাঁধিয়া রাখিয়াছিলেন, ইহা সভ্যজনোচিত কার্য্য নহে।

এই কথা যাঁহারা বলেন, তাঁহাদিগকে আমি একটী কথা জিজ্ঞাসা করি, যে, একজন রুগ্ন ক্ষীণকায় ব্যক্তি এক ছটাক সাগু খাইয়া পরিপাক করিতে পারে না, তাহাকে যদি অপরিমিত পলান্ন-কালিয়া ভোজন করান যায়, তবে তাহার কি দশা হয়, বলুন দেখি? যদি উপযুক্ত ঔষধাদি সেবনেও তাহাদের প্রকৃতি অনুসারে কোনকালেও তাহাদের উচ্চাহারের শক্তি না হয়, তথাপি তাহারা ঔষধ সেবন করিয়াছে বলিয়াই তাহাদিগকে পোলাও ইত্যাদি খাইতে দেওয়া উচিত কি? আপত্তিকারীগণ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, উপযুক্ত ঔষধ-সেবন সত্ত্বেও তাহাদিগের পীড়া সম্পূর্ণ আরোগ্য হয় নাই কেন? ইহার উত্তর—তাহাদের জাতীয় কর্ম্মফল ও ভারতের সমতল বনভূমির প্রকৃতি। তাহারা আর্য্যজাতির বশীভূত ও পদানত হইয়াও সুখস্বচ্ছন্দে জীবিকানির্ব্বাহ করিতে থাকায় তাহাদের কোন অভাব ও আবশ্যকতাবোধের স্রোত হৃদয়ে প্রবাহিত হয় নাই। তাহারা চিরকালই আপন অবস্থায় সন্তুষ্ট ছিল; তবে আর্য্যজাতির সংস্রবে যতদূর সম্ভব, ততদূর উন্নত হইয়াছিল। কিন্তু তাহাদের সংস্রবে এবং ভারতের পূর্ব্বোক্ত প্রকৃতির কর্ম্মফলে ভারতীয় আর্য্যগণের মধ্যস্থ শ্রমজীবীগণ ক্রমে ক্রমে তাহাদের মধ্যে মিশিয়া গিয়াছে, তাহার আর সন্দেহ নাই; যেহেতু স্রোতের স্বাভাবিক গতি নিম্নগামী; এই জন্যই ভারতের ৣ অংশ বৈশ্যজাতি একেবারেই বিলুপ্ত ও শূদ্রের অন্তর্ভুক্ত হইয়া গিয়াছে। যাহাহউক, আমরা আমাদের বর্ণনীয় বিষয় হইতে অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছি; এইক্ষণ পুনর্ব্বার আমরা আমাদের আলোচ্য বিষয়ে মনোনিবেশ করিব। *

আর্য্য পিতামহগণ পূর্ব্বোক্ত মত চারি জাতিতে বিভক্ত ও অনার্য্যগণকে উত্তর-প্রদেশ হইতে কতকাংশে বিতাড়িত ও কতকাংশে স্বসম্প্রদায়ভুক্ত করিয়া, পুণ্যময়ী গঙ্গা-যমুনার স্রোতের ন্যায় তাঁহারা ভারতের উত্তর-পশ্চিম-প্রদেশে ব্যাপৃত হইয়া পড়েন। তাঁহাদের মধ্যে সমাজের মূর্ত্তিমান বল, বীর্য্য, পরাক্রম ও ক্ষমতা স্বরূপ, বৈষয়িক জ্ঞান, বুদ্ধি, উদ্যম ও

* পাঠকগণ মনে করিতে পারেন, প্রবন্ধ-লেখক অবতারের ঐতিহাসিকতত্ত্ব প্রমাণ করিতে গিয়া, ভারতের প্রাচীন ইতিহাস বর্ণনা করিতেছেন, এপর্য্যন্ত অবতারের স্পষ্ট কোন প্রসঙ্গ দেখা যায় না; ইহা যাঁহারা মনে করিবেন, তাঁহাদিগের নিকট প্রবন্ধ লেখক অতি বিনীতভাবে জানাইতেছেন যে, তাঁহারা কিঞ্চিৎ ধৈর্য্যাবলম্বন করিবেন; ক্রমেই অবতারের ঐতিহাসিকতত্ত্ব যে প্রমাণিত হইবে, উপরোক্ত বর্ণনার মধ্যেই তাহার ভিত্তি সংস্থাপিত হইয়াছে। বিশেষ চিন্তা করিলে বুঝিতে পারিবেন; ক্রমে বিশদ হইবে।

অধ্যবসায়ের নেতাস্বরূপ কার্য্যকুশল ক্ষত্রিয়গণ কোশল, পাঞ্চাল, হস্তিনা, বিদেহ, কাশী প্রভৃতি স্থানে এক একটী রাজ্য সংস্থাপন পূর্ব্বক এক একজন সূর্য্য ও চন্দ্রবংশীয় প্রধান নেতারূপে সিংহাসনে আরূঢ় হইয়া সমগ্র আর্য্যাবর্ত্ত শাসন ও পালন করিয়াছিলেন। (ক্রমশঃ প্রকাশ্য)

শ্রীশশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

শ্লোকাষ্টক।*

চেতো দর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নিনির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনম্ ॥১॥

অনুবাদ। শ্রীকৃষ্ণের সঙ্কীর্ত্তনের জয় জয়কার! কেননা হরিসঙ্কীর্ত্তনে চিত্তরূপ দর্পণ মার্জ্জিত হয়, সংসাররূপ মহাদাবাগ্নি নির্ব্বাণ হয়, ইহা মুক্তিরূপ কুমুদে চন্দ্রিকাবর্ষণ করে, বিদ্যা (ব্রহ্মজ্ঞান) রূপা বধূর জীবন দান করে, আনন্দসাগর বর্দ্ধন করে, প্রতিপদোচ্চারণে অমৃতরসের পূর্ণ অস্বাদ প্রদান করে এবং ইন্দ্রিয়, মন প্রভৃতি (সর্ব্বাত্মা) ইহাতে শীতল হয়।

বিশদীকরণ। স্বচ্ছ বস্তু সমল হইলে, তাহাতে কিছুই প্রকাশ পায় না। চিত্ত দর্পণবৎ স্বচ্ছ; বিষয় তাহার মল। হরিসঙ্কীর্ত্তনে সেই মল নির্ম্মল হইলে, ব্রহ্মজ্যোতিঃ স্বতঃ প্রকাশ হয়; তাই বলিতেছেন—"চেতোদর্পণমার্জ্জনম্"।

চতুর্দ্দিকে দাবাগ্নি জ্বলিলে যেমন বনচারীর নিস্তার নাই; কোথায় যাইবে? যে দিকে পলাইবে, সেই দিকেই দাবদাহ। দুঃখের আর সীমা নাই। সেইরূপ সংসার পাপীর চারিধারে জ্বলিতেছে। এক সংসার হইতে এসংসারে আসিয়াছে, আবার মরিলেও আবার সংসার। প্রাণী সংসারদাবানলে পড়িয়া পূর্ব্ব জন্মে দগ্ধ হইয়াছে, এ জন্মে হইতেছে এবং পর জন্মেও হইবে। প্রাণ ছটফট্ করিতেছে, কেবল হরিসঙ্কীর্ত্তনরূপ অমৃতে সে দাবদাহ নির্ব্বাণ হয়! তাই বলিতেছেন:—"ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণম্"।

মুক্তি যেন কুমুদ। কুমুদ যেমন স্নিগ্ধকর-চন্দ্রিকায় বিকশি পায়, সেইরূপ মনোমুগ্ধকর হরিসঙ্কীর্ত্তনে মুক্তি বিকাশ পায়; তাই "শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণম্"।

আমাদের কোণের বধূ বিদ্যা (ব্রহ্মজ্ঞান), তাহার এক মাত্র জীবন শ্রীহরিসঙ্কীর্ত্তন। তাই "বিদ্যা-বধূ-জীবনম্"।

এ ত দূরের কথা, সঙ্কীর্ত্তন-প্রারম্ভেই আনন্দ-সাগরে যেন উচ্ছাস (কোটাল) আসে। তাই "আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনম্" এবং সঙ্কীর্ত্তনীয় প্রত্যেক পদের উচ্চারণে যেন অমৃতের সম্পূর্ণ আস্বাদন হয় এবং ইন্দ্রিয়, মন, প্রাণ যেন জুড়াইয়া যায়; তাই বলিয়াছেন:—"প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনম্" "সর্ব্বাত্মস্নপনম্"।

এহেন সঙ্কীর্ত্তনে অধিকারী কে?

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয় সদা হরিঃ ॥২॥

অনুবাদ। তৃণ হইতেও অতি নীচু, বৃক্ষের ন্যায় সহিষ্ণু ও অভিমানবর্জ্জিত, অথচ (অন্যের) সম্মানকারী ব্যক্তিই হরিসঙ্কীর্ত্তনে অধিকারী।

বিশদীকরণ। তৃণ সকলেরই পদতলে; তদপেক্ষা নীচ মাটি; অতএব "মাটির মানুষ"

* এই শ্লোকাষ্টক শ্রীচৈতন্যদেবের শ্রীমুখের বাণী

(অর্থাৎ সুবিনীত) হইয়া যে তৃণ অপেক্ষাও অতি নীচভাবে অবস্থান করে; আর বৃক্ষ স্বশিরে রৌদ্র, বৃষ্টি প্রভৃতি সহ্য করিয়া আশ্রিতের ক্লেশ দূর করে; অধিক কি, অনাতপদ্বারা ছেদকেরও শ্রান্তি হরণ করে! এহেন বৃক্ষের ন্যায় যে সহিষ্ণু এবং যে বর্ণাশ্রমের বা ধন-সম্পদাদির অভিমান করে না, কিন্তু অপরের বর্ণাশ্রমের ও ধন-সম্পদাদির সম্মান করে, সেই ব্যক্তি হরি-সঙ্কীর্ত্তনে নিত্যাধিকারী।

নাম্নামকারি বহুধা নিজসর্ব্বশক্তি-
স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণেন কালঃ।
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্মমাপি
দুর্দ্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ ॥ ৩ ॥

অনুবাদ। ভগবন্! তুমি বিষ্ণু প্রভৃতি নাম ধারণ করিয়াছ। সেই নাম বিশেষে নিজের (রোগনাশক প্রভৃতি) শক্তি অর্পিত করিয়াছ; "ঔষধে চিন্তয়েদ্ বিষ্ণুং" ইত্যাদি রূপে স্মরণের নিয়ম করিয়াছ। (মূঢ় মানবের প্রতি) তোমার এইরূপ কৃপা, কিন্তু হায়! আমার এমন দুর্দ্দৈব! তোমার নামে আমার অনুরাগ জন্মিল না!

তাই প্রার্থনা করি—

ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং জগদীশ-কাময়ে। মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ॥ ৪ ॥

অনুবাদ। হে জগদীশ! আমি ধন চাহি না, জন চাহি না, ভাল কবিত্বশক্তিও চাহি না। যেন প্রতি জন্মে ঈশ্বরে (তোমাতে) নিষ্কাম ভক্তি (অনুরাগ) হয়।

অয়ি নন্দতনুজ! কিঙ্করং পতিতং মাং বিষমে ভবাম্বুধৌ কৃপয়া তব পাদপঙ্কজস্থিতধূলী-সদৃশং বিচিন্তয় ॥ ৫ ॥

অনুবাদ। অয়ি নন্দনন্দন হরি! আমি তোমার কিঙ্কর। (আজ ভবকর্ণধার প্রভুকে হারাইয়া) বিষম সংসারসাগরে পড়িয়াছি। অতএব আমাকে তোমার চরণের রেণুসদৃশ চিন্তা কর। (অর্থাৎ চরণের রেণু যেমন চরণ ছাড়া হয় না, আমাকেও সেইরূপ চরণ-ছাড়া করিও না। দাস্য-ভক্তি প্রদান কর।)

নয়নং গলদশ্রুধারয়া বদনং গদ্গদরুদ্ধয়া গিরা। পুলকৈর্নিচিতং বপুঃ কদা তব নাম-গ্রহণে ভবিষ্যতি ॥ ৬ ॥

অনুবাদ। (বল দেখি কৃষ্ণ!) কবে তোমার নামোচ্চারণে নেত্র হইতে অশ্রু বিগলিত হইবে? বাক্য গদ্গদরূপে মুখেই রুদ্ধ থাকিবে? এবং শরীর রোমাঞ্চিত হইবে?

যুগায়িতং নিমেষেণ চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতম্।
শূন্যায়িতং জগৎ সর্ব্বং গোবিন্দবিরহেন মে ॥৭॥

অনুবাদ। (সখি!) আজ গোবিন্দ-বিরহে নিমেষ কাল যুগবৎ বোধ হইতেছে; চক্ষু যেন বর্ষার ধারা বর্ষণ করিতেছে; জগৎ শূন্য বলিয়া বোধ হইতেছে!

আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মামদর্শনান্মর্ম্মহতাং করোতু বা। যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ ॥ ৮ ॥

অনুবাদ। (সখি) কৃষ্ণ আমাকে প্রেমালিঙ্গনপূর্ব্বক পাদরতা (চরণের দাসীই) করুন, অথবা দুঃখে পেষণ করুন, কিম্বা দর্শন না দিয়া মর্ম্ম-পীড়িতাই করুন, তিনি লম্পট যা' তা' করুন; আমার কিন্তু তিনিই প্রাণনাথ, অপর কেহ নয়।

অনুশীলন। পাঠক! একবার মার্জ্জিত রুচিতে রাধার আত্মসমর্পণ অনুধাবন করুন। রাধা সখিকে বলিতেছেন—সখি হে! দাসীর উপর প্রভুর ক্ষমতা সর্ব্বতোমুখী। একতঃ তিনি দাসী রাখিতেও পারেন, নাও পারেন, আমি কিন্তু নাছোড়বন্দা, তিনি পুরস্কার প্রভৃতি কিছু দিউন বা নাদিউন, আমি তাঁহার দাস্য

করিবই করিব, ইহা স্থির ; কাজেই অনুগ্রহ হয়, প্রেমালিঙ্গন দিতে পারেন, নিগ্রহ হয়, দুঃখের ভারে চূর্ণ করিতে পারেন। বেশী কিছু করিতে হয় না—দর্শন না দিলেই মর্ম্মহতা হই! দ্বিতীয়তঃ তাঁহার অনেক দাসী, তাঁহার সেবার ভাবনা কি? তিনি যে লম্পট—ধৃষ্ট নায়ক; তাঁহার মনের মত কাজ করে, তাঁহাকে ভাল-রূপে শুশ্রূষা করে, ছায়ার ন্যায় তাঁহার অনুবর্ত্তন করে, এমন অনেক আছে; কিন্তু তিনি ছাড়া রাধার প্রাণনাথ আর কেহ নাই। রাধা তাঁহার চরণে শরণ লইল। রাধাকে দুঃখ দিয়া তিনি সুখী হন, হউন। অন্যের সঙ্গে রঙ্গরসে সুখী হন, হউন; রাধা ভাবিবে, "আমার প্রাণনাথ সুখী" তাহাতেই রাধার অপার আনন্দ; রাধা আত্ম-সুখ চায় না, তাঁহার সুখেই রাধা সুখী। অথবা কৃষ্ণই রাধার আত্মা,—কৃষ্ণ-সুখই রাধার আত্মসুখ!

পাঠক! নাসিকা কুঞ্চিত করিও না। এ চৈতন্যদেবের স্বকপোলকল্পিত শ্লোক। তিনি বিবাহিত হইয়াও চিরব্রহ্মচর্য্যব্রতে দীক্ষিত। তাঁহার জীবনী আলোচনা করিলে রুচির পরম পবিত্রতা উপলব্ধি হইবে। এহেন শ্রীগৌরচন্দ্র রাধার মুখে শ্রীকৃষ্ণকে 'লম্পট' বলিলেন। ইহার আবার গূঢ়তা আছে। রাধাকৃষ্ণের প্রেম অতুল! একবার কুসংস্কারের ভার রাখিয়া, সুরুচি-কলস লইয়া ভক্তিসাগরে সন্তরণ কর, কূল পাইবে। সকলেরই একরূপ রুচি নয়, রুচিভেদে উপাসক-সম্প্রদায় ভিন্ন ভিন্ন হইয়াছে। সংসারের ছায়া ভগবানে প্রতিফলিত করিয়া মনের আবেগ দূর করিতে হয়, নতুবা উপায় নাই। সংসারের পূজ্যগণের সহিত যেরূপ ব্যবহার করিতে হয়, ভগবানের প্রতি সেইরূপ ব্যবহারই স্বাভাবিক; তাই কেহ মাতৃভাবে, কেহ পিতৃভাবে, কেহ প্রভুভাবে বিভোর হইয়া ভাবোচিত বাক্যাদি ব্যবহার করেন। বস্তুতঃ তিনি মাতা নন, পিতা নন, প্রভু নন, অথচ তিনিই সর্ব্বভাবময়! আমরা তাঁহার যে কোন ভাবাশ্রয় করিয়া পূজ্য-পূজকসম্বন্ধ রক্ষা করি। হিন্দু-রমণীর একজন পরম পূজ্য আছেন, তাঁহার নাম স্বামী। হিন্দুর নিকট স্বামীর আসন মাতা-পিতার আসনের অনেক উপরে। তাই পিতা নন, মাতা নন, গুরু নন, স্বামীই স্ত্রীর একমাত্র মহাগুরু। গোপবালারা ভগবান্‌কে এহেন স্বামীভাবে পূজ্য বিবেচনা করিয়া, স্বামীর আসনে বসাইয়া, তাঁহার পূজা করিয়া, সংসারের তাপ হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছেন। স্থানবিশেষে অমৃতও বিষ হয়, বিষও অমৃত হয়। পতি-পত্নীভাব অপব্যবহারে অন্যত্র দূষিত হইতে পারে, ভগবানের সম্বন্ধে দোষাবহ নয়। তিনি ভাবের সাগর, যে ভাব চাহিবে, সেই ভাব পাইবে। যদি বল, শৃঙ্গাররস ভক্তিরসের বিরোধী, পতি-পত্নীভাবে শৃঙ্গাররস মনে স্ফুরিত হয়। বিরোধী হওয়া দূরে থাক, বরং অনুকূল হইয়াছে; গুণপ্রধানভাবে শৃঙ্গাররস ভক্তিরসের পোষক হইয়াছে। তুমি শৃঙ্গাররসের সাত্ত্বিক মর্ম্ম জাননা বলিয়া কুসংস্কারবশতঃ কুভাবে কুণ্ঠিত হও। বস্তুতঃ মাতা, পিতা, ভ্রাতা, ভগিনী, জ্ঞাতি, যে কোন সম্বন্ধ বল, সকল সম্বন্ধই মূলতঃ শৃঙ্গাররসে অনুপ্রাণিত। যাহার মূলে শৃঙ্গাররস নাই, এমন সম্বন্ধই নাই। কৈ! সে সময়ে ত কুরুচিতে নাসিকা কুঞ্চিত হয় না; এখন হয় কেন? সংস্কারই মূল। চৈতন্য-চরিতামৃতে আছে,—

দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য আর যে শৃঙ্গার।
চারি ভাব চতুর্ব্বিধ ভক্তির আধার॥
নিজ নিজ ভাব সবে শ্রেষ্ঠ করি মানে।
নিজভাবে করে কৃষ্ণসুখ আস্বাদনে॥
তটস্থ হইয়া যদি দেখয়ে বিচারি।
সব রস হতে শৃঙ্গারে অধিক মাধুরী॥

ভগবান্ স্বয়ং গীতায় বলিয়াছেন,—

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে
তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্ ॥"

অর্থাৎ আমাকে পিতৃভাবে, সখিভাবে অথবা প্রাণপতিভাবে, যেভাবে যে ভক্তিভরে ভজনা করে, আমি তাহার নিকট সেই ভাবে প্রকাশ পাই

ইহা যেন মানিয়া লইলাম, কিন্তু গোপীগণ ভগবানের সহিত পতি-পত্নী ব্যবহার করিলেন কিরূপে? ইহাতে কি কুরুচি নাই? ইহা কি ভক্তির অঙ্গ? "অধ্যাত্মিক অর্থ" করিলে চলিবে না। বাহ্য-অর্থ-সঙ্গতি বিষয়ে আগামীবারে আলোচনার ইচ্ছা রহিল

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ স্মৃতিতীর্থ।

ভাষাপরিচ্ছেদ। *

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

বর্ণঃ শুক্লো রসস্পর্শৌ জলে মধুরশীতলৌ।
স্নেহস্তত্র দ্রবত্বন্তু সাংসিদ্ধিকমুদাহৃতম্ ॥ ৩৯ ॥

বিষমপদব্যাখ্যা—১। মধুরশীতলৌরসস্পর্শৌ—মধুর রস (আস্বাদ) শীতল—স্পর্শ॥ ২। স্নেহঃ—গুণবিশেষ। পরে সুব্যক্ত হইবে। ৩। সাংসিদ্ধিকং—স্বাভাবিক।

অনুবাদ। জলে শুক্লবর্ণ, মধুর রস, শীতল স্পর্শ, স্নেহগুণ ও দ্রবতা আছে; কিন্তু সেই দ্রবতা স্বাভাবিক বলিয়া কথিত হইয়াছে ॥৩৯॥

বিষদীকরণ। যমুনার জল কালো, জাহ্নবীর জল ধল, অজয়ের জল লাল এবং জলধির জল নীল,—এইরূপ জলের বিবিধ বর্ণ দেখিতে পাই; অতএব জলের শুক্লবর্ণ স্থির করা কিরূপে যুক্তিসঙ্গত হয়? এই পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, জলের নীলত্ব পীতত্বাদি নৈমিত্তিক। যেরূপ আধার (স্থান), সেইরূপ রঙ্ হইয়া থাকে। স্থানের বর্ণ জলে সংক্রান্ত হয়। উহার স্বাভাবিক বর্ণ শুক্ল। বর্ণ সমবায়ের নাম শুক্লবর্ণ। তাই জলের শুক্লবর্ণ আশ্রয়ের বর্ণান্তরে অল্পেই বিকৃত হয়। অর্থাৎ জলগত শুক্লবর্ণ, আশ্রয়গত নীলাদি বর্ণের সহিত মিশিয়া সেই বর্ণ হয়; কেননা নীলাদিবর্ণের পরমাণু-সমবায়ই তখন তাহাতে বেশী হইয়া দাঁড়ায়। কোন উপায়ে আশ্রয়ের গুণ তিরোহিত করিতে পারিলে, উহার স্বাভাবিক শুক্লত্ব স্বতঃই প্রকাশ পায়। যমুনার কালো জলে প্রস্তুত বরফ অবশ্য শাদা হইবে। আকাশের জল ও করকা নিরাধার অবস্থায় শাদা। তখন তাহাতে আধারগুণ সংক্রান্ত হয় না; কিন্তু যমুনার জলে পতিত হইলে, স্থানের গুণে কালো হয়; যমুনার জলও আকাশে উৎক্ষিপ্ত হইলে ধবল হয়। দূরস্থ অতল জলধি-জল নীল বোধ হয়, দৃষ্টির লাঘবাদি তাহার প্রতিকারণ। অতএব জলের নীলত্বাদি বর্ণ অস্বাভাবিক;

* গত হিন্দু-পত্রিকার ভাষাপরিচ্ছেদ প্রবন্ধে অনেক ভুল আছে। কতকগুলি ভুল অমর্ষণীয়। ১৭১ পৃষ্ঠের "আত্মা নিত্যদ্রব্য বুদ্ধি-বিশেষগুণ-ইত্যাতে, এই কবিতার বিশেষ গুণের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে" এই সন্দর্ভ টুকু ভুল। ১৮৫ পৃষ্ঠার প্রবন্ধের শেষে "উপভোগের মধ্যে" ভুল। ঐ স্থলে উপভোগের সাধন হইবে। এতদ্ভিন্ন কোন স্থানে নৈয়ায়িক লিখিতে 'নৈ' হইয়াছে ইত্যাদি। যাহা হউক, অতঃপর বিশুদ্ধতার চেষ্টা করা যাইবে।

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ স্মৃতিতীর্থ।

তাহার স্বাভাবিক বর্ণ শুক্ল।—ইহা যুক্তিসঙ্গত হইল।

এখন জলের মধুররস কিরূপে সঙ্গত হয়? দেশীয় কূপের জল বোদা (বিকৃতাস্বাদ) সমুদ্রের জল লোনা, কলের জল বিরস, নদীর জল সরস। এ পূর্ব্বপক্ষের উত্তরও পূর্ব্ববৎ। আশ্রয়ের গুণে জলের এইরূপ নানা রস হয়। যদি বৈজ্ঞানিক উপায়ে জলের ভৌমিক সম্বা-জনিত নৈমিত্তিকগুণ তিরোহিত করা যায়, তবে তাহার স্বভাবসুলভ মধুররস প্রকাশ পায়। তৃষার্ত্ত ব্যক্তি স্বয়ং জলের মধুররস অনুভব করিয়া থাকেন। হরীতকী বা কষায়-বস্তু ভোজনান্তে জল বড়ই মধুর বোধ হয়। কষায়বস্তুর আকর্ষণে জলের আশ্রয়লব্ধ কষা-য়াদিরস বিশ্লিষ্ট হয়; তখন তাহার স্বাভাবিক মধুরত্ব প্রকাশ পায়। ঐ মধুরতা হরীতকীর গুণ নয়; তবে হরীতকী উহার নিমিত্ত। যদি বল, রাসায়নিকযোগে অন্য রস হয়, আমিও স্বীকার করি; কিন্তু মধুরতারস যৌগিক নহে। অতএব সে মধুরতাটুকু কাহার ধরিতে হইবে? হরীতকীর ধরিতে পার না, কেননা হরীতকীর মুখ্য আস্বাদ কষায় রসেই বটে; কিন্তু জলের মধুরতা সর্ব্বত্র প্রত্যক্ষীকৃত। অতএব এখানে তাহারই মধুরতা বলাই যুক্তিসঙ্গত। হরীতকী ভোজনের পর, জল বেশি মিষ্ট হয়; অন্যত্র জলের মধুরতাগুণ আশ্রয়লব্ধ গুণান্তরের সহিত সংসৃষ্ট থাকায় ভাল প্রকাশ পায় না। এস্থলে রাসায়নিকযোগে তাহার তিরোধান হওয়ায় মধুরতার তীব্রতা হয়। যদি সন্দেশের চিনি, ছানা হইতে পৃথক্ করিয়া খাওয়া যায়, তবে তাহার মুখ্য আস্বাদ বড়ই মিষ্ট বোধ হইবে বৈ কি।

জলের স্পর্শ স্বভাবতঃ শীতল, তবে তেজের সম্পর্কে উষ্ণ হয়।

পৃথিবী প্রভৃতির নৈমিত্তিক দ্রবত্ব হইতে পারে, কিন্তু জলের দ্রবত্ব স্বাভাবিক॥ ৩৯॥

নিত্যতাদিঃ প্রথমবৎ কিন্তু দেহমযোনিজম্।
ইন্দ্রিয়ং রসনং সিন্ধুর্হিমাদির্বিষয়োমতঃ॥ ৪০॥

বিষমপদব্যাখ্যা ১। নিত্যতাদিঃ প্রথমবৎ—প্রথমোক্ত পৃথিবীর ন্যায় জলের নিত্যতাদি বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ "নিত্যানিত্যা চ সা দ্বেধা নিত্যা স্যাদনুলক্ষণা। অনিত্যা তু তদন্যা স্যাৎ সৈবাবয়বযোগিনী॥" ইত্যাদিবৎ জলও নিত্যপ্রভৃতি হইবে। ২। রসনম্—রসনা—জিহ্বা। ৩। হিমাদিঃ—আদিপদে বিল, খাল, সরোবর প্রভৃতি জলাশয় এবং করকা (শিল) প্রভৃতিও বুঝিতে হইবে।

অনুবাদ। পৃথিবীর ন্যায় জলের নিত্য-ত্বাদি; কিন্তু জলীয়-দেহ অযোনিজ; ইন্দ্রিয়, রসনা এবং বিষয় সমুদ্র-হিমপ্রভৃতি॥ ৪০॥

বিশদীকরণ। পৃথিবীর ন্যায় জলের নিত্য-ত্বাদি। ইহার তাৎপর্য্য—জল পৃথিবীর ন্যায় দ্বিবিধ—নিত্য এবং অনিত্য। পরমাণুরূপে নিত্য এবং দ্ব্যণুকাদিরূপে অনিত্য। অনিত্যের অবয়ব আছে। সেই অনিত্য জল, অনিত্য পৃথিবীর ন্যায় ত্রিবিধ—শরীর, ইন্দ্রিয় ও বিষয়-রূপ। পার্থিব-শরীরের ইন্দ্রিয় ও বিষয়ের সহিত এইমাত্র ভেদ—পার্থিব-দেহ যোনিজ ও অযো-নিজ এই দুইপ্রকার হয়; কিন্তু জলীয় দেহ কেবল অযোনিজ। পার্থিব-দেহ যেমন পৃথিবীলোকে প্রসিদ্ধ, সেইরূপ জলীয়-দেহ বরুণলোকে প্রসিদ্ধ। পার্থিব-ইন্দ্রিয় ঘ্রাণ; কিন্তু জলীয় ইন্দ্রিয়-রসনা। তাই রসনায় জলের গুণ রসের অনুভূতি হয়। যে ইন্দ্রিয় যে জাতীয় বস্তুর গুণ অভিব্যক্ত করে, সে ইন্দ্রিয় সেই জাতীয় বস্তু। সজাতি বস্তু যেমন সজাতি বস্তুর পরিপূরক ও উত্তেজক হয়, সেইরূপ সজাতির গুণ প্রকাশক হইয়া থাকে; যথা—শরীরের জলাংশ

ও স্থলাংশ ক্ষীণ হইলে, বাহিরের জলে ও স্থলে সেই ক্ষতির পূরণ হয়; তাই বলি—সজাতি সজাতির পরিপূরক। জলময় চন্দ্রের সন্নিকর্ষে সাগরের জল উত্তেজিত হয়; আবার সাগরের জল উথলিয়া উঠিলে, আমাদের শরীরের জল উত্তেজিত হয়, তাই বলি সজাতি সজাতির উত্তেজক; তেজঃ পদার্থ প্রদীপ তেজের গুণ রূপকে প্রকাশ করে, সেইরূপ তৈজসিক চক্ষু রূপের প্রকাশক; তাই বলি, যখন সজাতি বস্তু সজাতি বস্তুর গুণপ্রকাশক হয়, ইহা সিদ্ধান্ত হইল, তখন রসনা জলের গুণ রসকে আস্বাদ করে বিধায় রসনা জল-প্রধান-ইন্দ্রিয় হওয়াই স্বভাবসঙ্গত। ফলকথা রসনায় রস আছে বলিয়াই রসের আস্বাদ হয়। রস জলেই থাকে, সুতরাং রসনা জলের বিকার।

জলীয়বিষয় সাগর, নদী, বিল, খাল প্রভৃতি জলাশয় এবং বরফ করকাদি। উপভোগ-সাধনের নাম বিষয়। জল উপভোগ করিতে হইলে, অর্থাৎ রসনাদ্বারা রস আস্বাদন করিতে হইলে, জলাশয় তাহার সাধন। অতএব জলীয় বিষয় জলাশয়। করকা কঠিন বিধায় পার্থিব বলিয়া ভ্রম হইতে পারে; কিন্তু যখন করকা প্রলয়কালে জলে পরিণত হয়, তখন করকা জলীয়পদার্থ। কারণান্তরে উহার দ্রবত্ব প্রতিরুদ্ধ থাকায়, জল করকা ও বরফ আকারে বিরাজ করে। সূর্য্যকিরণ ও বাহ্য বায়ুর স্পর্শে যে জল—সেই জল হয় ॥ ৪০ ॥

স্পর্শ উষ্ণস্তেজসস্তু স্যাদ্রূপং শুক্লভাস্বরম্।
নৈমিত্তিকদ্রবত্বন্তু নিত্যতাদি চ পূর্ব্ববৎ ॥ ৪১ ॥
ইন্দ্রিয়ং নয়নং বহ্নি স্বর্ণাদির্বিষয়ো মতঃ।

কিয়ৎপদব্যাখ্যা। ১। শুক্ল ভাস্বরম্—শুক্ল এবং ভাস্বর (দীপ্তিবিশিষ্ট)। ২। নৈমিত্তিক—নিমিত্তাধীন, অস্বাভাবিক। ৩। পূর্ব্ববৎ—জলের ন্যায়।

অনুবাদ—তেজের স্পর্শ উষ্ণ এবং রূপ উজ্জ্বলশাদা। ইহার দ্রবভাব নৈমিত্তিক। নিত্যতাদি প্রভৃতি পূর্ব্বের (জলের) ন্যায়। কেবল ইহার ইন্দ্রিয় নয়ন এবং বিষয় অগ্নি ও স্বর্ণ প্রভৃতি।

বিষদীকরণ। উষ্ণ স্পর্শের সমবায়ীকারণের নাম তেজ, অর্থাৎ যাহার স্পর্শ উষ্ণ, তাহার নাম তেজ। সুশীতল চন্দ্রকিরণেও এ লক্ষণের অব্যাপ্তি হয় না; চন্দ্রগত জলীয় স্পর্শে উহার উষ্ণতা অভিভূত থাকে। ১৩০১ সালের হিন্দু-পত্রিকায় "বৈধকাল" শীর্ষকপ্রবন্ধে ইহার বিবরণ বিস্তৃতরূপে আছে। এইপ্রকার রত্ন-কিরণের উষ্ণভাব পার্থিবপদার্থে তিরোহিত থাকে; চক্ষু ও তৈজসিকপদার্থ, উহার উষ্ণতা অনুদ্ভূতরূপতাবশতঃ অনুভূত হয় না। তেজের রূপ শুক্ল অথচ উজ্জ্বল। জলের রূপ শুক্ল। পৃথিবীর রূপও শুক্ল হইতে পারে; কিন্তু ভাস্বর নয়—ইহাই তেজের সহিত বিশেষ। লৌকিক অগ্নি যে লাল দেখি, তাহার কারণ লৌকিক অগ্নি পার্থিবরূপে অভিভূত থাকে। মরকত প্রভৃতি রত্নও পার্থিবরূপে অভিভূত থাকায়, শুক্ল বলিয়া অনুভূত হয় না। চন্দ্রকিরণাদিতে আচ্ছাদকের অভাবপ্রযুক্ত শুক্ল ভাস্বররূপ বেশ প্রতীত হয়।

তেজের দ্রবত্ব নৈমিত্তিক। সুবর্ণাদি তেজঃ-পদার্থ, বিশিষ্ট অগ্নির সংযোগে দ্রবীভূত হয়; অতএব তেজের নৈমিত্তিক দ্রবত্ব প্রত্যক্ষসিদ্ধ।

তেজের নিত্যতাপ্রভৃতি পূর্ব্ববর্ত্তী জলের ন্যায়। জল যেমন দ্বিবিধ, তেজও সেইরূপ দ্বিবিধ—নিত্য এবং অনিত্য। পরমাণুরূপে নিত্য, দ্ব্যণুকাদিরূপে অনিত্য। অনিত্য দ্ব্যণুকাদি সাবয়ব। তাদৃশ অনিত্য তেজ ত্রিবিধ—শরীর, ইন্দ্রিয় ও বিষয়রূপ। যে শরীর অযোনিজ, যেমন পার্থিব-শরীর পৃথিবীতে প্রসিদ্ধ

এবং জলীয় শরীর বারুণলোকে প্রসিদ্ধ, সেই-রূপ তৈজস-শরীর সূর্য্যলোকে বিখ্যাত।' জলের সহিত বিশেষ এই—জলীয় ইন্দ্রিয় রসনা; কিন্তু তৈজস ইন্দ্রিয় চক্ষু এবং বিষয় অগ্নি স্বর্ণ প্রভৃতি। নয়ন যখন পরকীয় গুণ স্পর্শাদির অভিব্যঞ্জক না হইয়া, কেবল তৈজসিক গুণ রূপকে অভিব্যক্ত করে, তখন নয়নও প্রদীপের ন্যায় তৈজস। প্রদীপ তৈজসপদার্থ; তাই পরকীয়রূপ অভিব্যক্ত করে, স্পর্শাদি অভিব্যক্ত করিতে পারে না। তেজ ভিন্ন অন্য বস্তু রূপ প্রকাশ করিতে পারে না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সজাতি সজাতির সহিত মিলিয়া তাহার অভি-ব্যঞ্জক হয় ইত্যাদি।

এখন দেখা যাউক, সুবর্ণকে তেজঃপদার্থ বলা কিরূপে সঙ্গত হয়? সুবর্ণ ক্ষিতি, অপ্ কেন না হয়? গন্ধের সমবায়িকারণ পৃথিবী, রসের সমবায়িকারণ জল। স্বর্ণে গন্ধ নাই, রস নাই, অতএব স্বর্ণ পৃথিবী ও জল নয়। বস্তু-গত্যা স্বর্ণ তেজঃপদার্থ।

দ্বিতীয়যুক্তি—বিজাতীয় বস্তু বিজাতীয় বস্তুর বিপ্রকর্ষক হয়, অর্থাৎ বিজাতি বিজাতির নিকট থাকিতে পারে না। পরস্পর পরস্পরের হিংসা করে। অগ্নি ও জল পরস্পর বিরুদ্ধ জাতি। উভয়ে যদি এক স্থানে থাকে, তাহা-হইলে জল যদি প্রবল হয়, তবে অগ্নি নির্ব্বাণ হয় এবং অগ্নি প্রবল হইলে জল শুষ্ক হয়। উভয়ে তুল্যবল হইলে, পরস্পরের বলক্ষয় হয়। ইহা সকলেরই প্রত্যক্ষবিষয়।

অগ্নিতে কিছু প্রক্ষেপ করিলে, তাহার পার্থিব অংশ ভস্ম হইয়া পৃথিবীতে পতিত রয় এবং জলীয় অংশ ধূমাকারে মেঘে বিলীন হয়। আগুনে আগুন দিলে, পরস্পরের উপচয় বই অপচয় হয় না। তাই অবিশুদ্ধ (মরা) স্বর্ণ বিশিষ্ট-অগ্নিসংযুক্ত করিলে, তাহার অবিশুদ্ধ (পার্থিব) অংশ উড়িয়া যায়। বিশুদ্ধ (খাটি) অংশ পড়িয়া থাকে। সহস্র বহ্নি-সংযোগে বিশুদ্ধ স্বর্ণের তিলমাত্র পরিমাণও লঘু হয় না; কেননা, স্বর্ণ যে বহ্নির সজাতি; সজাতিদ্রোহ অস্বাভাবিক। ইত্যাদি কারণে স্বর্ণকে তেজোময় পদার্থ বলা হইয়াছে।

বস্তুন্তরে প্রতিহতপ্রযুক্ত চন্দ্রকিরণে উষ্ণতা যেমন সাধারণের অনুভূত হয় না, সেইরূপ বিশুদ্ধ স্বর্ণেও উষ্ণতা অনুভূত হয় না। গ্রন্থ-গৌরবভয়ে আর বিস্তৃত করিলাম না।

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ স্মৃতিতীর্থ।

শৌচাচার।

"শৌচাচারপরো যস্তু স মুক্তো ঘোরকিল্বিষাৎ।"

আমাদের দেশে লোকে যাহাকে "শুচি-বায়ু" বলে, তাহা শাস্ত্রোক্ত শৌচাচারের অমিত-ব্যবহার ও অপব্যবহার মাত্র। যথা 'চাল-গোবর-দেওয়া' 'দুয়ার-কাচা' প্রভৃতি অনেক স্থলে অমিত ব্যবহার, এবং অধিক জল বসাইয়া রোগ-আনা ও অতিশৌচসেবাজনিত অনব কাশফলে কর্ম্ম-হানি প্রভৃতি অপব্যবহার। এ উভয়ের মধ্যবর্ত্তী যে সংযত স্বাস্থ্যকর পবিত্রতার ভাব ও ক্রিয়া, তাহাই শৌচাচার। ইহাতে সঙ্কীর্ণতা নাই, সঙ্কীর্ণতা নাই, প্রমাদ নাই; ভিন্ন-ধর্ম্মী বা ভিন্নসামাজিকের প্রতি বিরক্তি-বিদ্বেষ

নাই; আছে কেবল প্রশস্ততা, প্রসন্নতা, অন্তর্বাহ্য-স্বাস্থ্যকরতা—এক কথায় সাত্বিকতা। শৌচাচার এরূপ পরমপদার্থ হইলেও, অধুনা আমরা তাহাতে শোচনীয়রূপে উদাসীন! এক মাত্র ভৌতিক পরিচ্ছন্নতার কথঞ্চিৎ প্রিয়তা ব্যতীত শৌচাচারের আর বড় ধার ধারি না। সে পরিচ্ছন্নতাও, সূক্ষ্ম রসায়ন-বিজ্ঞানাদির অনুমোদিত যত না হউক, স্থূল-দৃষ্টি-পূত হইলেই হইল। ধূল-বালি, ঝুল-কালী, মলা-মাটি প্রভৃতির স্থূলপরিহারেই আমাদের সে শৌচাচার-প্রবৃত্তি পরিতৃপ্ত। এই বাহ্যিক পরিচ্ছন্নতা মাত্রকেই পর্য্যাপ্ত বোধের ফলে এই টুকুতেই এক্ষণে আমাদের শৌচাচার পর্য্যবসিত।

যে শৌচাচারের অতুল্য উপকারিতা, অবশ্য-প্রয়োজনীয়তা ও অপূর্ব্বগৌরব শাস্ত্রে তারস্বরে কীর্ত্তিত, মাত্র শাস্ত্র-সেবার অভাবেই আমরা তাহাতে বঞ্চিত। আরও কতকগুলি অবান্তর কারণের উল্লেখ করা যাইতে পারে, কিন্তু পরম্পরা সম্বন্ধে চিন্তা করিলে, সে সব উহারই প্রসূত, প্রতীয়মান হইবে। 'কালের গতি' 'কলির ধর্ম্ম' 'পাশ্চাত্যশিক্ষার ফল' ইত্যাদি, অনেককথাই ঐ এক কারণেরই রূপান্তর—ভাবান্তরমাত্র। ফলে শাস্ত্রীয় শৌচাচারের অধিকারানুযায়ী যথাসম্ভব সেবা-সঙ্কোচেই আমাদের বর্ত্তমান জাতীয় দুর্গতির সমগ্র রহস্য নিহিত। কথাটা ক্রমে পরিষ্কার করার চেষ্টা করা যাউক।

শাস্ত্র বলেন,—শৌচ দ্বিবিধ, অন্তঃশৌচ ও বহিঃশৌচ। অর্থাৎ জল-মৃত্তিকাদি দ্বারা ভৌতিকশুচিতা-সম্পাদন বাহ্যশৌচাচার ও চিত্তের নির্ম্মলতা-সাধন অন্তঃশৌচাচার। আবার এতদুভয়ের মধ্যে জন্য-জনকতা সম্বন্ধ ব পরস্পর সাপেক্ষতা রহিয়াছে। বাহ্যশৌচের ফলে যে সত্বগুণোদ্দীপন, তাহাও যেমন চিত্ত-শোধনের সহায়, আবার শুদ্ধচিত্ততার ফল যে সাত্বিকী প্রবৃত্তি বা রুচি, তাহাও বাহ্যশৌচের নিয়ন্ত্রী। অতএব অধিকার-ভেদজনিত প্রকার-ভেদে উভয়বিধ শৌচাচারই হিন্দুর অবশ্য সেব্য।

উচ্চাধিকারীগণের যদিও অন্তঃশৌচেই মুখ্য লক্ষ্য এবং বাহ্যশৌচে গৌণলক্ষ্য হওয়া স্বাভাবিক, তথাপি লোক-শিক্ষার্থে নিষ্কামভাবেও বাহ্য-শৌচানুষ্ঠান তাঁহাদের অবশ্য কর্ত্তব্য। নচেৎ মহদনুকরণ-প্রিয়তার নৈসর্গিক নিয়মে নিম্নাধিকারীগণ "ইতোনষ্টস্ততঃ ভ্রষ্ট" হয়। গীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—

"যদ্‌যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরোজনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে॥"
মহতের অনুকারী সাধারণে হয়।
তৎকৃতসিদ্ধান্ত যাহা, তাই লোকে লয়॥

স্থানান্তরে কহিয়াছেন:—

"ন বুদ্ধি ভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাম্।
যোজয়েৎ সর্ব্বকর্ম্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্॥"
কর্ম্মাসক্ত অজ্ঞদের বুদ্ধিভেদ না করিবে।
নিজে কর্ম্ম করি জ্ঞানী সর্ব্বকর্ম্মে নিয়োজিবে॥

অতএব উচ্চাধিকারী জ্ঞানীরাও লোক-শিক্ষার্থ অন্তরে নির্লিপ্ত—ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য থাকিয়াও বাহিরে সমস্ত ক্রিয়া-কর্ম্ম—আচার-ব্যবহার রক্ষা করিবেন; বিশেষতঃ সর্ব্বভূত-সেবক গৃহস্থাশ্রমী এ শাস্ত্রানুশাসনে ধর্ম্মতঃ বাধ্য। শাস্ত্র-বিশ্বাসের সহিত একটু চিন্তা করিলে বুঝা যায় যে, গৃহীর পক্ষে এ উপদেশের উপেক্ষা পাশ্চাত্য দার্শনিকের "Utility" তত্ত্বেরও প্রতিকূল হইয়া দাঁড়ায়। পাশ্চাত্য সাহিত্য-দর্শনাদিতে শিক্ষিত—অথচ আর্য্যশাস্ত্রে ভক্তিমান ও তদালোচনাকারী মাত্রেই বুঝেন যে, পাশ্চাত্য সমাজের এত আদরের হিতবাদ-তত্ত্বের দুরধিগম্য অন্তস্তলেও আর্য্য-শাস্ত্রীয়

শৌচাচার-বিধি প্রবেশ করিয়াছে। যে শিক্ষার অপব্যবহার আর্য্য-শাস্ত্রীয় তত্ত্বসমূহের সত্য-জ্যোতিঃ আচ্ছাদন করে, তাহারই সুব্যবহারের ফল আর্য্যশাস্ত্রসেবায় নিযুক্ত হইলে, আর "আলো-আঁধারি" লাগার ভয় থাকে না। অতএব ইহা আশা করা অসঙ্গত নয় যে, আর্য্যশাস্ত্রে শ্রদ্ধাবান্ হইলে, তদ্বিহিত শৌচাচার সর্ব্ববিধ অধিকারীর পক্ষেই যথাপ্রয়োজনীয়রূপে সুখকর ও সুকর হয়।

শৌচাচারের এক অপূর্ব্ব বিশেষত্ব এই যে, ইহা 'স্বয়ং-প্রমাণ'। অন্য শতসহস্র যুক্তি-তর্ক-পরীক্ষিত প্রমাণ থাকিলেও, অনুষ্ঠানকারীর পক্ষে তাহার অপেক্ষা নাই। যে একবার যেকোন শৌচাচারে আনুষ্ঠানিক হইয়াছে, সে আর তাহা ছাড়িতে পারে না—ছাড়ে না। কিছু দিন পরে ছাড়ার কল্পনা মনে আনিলেও যেন কেমন-কেমন লাগে! দু একটা স্থূল সাধারণ আচার-অভ্যাসের দৃষ্টান্তই কল্পনা করুন; যথা দশ দিন পর্য্যন্ত কেহ পায়খানায় যাওয়ার বস্ত্রাদি সহ অন্নাদি-গ্রহণ ত্যাগ করিলে বা প্রস্রাব-ত্যাগান্তে জল-শৌচাদি গ্রহণ করিলে, এগার দিনের দিন তদন্যথার কল্পনাতেও কেমন-কেমন লাগিবে। শৌচাচার-জনিত পবিত্রতার অনুভূতিই মনুষ্যত্বের সারস্বরূপ সাত্ত্বিকভাব-সঞ্চার সূচনা করে। বাস্তবিক সাধারণ শৌচাচার মানব-দেহীরপক্ষে—সুতরাং হিন্দুশাস্ত্রোক্ত সিদ্ধর্ষি-সেবিত শৌচাচার হিন্দুর পক্ষে ভৌতিক ও আধ্যাত্মিক উভয়বিধ মঙ্গলের নিদান। শৌচাচারের স্বয়ংপ্রমাণত্ব এই কারণ-সম্ভূত। মাত্র পরীক্ষার্থ আচার-পরায়ণ হইলেও বাধা পড়িতে হয়। প্রয়োজনীয় বস্তু পাইলেই প্রকৃতি তাহা আত্মসাৎ করিয়া লয়। ইহাই প্রকৃতির প্রকৃতি—ইহাই সত্যের সর্ব্ববিজয়িনীশক্তি।

শৌচাচার সম্বন্ধীয় আর্য্য-শাস্ত্রের উক্তিগুলিতেই উপরোক্ত সিদ্ধান্ত স্পষ্ট প্রমাণিত। শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ, তন্ত্র, ইহারা সকলেই অবিসংবাদিতরূপে 'শৌচাচার' 'সদাচার' 'আচার' 'আচারধর্ম্ম' ইত্যাদি শব্দে ঐ এক তত্ত্বেরই মহিমা ঘোষণা করিয়াছেন। সংক্ষেপতঃ বলা যায়, মানুষের যাহা কিছু প্রয়োজন, মানুষের প্রাণের যে কিছু প্রাকৃতিক আকাঙ্ক্ষা, তৎসমস্তেই অধিকার ও প্রকার-ভেদে শৌচাচারের অবশ্যপ্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। অন্যান্য শাস্ত্রের বাক্য-বাহুল্য বিস্তার না করিয়া, ধর্ম্মশাস্ত্ররাজ মনুর একটি মাত্র উক্তি দেখিলেই, ইহার যাথার্থ্য বুঝা যাইবে:

"আচারাল্লভতে হ্যায়ুরাচারাদীপ্সিতাঃ প্রজাঃ।
আচারাদ্ধনমক্ষয্যমাচারো হন্ত্যলক্ষণম্॥
আচারেতে আয়ু আর সুযোগ্য সন্তান পায়।
আচারে অক্ষয় ধন, অলক্ষণ দূরে যায়॥"

আচার সম্বন্ধে এবম্বিধ প্রমাণসমূহ আর্য্য-শাস্ত্রের যেখানে সেখানে বহুলভাবে বিকীর্ণ রহিয়াছে। এমন যে অতি প্রয়োজনীয় আচার-ধর্ম্ম—সর্ব্বপ্রয়োজনসাধনের মূলীভূত প্রয়োজনীয় আচার ধর্ম্ম, তাহাতে আমাদের উপেক্ষা ও উদাস্য কমিয়া, যত শ্রদ্ধা ও আনুষ্ঠানিক দৃঢ়তা বাড়িবে, আমাদের জাতীয় অবস্থা ততই শনৈঃ শনৈঃ অভ্যুদয়ের দিকে অগ্রসর হইবে। "আচারহীনং ন পুনন্তি বেদাঃ" বেদ সকল আচারহীনকে পবিত্র করেন না। অনাচারের দোষে যে শাস্ত্রানুশাসনের বহির্ভূত হয়, তাহাকে আর কে রক্ষা করিবে? "শৌচাচার-বিহীনস্য প্রেত্যেহ বিনশ্যতি" শৌচাচার-হীনের ইহকাল-পরকাল উভয়ই নষ্ট হয়! অকালমৃত্যুর হেতুনির্দ্দেশস্থলে মনু বলিয়াছেন,—

"অনভ্যাসেনবেদানামাচারস্য চ বর্জ্জনাৎ।
আলস্যাদন্নদোষাচ্চ মৃত্যুর্বিপ্রান্ জিঘাংসতি॥"

বেদশাস্ত্র-অনভ্যাস, আচার-বর্জ্জন,
আলস্য ও অন্নদোষে মরে বিপ্রগণ।

মনুর মতে এই কয়টি অকালমৃত্যুর কারণ। এস্থলে ব্রাহ্মণাদি শ্রেষ্ঠ বর্ণ—ব্রহ্মণ্যগুণ-প্রয়াসী সাত্ত্বিকতাভিলাষী ব্যক্তিমাত্রেরই পক্ষে আচার-ধর্ম্মের দৃঢ়তা ও সতর্কতা বিধানার্থ 'বিপ্রান্' (বিপ্রগণকে) শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। অতএব দেখুন, স্বদেশ, স্বসমাজ ও স্বশাস্ত্র-বিহিত আচার ব্যতীত সে জাতি জীবিত থাকিতে পারে না। যে জাতি অপর প্রবলতর জাতির আততায়িতায় থাকিয়া আপন আচার ছাড়িয়াছে, সেই জাতিই ক্রমে সেই প্রবলতরে মিশ্রিত—বিরলীভূত ও বিলুপ্ত হইয়াছে। ইতিহাস এ সত্যের সাক্ষ্য দিতেছে; বর্ত্তমান মর্ত্ত্য-মানবসমাজও ইহার দৃষ্টান্ত দেখাইতেছে। ব্যষ্টিভাবে ব্যক্তিগত সত্যই সমষ্টিভাবে জাতিগত হয়। বিধির বিধানে এখন ত এজাতি মৃতবৎ; সজীবতার পরিচয় কতটুকু? প্রকৃতি যেন জাতিটাকে শনৈঃ শনৈঃ উৎসন্নতার দিকে লইয়া যাইতেছেন; শনৈঃ শনৈঃ জাতিটা যেন ধ্বংসপুরীর নিকটবর্ত্তী হইতেছে। মৃত্যুর কালিমছায়া যেন জাতিটাকে ম্লান করিয়া তুলিয়াছে। ভগ্নগণ্ড, মগ্ননেত্র, মলিনমুখ, দুর্ব্বলদেহ হিন্দুমূর্ত্তি হিন্দু-ভূমির সর্ব্বত্রই—হিন্দুভূমিময় দৃষ্ট হয়! তবে একথা সমাজবদ্ধ গৃহীমানবমণ্ডলীর পক্ষে ঠিক বটে; কিন্তু সাধু-সন্ন্যাসী বিজনবাসী ঋষিদের পক্ষে নহে। কলিতে সিকি ধর্ম্ম আছেন, সুতরাং সিকি ঋষিও আছেন, সন্দেহ নাই। তাঁহাদের মধ্যে অধিকার-ভেদে—প্রস্থান-ভেদে যেরূপ শৌচাচার থাকুক না কেন, কিন্তু সমাজবদ্ধ বিরাট গৃহী-মানবমণ্ডলীর সমাজ-প্রচলিত শাস্ত্রানুসারে যথাশক্তি—যথাসম্ভব শৌচাচারপরায়ণ হওয়া উচিত; তদ্ভিন্ন মনু-বাক্যানুসারে মনুষ্য-জীবনের অবশ্যপ্রয়োজনীয় বিষয়গুলি লাভ হইতে পারে না। বিশেষতঃ আমাদের জাতীয় অস্তিত্ব পৃথিবী-পৃষ্ঠ হইতে বিলুপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয় না হইলে, আমরা আমাদের সত্ত্ব ও বিশেষত্ব-রক্ষক আচারধর্ম্মে কদাচ উপেক্ষা করিতে পারি না। ভিন্ন দেশ, ভিন্ন সমাজ, ভিন্নধর্ম্ম-অবলম্বীদের আর্য্যশাস্ত্রীয় শৌচাচারের জন্য তত আসে যায়না বটে, তথাপি সমগ্র মানবসমাজই আর্য্যর্ষিদের চরণে (প্রত্যক্ষভাবে যত না হউক) পরোক্ষ ও পরম্পরাভাবে বিশেষ ঋণী; সুতরাং হিন্দুদের আর কথা কি? তাঁহারা তাঁহাদের প্রয়োজনীয় সমস্ত বিষয়ই আর্য্যর্ষিদের শাস্ত্রে পাইবেন; উহা কল্পভাণ্ডার!

আর্য্যর্ষিগণ যোগ-সিদ্ধ-জ্ঞান-বিজ্ঞান-বলে এই বিশ্ব-রহস্যের অন্তরতমপ্রদেশে প্রবেশ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন; একথা এখন পাশ্চাত্য মহামহোপাধ্যায়গণও অবনত মস্তকে স্বীকার করিতেছেন। আর্য্যর্ষিগণ শারীরতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব, প্রাকৃতিকতত্ত্ব ইত্যাদি সারতত্ত্বগুলির রাসায়নিক মন্থনোৎপন্ন নবনীতসদৃশ এক একটি আচার-বিধি আমাদিগকে কৃপা-উপহার প্রদান করিয়াছেন। আমরা অধিকার ও প্রকার-ভেদে শাস্ত্রের প্রকৃত অভিপ্রায়ানুরূপ শৌচাচার-সেবার দ্বারাই সে নবনীতের অবিকৃত আস্বাদ ও উপকারিতা পাইতে পারি; নচেৎ অচার-ভ্রমে কুসংস্কারের সেবায় অনিষ্ট ভিন্ন ইষ্ট নাই। একপক্ষে যেমন যুক্তি-প্রমাণ-পরীক্ষিত, আর্য্যর্ষিগণের প্রকৃতঅভিপ্রায়-অনুস্যূত শাস্ত্রোক্ত সদাচারগুলি জীবনের চরম ও পরম লক্ষ্যসাধনের সাহায্যস্বরূপ অবলম্বন করিতে হইবে, অপরপক্ষে তদ্রূপ কুব্যাখ্যা-কল্পিত—প্রমাদ-প্রচলিত আচারের ছদ্মবেশধারী কুসংস্কারসমূহ অনাচারস্বরূপ—অমঙ্গলস্বরূপ জানিয়া পরিহার করিতে হইবে। যাহা সদাচার—শৌচাচার,

তাহাতেই সংস্কার; যাহা অনাচার—কুসংস্কার, তাহাতেই সংহার! শৌচাচারের জয় হউক; ভগবান্ আমাদিগকে সংহার হইতে রক্ষা করুন

(ক্রমশঃ)

শ্রীশরদিন্দু মিত্র।

মূর্ত্তিপূজা। *

(সগুণ-ব্রহ্মোপাসনা।)

পাশ্চাত্য-শিক্ষার ফলে "মূর্ত্তিপূজা" বিশেষ আপত্তি-জনক অনুষ্ঠান বলিয়া অনেকের নিকট বিবেচিত। যদিও কিছুদিন পূর্ব্ব-অপেক্ষা সে ভাবের অধুনা ক্রমে কিছু পরিবর্ত্তন হইতেছে, তথাপি নব্যশিক্ষিতসমাজে এখনও তাহার প্রবলতা রহিয়াছে। এজন্য মধ্যে মধ্যে এই গুরুতর বিষয়টির আলোচনা আবশ্যক। মূর্ত্তি-পূজার স্বাভাবিকতা ও যুক্তিযুক্ততা বুঝাইবার জন্য এযাবৎ অনেকে অনেক বক্তৃতা, রচনা ও আলোচনা করিয়াছেন। যত হয়, ততই ভাল। এ প্রবন্ধেও তৎসম্বন্ধে কিছু চেষ্টা করা যাইবে।

হিন্দুধর্ম্মের প্রাণস্বরূপ সাকারোপাসনাকে নিরাকরণকরতঃ খ্রীষ্টধর্ম্ম এতদ্দেশে প্রচার জন্য খ্রীষ্টান মিসনরীগণ সভার বক্তৃতামঞ্চে বা উন্মুক্ত রাজপথে বক্তৃতা করিয়া ও হিন্দুর মূর্ত্তি-পূজার বীভৎস নিন্দাপূর্ণ পুস্তিকাদি প্রচার পূর্ব্বক নানারূপ চেষ্টা করিতেছেন; তদ্ব্যতীত হিন্দুকুলোৎপন্ন কয়েকটি প্রাণীরও তদ্বিষয়ে প্রাণপণ-যত্ন আছে। হিন্দুসমাজস্থ হিন্দুসন্তানও অনেকে সেই স্রোতের টানে পড়িয়া মূর্ত্তি-পূজার বিরোধী হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। যবনাধিকারকালে মাত্র রাজশক্তির ভৌতিকপরাক্রম-সাহায্যে, যবন কর্ত্তৃকই সময়ে সময়ে হিন্দুধর্ম্ম ও মূর্ত্তি-পূজার উপর আক্রমণ হইত, কিন্তু তখন হিন্দুবংশীয় প্রায় কেহই স্বধর্ম্ম-বিদ্রোহী হইত না; এখন কিন্তু তদ্বিপরীত! এখন রাজশক্তির সহায়তা পাইয়া, খ্রীষ্টান পাদ্রীগণ যতটুকু কৃতকার্য্য হইতেছেন, হিন্দু-সমাজভ্রষ্ট ও হিন্দুসমাজস্থ অহিন্দুগণের চেষ্টা তদপেক্ষা অধিক ফলবতী। তাঁহাদের আক্রমণ অধিক আপাত-সাংঘাতিক; ফলে কিছু নয়।

আজকাল কিয়দংশে প্রতিক্রিয়ার চিহ্ন লক্ষিত হইতেছে। অনুষ্ঠানে তত না হইলেও, মতবাদে অনেকটা হইয়া উঠিতেছে। মূর্ত্তি-পূজার অনুকূল আলোচনাধিক্যই তাহার প্রমাণ। সত্য অগ্রে মন অধিকার করিয়া, পরে কার্য্যে প্রকাশ পায়। অতএব বর্ত্তমান সমাজের মন-প্রস্তুতির জন্য তদ্বিষয়ক আলোচনা এক্ষণে যত হয়, ততই মঙ্গলের কারণ।

খ্রীষ্টানমিসনরীগণ (সদুদ্দেশ্য প্রণোদিত হইলেও) কোন বিচার বিতর্ক না করিয়া, কেবল যেন স্বাভাবিক কর্ত্তব্যবোধেই, হিন্দুর মূর্ত্তি-পূজার বিরুদ্ধে নিরবচ্ছিন্ন নিন্দাস্ত্র নিক্ষেপ করেন। তাঁহাদের মধ্যে শিক্ষিত বুদ্ধিমানগণ যদি একটু প্রশান্ত ধৈর্য্যের সহিত চিন্তা করেন, তবে বুঝিতে পারেন, যে তাঁহাদের যত আক্রমণ কেবল মূর্ত্তি-পূজার ভৌতিক সত্বার উপরে, কিন্তু ভাবের বহুদূরে। যাহা হউক, আমরা খ্রীষ্টান ও অন্যান্য একেশ্বরবাদী সম্প্রদায়ের উপাসনাতত্ত্বে কোন দোষারোপ না করিয়া মাত্র বিনীতভাবে এইটুকু দেখাইতে চাই যে, তাঁহাদের ঈশ্বরো-

* "National Magazine" নামক একখানি ইংরাজী সাময়িকপত্রে শ্রীযুক্ত যদুনাথ মজুমদার এম, এ, মহাশয়ের লিখিত "Idolworship" শীর্ষক এক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, তাহারই ভাবানুসারে বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধ লিখিত।

পাসনাপদ্ধতি হিন্দুশাস্ত্রানুমোদিত নিম্নতম সোপানস্থ 'বাহ্য-পূজা' অপেক্ষাও কোন অংশে শ্রেষ্ঠ নহে।

কোন খ্রীষ্টান, ব্রাহ্ম বা মুসলমান উপাসনা অর্থে কি বুঝেন? উপাসনা কি কেবল কতিপয় মন্ত্র-পাঠ বা প্রার্থনা-প্রকরণেই পর্য্যবসিত? ঈশ্বর আমাদিগকে বিবিধ প্রয়োজনীয় বস্তু দিয়াছেন, তজ্জন্য কৃতজ্ঞতাপ্রকাশ ও আরো দিবেন, এই আশায় তাঁহার নিকট প্রার্থনা এবং তাঁহাকে সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান প্রভৃতি কতিপয় বিশেষণে স্তুতিমাত্র করাই কি উপাসনা? অবশ্য তাহা নহে। "ঈশ্বর-পুত্র" আখ্যায় অভিহিত খ্রীষ্টীয় জগতের আদর্শ-পুরুষ ও ধর্ম্মগুরু স্বয়ং যীশুখ্রীষ্ট বলিয়াছেন, "ভক্তিমান্ দরিদ্রেরাই ধন্য, কারণ স্বর্গ-রাজ্য তাহাদিগেরই জন্য। তাহারাই ধন্য, যাহারা সাধুতার জন্যই ক্ষুধিত ও তৃষিত, কারণ তাহারাই পরিতৃপ্ত হইবে। তাহারাই ধন্য, যাহাদের চিত্তদর্পণ নির্ম্মল, কারণ তাহারাই ঈশ্বরকে দেখিবে। অতএব তোমরা পূর্ণতম স্বর্গীয় পিতার ন্যায় পূর্ণতা লাভ কর।" এই বাক্যাবলীর তাৎপর্য্য কি? অর্থাৎ পূর্ণ আদর্শ-স্বরূপ পরমেশ্বরকে সম্মুখে রাখিয়া তৎস্বরূপতা লাভের চেষ্টাই উপাসনা।* যদি মনে মুখে ঐক্য না থাকে, তবে মাত্র মুখের বাঙ্ময় প্রার্থনায় উপাসনার প্রয়োজন পূর্ণ হইতে পারে না। আদর্শানুরূপ হইতে যাওয়া কেবল মুখের কথার কর্ম্ম নয়। প্রকৃত উপাসক উপাস্যের আদর্শ হৃদয়ে স্থাপন করিয়া তদনুরূপভাবে আত্মগঠন করিতে চেষ্টা করেন। কখনও তিনি প্রেম-ভক্তিতে উচ্ছলিত-চিত্ত হইয়া, উপাস্যের ভাবে বিভোর হন। প্রার্থনাদি আর কিছুই নহে; সাধকের ভাবোদ্বেলিত হৃদয়োচ্ছ্বাসের উচ্ছলিত অংশই ভাষাদ্বারা বাহিরে আসিয়া পড়িলে, তাহাই কখনও স্তুতি, কখনও গীতি, কখনও প্রার্থনা—কখনও রূপবর্ণনা ইত্যাদিরূপে পরিণত হয়। উহাতে উপাস্যের আদর্শত্ব হৃদয়ে আয়ত্ত, ঘনীভূত ও দৃঢ়সংবদ্ধ হইতে থাকে। উপাসনার যত কিছু অঙ্গ, সমস্তই কেবল ভগবৎভাবানুবন্ধের পোষকমাত্র। আভ্যন্তরিক ভাবসাধনই উপাসনার মুখ্য লক্ষ্য।

মনে করুন, কোন খ্রীষ্টীয় সাধক উর্দ্ধদৃষ্টি করিয়া বলিলেন, "পিতঃ! তুমি দয়াময়" অথচ দয়া-ভাবদ্যোতক কোন মূর্ত্তি তাঁহার ভৌতিক-নেত্রের সম্মুখে নাই। কিন্তু তথাপি যদি তিনি অকৃত্রিম উপাসক হন, তবে তাঁহার মনশ্চক্ষের সম্মুখে ভাষার অতীত—চিত্রবিদ্যার অতীত এক অপূর্ব্ব দয়ার আদর্শ ঈশ্বরমূর্ত্তি প্রতিভাত হইবে! এবং সাধকও সেই আদর্শানুরূপ আত্মগঠন করিয়া, নিজে দয়াময় হইতে ইচ্ছুক হইবেন। আর যদি কেহ মুখে মাত্র এই কথা বলিয়াই অবসর হন, তাঁহার উপাসনা ব্যর্থ হইবে; তিনি আদর্শ উপাস্যের দিকে তদ্দ্বারা এক অঙ্গুলিও অগ্রসর হইতে পারিবেন না।

সাধকগণের বিভিন্ন রুচি ও অধিকার অনুসারে উপাস্য-আদর্শের বিভিন্নতা সংঘটিত হয়। নিম্নাধিকারীকে উচ্চাধিকারীর উপাস্য আদর্শ-তত্ত্ব শিক্ষা দেওয়া "বেণাবনে মুক্তা বোনা" মাত্র। "আত্মবৎ সেবা"ই স্বভাবকর্ত্তৃক সংসিদ্ধ। যে যেমন প্রকৃতিধারী, তাহার উপাস্যও তদ্রূপ। অসভ্য, আমমাংসাশী দ্বীপনিবাসী ঘোর তামসিক মনুষ্যের আদর্শ-ঈশ্বরও বিকট—বীভৎস শক্তি-সম্পন্ন ভূত-প্রেতমাত্র।

গীতাতে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—

যজন্তে সাত্ত্বিকা দেবান্ যক্ষরক্ষাংসি রাজসাঃ।
প্রেতান্ ভূতগণাংশ্চান্যে যজন্তে তামসা জনাঃ॥

* আর্য্যশাস্ত্র বলেন উপ—সমীপে, আসনা—বসা; অর্থাৎ "উপাসনা" অর্থে ঈশ্বরের কাছে বসা। ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট অর্থ আর কি হইতে পারে?

সাত্ত্বিকেরা পূজে দেব, যক্ষ-রক্ষ রাজসেরা।
ভূতপ্রেত প্রভৃতিরে পূজা করে তামসেরা॥

কোন জ্ঞানী কৌতুকচ্ছলে বলিয়াছিলেন যে,—

মহিষের যদি ঈশ্বর-জ্ঞান থাকিত, তবে সে ভাবিত, ঈশ্বর একটী প্রকাণ্ড মহিষ! তিনি প্রকাণ্ড শৃঙ্গ আন্দোলন করিয়া, স্বর্গের মাঠে ঘাস খাইতেছেন! ফলে অধিকারভেদানুসারে, বহুবিধ ঈশ্বরাদর্শ, বহুবিধ প্রণালীতে উপাসিত হওয়াই স্বাভাবিক। যাহা স্বাভাবিক, তাহাই ফলপ্রদ। এক "হরিবৈদ্যের হরীতকী ও সোণা-মুখী-বাটা" সকল রোগে খাটে না। সেই নিরাকার—নিগুর্ণ—নিরুপাধিক বৈদান্তিকব্রহ্মের ভাব অধুনা কয়জনে বুঝিতে পারে? যাহার কিছুই মর্ম্মগ্রহ—কিছুই রসাস্বাদ হইল না, মনোপ্রাণ দিয়া তাহার ভজনে মজিয়া যাওয়া কদাচ সম্ভব হয় কি? নিরাকার উপাসনার অনধিকার চর্চ্চা করিতে গিয়া, প্রায়ই "ইতো-নষ্টস্ততভ্রষ্টঃ" হইতে হয়। এই দ্বৈত-প্রপঞ্চ জগতে সসীমত্ব বা সাকারত্বের হাত এড়াইতে না পারিলে আর নিরাকার ভজনের আশা নাই।

বিধাতা যেমন অদন্ত শিশুর জন্য দুগ্ধ দিয়া, সদন্ত মানবের পক্ষে অন্নের ব্যবস্থা করিয়াছেন, তদ্রূপ জ্ঞান-জগতে শিশুবৎ নিম্নাধিকারীগণের জন্য স্থূল "বাহ্যপূজার" বিধান করিয়া, অধ্যাত্ম-জ্ঞানী উচ্চ সাধুর জন্য "মানস-পূজা"র বিধি দিয়াছেন। ফলে মানসপূজাও নিরাকারের পূজা নহে। মনোমন্দিরে আদর্শ উপাস্যমূর্ত্তি স্থাপন-পূর্ব্বক মনোজগতের উপকরণে তাঁহার সেবা করাই মানসপূজা। প্রত্যেক বাহ্য পূজানুষ্ঠানেই সর্ব্বাগ্রে যে মানস-পূজার বিধি শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে, তদালোচনাতেই ইহার যাথার্থ্য স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। শিশুর আদর্শ বৃদ্ধের পক্ষে অকিঞ্চিৎকর, বৃদ্ধের আদর্শ শিশুর কাছে নিরর্থক। মূর্খের আদর্শ জ্ঞানীর কাছে অকিঞ্চিৎকর, জ্ঞানীর আদর্শ তদ্রূপ মূর্খের কাছে নিরর্থক।

অধিকারাতীত উচ্চ আদর্শ আলম্বন-চেষ্টায় কোন ফল নাই। লম্ফ দিয়া বৃক্ষাগ্রে উঠিতে গেলে, পা ভাঙ্গিবারই সম্ভাবনা। অন্তরে স্বাভাবিক উপযোগিতা না থাকিলে, কেবল বাহিরের অনধিকার-চর্চ্চায় "হিতে বিপরীত" হয়! ইঁট মারিলে পাট্‌খেলে প্রত্যুত্তর দেওয়া যাহার প্রবৃত্তি, "বাঁ গালে চড় মারিলে, ডাইন্ গাল বাড়াইয়া দেও" উপদেশটী কি তাহার পক্ষে উপহাসের নহে? যে ব্যক্তি স্বপরিবারও স্বজাতির প্রতি দয়া করিতেও পরাঙ্মুখ, তাহাকে নিকৃষ্ট প্রাণীগণকে দয়া করিতে শিক্ষা দেওয়া কি বিড়ম্বনা নহে? অতএব সর্ব্ব অধিকারাতীত নিরাকারতত্ত্ব সাকার-সর্ব্বস্ব সাধকের কোন কাজে আসে না। যদিও কেহ ভ্রমে, কল্পনায়, হুজুকে বা অনুকরণে পড়িয়া আপনাকে নিরাকারোপাসক জ্ঞান করেন, কিন্তু তাঁহার আদর্শে মাটি, ধাতু, প্রস্তর, কাষ্ঠ বা রক্তমাংস না থাকিলেও সাকারত্ব আছে, সন্দেহ নাই। কথাটা ক্রমে পরিষ্কার করার চেষ্টা করিব।

দৈবপ্রকাশ, আবির্ভাব ও প্রত্যাদেশ ইত্যাদি বিশ্বাস না করিলেও কোন না কোনরূপ ঐ আদর্শ-হৃদয়ে স্থাপনের সরল চেষ্টা ব্যতীত উপাসনা আর কিছুই হইতে পারে না। কিন্তু ক্ষুদ্রহৃদয় মানব সাধনের প্রথমাবস্থায় সে অনন্তস্বরূপের কতটুকু অংশ আপন সীমাবদ্ধ জ্ঞানে আয়ত্ত করিতে পারে? সুতরাং তাহার উপাস্য-আদর্শ পরিমিত—সান্ত হইলেই, তাহার উপাসনার প্রথম সোপানস্থল মূর্ত্তিপূজারূপে পরিণত হয়। তবে কিনা, সে মূর্ত্তিপূজা ভৌতিক উপাদান-ময় মূর্ত্তিপূজা না হইয়া, শব্দময় বা ভাবময় মূর্ত্তিপূজা হইতে পারে; কিন্তু তাহাহইলেও

সেই অন্তঃসাকার বহির্নিরাকার উপাসনার আদর্শ-আয়ত্তীকরণ সহজ হয় না। এই জন্যই অকৃত্রিম উপাসকের পক্ষে হিন্দুশাস্ত্র-বিহিত মূর্ত্তিপূজা তৎসম্বন্ধে প্রত্যক্ষ ফলবতী।

ভক্তির স্বাভাবিক শক্তিতেই ভক্ত ভক্তি-ভাজনের অনুকরণপ্রিয়তা প্রাপ্ত হয়। সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ-ভেদে ত্রিবিধ ভক্তির ফলে ত্রিবিধ উপাসনা গীতাদি শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে; সুতরাং উপাস্য আদর্শের আয়ত্তীকরণ তত্তৎ প্রণালী অনুসারেই হইয়া থাকে।

প্রত্যেক মনুষ্যই পরস্পর বিভিন্ন আকৃতি-প্রকৃতিবিশিষ্ট হওয়ায়, প্রত্যেকের আদর্শ কিছু না কিছু ভিন্নত্বযুক্ত হইবেই; সুতরাং কাহারও উপাস্য আদর্শ অপরের অবিকল অনুরূপ না হইতে পারে। হিন্দুশাস্ত্রবিহিত মূর্ত্তি-পূজায় "প্রতিমায়াং ঘটে পটে" স্থূল-মূর্ত্তি-ধ্যানের বিধান থাকায়, অনেক উপাসকেরই পরস্পর ভাব-সহানুভূতির ফলে উপাস্য-আদর্শের অভিন্নত্ব স্থূলতঃ সম্পাদিত হইয়াছে। হিন্দুর তেত্রিশকোটি দেবতা আর অধিক কি? বরং এ উপায়ের অভাব নিবন্ধন অন্য ধর্ম্মাবলম্বী উপাসকগণের অন্তরে অন্তরে অনন্তকোটি দেবতার অস্ফুট ও বিশৃঙ্খল আগম—নিগম কল্পিত হইতে পারে! তাহাহইলে এক একটী মানুষের এক একটী স্বতন্ত্র ঈশ্বর হইয়া দাঁড়ায়! আবার সেই একটীও সর্ব্বদা একরূপ নহেন; ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন রূপ-গুণ ধারণ করেন। অবশ্য বাহিরে এক নিরাকার, কিন্তু অন্তরে অনন্ত সাকার! অন্তর্ব্বাহ্যে একীকরণ ভিন্ন কোন বিষয়েরই স্থিরত্ব সম্পাদিত হয় না; আবার স্থিরত্ব ভিন্ন ভাবের গাঢ়ত্ব ও ভক্তির দৃঢ়ত্বও সম্ভাবিত নহে। ভরসা করি, চিন্তাশীল ধীমান মাত্রেই বুঝিবেন যে, এই কারণে আর্য্যশাস্ত্রে স্থূলমূর্ত্তি অবলম্বনে ঈশ্বরোপাসনার বিধান। ভগবানও স্বীয় জগদ্বীজরূপিণী প্রকৃতির এই নিয়ম রক্ষার্থ সাকারভাবেই সাধককে কৃপা করেন; শাস্ত্রে তাহার ভূরি বর্ণনা রহিয়াছে এবং এই জন্যই উক্ত হইয়াছে,—

"সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপকল্পনা।"

যাহা এক, তাহা নিরাকার হইতে পারে; যাহা বহু, তাহা সাকার না হইয়া পারে না। একে অসীমত্ব সম্ভবে, কিন্তু সসীমত্ব ভিন্ন "বহু" সৃষ্টি অসম্ভব। স্থূল-দর্শন-স্পর্শেন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত হওয়া ভিন্ন সাকারত্ব অলীক, ইহা অদার্শনিকের উক্তিমাত্র। বস্তুতঃ সসীমত্ব ও সাবয়বত্ব এক কথা। সসীমত্ব ব্যতীত যেস্থলে বহুত্ব অসম্ভব, সেস্থলে "বহু" মাত্রই সাবয়ব বা সাকার, তাহাতে সন্দেহ নাই। অতএব "একোঽহং বহুস্যাম্ প্রজায়ে" এই শ্রুতির তাৎপর্য্যানুসারে এক ঈশ্বর বহু হইয়া, জগৎ সৃষ্টি করিলেন, এই সিদ্ধান্ত পাওয়া যাইতেছে। মায়াদ্বারাই ব্রহ্মের বহুত্ব কল্পিত হইয়া সৃষ্টি-প্রপঞ্চ রচিত হইয়াছে। বহুত্বই মায়া ও মিথ্যা, একত্বই ব্রহ্ম ও সত্য, ইহাই বেদান্ত বা উপনিষদের সার-রহস্য। এক্ষণে দেখুন, আমরা মায়া-জাত জীব হইয়া বহুত্ব, বা সাকারত্বের হাত এড়াইব কিরূপে? উপাস্য-উপাসকের দ্বৈতভাব স্বাভাবিক। দ্বৈত হইতেই বহু বা অনেক উৎপন্ন এবং অদ্বৈতই এক। অতএব উপাসনা করিতে হইলে, দ্বৈতত্ব, বহুত্ব, সসীমত্ব, সাকারত্ব পরস্পর অভিন্ন হইয়াই উপাসকের অভিপ্রায় সংসিদ্ধ করে। বিষয় বড় জটিল, কিন্তু দার্শনিক ধীষণা সহযোগে আর্য্যশাস্ত্র আলোচনা করিতে পারিলে, নিশ্চয়ই বুঝা যায় যে, মূর্ত্তি-পূজা বা সাকারোপাসনা ব্যতীত উপাসকের পিপাসার পূর্ণপরিতৃপ্তি কদাচ সম্ভাবিত নহে। অন্য ধর্ম্মাবলম্বীরাও যে উপাসনা করেন, তাহাও প্রকারান্তরিত মূর্ত্তি পূজা, সন্দেহ নাই। যেখানে

উপাসনা, সেই খানেই উপাস্য-উপাসকরূপ দ্বৈতভাব, যেখানে দ্বৈত, সেখানেই বহুত্ব বা অনেকত্ব; যেখানে অনেকত্ব, সেখানেই সসীমত্ব, যেখানে সসীমত্ব, সেই খানেই সাকারত্ব।

খ্রীষ্টান মুসলমান প্রভৃতি উপাসকের সম্মুখে কোন ভৌতিক-মূর্ত্তি সংস্থাপিত না থাকিলেও, আত্মাদর্শের সসীমত্ব-জনিত মনোময় বা ভাবময় মূর্ত্তি কোথায় যাইবে? যদি কেহ তাহা অস্বীকার করেন, তাঁহাকে বাস্তবিক 'নিরাকার-উপাসক বা শূন্যোপাসক' বলিতে আমাদের কোন আপত্তি নাই। 'বাতাস-খাওয়া' 'আছাড়-খাওয়া' বা 'খড়িকা-খাওয়া' ইত্যাদি খাওয়ায় যদি কাহারও পেট ভরে, তবে আর তাহার আহার্য্য-সংগ্রহের আবশ্যক কি?

এক্ষণে দেখা যাউক, ভৌতিক-মূর্ত্তি অবলম্বনে ঈশ্বরোপাসনায় কৃতকার্য্যতা অধিকতর সম্ভাবিত কি না? খ্রীষ্টান মিসনরীরা সোজা সিদ্ধান্তদ্বারা বলেন যে, "হিন্দুরা স্বহস্তে মূর্ত্তি গড়িয়া, সৃষ্টিকর্ত্তার সৃষ্টিকর্ত্তা হয়! আবার তাহারই পূজা করে! কি নির্ব্বুদ্ধিতা!" কিন্তু নির্ব্বুদ্ধিতাটা কোন্ দিকে? বুদ্ধিমান্ বুঝেন যে, ভাব না বোঝাই নির্ব্বুদ্ধিতা। যে সমস্ত ঐশ্বরিক অপূর্ব্ব স্তব, স্তুতি, মন্ত্রাদি, মৃন্ময়াদি মূর্ত্তির সম্মুখে উচ্চারিত হয়, তাহা কি তত্তৎ মূর্ত্তির জড়ীয় উপাদানকেই উদ্দেশ করে মাত্র? এত বড় স্থূল কথাটাও যে আবার বক্তৃতা করিয়া বা প্রবন্ধ লিখিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করিতে হয়, ইহাই আমাদের দুর্ভাগ্য ও কালমাহাত্ম্যের ফল মাত্র। বুদ্ধিলেশশূন্য নিতান্ত পাগল ভিন্ন কোন অসভ্য বন্য মানবও বোধ হয় আপন আয়ত্তাধীন কোন জড়সত্তা মাত্রকে ঈশ্বর বুদ্ধি করিতে পারে না; অবলম্বন যে কোন জড়সত্তা হউক, কোন না কোনরূপে তৎসংসৃষ্ট কোন না কোন চিৎ-সত্তা তাহার উপাসনার লক্ষ্যস্থল হই-বেই। জড়-প্রতিমাবলম্বী হিন্দু-পূজকের লক্ষ্য যে কিরূপ পূর্ণজ্ঞান-প্রেম-পবিত্রতা-স্বরূপ সর্ব্বশক্তিমান চিৎসত্তায় সন্নিবিষ্ট, তাহা তাঁহার শাস্ত্র, ব্যবহার ও পূজা-প্রণালী আলোচনা দ্বারাই জ্ঞাতব্য।

আর একটী কথা বিশেষ বিবেচ্য। শব্দ কি সাকার নহে? উহাও ভৌতিক ও সসীম, সুতরাং একভাবে সাবয়ব বা সাকার। উহা-দ্বারা যখন ঈশ্বর-জ্ঞান জন্মে, তখন উহা ঈশ্বরের শাব্দিক-মূর্ত্তি, সন্দেহ নাই। "হরি" নাম ভজনে কি হ-র-ই এই বর্ণত্রয়ের ভজন হয়, না ঐ ত্রিবর্ণ-সংস্কার-সম্বদ্ধ কোন চিৎসত্তার ভজন হয়? অবশ্য শেষেরটিই সত্য। তবে "হরি" শব্দটি ঈশ্বরের একটি মূর্ত্তিস্বরূপ সন্দেহ নাই। "যেই নাম সেই কৃষ্ণ" "অভেদ নাম-নামিনঃ" ইত্যাদি বাক্যের তাৎপর্য্যও এই সত্য-নিহিত। উচ্চারিতভাবেও যেমন, লিখিত ভাবেও তদ্রূপ। হরির মৃন্ময়াদি মূর্ত্তি দর্শনেও ভক্তের যে ভাবের স্ফূরণ হয়, "হরি" শব্দটি গ্রন্থাদিতে দর্শনেও ঠিক তদ্রূপ। খ্রীষ্টান্ প্রভৃতি উপাসকের ঈশ্বরের বর্ণময়ী মূর্ত্তিতে আপত্তি নাই; কারণ তাহাও যদি তাঁহারা ত্যাগ করেন, তবে আর কি লইয়া থাকিবেন? হিন্দুর কেমন পাকা বন্দোবস্ত দেখুন; চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি সমস্ত ইন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত মূর্ত্তিতেই তাঁহার ঈশ্বরোপাসনার উপায় রহিয়াছে। অধিক বলা বাহুল্য; হিন্দুর সাকারোপাসনার সমগ্র ব্যাপারটা আলোচনা করিলে, সকলেই ইহা বুঝিয়া চমৎকৃত ও পরিতৃপ্ত হইতে পারেন।

নিরাকার নির্গুণ ব্রহ্ম উপাসনার অতীত; কেবল বৈদান্তিক অদ্বৈতজ্ঞানের বিষয়ীভূত। যখন সসীমত্ব বা সাকারত্বের বীজস্বরূপ দ্বৈতভাব বা উপাস্য-উপাসকভাব বিলুপ্ত হয়, যখন "সোঽহং" "তত্ত্বমসি" ইত্যাদি মহাবাক্যের

সত্ত্বা-সম্বোধ জন্মে, যখন শঙ্করাচার্য্যের সেই "চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহং" অবস্থা উদিত হয়, যখন নির্ব্বিকল্প সমাধিতে সাধকের সাকারেই নিরাকরত্ব-পরিণতি হয়, তখনই নির্গুণ-নিরাকার-ব্রহ্মজ্ঞান। উপাসনা সগুণ-ব্রহ্মেরই হইয়া থাকে। "উপাসনানি সগুণ-ব্রহ্মবিষয়-মানসব্যাপারাণি" শ্রুতি স্পষ্টই একথা বলিয়া দিয়াছেন। সমষ্টিভাবে যিনি অনন্ত গুণসম্পন্ন সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বর, তিনিই ব্যষ্টি ভাবে ভিন্ন ভিন্ন গুণ ও শক্তিসমন্বিত হইয়া, ভিন্ন ভিন্ন দেবরূপে উপাসিত হইতেছেন। এই প্রণালীতেই তেত্রিশকোটি দেবতার উদ্ভব। এক নির্গুণ ব্রহ্মই প্রকৃতি বা মায়াযোগে সগুণ দুই হইয়া, ক্রমে সগুণ ব্রহ্ম—বিষ্ণু—মহেশ্বর। তিন, ক্রমে পঞ্চোপাসকের পঞ্চ ইষ্টদেব—মুক্তি-দাতৃত্বস্বরূপে ঐ পঞ্চই আবার ঐ একস্বরূপ; ক্রমে ক্রমে তেত্রিশকোটিতে সগুণব্রহ্মের ব্যষ্টি-ভাবগত গুণাবতার দেবত্ব-পরিণতি।

একে তিন, তিনে পাঁচ, পাঁচে পুনঃ এক;
একেতে তেত্রিশকোটি—একেতে অনেক!

হিন্দুশাস্ত্রীয় বিধির প্রকৃত দার্শনিক তাৎপর্য্য বুঝিবার শক্তির অভাবেই খ্রীষ্টান মিসনরী প্রভৃতিরা ও পাশ্চাত্যশিক্ষা-বিভ্রাট-বিকৃত হিন্দু-সন্তানেরা হিন্দুকে "পৌত্তলিক" "জড়োপাসক" "বহু ঈশ্বর-পূজক" ইত্যাদি বিশেষণে নিন্দা করিয়া থাকেন। বুদ্ধিমান্ হিন্দুর কিন্তু উহা 'নিন্দা' বিবেচনা করিয়া অসন্তুষ্ট হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে। আমাদের ঐ কয়টি বিশেষণ সত্য বলিয়া মানিয়া নিতেও কোন আপত্তি নাই—কোন অগৌরবের বিষয় নাই। শব্দে কিছু আসে যায় না; তাৎপর্য্য যিনি যাহা বুঝেন, তাহা লইয়াই বিচার। তবে কি না নিন্দাকারীদের ভ্রমপ্রদর্শন না করা কর্ত্তব্যের ত্রুটি বটে।

সাকারের সাহায্য ভিন্ন নিরাকারের অভি-ব্যক্তি অসম্ভব ও অস্বাভাবিক। সাংসারিক বহু বিষয়েও ইহার সাদৃশ্য-দৃষ্টান্ত কল্পিত হইতে পারে। মনে করুন, চিন্তাকে যদি নিরাকার বলেন, (সূক্ষ্ম দার্শনিক বিচারে তাহাও নিরাকার নহে) তবে একের চিন্তা অপরের গোচর করিতে হইলে, সাকার শব্দ বা লিপি (অক্ষর) ব্যবহার ভিন্ন উপায়ান্তর আছে কি? যিনি স্থূল আকার পরিত্যাগপূর্ব্বক পরলোকগত হইয়াছেন, তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি বা ফটোগ্রাফ্ বা জীবন-চরিত-পুস্তকাদি সাকার উপায় দ্বারাই তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। প্রাচীন মিসরের চিত্রাক্ষরের একটি দৃষ্টান্ত চিন্তা করুন। "দ্রুততা" এই শব্দটি প্রকাশ করিতে হইলে, একটি তীর অঙ্কিত করিলেই উদ্দেশ্য-সিদ্ধি হইল! একটি তীরের মূর্ত্তিমাত্র অঙ্কনেই "দ্রুততার" একটা নিরাকার ভাব পরিষ্কার প্রকাশিত হইল। এইরূপ অনেক দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করা যাইতে পারে। কবি, গায়ক, চিত্রকর, ভাস্কর, ইহাঁরা সকলেই নিরন্তর নিরাকার ভাবকে সাকারে অভিব্যক্ত করিতেছেন।

মূর্ত্তিপূজায় ঈশ্বরের সর্ব্বজ্ঞতা, সর্ব্বশক্তিমত্তা ও সর্ব্বব্যাপিতা ইত্যাদি গুণের কোন ব্যত্যয় সম্ভাবিত নহে। একই সময়ে শতসহস্র স্থানে একই পূজা হইতেছে; অথচ প্রত্যেক পূজকই ঈশ্বরের তত্তৎস্থানগত বিদ্যমানতা যুগপৎ অনুভব করিতেছেন। কেহ এরূপ ভাবে না যে, "আমার বাড়ী দুর্গা এসেছেন, সুতরাং ওবাড়ীতে আর যাবেন কি করে?" এক দুর্গা, একই সময়ে, শতসহস্র স্থানে পূজা নিতেছেন, শতসহস্র সাধকের আবেদন শুনিতেছেন, বর দিতেছেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। নিন্দুক বলে "তুমি মাটির দশভুজা পূজিতেছ" হিন্দু জানেন, এই মাটির দশভুজাতেই তিনি অনন্তভুজা ব্রহ্ম-ময়ীকে পূজিতেছেন। শুধু অন্ধ বিশ্বাসে

জানা নহে, ভক্তি থাকিলে, এই পূজার প্রত্যক্ষ ফল হাতে হাতে পাইয়া কৃতার্থ হইতেছেন। হিন্দুর সাকারোপাসনা আবহমানকাল হইতে—সেই ইতিহাসাতীত সুদূর বৈদিককাল হইতে ভগবানের সনাতন বিধানে সংস্থাপিত চির-পরীক্ষা-পূত সত্য।

এস্থলে ইহাও বলা আবশ্যক যে, বাহ্য-প্রতিমাপূজাই যে হিন্দু-উপাসনার সর্ব্বস্ব, তাহা নহে; ইহা সর্ব্বপ্রথম সোপানমাত্র। মানস-পূজা উচ্চাধিকারীর জন্য। পুরাণাদি শাস্ত্রে শতসহস্র মানস-পূজক উচ্চাধিকারী ঋষির বর্ণনা রহিয়াছে। তবে কথা এই যে, মানস-পূজা হইলেও তাহা আধুনিক 'নিরাকার উপাসনা' নহে, তাহা সগুণ ব্রহ্মোপাসনা বা সাকারোপাসনাই বটে। তাঁহাদের বাহিরে কোন জড়মূর্ত্তি স্থাপনের প্রয়োজন নাই; তাঁহারা চিত্তপটেই গুরুদত্ত মন্ত্রের ধ্যানানুযায়ী ভগবানের অপার্থিব চিদ্‌ঘনরূপ দর্শন পাইয়া থাকেন। তন্ত্রশাস্ত্র উপাসনার চারিটী শ্রেণী বা সোপান নির্দ্দেশ করিয়াছেন, যথা—

"অধমা প্রতিমাপূজা, জপস্তোত্রাদিমধ্যমা।
উত্তমা মানসীপূজা, সোঽহং পূজোত্তমোত্তমা॥"

হিন্দুধর্ম্ম বিশ্ববিদ্যালয়তুল্য। ইহাতে সর্ব্বাধিকারীরই শ্রেণী-স্থান রহিয়াছে। ভৌতিক মূর্ত্তিপূজক হইতে আধ্যাত্মিক সোঽহংপূজক পর্য্যন্ত এখানে বিদ্যমান। কাহারই নিরাশ হইবার কথা নাই। ফলতঃ সোঽহং-পূজায় না পৌঁছানপর্য্যন্ত সাকারোপাসনা সম্পূর্ণ অতিক্রম করিতে কাহারও সাধ্য নাই। অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বীরাও (তাঁহাদের শাস্ত্রের অধিকারানুযায়ী, পরিষ্কাররূপ মূর্ত্তি-পূজার ব্যবস্থাভাবজনিত অসম্পূর্ণতা-সত্বেও) প্রকৃতির অনতিক্রম্য নিয়মের ফলে ঈশ্বরের সাকারত্বভাব কোন না কোনরূপে অনুভব না করিয়া পারেন না। খ্রীষ্টানের স্বর্গের সিংহাসন, জগৎপিতা তাহাতে সমাসীন, দক্ষিণে পুত্র যীশুখ্রীষ্ট, বামে পবিত্রাত্মা, আবার ঈশ্বরাত্মার কপোতমূর্ত্তিতে অবতরণ" আবার ঈশ্বরের নিজ মূর্ত্তির অনুরূপ মানব সৃজন, এ সব কথায় কি সাকারত্ব আসিতেছে না? মুসলমান শাস্ত্রেও স্বর্গের চমৎকার বর্ণনা রহিয়াছে। মহম্মদ আল্লার দর্শন পাইতেন, তাঁহার সহিত আল্লার কথাবর্ত্তা হইত। কোরাণের প্রথম পুঁথীখানি স্বর্গের লিখিত; খোদা স্বয়ং তাহা পর্ব্বত-গুহায় মহম্মদকে দান করেন; ইত্যাদি বিবরণে মুসলমানের ঈশ্বরের শূন্য-নিরাকারত্ব আর কোথায় থাকে? কেবল "ব্রাহ্ম" আখ্যাধারী কতিপয় ব্যক্তি হিন্দুশাস্ত্রোক্ত অদ্বৈতজ্ঞান-বিষয়ীভূতস্বরূপলক্ষণস্থ খাঁটি নির্গুণ নিরাকার ব্রহ্মকে গরজের দায়ে উপাসনার সগুণক্ষেত্রে জোর করিয়া টানিয়া আনিয়াছেন! সগুণ—অথচ নিরাকার, ইহা দার্শনিক বিচারে "সোণার পাথরের বাটী" বিশেষ! কাজেই অগত্যা "রাতুল চরণ" "প্রসন্নমুখ" "প্রেম-ঘনরূপ" ইত্যাদির আশ্রয় নিতে হইয়াছে। আবার প্রাচীন সাকারোপাসক ধ্রুব, প্রহ্লাদ প্রভৃতি হইতে আধুনিক ভক্তাবতার শ্রীচৈতন্য, রামপ্রসাদ, সর্ব্বানন্দ, তুলসীদাস, রামকৃষ্ণপরমহংস প্রভৃতি সকলের শরণ নিতে হইতেছে। তদ্ভিন্ন উপায় কি? ব্রাহ্মদের মধ্যেও যাঁহারা ধার্ম্মিক, ভাবুক ও ভক্ত হইতেছেন, তাঁহারাও স্বস্ব সাধনা কোন না কোনরূপে সাকারোপাসনার ভাবে পরিণত করিয়া, একরূপ কৃতকার্য্য হইতেছেন; অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন, এ সমস্ত বিষয় আলোচনাকারী ব্যক্তিমাত্রেই উহা জানিতেছেন ও বুঝিতেছেন। কোন না কোনরূপ সাকারোপাসনার ভাব ভিন্ন কোন ধর্ম্মসম্প্রদায় টিকিতে পারে না। ধর্ম্ম-জগতের পুরাতন ইতিহাস ও

বর্ত্তমান অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া "ব্রাহ্ম" আখ্যাধারীদের ইহা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য।

উপাসকের জীবনেই উপাসনার সফলতার লক্ষণ লক্ষিত হয়। উপাসনাটি ভগবান্ গ্রহণ করিলে— সে আত্মোদ্ধারের আবেদনপত্রে তাঁহার 'সহীমোহর' পড়িলে, সে উপাসককে আর চিনিতে বাকি থাকে না। তিনি লোকালয়ের লোক হইলে, শীঘ্রই ধরা পড়েন! তাঁহার কার্য্য, তাঁহার কথা, তাঁহার ভাবভঙ্গি, চাল-চলন, এমন কি—চক্ষের চাহনীটি পর্য্যন্ত তাঁহাকে ধরাইয়া দেয়! প্রেম, ভক্তি, পবিত্রতা, ঔদার্য্য, দয়া, ক্ষমা, বিনয়, সরলতা, দক্ষতা ইত্যাদি সমস্ত সদ্‌গুণই তাঁহাতে সান্ধ্য-গগনে নক্ষত্ররাজির ন্যায় দেখিতে দেখিতে ফুটিয়া উঠে! এই ঘোর তামস কলিযুগে—ধর্ম্মের এই অত্যধঃপতন-সময়েও সাকারোপাসক হিন্দু-সমাজে এরূপ সাধকের অভাব নাই। ভিন্নদেশী ভিন্নধর্ম্মীরা যাহাই বলুন, কিন্তু দেখিয়া, শুনিয়া, জানিয়া, বুঝিয়াও হিন্দুবংশজাত অনেকের মুখে ও লেখনীতে হিন্দুধর্ম্মের—তথা সাকারোপাসনার নিন্দা দুঃখজনক বিস্ময়জনক বটে। হিন্দুধর্ম্মে অনভিজ্ঞতা-নিবন্ধন, আর পরাধীন, পরনির্জ্জিত দুর্ব্বল জাতির কোন বিষয়েই সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা সম্ভাবিত নহে, এই বিশ্বাসজনিত অন্ধ তাচ্ছিল্যবশতঃই বিদেশীয়েরা আমাদের সাকারোপাসনাকে এক কোপে কাটিতে চাহেন! মোট কথা সকলই বুঝিবার ভুল। আমাদের সগুণব্রহ্মোপাসনা তাঁহাদের সিদ্ধান্তানুযায়ী অন্তরে বাহিরে সাকারত্বময় "অসভ্য-পুতুলপূজা" নহে। নিরাকারের উপাসনা হইতে পারে না; হিন্দুর শাস্ত্র হিন্দুকে তাহা শিখাইয়াছেন, তাই হিন্দুর উপাসনায় অপরিহার্য্য আধার বা অবলম্বন সাকার-ভৌতিকত্ব। যাহারা সাকার বাদ দিয়া নিরাকার ধরিতে যান, তাঁহাদের নিরাকার নিরাকারই হইয়া যায়, সুতরাং কিরূপে ধরা যাইবে?

মূর্ত্তি-পূজাসম্বন্ধে অনেকে অনেক কথা কহিয়াছেন; আমরাও এবার এ সম্বন্ধে এ প্রবন্ধে আর অধিক আলোচনা করিব না। উপসংহারে আমাদের সর্ব্বান্তঃকরণের বিশ্বাসানুযায়ী এইটুকুমাত্র নিবেদন যে, বৃথা-তর্ক-তরঙ্গ এড়াইয়া, ভগবানের দিকে একটু রতি-গতি-মতি লাগাইয়া, গুরুমন্ত্র গ্রহণকরতঃ, সাকারোপাসনার পদ্ধতি অনুসারে আপন অধিকারানুযায়ী সাধনমার্গে অগ্রসর হইতে পারিলে, দয়াময় ভগবান্ আপনি দয়া করিয়া সর্ব্বসন্দেহ ভঞ্জন ও সর্ব্বমনোবাঞ্ছা পূরণ করিবেন। তিনি সাকার কি নিরাকার, তিনিই বুঝাইয়া দিবেন।

শ্রীশরদিন্দু মিত্র।

দেবাসুর-সংগ্রাম।

(প্রাণায়াম)

(*) দেবাসুরাহ বৈ যত্র সংযতিরে উভয়ে প্রাজাপত্যাস্তদ্ধদেবা উদ্গীথমাজহ্রুরনেনৈনানভি ভবিষ্যাম॥

দেবাসুরের সংগ্রাম মাত্র পৌরাণিক আখ্যান নহে। চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই প্রতি নিমেষে এই বিশ্বে দেবাসুরের সংগ্রাম উপলব্ধি করিতে পারেন।

মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষ, লতা, প্রস্তর, ধাতু, আব্রহ্ম স্তম্বপর্য্যন্ত সকল পদার্থেই দেবাসুর-সংগ্রাম পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। বিশেষ প্রণিধান করিয়া দেখিলে, ইহাও উপলব্ধি হইবে যে, দেবাসুর-সংগ্রামই এই ব্যবহারিক জগতের কারণ। দেবাসুর-সংগ্রাম না থাকিলে, আমরা এই পরিদৃশ্যমান জগতের পরিচ্ছিন্ন-সত্তা উপলব্ধি করিতে পারিতাম না।

উদ্ভিদ-জগৎ গ্রহণ করুন। ইহাদিগের মধ্যে এই দেবাসুর-সংগ্রাম দেখিতে পাইবেন। উদ্ভিদ্ জগতে যেমন কতকগুলি বৃক্ষলতা আমরা বিশ্বের মঙ্গলে নিযুক্ত দেখিতে পাই, তেমনই আর কতকগুলি ইহার ধ্বংসসাধনের জন্যই যেন ব্যাপৃত রহিয়াছে। বৃক্ষাদির মধ্যে যেরূপ অমৃত-বৃক্ষ আছে, সেইরূপ বিষবৃক্ষও পরিলক্ষিত হয়। কতগুলি বৃক্ষ যেরূপ সুশীতল ছায়া ও সুমিষ্ট ফল প্রদানে জগতের মঙ্গল সাধন করে, তদ্রূপ আর কতগুলি বৃক্ষের ছায়া ও ফলদ্বারা মহান অনর্থ সংঘটিত হইয়া থাকে। নিম্বের ছায়া যেরূপ রোগোপশমকারী, তিন্তিড়ী বৃক্ষের ছায়া তদ্রূপ রোগবর্দ্ধনকারী। পর্য্যালোচনা করিলে, এইরূপ বৃক্ষলতার মধ্যে দুই শ্রেণীই প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। তাহার এক শ্রেণীকে উদ্ভিদ্ জগতে 'দেবতা' ও অপর শ্রেণীকে 'অসুর' বলা যাইতে পারে। উদ্ভিদ্ জগতের এই দেবতাশ্রেণীই মানবের আরাধ্য ও সেব্য বলিয়া আর্য্যশাস্ত্র নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই জন্যই তুলসী, বিল্ব, বট, অশ্বত্থ, নিম্ব, আমলকী প্রভৃতি আর্য্য-প্রদেশে এত আদরণীয়।

উদ্ভিদ্ জগৎ ছাড়িয়া দিয়া পশুজগতের বিষয় চিন্তা করুন। তাহাকেও এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত দেখিতে পাইবেন। গোজাতি যে আর্য্য-সমাজে এত আরাধ্য, সে কেবল গোজাতি পশু-জগতে দেবতা বলিয়া। একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে, অন্যান্য পশুদিগের মধ্যেও ন্যূনাধিক পরিমাণে পশুজগতের দেবত্ব ও অসুরত্ব পরিলক্ষিত হইবে। সিংহ-ব্যাঘ্রাদি যেমন মানবের ধ্বংসসাধনে নিরত, সেইরূপ হস্তী-ঘোটকাদি পশু তাহাদের কল্যাণসাধনে নিয়োজিত রহিয়াছে।

সমগ্র জগতেই এই দুই ভাব আবহমান-কাল চলিয়া আসিতেছে। একটু চিন্তা করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন যে, এই দুই ভাব সাত্ত্বিক ও তামসিক ভাব ভিন্ন আর কিছুই নহে। এই উভয় ভাবের মধ্যে ন্যূনাধিক পরিমাণে রাজসিক ভাবের ক্রিয়াও বর্ত্তমান রহিয়াছে। (কশ্চিদ্‌পরিব্রাজকস্য)

(ক্রমশঃ)

(*) দেবাঃ—শাস্ত্রোদ্ভাষিতাঃ সাত্ত্বিকইন্দ্রিয়বৃত্তয়ঃ। অসুরাঃ—তমোরূপা ইন্দ্রিয়বৃত্তয়ঃ। দেব্যঃ স্বাভাবিক তমোরূপাসুরাভিভবনায় প্রবৃত্তা ইত্যন্যোন্যাভিভবোদ্ভবরূপঃ সংগ্রাম ইব সর্ব্বপ্রাণিষু প্রতিদেহং দেবাসুর-সংগ্রামোঽনাদিকালপ্রবৃত্ত ইত্যভিপ্রায়ঃ। শাঙ্করভাষ্য।

প্রজাপতিঃ—কর্ম্মজ্ঞানাধিকৃত পুরুষঃ।

শ্রীশ্রীহরিঃ।

[১৮৪৭ সালের ২০ আইনমতে রেজিষ্ট্রীকৃত।]

হিন্দু-পত্রিকা।

৪র্থ বর্ষ, ৪র্থ খণ্ড, ৩য় ও ৪র্থ সংখ্যা, | ১৩০৪ সাল, ১৮১৯ শকাব্দা, | আষাঢ় ও শ্রাবণ।

দেবাসুর-সংগ্রাম।

(প্রাণায়াম)

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

কোন বস্তুতে সত্ত্বাধিক্য থাকিলেই তাহাকে "সাত্ত্বিক" বলা যায়। কিন্তু তাই বলিয়া যে তাহাতে তম আদি নাই, এরূপ নহে। সাত্ত্বিক শ্রেণীর মধ্যেও ন্যূন পরিমাণে তমোগুণাদি দৃষ্ট হয় এবং তামসিক শ্রেণীর মধ্যেও ন্যূন পরিমাণে সত্ত্ব দৃষ্ট হয়।

দ্বন্দ্বাত্মক জগতে ভাল ও মন্দ, এই যে দুই সাধারণ আপেক্ষিক ভাব রহিয়াছে, তাহারই ভাল বিভাগকে সাত্ত্বিক বা "সুর" সংজ্ঞা ও মন্দ বিভাগকে তামসিক বা "অসুর" সংজ্ঞা দেওয়া যাইতে পারে। রজঃ এ দুয়ের মধ্যবর্ত্তী সংযোজক অবস্থা মাত্র। উহা তম হইতে সত্ত্বে আরোহণের বা সত্ত্ব হইতে তমে অবতরণের সোপান মাত্র; সুতরাং উহার স্বতন্ত্রোল্লেখ নিষ্প্রয়োজন; আমরা মাত্র সাত্ত্বিক দেবভাব ও তামসিক দৈত্যভাব লইয়াই দেবাসুর-সংগ্রামের তত্ত্ব আলোচনা করিব।

ইতর জগৎ পরিত্যাগ করিয়া মনুষ্যজগতে আসিলে, যেরূপ ত্রিগুণের ন্যূনাধিক্যানুসারে স্থূলতঃ ভাল ও মন্দ দুই বিভাগ পরিদৃষ্ট হয়, সেইরূপ আবার প্রত্যেক মনুষ্যেই এই দুইটী অবস্থা ন্যূনাধিকরূপে পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। এক মনুষ্যেই কখনও সৎ কখনও অসৎ প্রবৃত্তি প্রবল হইয়া উঠে। আহার, বিহার, চিন্তা, কার্য্য ইত্যাদিতে কখনও দেবভাব, কখনও অসুরভাব প্রবল হয় এবং উহাদিগের মধ্যে তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হয়। এই তুমুল সংগ্রামে দেবভাব দ্বারা অসুরভাবকে পরাভব করিবার ইচ্ছা করিলে, ওঙ্কারেরই শরণ গ্রহণ করিতে হয় এবং উহাই পরিস্ফুট করা প্রবন্ধশীর্ষোক্ত শ্রুতির উদ্দেশ্য।

প্রবন্ধশীর্ষোক্ত শ্রুতি বলেন,—প্রজাপতি-বংশীয় দেবতা এবং অসুরেরা সংগ্রাম করিয়াছিলেন। দেবতারা অসুরদিগকে পরাভব করিবেন বলিয়া "উদ্গীথ" অর্থাৎ ওঙ্কারের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য্য বলিতেছেন যে, এই "দেবতা" শব্দের অর্থে সাত্ত্বিক ইন্দ্রিয়-বৃত্তি এবং অসুর শব্দার্থে তামসিক ইন্দ্রিয়-বৃত্তি। চক্ষু,

কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্, বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ এবং মন, এই একাদশটী ইন্দ্রিয়। জ্ঞান, কর্ম্ম ও অন্তরিন্দ্রিয়ের প্রত্যেকটীতেই এই দেবভাব ও অসুরভাব পরিলক্ষিত হয়।

আমরা আমাদের জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সুব্যবহার ও কুব্যবহার দুইই করিতে পারি। চক্ষুদ্বারা পবিত্র ও রমণীয় বস্তু দর্শনে যেরূপ সাত্ত্বিকতার বৃদ্ধি হয়, সেইরূপ কুৎসিৎ বা অপবিত্র বস্তু দর্শনে তামসিকভাবের বৃদ্ধি হয়। তবে সাত্ত্বিক ভাবের আধিক্য থাকিলে, কুদর্শনেও যে কিঞ্চিৎ সত্ত্বগুণজনিত রমণীয়তা, তাহাই তোমার গ্রহণীয় হইবে। বারবণিতাদিগের মুখ-সন্দর্শনে সাধু, মহাপুরুষদিগের ভগবৎপ্রেম জাগরূক হয়! যাহাতে যে ভাব প্রবল থাকে, সকল বস্তু হইতেই সে সেই ভাববর্দ্ধক উপাদান সংগ্রহ করিয়া লয়। মানুষ সুদর্শনে যেরূপ প্রীতি পায়, অবস্থা-ভেদে কুদর্শনেও তদ্রূপ প্রীতি পাইয়া থাকে। জগতে সাত্ত্বিক দৃশ্য কাহারও প্রিয়, কাহারও বা তামসিক দৃশ্য প্রিয়। মানুষে যেমন সুশ্রাব্য শব্দ শুনিতে ভাল বাসে, সেইরূপ কুশ্রাব্য শুনিতেও তাহার প্রীতি দেখা যায়। আমরা সময়ে সময়ে পরগুণানুবাদ শুনিতে যেমন ভালবাসি, আবার পরনিন্দাও সেইরূপ সময় সময় আমাদের শ্রুতিসুখকর হইয়া থাকে। দেবতাদিগের মহিমাব্যঞ্জক সামগানাদি যেরূপ আমাদের তৃপ্তিপ্রদ হয়, বারবণিতাদিগের বিলাসোদ্দীপক তরল সঙ্গীতাদিতেও আমরা তদ্রূপ সময় সময় আকৃষ্ট হই। এ কেবল আমাদিগের অন্তর্নিহিত 'দেব' ও 'অসুর'ভাবের সংগ্রাম-ফলমাত্র। মানুষ যেরূপ সুগন্ধে আসক্ত, তদ্রূপ দুর্গন্ধেও সময় সময় আসক্ত দৃষ্ট হইয়া থাকে। ঘৃতের পবিত্র সৌরভে ব্রহ্মদেশবাসীর নাসিকা কুঞ্চিত হয়; কিন্তু পশ্বাদির পূতিগন্ধপূর্ণ গলিত শব তাহাদের প্রিয় আহার্য্য! একই মানুষের সময়বিশেষে সত্ত্বাদি গুণভেদের অবস্থাবিশেষে কখনও সুগন্ধে কখনও দুর্গন্ধে রতি দেখা যায়। আমাদের দেশেও মৎস্যভোজীদের মধ্যে কখন কাহারও সদ্যঃ রোহিতমৎস্যের ঝোল অপেক্ষা পচা দুর্গন্ধ ইলিস চর্চ্চড়ী যে প্রিয় বোধ হয়, তাহার কারণ তামসিকতার আধিক্য ভিন্ন আর কিছুই নহে।

অবস্থাভেদে মধুরাদি সাত্ত্বিকরস যেরূপ প্রিয় হয়, আবার কটূম্লাদি অসাত্ত্বিকরসও তদ্রূপ প্রিয় হয়। সাধ্বী সহধর্ম্মিনীর পবিত্র স্পর্শে সুখানুভব না করিয়াও মানুষ বারাঙ্গনার আলিঙ্গনে স্বর্গ-সুখ অনুভব করে! পঞ্চেন্দ্রিয়ের দ্বারাই জীব-জীবনের পতন হয়। মহাত্মা তুলসীদাস বলিয়াছেন,—

> "অলি-পতঙ্গ-মৃগ-মীন-গজ্
> ইস্‌কো একহি আঁচ;
> তুলসী উস্‌কো ক্যা গত্,
> যিস্‌কো পিছে পাঁচ?"

অলি ঘ্রাণেন্দ্রিয়-লোভে পুষ্পমধু পান করিতে গিয়াই কেতকী-কণ্টক-বেধনাদি বিবিধ বিপদে পতিত বা মৃত হয়, পতঙ্গ দর্শনেন্দ্রিয়-আকর্ষণে বহ্নির রূপ-সম্ভোগ করিতে গিয়া জীবন হারায়, মৃগ শ্রবণেন্দ্রিয়ের দ্বারা ব্যাধের সুমধুর বংশীধ্বনিতে মুগ্ধ হইয়া পাশবদ্ধ বা বাণবিদ্ধ হয়, মীন রসনেন্দ্রিয়ের প্রলোভনে বড়িস-বিদ্ধ-খাদ্য গলাধঃকরণ করিয়া মীনলীলা সম্বরণ করে এবং হস্তী স্পর্শেন্দ্রিয়ের পরিসেবনার্থ শিক্ষিতা হস্তিনীর অঙ্গসঙ্গ-লোভে মুগ্ধ হইয়া ধৃত বা মৃত হয়। পশ্বাদি ইতর প্রাণীতে তমোগুণের প্রাবল্য বশতঃ তাহাদের এক একটী ইন্দ্রিয়ের তামসিক সেবাতেই প্রায় এবম্বিধ অনর্থ ঘটে, আর সত্ত্বগুণাধিক্য পাইয়াও মানুষ যদি পাঁচটি ইন্দ্রিয়েরই তামসিকসেবায় আসক্ত হয়, তবে তাহার কি

গতি হইবে? ফলে সাত্ত্বিক ইন্দ্রিয়সেবাতেই মানুষের দেবভাব ও তামসিক ইন্দ্রিয়সেবাতেই অসুরভাব অভিব্যক্ত হয়।

যেরূপ জ্ঞানেন্দ্রিয়ে, সেইরূপ কর্ম্মেন্দ্রিয়াদিতেও দেবভাব-অসুরভাব পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ, এই পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়ের সদ্ব্যবহারজনিত যে দেবভাব, তাহাতে যেমন অশেষপ্রকার আত্মহিত ও পরহিত সংসাধিত হইতে পারে, তেমনি উহাদের অপব্যবহারজনিত আসুরভাবের ফলে আত্মানিষ্ট ও পরানিষ্ট সংঘটিত হয়, তৎপক্ষে সন্দেহ নাই। অন্তরিন্দ্রিয় মনেরও ঐরূপ দ্বিবিধভাব আছে এবং তদুপযুক্ত ক্রিয়াদ্বারা ঐ ভাবদ্বয় বর্দ্ধিত হয়।

উপরে যাহা বলা হইল, তদ্দ্বারা স্পষ্ট উপলব্ধি হইবে যে, ইন্দ্রিয়াদিতে তামসিকভাব আছে বলিয়াই আমরা উহার তামসিক ব্যবহার করিতে পারি। শ্রুতিও এইজন্য বলিতেছেন যে "দেবগণ উদ্গীথ অর্থাৎ প্রণবসাধনের জন্য নাসিকায় প্রবেশ করিলেন, অসুরগণও সেইখানে প্রবেশ করিল; এই জন্য নাসিকাদ্বারা সুগন্ধ ও দুর্গন্ধ দুয়েরই উপলব্ধি হইয়া থাকে। এইরূপে দেবগণ ইন্দ্রিয় হইতে ইন্দ্রিয়ান্তরে প্রবেশ করিলে, অসুরগণও তাঁহাদের অনুসরণ করিল; তজ্জন্যই প্রত্যেক ইন্দ্রিয়েরই বিষয়ে সু—কু দুই ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়। কোন ইন্দ্রিয়াশ্রয় গ্রহণ করিয়াই দেবগণ অসুরদিগকে পরাভব করিতে না পারিয়া, অবশেষে প্রাণের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ওঙ্কারসাধনে প্রবৃত্ত হইলেন এবং অসুরগণ কেবল সেইস্থলে প্রবেশ করিতে না পারিয়া দেবগণকর্ত্তৃক পরাভূত হইল।

চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়সংযম করিতে ইচ্ছা করিলেই চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়সংযম করা যায় না। মনে দৃঢ় সঙ্কল্প করিলাম যে কোন অদর্শনীয় বস্তু দর্শন করিব না; কিন্তু চক্ষুর মধ্যে নিহিত তামসিকশক্তি আছে বলিয়া সর্ব্বেন্দ্রিয়-ভাবময় মনেও সেই অদর্শনীয় বস্তু দেখিবার ঔৎসুক্য রহিয়া গেল। মন এবং অন্যান্য জ্ঞানেন্দ্রিয়াদির কার্য্য পরস্পর সাপেক্ষ। জ্ঞানেন্দ্রিয়ের দ্বারাই মনের সংস্কার জন্মে এবং সেই সংস্কারদ্বারাই মন নিয়মিত হয়; অথচ আবার মনের দ্বারাই চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় পরিচালিত ও নিয়মিত হয়। কর্ম্মেন্দ্রিয়গুলির কার্য্যও এইরূপ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও মনের উপর নির্ভর করে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে কেবল এই ইন্দ্রিয়সংযম করিতে চেষ্টা করিলে, তাহাদিগকে সংযত করা যায় না। মনে করিলাম যে আর দুশ্চিন্তা করিব না, কিন্তু যেন আমার অজ্ঞাতসারে কোথা হইতে দুশ্চিন্তা আসিয়া পড়িল; মন আর সংযত রহিল না। এই ভাবেই গীতায় "বলাদিব নিয়োজিতঃ" বলা হইয়াছে।

প্রাণই জীবের জীবত্বের কারণ। শ্বাস-প্রশ্বাস না থাকিলে, জীবের জীবত্ব থাকে না।

বৃহদারণ্যক প্রভৃতি শ্রুতিতে উক্ত আছে, ইন্দ্রিয়াদি ও প্রাণের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব লইয়া বিবাদ হইলে, তাহারা সকলে প্রজাপতির সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া, তাহাদের মধ্যেকে শ্রেষ্ঠ, এই প্রশ্ন করিল। প্রজাপতি তদুত্তরে বলিলেন যে, তাহাদিগের মধ্যে যাহার অস্তিত্ব না থাকিলে অন্য সকলের অস্তিত্বের অভাব হইবে, সেই শ্রেষ্ঠ। তদনুসারে ইন্দ্রিয়গণ একে একে দেহ পরিত্যাগ করিয়া গেল, কিন্তু অন্যান্য ইন্দ্রিয়গণের ও প্রাণের ক্রিয়া অব্যাহত রহিল। অবশেষে প্রাণ দেহ পরিত্যাগে উদ্যত হইলে সকল ইন্দ্রিয়েরই ইন্দ্রিয়ত্ব লোপের উপক্রম হইল; তখন তাহারা বুঝিতে পারিল যে, প্রাণের অস্তিত্ব ভিন্ন তাহাদের কাহারও অস্তিত্ব

থাকিতে পারে না এবং তদনুসারে প্রাণেরই সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিল।

উপরে যাহা বলা হইল, তাহাতে স্পষ্ট উপলব্ধি হইবে যে, প্রাণেই জীবের জীবত্ব এবং তাবৎ ইন্দ্রিয়ই প্রাণের অধীন; এই প্রাণেরই সংযম করিতে পারিলে, তাবৎ ইন্দ্রিয় সংযমিত হয়। এই প্রাণেরই সংযম সাধনে সাত্ত্বিক ভাবের উদয় হয়। প্রাণের সংযমকেই "প্রাণায়াম" বলে। "প্রাণান্ যময়তীতি প্রাণায়ামঃ।" অতএব এই প্রাণায়ামের দ্বারাই প্রণব সাধন করিতে পারিলে, ইন্দ্রিয়াদিতে তামসিকভাব অর্থাৎ আসুরিকভাব কখনও প্রবল হইতে পারে না। এই জন্যই শ্রুতিতে বলা হইয়াছে যে, দেবগণ অসুরগণকে পরাভূত করিবার জন্য অবশেষে প্রাণ আশ্রয় করিয়াই কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন।

শ্রুতি যথা—

"তে হ নাসিক্যং প্রাণমুদ্গীথমুপাসাঞ্চক্রিরে তং হাসুরা পাপ্মনা বিবিধুঃ তস্মাত্তেনোভয়ং জিঘ্রতি সুরভি চ দুর্গন্ধি চ পাপ্মনা হ্যেষবিদ্ধঃ॥ ২॥

অথ হ বাচমুদ্গীথমুপাসাঞ্চক্রিরে তাং হাসুরাঃ পাপ্মনা বিবিধুস্তস্মাত্তেনোভয়ং বদতি সত্যঞ্চানৃতং চ পাপ্মনা হ্যেষা বিদ্ধা॥ ৩॥

অথ হ চক্ষুরুদ্গীথমুপাসাঞ্চক্রিরে তদ্ধাসুরাঃ পাপ্মনা বিবিধুস্তস্মাত্তেনোভয়ং পশ্যতি দর্শনীয়ং চাদর্শনীয়ং চ পাপ্মনা হ্যেতদ্বিদ্ধম্॥ ৪॥

অথ হ শ্রোত্রমুদ্গীথমুপাসাঞ্চক্রিরে তদ্ধাসুরাঃ পাপ্মনা বিবিধুস্তস্মাত্তেনোভয়ং শৃণোতি শ্রবণীয়ঞ্চাশ্রবণীয়ঞ্চ পাপ্মনা হ্যেতদ্বিদ্ধম্॥ ৫॥

অথ হ মন-উদ্গীথমুপাসাঞ্চক্রিরে তদ্ধাসুরাঃ পাপ্মনা বিবিধুস্তস্মাত্তেনোভয়ং সঙ্কল্পতে সঙ্কল্পনীয়মসঙ্কল্পনীয়ঞ্চ পাপ্মনা হ্যেতদ্বিদ্ধম্॥ ৬॥

অথ হ য এবায়ং মুখ্যঃ প্রাণস্তমুদ্গীথমুপাসাঞ্চক্রিরে তং হাসুরাঃ ঋত্বা বিদধ্বংসুর্যথাশ্মানমাখনমৃত্বা বিধ্বংসেত।

অর্থাৎ দেবগণ প্রণব-সাধনার্থ যথাক্রমে নাসিকা, বাক্য, চক্ষু, কর্ণ ও মন প্রভৃতি ইন্দ্রিয় আশ্রয় করিলে, অসুরেরাও তত্তৎস্থানে গেল; সুতরাং সুগন্ধ, দুর্গন্ধ, সত্য, মিথ্যা, সুরূপ, কুরূপ, সুশ্রাব্য, অশ্রাব্য এবং সঙ্কল্পনীয়তা ও অসঙ্কল্পনীয়তা, এইরূপ দ্বিবিধভাব প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ে উৎপন্ন হইল। অবশেষে দেবগণ প্রাণে আশ্রয় নিয়া প্রণবসাধনে সফলকাম হইলেন। কঠিন প্রস্তর খুঁড়িতে গিয়া কুদ্দালাদিই যেমন ভাঙ্গিয়া যায়, প্রাণ অধিকার করিতে গিয়া অসুরগণও তদ্বৎ দশা প্রাপ্ত হইল।

অতএব এই প্রাণাশ্রয়রূপ প্রাণায়াম-যোগই দেবাসুরের সংগ্রাম-নিষ্পত্তি ও অসুরের পরাভবের অনন্য উপায়। প্রবন্ধ-শীর্ষোক্ত শ্রুতিতে দেবতা অর্থে সৎপ্রবৃত্তি, অসুর অর্থে অসৎপ্রবৃত্তি এবং প্রজাপতি অর্থে মানবাত্মা বুঝাইয়াছে। মানবের আসুরভাব দমনপূর্ব্বক দেবভাব আশ্রয় করতঃ কৃতার্থ হইতে হইলে, প্রাণায়ামই তাহার প্রধান উপায়, ইহাই শ্রুতির তাৎপর্য্য।

শমন-দমন।

যাহার স্মরণে দেব, দানব, মানব, যক্ষ, রক্ষ, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, সকলেই সশঙ্কিত; পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষ, লতা, তৃণ, গুল্ম পর্য্যন্ত যাহার ভয়ে ভীত; পৃথিবী নিজে, স্বয়ং সৌরজগৎ,—এমন কি, এই বিরাট ব্রহ্মাণ্ড-কাণ্ড যাহার বিশ্ব-করালকবলের দিকে অজগর-দৃষ্টি-শক্তি-সমাকৃষ্ট অবশ পক্ষীটির ন্যায় আকৃষ্ট, তাহারই নাম শমন বা মরণ। জন্ম ও মৃত্যু পরস্পর আপেক্ষিক; জাত হইলেই মৃত হইতে হইবে। সৃজন-মরণ একই বস্তুর যেন দুই পৃষ্ঠ; তাই সৃষ্টবস্তুমাত্রই শমনের অধীন। 'মৃত্যুরেব ন সংশয়ঃ' মরণ নিশ্চয়, নাহিক সংশয়। একদিন না একদিন তার খর্পরে পড়িতেই হইবে; তাই তারে এত ভয়! যদি কোনরূপে তাকে এড়াইবার যো থাকিত, তবে কি আর তাহার নামে আতঙ্ক, স্মরণে লোমাঞ্চ, চিন্তনে হৃৎকম্প উপস্থিত হইত? কিন্তু এড়াইবার কি উপায় নাই? তবে 'শমন-দমন' কথাটি কোথা হইতে আসিল এবং উহার অর্থইবা কি? এই যে নানাশাস্ত্রে, নানাগ্রন্থে, সভার মাঝে, সাধুর কাছে, উপদেষ্টার উপদেশ-দানে, ভক্তগায়কের ভজন-গানে ঐ কথাটি চলিয়া আসিতেছে, উহার প্রকৃত তাৎপর্য্য কি? বাস্তবিক কি এমন প্রতিষেধ সম্ভবে, যাহাতে শমন-দমন সম্পাদন করা যায়?—অর্থাৎ না মরিয়া পারা যায়? শাস্ত্রে শুনিতে পাই, অশ্বত্থামাদি সাতজন "চিরজীবী"; দেবগণ অমৃত পান করিয়া 'অমর' হইয়াছেন, ইত্যাদি; আবার শাস্ত্রই বলেন, মহাপ্রলয়ে "আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্ত" অর্থাৎ ব্রহ্মা হইতে তৃণপর্য্যন্ত কিছুই থাকিবে না! হরি হরি! তাহাহইলে চিরজীবীত্ব ও অমরত্ব বিরাটকালের এক ক্ষুদ্র অংশব্যাপী মাত্র! অতএব শমনের শক্তি সর্ব্বনাশী, কালের কবল বিশ্বগ্রাসী, তাহাতে ... সংশয় নাই। 'জগৎ' শব্দের অর্থই যাহা গত হইয়াছে—হইতেছে ও হইবে, অর্থাৎ যাহা থাকিবার নয়। মরণই নিয়তি, নিয়তিই প্রকৃতির গতি; এই গতিতেই জগচ্চক্র নিয়ত কালের পথে চলিয়াছে। অনিত্য সর্ব্বভূত নিত্য-কালের ক্রীড়ার সামগ্রী মাত্র। বাজীকর যেমন বিবিধ খেলনা-বস্তুর দ্বারা বাজী দেখাইয়া, আবার সেগুলিকে থলীর মধ্যে পূরে, বিশ্ব-বাজীকর কালও নিয়ত বিবিধ বিচিত্র ভৌতিক বাজী দেখাইতেছে ও এক একটা খেলনা অতীতের থলিয়ায় পুরিতেছে। কালেই সমস্ত লয়, এই জন্য লয় বা মরণের আর এক নামই কাল। কাল-প্রাপ্তিই জগতের ব্যাপার; ইহাই একমাত্র জানার ও আলোচনার বিষয়, ইহাই একমাত্র সমাচার।

বকরূপী ধর্ম্ম যুধিষ্ঠিরকে এই প্রশ্নই জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "কা চ বার্ত্তা," অর্থাৎ সমাচার কি? ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠিরও এই উত্তরই দিয়াছিলেন,—

> "মাসর্ত্তুদর্ব্বীপরিবর্ত্তনেন,
> সূর্য্যাগ্নিনা রাত্রিদিবেন্ধনেন।
> অস্মিন্ মহামোহময়ে কটাহে
> ভূতানি কালঃ পচতীতি বার্ত্তা॥"

> "ঘোঁটন কারণ হৈল মাস ঋতু হাতা।
> রাত্রি-দিবা কাষ্ঠ তাহে, পাবক সবিতা।
> এই মহামোহের কটাহে কাল কর্ত্তা।
> ভূতগণে করে পাক এই শুন বার্ত্তা॥"
>
> (কাশীদাস।)

মোট তাৎপর্য্য এই যে, কালে সকলই যাইবে, কিছুই থাকিবে না, ইহাই জগতের একমাত্র খবর। ইহাই একমাত্র জ্ঞাতব্য, অর্থাৎ জগতের অনিত্যতাই একমাত্র জ্ঞাতব্য।

ইহা জানিলেই সংসার-পাশ ছেদ হয়; ভূস্ত্যজ্য ...সক্তি হইতে মুক্তি পাইয়া মন নিত্যে—অর্থাৎ আত্মায় আত্মসমর্পণ করে; কিন্তু ভগবানের সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারিণী মায়া-শক্তির কি অনির্ব্বচনীয় অসামান্য ইন্দ্রজাল যে, তাহাতে মুগ্ধ হইয়া আমরা প্রতিদিন—প্রতিমুহূর্ত্তে এই বার্ত্তা পাইয়াও পাইতেছি না—জানিয়াও না-জানার ফল অতিক্রম করিতে পারিতেছি না! ইহা বড়ই আশ্চর্য্য! যুধিষ্ঠির 'কিমাশ্চর্য্যম্' প্রশ্নের উত্তরে ইহাই বলিয়াছিলেন, যথা—

"অহন্যহনি ভূতানি গচ্ছন্তি যমমন্দিরম্।
শেষাঃ স্থিরত্বমিচ্ছন্তি কিমাশ্চর্য্যমতঃপরম্॥"
দিন দিন জীবজন্তু যাইতেছে যম-ঘর।
শেষেরা স্থিরত্ব চায়, কি আশ্চর্য্য এর পর!

অঘটন-ঘটন-পটীয়সী মায়াই জাগতিক আশ্চর্য্য ব্যাপার সমূহের নিয়ন্ত্রী; অতএব এই সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্য ব্যাপারটিও মায়াজাত মহামোহেরই মোহিনীশক্তির ফল। এ বিলয়-বার্ত্তা বা মরণের কথা যখনই আমরা একটু অভিনিবিষ্ট ভাবে ভাবনা করি, যখনই শ্মশান-বৈরাগ্য প্রভৃতি উদ্দীপক কারণে এই মৃত্যু-চিন্তা উদ্দীপ্তা হয়, তখনই শমন-দমনের কথাটা অধিকারী-ভেদে অস্পষ্ট বা উজ্জ্বলভাবে মনে আসে; কিন্তু তাহার স্থায়িত্ব ক্ষণিক। আসল কথাটা কেহই ভাল করিয়া ভাবে না। যাহা ভিন্ন সমস্তই অকৃতার্থতা, যে শমন-দমনের কোনরূপ উপায় অবলম্বন ভিন্ন মনুষ্য-জীবনের মুখ্য লক্ষ্যটুকু ভস্ম-বিক্ষিপ্তবারিবিন্দুবৎ ব্যর্থতায় বিলীন হয়, তাহার বিষয়েই আমরা শোচনীয়ভাবে উদাসীন! জগতে যিনি যত বিদ্যা, বুদ্ধি, ধন-মান, রূপ-গুণ, যশ-সৌরভ ও পদ-গৌরব ইত্যাদিতে বিভূষিত হউন না কেন, শমন-দমনের বা মরণ-হরণের উপায় না করিতে পারিলে, সব বৃথা—সব বিড়ম্বনা।

এ সংসারখানা কেবল "কসাইখানা" মাত্র। আমরা নিতান্ত দীনহীন ছাগ-মেষাদির ন্যায় কর্ম্মডোরে বদ্ধ হইয়া মূঢ়তা-জনিত নিশ্চিন্ততায় নিদ্রিত রহিয়াছি। শমন কখন কাহারে ধরেন, কখন কাহারে 'জবাই' করেন, কিছুই স্থিরতা নাই; হায়! সময়কালে একটু ছট্‌ফটানি ভিন্ন কোন ক্ষমতাই নাই! কি শোচনীয় অবস্থা! এই ভাবের 'রামপ্রসাদী' সুরে একটী গান আছে;—

আর খাবনা পাতা নেঙ্গুড় নেড়ে।
আমার ছোরার কথা মনে পড়ে॥
এ সংসারখান কসাইর দোকান, (কসাই) শমন-উদ্দীন্ আস্‌ছে তেড়ে।
(হাতে হাস্‌ছে ছোরা) ঐ শমন-উদ্দীন্ আস্‌ছে তেড়ে॥
বি-এ এম্-এ জজ্ মেজেষ্টার নির্ভাবনায় নেঙ্গুড় নাড়ে।
(যেন) যো নাই জানার, কসাইখানার ছাগল ভেড়াই সকল ভেড়ে॥
নিত্য নূতন ঘাষ-পাতা-খড় খাচ্চি আর ঘুমাচ্চি পড়ে।
(কচ্চি) শিং-ল্যাজের বাহারে বিহার, জবাইর চিন্তা সবাই ছেড়ে॥
ছোরা-মারা জান্‌লে যারা, ভাগ্‌লে তারা দড়া ছিঁড়ে।
আমি রোগা ভ্যাড়া, পাকা দড়া, টান্‌লে আরো এঁটে পড়ে॥
(এই) নিরুপায় (অমুকের) উপায় আছে সদায় ওপায় পড়ে।
(তবে) কসাইর বাপের সাধ্য কি আর গোঁসাই যদি দেয়গো ছেড়ে॥

গানটী কৌতুকের ভাষায় রচিত বটে, কিন্তু ইহার মর্ম্মে মর্ম্মে মর্ম্মভেদী দীর্ঘশ্বাস ও হা হুতাশ বর্ত্তমান! বাস্তবিক শমন-দমনের উপায় ভিন্ন দুর্লভ মনুষ্য-জন্মের কোন সার্থকতাই সম্ভাবিত নহে। এ সংসারে অনেকের বুদ্ধিমত্তার বিশেষ খ্যাতি আছে বটে, কিন্তু শমনের 'শমন জারী' হইলে, সব বুদ্ধি ফুরাইয়া যায়! যাঁহার বুদ্ধি তাহার প্রতীকার করিতে সমর্থ, তিনিই যথার্থ বুদ্ধিমান্; নচেৎ উপরোক্ত গানটির ভাবে শৃঙ্গ-

লাঙ্গুল বৃদ্ধির বৃদ্ধি প্রকৃতপক্ষে উপহাসের বিষয়ী-ভূত মাত্র।

এখন কথা হইতেছে, শমন দমন বাস্তবিক সম্ভব কি না? পূর্ব্বে আলোচিত হইয়াছে, মরণের হাত কাহারও এড়াইবার যো নাই। দেহ-ত্যাগ অনিবার্য্য—অবশ্যম্ভাবী। আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্ত সমস্তই নিয়তির নিয়ত অধীন। তবে শমন-দমনের সার্থকতা কিরূপ?

ভগবানের নাম নিলে নাকি শমন দমন হয়। "নামে শমনভয় দূরে যাবে বোল হরি-বোল" ইত্যাদি নামকীর্ত্তন ভক্তগণ গান করিয়া থাকেন। বিসূচিকা-মারী প্রভৃতি উপস্থিত হইলে "পালা পালারে শমন! এদেশে চাঁদ গৌর এল। ঐ যে হরিনাম চৌকিদার তোরে গেরেপ্তার কর্ত্তে এল॥" ইত্যাদি সঙ্কীর্ত্তন গাওয়া হয় এবং ৺কালীপূজা করা হয়।

কালিকাপূজনং কিম্বা শ্রীহরের্নামকীর্ত্তনম্।
ভয়স্য ভয়-সংতুল্যং কৃতান্তস্য কৃতান্তবৎ॥
যেনৈব বার্য্যতে নিত্যং ভবরোগঃ সুদারুণঃ।
তেন সামান্যরোগস্য নিবারণে তু কা কথা॥
কালিকা-পূজন কিম্বা কীর্ত্তন শ্রীহরি-নাম।
ভয়েরো ভয়স্বরূপ, যমেরো যম-সমান॥
যাহাতে নিবারে ঘোর ভবরোগ অনিবার,
নাশিতে সামান্যরোগ কথা কি তাহার আর?

বাস্তবিক একথা পরীক্ষিত সত্য। হরি-সঙ্কীর্ত্তন, কালীপূজা ইত্যাদি দৈবানুষ্ঠানে সর্ব্বোত্তম পুরুষকার হয়; কারণ আপৎকালে এবং সর্ব্বকালেই "নচদৈবাৎ পরং বলম্।" তবে কথা এই যে, উপাসকের ইচ্ছা-শক্তি (Will-force) যতু প্রবলা হইবে, উপাসনার ফল তত ফলিবে—উপাসনা তত উপাস্যের গৃহীত হইবে। গীতাতে চতুর্ব্বিধ উপাসকের উল্লেখ আছে, যথা,—

'আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ।'

মারীভয়ে শমন দমন-সঙ্কল্পে যখন পূর্ব্বোক্ত দৈব ক্রিয়াদি করা হয়, তখন সেই ভীত-সংত্রস্ত-ব্যাকুল উপাসকগণ 'আর্ত্ত' ভক্তের আসন গ্রহণ করতঃ প্রবল চিত্তবেগসহকারে উপাসনা করে; সুতরাং ইচ্ছাশক্তি-সমুত্তেজিতা প্রার্থনা সদ্যঃ ফলবতী হয়। ইহা ত যেন বুঝিলাম, কিন্তু একেবারে শমন-দমনের উপায় কি? এই বর্ত্তমান ভৌতিক দেহটা লইয়া অনন্তকাল অমর হইয়া থাকাই যদি 'একেবারে শমন দমন' হয়, তবে তাহা শাস্ত্রমতে ব্রহ্মারও অসাধ্য বিধায় মর্ত্ত্য-উপাসকের পক্ষে একান্ত অসম্ভব; অন্ততঃ মহাপ্রলয়ে দেহ-লয় অবশ্যম্ভাবী। অনিত্যের 'নিত্যবদ্ভাতি' অবস্থা মহাপ্রলয়ে আর থাকে না। কালে ভূতের উপর কালের অধিকার হইবেই। বলিয়াছিত, এই জন্যই যুধিষ্ঠির বলিয়াছিলেন, জগতের ইহাই একমাত্র খবর। মায়িক দেহ হইলেই মরিতে হইবে। স্বয়ং ভগবানই 'ধর্ম্মসংস্থাপনার্থে' লীলায় মায়িক দেহ-ধারণ করিয়া আবার মরণাভিনয়ে তাহা ত্যাগ করিয়াছেন! এহেন ভক্ত-চূড়ামণি প্রহ্লাদ, তিনিও নামের গুণে—দৈববলের গুণে বহুবার মরণের মুখে রক্ষা পাইয়াও চিররক্ষিত হইলেন না। তাঁহার দেহরক্ষায় যত দিন ভগবানের প্রয়োজন ছিল, ততদিন বহু দেহান্তকর বিপদে রক্ষা করিয়া, কালে তাঁহাকেও অনিত্য দেহ ছাড়াইয়া নিত্য ধামে লইয়া গেলেন। দৈব-বলে রাবণের কাটামাথা পুনঃ পুনঃ যোড়া লাগিয়াও চিরদিন সে মাথা রহিল না; অচিরাৎ নিয়তি-নিয়মিত যথাসময়ে লঙ্কার বারিধি-বেলার বালুকাশয্যায় তাহা লোটাইল! অধিক বলা বাহুল্য, ফলে দৈববলে শতসহস্রবার আসন্ন মৃত্যুর আক্রমণ অতিক্রম করিলেও একদিন অনিত্য মায়িক ও ভৌতিক দেহের উপরে

(কালপূর্ণ হইলে) কালের অধিকার আসিবেই। শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে,—

"নাকালে ম্রিয়তে কশ্চিদ্বিদ্ধঃ শরশতৈরপি।
ছিন্নকুশাগ্রমাত্রেণ প্রাপ্তকালো ন জীবতি॥"

অকালে না মরে যদি বিঁধে শত শরে।
কালপূর্ণ হলে ছিন্ন কুশাগ্রেও মরে!

এতাবতা ভরসা করি, এই টুকু বুঝা গেল যে, "শমন-দমন" যদি ঠিক কথা হয়, তবে সে এরূপ স্থূল দমন নয়; সে দমনের অন্যরূপ সূক্ষ্ম রহস্যময় অর্থ আছে। অতএব সে অর্থ কি—সে রহস্য কি, যথাসম্ভব বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক।

ভক্ত সাধকগণ কখনও অনিত্য ভৌতিক দেহের মোহে মজিয়া এই মলভাণ্ড অন্ন-পরিণাম-পিণ্ডটির চিরস্থায়িত্ব বিধানই কৃতার্থতার কারণ মনে করেন না; অথচ তাঁহারা শমন-ভয়ে ভীত হইয়াই যে 'অভয় চরণে' শরণ লইয়াছেন, একথা অনেকের মন্ত্রে, প্রার্থনায়, স্তবে, গানে স্পষ্ট ব্যক্ত হইয়াছে। এই ভাবের 'শমন ভয়' ও 'ভবভয়' যেন একই বস্তু বোধ হয়; কারণ উপযুক্ত প্রয়োগ-ক্ষেত্রে এতদুভয়ের যে কোন কথাটিই সমঅভিপ্রায়ে প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

পুরাণ-ইতিহাস আলোচনায় জানা যায় অনেক ভক্ত সম্ভবতঃ এ যাবৎ ভব-ভয়-মুক্ত হইয়াছেন, ভবসিন্ধুর পারে গিয়াছেন, যম-যাতনা এড়াইয়াছেন, শমনভয় দমন করিয়া আত্মার সহিত রমণ করিতেছেন। এসমস্তই সম্পূর্ণ সত্য হইতে পারে, অথচ দেহাত্মবুদ্ধিবিহীনতাবশতঃ সকলেই কিন্তু অন্নপিণ্ড স্থূল দেহের স্থিতি-ক্ষতি সমজ্ঞান করিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। কোন দার্শনিক কবি ঠিক লয়াছেন,—

"সাধুর জীবন মৃত্যু একই সমান।"

সাধুর লক্ষণ বিষয়ে শাস্ত্র বলেন,—

"ন প্রিয়তে বন্দ্যমানো নিন্দ্যমানো ন কুপ্যতি।
নৈবোদ্বিজেত মরণে জীবনে নাভিনন্দতি॥"

বন্দনায় নহে তুষ্ট, নিন্দায় অরুষ্ট রয়।
মরণেও অনুদ্বিগ্ন, জীবনেও প্রীত নয়॥

অতএব দেখা গেল, অনিত্য দেহের মায়ায় ভক্তগণ শমন দমনার্থ লালায়িত নহেন, অথচ তাঁহারা যে জন্য লালায়িত, শমন-দমন ভিন্ন তল্লাভ-সম্ভাবনাও সুদূরপরাহত। এক্ষণে বোধ হয় এটুকু বুঝা গেল যে, যদি দেহে শমনের অধিকার অবারিত—অব্যাহত রহিলেও শমন-দমনের সম্ভাবনা থাকে, তবে সেইরূপ শমন-দমনই ভক্ত সাধকের অভিপ্রেত। দেখা যাউক, তাহা কিরূপ।

শ্রীভগবান গীতায় এ গুরুতর রহস্য ভেদ করিয়া দিয়াছেন। তিনি প্রথমতঃ গীতার প্রথমাংশেই এই কথাটি বলিয়া রাখিয়াছেন যে—

"জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ।
তস্মাদপরিহার্য্যেঽর্থে নত্বং শোচিতুমর্হসি॥"
জন্মিলে নিশ্চিত মৃত্যু, মরিলে জন্ম নিশ্চিত।
অতএব অনিবার্য্যে শোক তব অনুচিত॥"

অপরিহার্য্য বিষয়ে শোক করা মূঢ়তা মাত্র। অতএব দেহী হইলেই দেহত্যাগ একান্ত অপরিহার্য্য বিধায় তজ্জন্য উদ্বিগ্ন হওয়া বা জীবনের মায়ায় শোক-কাতর হওয়া নিতান্তই মোহের কার্য্য। উপাসনার সুস্নিগ্ধ সুধাপানে অনিত্যাসক্তির নেশা বা মোহ-মদিরার ঘোর কাটিয়া গেলেই দেহ-সর্ব্বস্বতা দূর হয়। এই তত্ত্বেই শমনের প্রথম পরাজয়—শমন-দমন-রহস্যের প্রথম স্তর-ভেদ। দেহের প্রতি যদি আমার স্বার্থ, সহানুভূতি, মমতাবুদ্ধি না থাকিল, তবে শমনকে "কদলী-প্রদর্শন" কঠিন নহে। ভক্ত-জগতে অনেকেই 'কালকে কলা দেখাইয়া' "কালের মুখে কালী দিয়া" "ডঙ্কা মারিয়া" চলিয়া গিয়াছেন। সাধুগণ হাসিতে হাসিতে দেহ ত্যাগ করেন, পাপীরা অশ্রুজলে

ভাসিতে ভাসিতে জীবন ত্যাগ করে। সাধু শিরোরত্ন তুলসীদাস ঠিক বলিয়াছেন,—

"তুলসি! যব্ জগমে আয়ো জগ হসে তোম্ রোয়।
অ্যাসা কুর্ণিকর্ চলো কি তোম্ হসে জগ রোয়।"
তুল্সি! যবে এলে ভবে, কাঁদ্‌লে তুমি, হাস্‌লে লোক।
যাবার বেলা এম্নি যাবে, হাস্‌বে তুমি, কাঁদবে লোক॥

বাস্তবিক অন্তরে বাহিরে হেসে যেতে পারিলেই শমনের শাসন শিথিল হয়। তাহলে মৃত্যু-যাতনাও হয় না এবং শমনপুরে বা শমন-বিহিত-বিধানে "নরক" নামক কোন পারলৌকিক দুর্ভোগও ঘটে না। আমাকে যদি তুমি প্রহার কর, অথচ আমার ব্যথা না লাগে, তবে তোমার প্রহার সার্থক হয় কি? বরং তুমিই প্রকারান্তরে প্রহারিত হও; তোমারই হাতে হয়ত ব্যথা লাগে! গীতার পূর্ব্বোক্ত শ্লোকের শিক্ষায় এই এক ভাবে শমন-দমন হয়; এতদ্ব্যতীত শমন-দমন-রহস্যে আর একটী অন্তঃস্তর আছে; তদালোচনায় ভরসা করি বুঝা যাইবে যে, সম্পূর্ণ-শমন-দমন কিরূপ।

মরণ হয় কাহার? শমনের অধিকার কিসের উপর? দেহী ত মরে না, মরে দেহ; তবে আর শমনকে দেহীর ভয় কি? গীতায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন, মৃত্যু জীবাত্মার পরিচ্ছদ-পরিবর্ত্তন মাত্র।

"বাসাংসিজীর্ণানি যথা বিহায়।
নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি॥
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী॥"

যথা জীর্ণ-বস্ত্রভার, করি নর পরিহার,
পরে নব বসন অপর,
তথাবৎ জীর্ণকায়, দেহী পরিত্যজি যায়,
পুনঃ পায় নব কলেবর।

অতএব মৃত্যু যদি জীবাত্মার (আসল মানুষের) পোষাক-বদল মাত্র হইল, তবে আর তাহা এমন ভয়াবহ, এমন নিদারুণ, এমন সর্ব্বনাশক ব্যাপার বলিয়া বোধ হয় কেন? ইহার একমাত্র কারণ আমাদের দেহাত্ম-বুদ্ধি ও তদানুষঙ্গিক মায়ামোহ এবং মৃত্যু-যাতনার ভয়। 'দেহ আমার' মাত্র না ভাবিয়া, দেহই যেন 'আমি' বলিয়া যে ভ্রান্ত জ্ঞান, তাহাই দেহাত্ম-বুদ্ধি; সুতরাং দেহের নাশেই 'আমি নষ্ট হইলাম' এই মোহজ দৃঢ় সংস্কারই মৃত্যুকে এত অপ্রিয়, এত আপত্তিজনক, এত অমাঙ্গলিক ও এত বিকটবিভীষিকাপূর্ণ করিয়াছে! পরন্তু মৃত্যুতেই আমি একেবারে ফুরাইয়া যাইব না, এ বিশ্বাস সাধারণের একরকম থাকিলেও, তাহা বড় সংশয়ান্দোলিত, অস্পষ্ট ও দুর্ব্বল। এহেন সোণার সংসার, এহেন প্রেমের পুতুল স্ত্রীপুত্রাদি, এহেন পার্থিব ভোগ-বৈচিত্র্য-ব্যাপার, এ সবের অসহ্য বিরহ ত অনিবার্য্য; তারপর আবার মৃত্যু-যাতনা!—ইহার কল্পনাও লোমাঞ্চকর! এখানেই আপত্তির শেষ নহে,—আরও আছে। মর্ম্মন্তুদ মৃত্যু-যাতনায় দেহ হইতে নিস্ক্রান্ত হইয়াও নাজানি কোথায় কি ভাবে থাকিতে হইবে! সুখে থাকি, দুঃখে থাকি, এ পৃথিবীর সঙ্গে একরূপ আপোষ-নিষ্পত্তি করিয়া নিয়াছিলাম, কিন্তু সে অজ্ঞাত-তত্ত্ব অদ্ভুত রহস্যময় পরলোকে না জানি কেমনে কাটাইব? কবিবর ৺ঈশ্বরগুপ্ত বলিয়াছিলেন,—

'মরে যদি ফিরে আসি, মনে যদি রয়,
তবে ত বলিতে পারি মরিলে কি হয়।'

বাস্তবিক পারলৌকিক রহস্য জীবন-যবনিকার চির অন্তরালে অবস্থিত। সে দুর্ভেদ্য দুরপসার্য্য যবণিকা যাঁহার অন্তশ্চক্ষুতে স্বচ্ছ প্রতীয়মান হয়, তাঁহারই ধর্ম্মসাধন সার্থক—মানবজন্ম সফল। তাঁহারই দেহাত্মবুদ্ধি বিদূরিত,

'শমন-দমন' তাঁহারই আয়ত্তীভূত। কিন্তু এ তামস কলিযুগে সেরূপ সৌভাগ্যভাজন সাধক কয়জন আছেন? যেরূপ অবস্থা, তাহাতে লোকালয়ে একরূপ নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না; তবে বনে, বিজনে, কন্দরে, গহ্বরে কিয়ৎ-সংখ্যক থাকিতে পারেন। আবার তাই বলিয়া গৃহাশ্রমী সাধকের যে সে অধিকারই নাই, তাহা নহে। অধিকার বিলক্ষণ আছে; রাজর্ষি-জনকও গৃহী ছিলেন, অথচ গীতায় তিনিই আদর্শ-সাধকরূপে উক্ত হইয়াছেন। অতএব আমাদের নিরাশ হইবার কথা নাই। ঐ আদর্শ সম্মুখে কল্পনা করিয়া, যথাশক্তি যথা-সম্ভব অগ্রসর হইতেই হইবে। যেখানে সাধনের জন্য সুদুর্লভ মানব জন্ম ভাগ্যবলে লাভ হইয়াছে, সেখানে এমন জন্মটী যাহাতে 'মাঠে মারা' না যায়, তাহার যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেই হইবে। যে না করে, সে আর সহস্র বিষয়ে বুদ্ধিমান বলিয়া খ্যাত হইলেও প্রকৃতপক্ষে নির্ব্বোধের চূড়ামণি!

'নলিনী-দলগত-জলবত্তরলম্' এই মানব-জীবনে নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া থাকায় সময় নাই। কখন শমন সন্নিহিত হন, কিছুই স্থিরতা নাই। অতএব প্রতিমুহূর্ত্তেই মরণ-সম্ভাবনা জানিয়া সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিতে হইবে। অপ্রস্তুতেরই শমন-সঙ্কট সুনিশ্চিত, শমন দমন সুদূরপরাহত। নীতি-শাস্ত্রকারেরা ঠিক বলিয়াছেন,—

"অজরামরবৎ প্রাজ্ঞ বিদ্যামর্থঞ্চ চিন্তয়েৎ।
গৃহীত ইব কেশেষু মৃত্যুনা ধর্ম্মমাচরেৎ॥"

অজর অমর হয়ে বুদ্ধিমান
বিদ্যা অর্থ উপার্জ্জিবে।
শমন দিয়েছে কেশে এসে টান,
ভেবে ধর্ম্ম আচরিবে।

যিনি মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত, তিনিই 'মৃত্যুঞ্জয়' হইতে পারেন। মৃত্যুর সম্ভাবনা যেখানে প্রতি-ক্ষণেই রহিয়াছে, সেখানে অপ্রস্তুত থাকা কেবল মূর্খতা মাত্র।

মরণকে মরণ-বোধ না করিতে পারিলেই তাহাকে নির্ভয়ে আলিঙ্গন করা যায়, তাহার দর্প চূর্ণ করা যায়। প্রকৃতপক্ষে সে যে আমাকে স্পর্শ করিতেও অক্ষম, মাত্র আমার এই রক্ত-মাংসের খোলসটা লইয়াই তাহার যত আস্ফালন, এই টুকু বুঝিতে পারিলেই তাহার শূন্য-গর্ভ 'চোকরাঙ্গাণীতে' আর ভয় থাকে না। শমনের পাঞ্চভৌতিক অস্ত্র বা "পঞ্চত্ব" আমার পোষাকটী মাত্র কাড়িয়া লইতে পারে, আমার চিন্ময় অঙ্গে আঁচড়টিও দিতে পারে না। গীতা বলেন,—

"নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতিপাবকঃ।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ॥"
শস্ত্র নাহি ছিঁড়ে, নাহি দহে হুতাশন।
জল না ভিজায়, নাহি শোষে সমীরণ॥

দেহ অনিত্য পঞ্চভূত-রচিত, এই জন্য তাহার বিনশ্বরত্ব পঞ্চভূতেরই সাধ্য, তাহারই নাম পঞ্চত্ব। দেহী নিত্য, সুতরাং চির অবিনশ্বর। যাহা ছিল, তাহা আছে ও থাকিবে; যাহা অনিত্য, তাহা ছিল না, বর্ত্তমানেও নাই, কেবল মায়ার দ্বারা ঐন্দ্রজালিক বিদ্যমানতা অনুভূত হয় মাত্র, সুতরাং তাহা ভবিষ্যতেও থাকিবার নহে।

"নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ
উভয়োরপি দৃষ্টোঽন্তস্ত্বনয়োস্তত্ত্বদর্শিভিঃ॥"(গীতা)
নাহি অনিত্যের সত্ত্বা, অসত্ত্বা নিত্যের।
দেখেছেন তত্ত্বজ্ঞানী অন্ত উভয়ের॥

ভগবান স্পষ্টাক্ষরেই বলিয়াছেন যে, দেহী হত্যা ও হনন উভয়েরই অতীত।

"যএনং বেত্তি হন্তারং যশ্চৈনং মন্যতে হতম্।
উভৌ তৌ ন বিজানীত নায়ং হন্তি ন হন্যতে॥

যে ইহারে হন্তা ভাবে, যেবা ভাবে হত,
উভয়ের কেহই না জানে স্বরূপতঃ;
না করেন হত্যা ইনি, নাহি হন হত।

কথা সম্পূর্ণ সত্য; কিন্তু এসব তত্ত্ব কেবল গ্রন্থে পাঠ করিলে ফল নাই। পূর্ণোদরে ঔষধ সেবনে যেমন তাহার ক্রিয়া নিষ্ফল হয়, বি ষয়া সক্তি, দেহাত্মবুদ্ধি প্রভৃতিতে চিত্ত পূর্ণ থাকিলে, কোন তত্ত্ব-কথাই কার্য্যকরী হয় না। চিকিৎসকগণ কুপিতমলপূর্ণ উদর বিরেচন-চিকিৎসার দ্বারা নির্ম্মল করিয়া ঔষধ দিলে, তবে তাহা উপযুক্ত ক্রিয়াবান হয়। আধ্যাত্মিক চিকিৎসারও সেই প্রণালী। বৈরাগ্য-বিরেচনে চিত্ত লঘু ও নির্ম্মল হইলে, তবে তত্ত্বোপদেশ মহৌষধে ভব-ব্যাধি বিনাশের সম্ভাবনা হয়।

যদি বল গৃহীর বৈরাগ্য কিরূপে সম্ভবে? আর্য্যর্ষি বলেন,—গৃহীর বৈরাগ্যই বৈরাগ্য। না পেয়ে উপবাস, বায়ু বদলে তীর্থবাস, বেগারে গঙ্গাস্নান, অক্ষমতায় ক্ষমা-দান, এ সব যেমন বিশেষত্ব-শূন্য, গৃহাশ্রম-শূন্য সন্ন্যাসীর বৈরাগ্যও প্রায় তদ্বৎ। যাহার আয়োজন নাই, তাহার আর বিয়োজন কি? যাহার উপকরণ নাই, তাহার আর নিরাকরণ কি? অতএব গৃহীর বৈরাগ্যই বৈরাগ্য। নীতিশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে,—

"বিকারহেতৌ সতি বিক্রীয়ন্তে।
যেষাং ন চেতাংসিতয়েব ধীরাঃ॥
বিকারের হেতু সত্ত্বেও যে জন
অবিকৃত চিত্ত, সেই মহাজন॥

গৃহীর পক্ষে এই মহাজনত্ব লাভের স্বাভাবিক উপায় রহিয়াছে। জনকরাজা গৃহী ছিলেন, ধ্রুব-প্রহ্লাদ গৃহী ছিলেন, বিদুর-উদ্ধব অর্জ্জুনাদি গৃহী ছিলেন, বাণ-সুরথ-অম্বরীশ প্রভৃতি গৃহী ছিলেন, ইদানীন্তন সর্ব্বানন্দ, তুলসীদাস, রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত প্রভৃতি গৃহী ছিলেন। ঋষিগণ অনেকেই তপোবনে গৃহাশ্রমী ছিলেন। এখনই আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারি না, যে আমাদের বিষয়-সেবা বজায় রাখিয়া ধর্ম্ম-সেবা কিরূপে সম্ভবে। কেবল স্ত্রী সাজাইয়া, ছেলে পড়াইয়া, টাকা করিয়া ও পোষাক পরিয়া যদি ভব-সিন্ধু পাড়ি-দেওয়া যাইত, তবে আর ভাবনা কি ছিল? আমরা কিন্তু যেন তাই ভাবিয়াই বসিয়া আছি!

ভব-সিন্ধুপারে যেতে এখন আমাদের আর বিশেষ কিছু লাগে না; কিন্তু যখন প্রকৃত ভবসিন্ধুর গভীর গর্জ্জন 'শেষের সে দিনে' শুনা যায়, যখন শমন-সঙ্কটের বিকট বিভীষিকা ত্রিভুবন অন্ধকার করিয়া গ্রাস করিতে আসে, তখন নিরুপায়! তবে কি না 'ও পায়ে' শরণ নিতে পারিলে উপায়ের আর অভাব থাকে না; ভবসিন্ধুর দুস্তরতা বা শমন-দমনের দুষ্করতা আর উপলব্ধি হয় না। তাহলে রামপ্রসাদের সহিত সমস্বরে বলা যায়,—

"শমন! কি ভয় দেখাস্ মোরে॥
তোরে ভয় করিনে ভয়ের ভয় ঐ অভয়ার
চরণের জোরে।"

অথবা

"ছুঁওনারে শমন! আমার জাত গিয়েছে॥
আমি ছিলাম গৃহবাসী, কেলে সর্ব্বনাশী, (আমায়)
সন্ন্যাসী করেছে।"

রামপ্রসাদ কিন্তু বস্তুতঃ কখনও গৃহবাস ত্যাগ করেন নাই, কিন্তু তথাপি "কেলে সর্ব্বনাশী" তাঁহাকে অন্তরে অন্তরে সন্ন্যাসী সাজাইয়াছিল, তাই তিনি বীরদর্পে শমন-সঙ্কট অতিক্রম করিতে পারিয়াছিলেন।

ভগবদুপাসনা ব্যতীত অনিত্যাসক্তি ত্যাগ কদাচ সম্ভাবিত নহে; অনিত্যাসক্তি ত্যাগ ভিন্ন দেহাত্মবুদ্ধি বিদূরিত হয় না, এবং তাহা না হইলে, শমনের অধিকারও এড়ান যায় না।

শমনের অধিকার দেহটী লইয়া; এখন আমি যদি দেহটীতে লাগিয়া থাকি, তবে আমিও তৎসহ শমনাধিকৃত হইব, সন্দেহ নাই; অতএব দেহটীতে নির্লিপ্ত থাকিয়া, মাত্র ভগবানের অভয়চরণে সংলিপ্ত থাকিতে হইবে; তবে আর শমনের ভয় থাকিবে না।

মৃত্যু যে কিছুই নয়, উহা মানুষের কিছুই করিতে পারে না, 'মৃত্যু' বলিয়া যথার্থ একটা 'সৎ' বস্তুরই স্বভাব, উহা কাল্পনিক পদার্থ-মাত্র—একরূপ পরিবর্ত্তনের নামান্তর মাত্র, কেবল অনিত্যের অনিত্যতা-সূচক মাত্র; যাহা নাই, তাহারই না থাকা মাত্র! মৃত্যু মরাকেই মারে, জীবিতের কাছে আসিলে, মৃত্যুরই মৃত্যু উপস্থিত হয়! অতএব জীবন চাই। জগজ্জীবন শ্রীভগবানের শ্রীচরণামৃতপানেই জীবন লাভ হইবে; শমন-শঙ্কা-শোষিত সন্তপ্ত হৃদয় স্নিগ্ধ, আপ্যায়িত ও অমৃতীভূত হইবে।

শ্রীশরদিন্দু মিত্র।

পদ্যানুবাদ-মালা।

ভগবদিচ্ছায় আর্য্যশাস্ত্র-সাহিত্য-সিন্ধুর অমৃতময় গর্ভে অগণিত অমরজ্যোতিঃ রত্নরাজি ইতস্ততঃ বিকীর্ণ রহিয়াছে। যথেচ্ছা-সংগৃহীত তাহারই কতিপয় রত্ন পদ্যানুবাদ-সূত্রে গ্রথিত করিয়া, মধ্যে মধ্যে শাস্ত্র ও ধর্ম্মপিপাসুগণকে উপহার প্রদান বিশেষ বাঞ্ছনীয়।

অবিকল পদ্যানুবাদের অতীব প্রয়োজন অনুভূত হয়। ঠিক শাস্ত্রের কথাগুলি কি, ঠিক ঋষিবাক্যগুলি কি, ইহা জানা তত্ত্বজিজ্ঞাসু মাত্রেরই অত্যাবশ্যকীয়। অতএব যাঁহারা সংস্কৃত জানেন না, তাঁহাদের জন্য অবিকল অনুবাদ ভিন্ন উপায়ান্তর নাই; কিন্তু ঐ অনুবাদ পদ্যে হইলেই ঠিক প্রয়োজনানুরূপ হইতে পারে; কারণ মূল প্রায় সমস্তই পদ্যে রচিত। তত্ত্বগুলি পরিচ্ছিন্নভাবে স্মরণীয়, শিক্ষণীয় ও হৃদয়গ্রাহী করিবার জন্যই পদ্যের সৃষ্টি ও ব্যবহার। পরন্তু উহারই বিশদীকরণ ও বোধ-পরিপাক-যোগ্যতা-সাধন জন্যই গদ্য ব্যবহৃত হয়। পদ্য-গ্রথিত তত্ত্বের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণেই গদ্যের স্বাভাবিক উপযোগিতা।

পদ্যের গদ্যানুবাদগুলি বাঙ্গলাভাষায় সচরাচর যেরূপ হইয়া থাকে, তাহাকে "বঙ্গানুবাদ" না বলিয়া বরং "বাঙ্গালা ভাষ্য" বলিলেই যেন অধিকতর সঙ্গত হয়। অনুবাদক প্রায়ই (গদ্যের কতকটা স্বাভাবিক শক্তিতেও বাধ্য হইয়া) গদ্যানুবাদে অল্পাধিক স্বকৃত ব্যাখ্যার প্রক্ষেপ মিশাইয়া, মূলবিষয়টি বিবৃত ও প্রকাশিত করিয়া থাকেন। এই কারণেই ঠিক ঋষিবাক্য—ঠিক আর্য্যগ্রন্থকার-লেখনী-নির্গত কথাগুলি কি, তাহা সংস্কৃতানভিজ্ঞ জিজ্ঞাসুজনের জানিতে হইলে, অবিকল পদ্যানুবাদই উহার অনন্যউপায়। ইহাতেই ঠিক বিমুক্ত-বল্কল সদ্য ফলটির ন্যায় সংস্কৃত ব্যাকরণের সন্ধি-বিভক্ত্যাদি-রচিত একখানি সূক্ষ্মস্তরমাত্র মুক্ত হইয়াই বিষয়টি প্রকাশ পায়। ইহাই পদ্যানুবাদের প্রধান প্রয়োজন; তদ্ভিন্ন ভাষার সার-সম্পাদন—পুষ্টিসাধনেরও ইহা প্রকৃষ্ট উপায়। শাস্ত্রীয় তত্ত্বার্থী সংস্কৃতানভিজ্ঞগণের সারস্বতসাধনায় ইহাই স্বাভাবিক সাহায্যকারী, তৎপক্ষে সন্দেহ নাই। অপিচ, সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণের পক্ষেও ইহা উপকারী ও আনন্দজনক।

"পদ্যানুবাদ-মালা" গ্রন্থনের উদ্দেশ্য

সংক্ষেপে নিবেদন করিলাম। ইহাতে ক্রমে সংস্কৃত শাস্ত্র-সাহিত্য-কল্প-ভাঁণ্ডারের বিবিধ স্তব, স্তুতি, ধ্যান, বর্ণনা, বিধি, ব্যবস্থা এবং বিবিধ প্রয়োজনীয় তত্ত্বের সার, সিদ্ধান্ত, উপদেশ ইত্যাদি সমস্ত আবশ্যক-বিষয়েরই যথাসাধ্য অনুরূপ পদ্যানুবাদ প্রকাশিত হইবে। ভরসা করি, কবি, পণ্ডিত ও শাস্ত্ররসজ্ঞগণের সাহায্যে এই "পদ্যানুবাদমালার" গ্রন্থন-গতি অব্যাহত থাকিতে পারিবে। এবিষয়ে আমাদের প্রধান গৌরব ও ভরসাস্থল পণ্ডিত-মণ্ডলীর কৃপাশীর্ব্বাদ ও সানুগ্রহ-সাহায্য বিশেষ প্রার্থনীয়।

আমরা প্রথমেই দেবদেব ভূতপতি শিবের প্রতি শৈবকুল-শিরোরত্ন শ্রীমৎ পুষ্পদন্তকৃত স্তোত্ররাজ "মহিম্নস্তোত্রের" পদ্যানুবাদ প্রকাশ করিলাম। এই স্তোত্রের অনুরূপ পদ্যানুবাদ-কার্য্যটি আমাদের নিকট বড়ই কঠিন বোধ হইয়াছে; তথাপি, এতদ্দ্বারা সংস্কৃতানভিজ্ঞ ভগবদ্ভক্তজন এমন বস্তুটির প্রকৃত সত্ত্বার যদি কিঞ্চিন্মাত্রও. রসাস্বাদন করিতে পারেন, এই আশায়, শিব-কৃপা-ভরসায় এ চেষ্টা করিয়াছি।

মহিম্নস্তোত্র।

(পদ্যানুবাদ)

অপার তোমার মহিমার পার,
নাহি পায় স্তুতি অজ্ঞান জনার।
ব্রহ্মা আদি দেব করে যেই স্তব,
তাহাও তোমাতে পায় পরাভব।
সকলেই স্বীয় বুদ্ধি-সাধ্যমত,
স্তব করি তব নহে নিন্দাস্পদ।
অতএব হর! স্তবনে তোমার,
অপবাদ-হীন এ চেষ্টা আমার ॥ ১ ॥
বাক্য ও মনের প্রাপ্তি-পথ-সীমা,
করে অতিক্রম তোমার মহিমা!
ভয়ে ভয়ে বেদ কহে কথা যাঁর,
কে হবে সমর্থ ভবে স্তবে তাঁর?
কতই যে-গুণ তাঁহাতে সম্ভব,
কাহার জ্ঞানের বিষয় সে সব?
দেখি লীলা-রূপে সগুণ-মূরতি,
কে না মজে মনে—কে না করে স্তুতি? ॥২॥
হে ব্রহ্মন্! সুরসিত সুধাসার
বাক্যের স্বয়ম্ তুমিই আধার!
সুর-গুরু-কৃত স্তবেতেও তাই,
বিস্ময়-বিষয় কিছুই যে নাই।
করি তব গুণ-কীর্ত্তন-কথন,
লভি পুণ্য তাহে হে পুর-মথন!
সে পুণ্যে পাইতে বাক্য-পবিত্রতা,
তব এ স্তবনে বুদ্ধি মম রতা ॥ ৩ ॥
হে বরদ! তব ত্রিগুণ-সম্ভব-
ত্রিমূর্ত্তি-গ্রহণ-ফলে,
জগতের হয় সৃষ্টি-স্থিতি-লয়,
তোমারি ঐশ্বর্য্য-বলে।
বেদ-ব্যক্ত সেই ঐশীশক্তিকেই
নিন্দে মূঢ়মতিগণ;
অসাধুরা তায় আনন্দই পায়,
নিরানন্দ সাধুজন ॥ ৪ ॥
কিসে কি চেষ্টায়, ধরি কি উপায়,
অবলম্বি কি আধার,
কি দেহ ধারণে, কি উপকরণে,
ঈশ-সৃষ্ট এ সংসার?

মূঢ়মতি মূর্খ, করে এ কুতর্ক,
জগৎ মজাতে মোহে ;
হেন তর্ক ছার, মাহাত্ম্যে তোমার,
অতি উপেক্ষিত রহে ॥ ৫ ॥
এই সাবয়ব ভূলোকাদি সব
অসৃষ্ট কি হতে পারে ?
বিনা সৃষ্টিকর, সৃষ্ট চরাচর,
সম্ভাবিত কিপ্রকারে ?
বিনা ভব-ধব, এ ভব-উদ্ভব
কদাচ সম্ভব নয় ;
হে অমরবর ! নির্ব্বোধ নিকর
তোমাতে সন্দিগ্ধ রয়। ৬ ॥
বেদ, সাংখ্য, যোগ, তথা শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণবাদি
নানা মতে "এই সত্য—এই পথ্য" ইতি বাদী-
রুচি-ভেদে ঋজু বক্র-নানাপথ-পথিকের
এক তুমি গম্যস্থান, সিন্ধু যথা নদীদের ॥ ৭ ॥
হে বরদ ! ফণি, মুণ্ড, খট্টাঙ্গ, ভস্ম, বৃষভ,
অজিন, পরশু মাত্র ব্যবহার্য্য বস্তু তব ;
কিন্তু সুর-সম্পদাদি তোমারি ভ্রূভঙ্গিমায় !
অবিমুগ্ধ আত্মারাম বিষয়-মৃগতৃষায় ॥ ৮ ॥
কেহ কন বিশ্ব 'নিত্য', কেহবা কন 'অনিত্য',
'নিত্যানিত্যে মিশ্র' কেহ কন ;
এ সকল মত-ভেদে বিমোহিত বিস্ময়েতে
হই আমি, হে পুর-মথন !
তবু তব স্তবে মম লজ্জা নাহি হয় ;
ধৃষ্টা মুখরতা মম অনুভূতা নয় ॥ ৯ ॥
ব্রহ্মা-বিষ্ণু দুইজন জানিতে অক্ষম হন
আদি-অন্ত মহিমার তব।
তুমি জ্যোতির্মূর্ত্তিমান ! হয়ে ভক্তি-শ্রদ্ধাবান,
বিধি-বিষ্ণু করিলা যে স্তব,
তাহে তুমি তাঁহাদিগে দিলা দরশন ;
নিষ্ফল তোমার সেবা না হয় কখন ॥ ১০ ॥
হেলায় ত্রিলোক জিনিল রাবণ,
স্থাপিল অশত্রু-একাধিপত্য ;
করিল যে বাহু বিংশতি ধারণ,
রণোৎসুক—শত্রু-মথন-মত্ত !
হে ত্রিপুর হর ! শির-পদ্মদলে
পাদপদ্ম তব পূজিল রাবণ ;
তোমাতে অচলা ভকতির বলে
এহেন প্রভাব করিল ধারণ ॥ ১১ ॥
তোমারি সাধন-সুসিদ্ধ-বিক্রমে
তোমারি কৈলাসে বাড়া'ল হাত !
তোমারি অলস-অঙ্গুষ্ঠ-তাড়নে
সশরীরে হ'ল পাতাল-সাৎ !
তাতেও তিষ্ঠিতে নারিল রাবণ ;
দুর্জ্জনের হয় বিবৃদ্ধি যদি,
পায় পরিণামে দুর্গতি এমন,
মোহ-মদ-মত্ত হইয়া অতি ॥ ১২ ॥
হে বরদ ! বাণ করিল অধীন
স্বীয় পরিবার সম ত্রিসংসার !
উচ্চ ইন্দ্র-পদ করিল সে হীন ;
কিছুই বিচিত্র নহেত ইহার।
যেহেতু তোমার পদযুগে সদা
পূজা-পরায়ণ ছিল সে বাণ ;
তব ও শ্রীপদে নোঙাইলে মাথা,
কেবা নাহি হয় উন্নতিমান ? ॥ ১৩ ॥
অকাল-ব্রহ্মাণ্ডক্ষয়- ভীত-সুরাসুর চয় !
তাসবে হইয়ে কৃপাবান,
জগৎ রক্ষিতে মন— ওহে দেব ত্রিলোচন !
কালকূট করেছিলে পান !
অহো ! তব কণ্ঠে কিবা তাহারি নীলিমা-বিভা !
তাহে কিবা শোভার সঞ্চার !
ভুবন-ভয়-ভঞ্জন করিছেন যেই জন,
বিকারেও গৌরব তাঁহার ! ১৪ ॥
সুরাসুর-নর-প্রতি অব্যর্থ বিজয়ী অতি
ভবে যার শর-সঞ্চালন,
সেইত মদন হায় ! ভাবিয়াছিল তোমায়
ইতর-দেবতা-সাধারণ !

তাই তার মনোময় তনু মাত্র হ'ল সার!
জিতেন্দ্রিয়ে তুচ্ছিলে না অমঙ্গল হয় কার?॥১৫॥

জগৎ রক্ষার্থ তব তাণ্ডব-নৃত্য কেবল;
তব ও চরণাঘাতে টলমল ভূমণ্ডল!
ভীমভুজ-সন্তাড়ন! ঊর্দ্ধ-জট আস্ফালন!
আকাশের প্রান্তে লাগে আঘাত সে'দাপে!
আহত ব্যাহত হয়ে গ্রহগণ কাঁপে!
প্রভো! তব জগতে যে প্রভুত্ব প্রকটে,
হয় তাহা এইরূপ বিপরীত বটে!॥ ১৬।

দিগন্তব্যাপী যে প্রবাহ গঙ্গার,
তারাপুঞ্জ-জ্যোতি-ফেণ-পুঞ্জ যার;
বারিধি-বেষ্টিত দ্বীপ এ জগৎ—
সৃষ্ট তব শিরে—দৃষ্ট বিন্দুবৎ!
এ হতেই আহা হয় হে নিশ্চয়,
তব দিব্যবপু-মহিমা-নির্ণয়।॥ ১৭॥

পৃথ্বী রথরূপা, বিরিঞ্চি সারথী;
চন্দ্র-সূর্য্য তাহে দুইচক্র-গতি,
সুমেরু ধনুক, স্বয়ং বিষ্ণু বাণ,
ত্রিপুর-তৃণের দহন-বিধান!
এত আড়ম্বরে কিবা প্রয়োজন?
প্রভু-ইচ্ছাতেই সর্ব্ব-সংসাধন!॥ ১৮॥

সহস্র কমলে ও পদ-কমলে
রত হরি অর্চ্চনায়;
কমিল তাহার একটি কমল,
অমনি আপন নয়ন-কমল
উৎপাটন করি আপনি শ্রীহরি
উৎসর্গিলা তব পায়!
সে ভক্তির ফলে তিনি সুদর্শনচক্র পান,
যে চক্র জাগ্রত সদা ত্রিলোক করিতে ত্রাণ॥১৯॥

সমাপিত যজ্ঞ করিতে ফলিত,
হে পুরুষ! তুমি আছ জাগরিত।
অর্চ্চনা তোমার বিনা কোথা কা'র
হত যজ্ঞে ফল ধরে?
ফল প্রদানেতে প্রতিভূ তোমাকে
এই জন্য ঠিক জানিয়াই লোকে
বেদে ভক্তিমান, বৈধক্রিয়াবান,
দৃঢ়বদ্ধ পরিকরে॥ ২০॥

ক্রিয়া-দক্ষ দক্ষ যজমান যথা,
যজ্ঞেশ্বর যথা আপনি বিধাতা,
যাহে ঋষি যত পৌরহিত্যে রত,
সদস্য সুর নিচয়;
যজ্ঞ-ফল-দানে তুমিই নিবৃত,
তাই হেন যজ্ঞ তোমাহতে হত!
অশ্রদ্ধায় কৃত যজ্ঞ সুনিশ্চিত
"অভিচার"-রূপী হয়।॥ ২১॥

মোহে মৃগরূপা-কন্যা-অনুগতি
করেছিলা মৃগরূপে প্রজাপতি;
তুমি ব্যাধ প্রায় তাড়াইলে তাঁয়,
ধনুর্ব্বাণ ধরি হাতে;
তব শরাঘাতে হয়ে সম্পীড়িত,
হইলেন স্বর্গপুরে পলায়িত;
তিনি যে তথাপি অমুক্ত অদ্যাপি
মৃগ-ব্যাধ-ভাবনাতে!॥ ২২॥

স্বলাবণ্য-বলে জিনিতে তোমারে,
হে বরদ! সেই পুষ্পায়ুধ-মারে,
আপন সম্মুখে দগ্ধ হতে দেখে
তখনি তৃণের ন্যায়,
হয়ে দেবী যম-নিয়ম-ধারিণী,
(তপস্যায়) তব দেহার্দ্ধ-ভাগিনী!
হে পুরমথন! মুগ্ধা নারীগণ
"স্ত্রীজিত" বলে তোমায়!॥ ২৩॥

শ্মশানেতে তব ক্রীড়া স্মরহর!
সহচর তব পিশাচ নিকর;
চিতাভস্ম তব অঙ্গ-আলেপন,
নৃমুণ্ডাস্থিমালা কণ্ঠেতে ধারণ!
হোক্ অমঙ্গল্য তব ব্যবহার,
স্মরে যারা (শিব) নামটি তোমার,

তাদের পরমমঙ্গল-বিধাতা
তুমিই ত হও, ওহে বরদাতা! ॥ ২৪ ॥
বৈধ প্রাণায়ামে প্রাণ নিরোধিয়া,
আত্মায় মনের সমাধি সাধিয়া,
আনন্দ-আবেগে অঙ্গ লোমাঞ্চিত,
আনন্দাশ্রু-ধারা নয়নে নিঃসৃত,
অমৃতের হ্রদে মগ্ন যোগীগণ
যে তত্ত্ব অন্তরে করি নিরীক্ষণ,
অনন্ত আহ্লাদে আপ্লুত-হৃদয়,
সে পরমতত্ত্ব তুমিই নিশ্চয় ॥ ২৫ ॥
তুমি হও সূর্য্য, তুমি শশধর,
তুমি হে পবন, তুমি বৈশ্বানর,
তুমি হও জল, তুমি হও ভূমি,
তুমি হে আকাশ, আত্মারূপী তুমি;
এইরূপে বাক্যে করি সীমাবদ্ধ,
প্রাচীন ঋষিরা কন তব তত্ত্ব;
কিন্তু এ বিশ্বের কি যে তুমি নয়,
তাহাই আমরা বুঝিনা নিশ্চয় ॥ ২৬ ॥
ঋক্ আদি তিন বেদ, তিনটি বৃত্তির ভেদ,
তিন লোক, তিন দেব আর—
অকারাদি বর্ণ তিন— স্বরূপে বিকারহীন,
একে তিন বিকাশ তোমার।
চতুর্থ সত্ত্বার তব সূক্ষ্মরূপ-অনুভব
নাদ-যোগে সাধিত সর্ব্বথা;
সমষ্টি ও ব্যষ্টি মতে, তুমিই প্রণব-পদে
প্রকাশিত হে আশ্রয়দাতা! ॥ ২৭ ॥
ভব, সর্ব্ব, রুদ্র, পশুপতি, উগ্র,
মহাদেব, ভীমেশান,
তব অভিধান, এই অষ্ট নাম,
বেদেও আছে প্রমাণ।
বাঞ্ছিতার্থ ফল লভিতে কেবল,
সাধনা করিয়া সার,
তেজরূপী সেই এই তোমাকেই
করি দেব! নমস্কার ॥ ২৮ ॥

নমো নিকটস্থ! নমো হে দূরস্থ!
বন-প্রিয়! নমোনমঃ।
ত্রিলোচন! নমঃ, নমো বৃদ্ধতম!
নমোনমঃ যুবতম!
নমো ক্ষুদ্রতম! নমো বৃহত্তম!
নমস্তে স্মর-সংহার!
নমঃ সর্ব্বস্থিত! নমঃ সর্ব্বাতীত!
নমস্কার! নমস্কার! ॥ ২৯ ॥
রজোগুণাধিক্যে তুমি বিশ্বসৃষ্টিকার,
হে ভব! উদ্দেশে তব করি নমস্কার।
জন-সুখ-সঞ্চারণ-সত্ত্বগুণ ধরি,
হে মৃড়! পালিছ সৃষ্টি, নমস্কার করি।
তীব্রতমোগুণ-সঙ্গে করিছ সংহার;
হর হে! ধর হে মম পুনঃ নমস্কার।
ত্রিগুণ-অতীত-মহজ্জ্যোতির আধার-
পরব্রহ্ম শিব! নমস্কার! নমস্কার! ॥ ৩০ ॥
কোথায় বা ক্ষীণ-সত্ত্ব দীন চিত্ত এই,
কোথা তব গুণাতীত নিত্য সত্ত্ব সেই?
এই ভয়ে ভীত হিয়া, তবু মোরে প্রবর্ত্তিয়া,
হে বরদ! ভকতি আমার—
গাঁথি বাক্য-পুষ্পহার, প্রদানিল উপহার,
শ্রীচরণ-যুগলে তোমার। ॥ ৩১ ॥
হে ঈশ্বর!
নীলগিরি মসী হয়, সিন্ধু মসী-পাত্র,
লেখনী সুরতরুর শ্রেষ্ঠ শাখা তত্র;
পত্র হয় পৃথ্বী যদি, আপনি শ্রীসরস্বতী
লেখিকা হইয়া সর্ব্বকাল লিখে যান,
তথাপি তব গুণের অন্ত নাহি পান! ॥ ৩২ ॥

—

'পুষ্প দন্ত' নামা সর্ব্বগন্ধর্ব্ব-ঈশ্বর,
দেবদেব-শিশুশশিশেখর-কিঙ্কর,
শিবেরে করিয়া রুষ্ট, তাহে হয়ে রাজ্যভ্রষ্ট,
বর্ণিবারে পরে শিব-মহিমা-বৈভব,
করিলেন অতিদিব্য এ "মহিম্নস্তব"।

স্বর্গ-মোক্ষ-হেতু সেই সুর-গুরু হরে
পূজি করযোড়ে যেবা একান্ত অন্তরে
পড়ে এ অমোঘ স্তব—পুষ্পদন্ত-কৃত,
হয় সে কিন্নর-স্তুত—রয় শিবাশ্রিত।

শ্রীপুষ্পদন্তের মুখ-পঙ্কজ-নিঃসৃত
এই স্তবে হরে পাপ, হর হন প্রীত।
হলে কণ্ঠে ধৃত, গৃহে স্থিত বা পঠিত,
ভূতেশ মহেশ তাহে হন মহাপ্রীত॥

শ্রীশরদিন্দু মিত্র

(সমাপ্ত)

জ্যোতিষ-তত্ত্ব।

জ্যোতিষ দুই ভাগে বিভক্ত, যথা—গণিত-জ্যোতিষ ও ফলিত জ্যোতিষ (Astronomy and Astrology)। গণিত জ্যোতিষ পাশ্চাত্য পণ্ডিত সমাজে স্বীকৃত, অনুমোদিত এবং প্রমাণ-সিদ্ধ, কিন্তু ফলিত জ্যোতিষ পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণ বিন্দুমাত্র বিশ্বাস করেন না। প্রকৃত-পক্ষে দেহতত্ত্বের (Physiology) সহিত মনস্তত্ত্বের (Psycology) যেরূপ সম্বন্ধ, গণিত-জ্যোতিষের সহিত ফলিত-জ্যোতিষের সেইরূপ সম্বন্ধ।

ইতিপূর্ব্বে বহুবার কথিত হইয়াছে যে, সৌরজগতস্থ গ্রহগণে যে যে বস্তু বা শক্তি আছে, মানবে তাহা সমস্তই আছে। মানব সৌরজগতের ক্ষুদ্র প্রতিকৃতি। হিন্দুশাস্ত্রমতে গ্রহ নয়টী বা নবগ্রহ, কিন্তু নাক্ষত্রিক দশা গণনাকালে বঙ্গদেশে আটটী গ্রহ ধরা হয়। ঐ আটটী গ্রহের মধ্যে সূর্য্য গ্রহগণের কেন্দ্র-স্বরূপ, সূর্য্য ভিন্ন সাতটী গ্রহ গণনীয়। ঐ সাতটী গ্রহের আধ্যাত্মিক শক্তির সহিত মানবের মূলাধার হইতে সহস্রার পর্য্যন্ত সাতটী চক্রের সৌসাদৃশ্য ও সামঞ্জস্য আছে। যাহা হউক, এক্ষণে শারীরিক ও মানসিকবৃত্তির সহিত ঐ গ্রহগণের সম্বন্ধ নির্ণয় এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। যেমন প্রকৃতির অন্তর-রাজ্যে মূলশক্তি দুই জাতীয়,—চিচ্ছক্তি ও জড়শক্তি, সেইরূপ বাহ্য-জগতেও সম ও বিষম (Possative & Negative) দুই জাতীয় তড়িৎশক্তি আছে। ঐ শক্তির ক্রিয়া দুই প্রকার যথা—আকর্ষণ ও বিক্ষেপণ (Attraction & Repulsion)। ঐ শক্তিদ্বয় ও তাহার আকর্ষণ, বিক্ষেপণ এবং প্রবৃত্তি ও উদ্যম হইতে যেমন মানবের অন্তর্বৃত্তি উৎপন্ন হইয়াছে, সেইরূপ উহা হইতে সমস্ত বাহ্যবস্তুও উৎপন্ন হইয়াছে। অঙ্গার (Carbon), যবক্ষার জান (Nitrogen), জলজান (Hydrogen), অম্লজান (Oxygen), লবণ (Salt), গন্ধক (Sulphur), প্রভৃতি অনেক গুলি উপাদান শারীরিক ও মানসিকশক্তি বা বৃত্তিবিশেষের পোষক বা হ্রাসক। যবক্ষার-জানদ্বারা ক্রোধবৃত্তিসমতা, লবণদ্বারা কাম-ক্রোধের উদ্দীপন হয়, এইজন্য যোগীগণ যবক্ষার-জান ব্যবহার করেন ও লবণ স্পর্শ করেন না। আবার অম্লজান ও গন্ধকদ্বারা যে জীবনীশক্তি বর্দ্ধিত হয়, ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত, এমন কি—অম্লজান ব্যতীত কোন জীব অল্প সময় মাত্রও জীবন ধারণ করিতে পারে না। গন্ধক ও অম্লজান যে উত্তেজক গুণবিশিষ্ট, তাহা ইহাদ্বারা প্রমাণীকৃত হইল। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, জড়জগৎ বা জড়বস্তুর মধ্যে উদ্যম ও প্রবৃত্তি

দেখিতে পাই, তাহাই অনুভূতি (Feeling) সম্মিলনে, জীবজগতের ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তি ও ক্রিয়া-শক্তিতে পরিণত হয়। অতএব অম্লজান ও গন্ধক কেবল শারীরিকশক্তি ও তেজবর্দ্ধক নহে, বাসনা ও তজ্জাত বৃত্তি অর্থাৎ কাম, ক্রোধ, লোভ, অহঙ্কার, প্রভৃতি বৃত্তির পোষক, জলজান ও যবক্ষারজান উহার বিপরীত গুণ-বিশিষ্ট, কিন্তু উহা শারীরিক অনিষ্টকারক নহে। উহাদ্বারা বাসনা ও কাম-ক্রোধ প্রভৃতি খর্ব্ব হওয়ায়, তদ্‌বিপরীত গুণবিশিষ্ট ধৃতি, ক্ষমা, শম, দম প্রভৃতি বৃত্তি বিকাশিত হয়। যাহা হউক, ঐ সকল উপাদানের মধ্যে পরস্পরের সংযোগ-বিয়োগ হইতে শরীরের এবং মনের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা সংঘটিত ও সদসৎ ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তি উদ্দীপিত হয়। শরীরের সহিত মনের এবং বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির যে বিশেষ সম্বন্ধ, তাহা পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রবন্ধে বর্ণিত হইয়াছে ; পুনর্ব্বর্ণন অনাবশ্যক। বিশেষ বিশেষ খাদ্য ভক্ষণ ও ঘ্রাণ প্রভৃতিদ্বারা যে বৃত্তিবিশেষ উত্তেজিত হয়, তাহা বোধ হয় সকলেই স্বীকার করিবেন। শ্বাস-প্রশ্বাসের তারতম্যে রেচক, পূরক, কুম্ভক প্রভৃতি প্রাণায়ামদ্বারা যোগিগণ যে অনাসক্ত ও ধারণাশক্তিসম্পন্ন হন, তাহাও ঐ যবক্ষারজান প্রভৃতি গ্রহণ, উপভোগ ও সামঞ্জস্যের ফলস্বরূপ। সৌরজগতস্থ গ্রহগণে সম ও বিষম জাতীয় তড়িৎ, আকর্ষণ ও বিক্ষেপণ এবং উদ্যম, প্রবৃত্তি সমস্তই আছে ; সুতরাং অম্লজান, যবক্ষারজান ও জলজান প্রভৃতি আবিষ্কৃত ও অনাবিষ্কৃত বহুবিধ উপাদান ঐ সকল গ্রহে বিদ্যমান রহিয়াছে ; তবে এক এক গ্রহে এক এক শক্তি বিশেষের ন্যূনাধিক্য আছে, যেহেতু সকল গ্রহ একরূপ উপাদানে নির্ম্মিত নহে। যেমন বৎসর, অয়ন, ঋতু, মাস, বার, তিথি, গ্রহণ প্রভৃতি গণনা জন্য সূর্য্য, পৃথিবী, চন্দ্র ও অন্যান্য গ্রহগণের স্থিতি, গতি, স্থান, দূরত্ব, সময়, পরিমাণ নির্ণয়ার্থে জ্যোতির্ব্বিদগণ গণিত-জ্যোতিষ (Astronomy) সৃষ্টি করিয়াছেন এবং বিষুব-রেখা (Equator) উষ্ণপ্রধান দেশ (Torrid Zone) দুইটী নাতিশীতোষ্ণপ্রদেশ (Two Temperate Zones) দুইটী শীত-প্রধান দেশ (Two Frigid Zones) রাশিচক্রের মধ্য-রেখার ক্রান্তিপাত (Ecliptic) প্রভৃতি বহুবিধ তত্ত্ব আবিষ্কৃত হওয়ায় গণিত-জ্যোতিষের অপেক্ষাকৃত উন্নতি সাধিত হইয়াছে। সেইরূপ আর্য্যঋষিগণ গ্রহতত্ত্ব ও গ্রহশক্তির সহিত মানব-প্রকৃতির সম্বন্ধ, শারীরিক ও মানসিক শুভাশুভ ফল নির্ণয় জন্য সৌর জগতের সীমান্ত-স্থান (Space) (ক) দ্বাদশ ভাগে বিভক্ত করিয়া, দ্বাদশটী রাশি অবধারণ এবং তদপেক্ষা সূক্ষ্ম ফল নির্ণয় জন্য প্রত্যেক রাশি ৩০ অংশে বিভক্ত করিয়া, প্রত্যেক রাশি ও তাহার প্রত্যেক অংশে গ্রহগণের গতি, স্থিতি ও সময়-নির্ণয় এবং গ্রহস্ফুট গণনা প্রভৃতি দ্বারা ফলিত-জ্যোতিষ-শাস্ত্র প্রণয়ন ও প্রচার করিয়া গিয়াছেন। কোন কোন মতে সূর্য্যের, কোন কোন মতে পৃথিবীর দ্বাদশটী রাশি ভ্রমণপূর্ব্বক একবার সূর্য্যমণ্ডল বেষ্টনের নাম বার্ষিক গতি বা এক বর্ষ এবং এক এক রাশি অতিক্রমে এক এক মাস ও এক এক কলা বা অংশ অতিক্রমে এক দিবারাত্র হয়। পৃথিবী কোন নির্দ্দিষ্ট রাশির নির্দ্দিষ্ট কলা বা অংশে অবস্থান করিয়া একবার স্বীয় দেহ আবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে সেই অংশ বা কলা অতিক্রম করে, উহারই নাম দিবারাত্র। যদিও পৃথিবী এক দিবারাত্রে

(ক) যত দূর সূর্য্যের আকর্ষণশক্তি বিস্তৃত, তাহাই সৌরজগতের সীমান্তস্থান।

রাশির একাংশের মধ্যে অবস্থান করে বটে, কিন্তু ঐ একাংশে অবস্থান করিয়া স্বীয় দেহ আবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে প্রতি দুই ঘণ্টায় এক এক রাশির সমসূত্রবর্ত্তী হয়; এইরূপে ক্রমে পরপর ১২টী রাশির সমসূত্রবর্ত্তী বা দৃষ্টিগোচরীভূত হইয়া আহ্নিক গতি বা এক দিবারাত্র অন্তে তৎপর দিন প্রত্যুষে তৎপরবর্ত্তী কলা বা অংশে গমন ও অবস্থান করিয়া, পূর্ব্ববৎ ২৪ ঘণ্টায় ক্রমিক ১২টী রাশির দৃষ্টি অতিক্রম করে। পৃথিবী যে রাশির সমসূত্রে—অর্থাৎ দৃষ্টিগোচর কালে যে ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করে, সে সেই রাশি এবং সেই রাশিতে যে যে গ্রহ অবস্থান করে, সেই সেই গ্রহের লগ্ন প্রাপ্ত হয়; সেই জন্মস্থ রাশিই তাহার প্রথম লগ্নস্থান। সেই রাশি হইতে ক্রমিক পরবর্ত্তী রাশি সকল গণনা আরম্ভ হয়, যথা—প্রথম জন্মস্থ রাশি লগ্ন, তৎপর দ্বিতীয় রাশিতে ধন, তৃতীয়ে ভ্রাতা, চতুর্থে বন্ধু, পঞ্চমে পুত্র, বিদ্যা, ষষ্ঠে শত্রু, সপ্তমে জায়া, অষ্টমে মৃত্যু, নবমে ধর্ম্ম, দশমে কর্ম্ম, একাদশে আয় ও দ্বাদশে ব্যয়। অতএব জন্মকালীন লগ্ন, ধন, ভ্রাতৃ, বন্ধু, পুত্র প্রভৃতি স্থানে যে গ্রহ বা যে যে গ্রহ অবস্থান করিবেক, সেই সেই গ্রহের শক্তি, গুণ ও প্রকৃতি অনুসারে মানবের সাধারণতঃ ধন, ভ্রাতৃ, বন্ধু, পুত্র, জায়া প্রভৃতি সম্বন্ধে শুভাশুভ নির্ণীত হইবেক; কিন্তু সূক্ষ্ম বা স্ফুট গণনায় কেবল এক এক রাশিতে গ্রহের অবস্থান নির্ণয় দ্বারা ঐ গণনার ইপ্সিত ফল লাভ হয় না। কোন্ রাশির কত অংশে বা কলায় কোন্ সময় কোন্ গ্রহ অবস্থান করে, তাহাই নির্ণয়দ্বারা সূক্ষ্ম বা স্ফুট গণনা সম্পন্ন হয়।

(নাক্ষত্রিক, স্থূল, অন্তঃ ও প্রত্যন্তর্দশা প্রভৃতির বিবরণ)

এক এক রাশি ২১/৪ অংশে বিভক্ত, অর্থাৎ এক এক রাশির সীমান্তর্গত ঊর্দ্ধভাগে ২১/৪ নক্ষত্রের অবস্থান; এইরূপে ১২টী রাশির ঊর্দ্ধভাগে ২৭টী নক্ষত্রের অবস্থান, ঐ এক এক নক্ষত্রের সীমান্ত স্থানে ২৭ ঘণ্টা পর্য্যন্ত যে চন্দ্র অবস্থান করেন, তদ্দ্বারা অশ্বিনী, ভরণী প্রভৃতি নক্ষত্র গণনা করা হয়। অতএব চন্দ্র ২১/৪ দিনে এক রাশি অতিক্রম করেন। এই নক্ষত্র গণনা হইতে মানবের স্থূল, অন্তঃ ও প্রত্যন্তর্দশা ও তাহার শুভাশুভ ফল নির্ণীত হয়; কিন্তু পাশ্চাত্য জ্যোতির্ব্বিদগণ পূর্ব্বোক্ত মত ২৭টী নক্ষত্রের অস্তিত্ব ও তৎসহ চন্দ্র ও পৃথিবীর সংস্রব ও সম্বন্ধ আদৌ স্বীকার করেন না, সুতরাং পাশ্চাত্য জ্যোতিষে গ্রহ ভিন্ন আদৌ নক্ষত্র গণনা নাই। হিন্দুজ্যোতির্ব্বিদগণের মতে নির্দ্দিষ্ট নক্ষত্রের সীমার মধ্যে চন্দ্রের অবস্থানকালে (যাহা সচরাচর ঐ ঐ নক্ষত্রে চন্দ্রের ভোগ বলে) জন্মগ্রহণ হইতে মানবের পূর্ব্বোক্ত দশা গণনারম্ভ হয়। যেমন কৃত্তিকা, রোহিণী, মৃগশিরা নক্ষত্রে জন্মগ্রহণ করিলে রবির দশায় জন্ম হয়। বঙ্গদেশে রবি হইতে শুক্রপর্য্যন্ত ৮টী দশায় ১০৮ বৎসর পরমায়ুর ঊর্দ্ধসংখ্যা গণনা করা হইয়া থাকে, যথা রবি ৬ বৎসর, চন্দ্র ১৫ বৎসর, ইত্যাদি। এইরূপে কোন ব্যক্তি চন্দ্রের দশায় জন্মগ্রহণ করিলে, চন্দ্র হইতে রবিপর্য্যন্ত ১০৮ বৎসর গণনার পূর্ণসীমা; কিন্তু মানবের লগ্ন, দশা, গ্রহদৃষ্টি প্রভৃতি সামঞ্জস্য করিয়া পরমায়ু নির্ণীত হয়। সে মতে অধিকাংশ ব্যক্তি প্রায় ৮টী দশা অতিক্রম করিতে পারে

না, এজন্য ষড়দশার অতিরিক্ত পরমায়ু গণনা প্রায় করা হয় না; ষড়দশার মধ্যেই প্রায় মৃত্যুকাল নির্ণীত হয়। দশা গণনার নিমিত্তই চন্দ্রকর্ত্তৃক নক্ষত্রের যত অংশ ভুক্ত হওয়ার পর জন্ম হয়, জন্মকালে সেই গ্রহের দশার তত ভুক্তাংশের কাল বাদ দিতে হয়, যথা ধনিষ্ঠা, শতভিষা, পূর্ব্বভাদ্রপদ নক্ষত্রে রাহুর দশা ১২ বৎসর, কিন্তু ধনিষ্ঠা, শতভিষা নক্ষত্র সম্পূর্ণ ও পূর্ব্বভাদ্রপদের ½ অংশ গতে জন্ম হইলে, ঐ ১২ বৎসরের ভুক্তকাল ১০ বৎসর বাদ দিয়া তাহার জন্মকাল হইতে রাহুর দশা ২ বৎসর গণনা করা হইবে। ৩ বৎসর বয়সে শুক্রের দশায় পড়িবে, ইহারই নাম স্থূলদশা। ঐ স্থূলদশার অন্তর্দ্দশা অন্তঃ এবং প্রত্যন্তর্দশা গণনা করা হয়। ঐ স্থূলদশাকে পুনর্ব্বার (অষ্টম দশার কাল ১০৮ বৎসর) ১০৮ ভাগ দিয়া প্রত্যেক দশার অন্তর্দশার কাল নির্ণীত হয়, যথা রাহুর দশা ১২ বৎসরকে ১০৮ ভাগ করিয়া একাংশে যত সময় হয়, তাহার নিজরাহু ১২ চন্দ্রের ১৫ ইত্যাদি যে গ্রহের যত অংশ সেই পরিমাণকাল সেই সেই গ্রহের অন্তর্দ্দশা। আবার ঐ একগ্রহের অন্তর্দ্দশা যত বৎসর বা মাস হয়, তাহাকে আবার ঐরূপ ১০৮ অংশে বিভক্ত করিয়া পূর্ব্বোক্ত মত প্রত্যেক গ্রহের যে পরিমাণ অংশ, তাহাই লইয়া প্রত্যন্তর্দশা নির্ণীত হয়। এইরূপ ক্রমে বিভক্ত ও প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া লইয়া, প্রত্যেক সূক্ষ্ম প্রত্যন্তর্দশা দিন, দণ্ড, পল পর্য্যন্ত নির্ণীত হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত বর্ষফল, কেতু, চক্র প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন রূপ গণনা আছে। যাহাহউক ফলিতজ্যোতিষের লগ্ন, দৃষ্টি প্রভৃতির কারণ নির্ণয়াপেক্ষা নাক্ষত্রিক দশার কারণ নির্ণয় করা বড়ই কঠিন। ঐ দশা গণনার প্রকৃত মর্ম্ম যে কি, অর্থাৎ নির্দ্দিষ্ট কয়েকটী নক্ষত্রে চন্দ্রের ভোগকালে ঐরূপ এক একটী দশা (যথা কৃত্তিকা, রোহিণী, মৃগশিরা, রবির দশা, ধনিষ্ঠা, শতভিষা, পূর্ব্বভাদ্রপদে রাহুর দশা ইত্যাদি) হওয়ার কারণ কি? ঐ ঐ নক্ষত্রে চন্দ্রের ভোগকালে রবি বা রাহুর কি সম্বন্ধ, ইহা নির্ণয় করা অতীব কঠিন। উৎকৃষ্ট খ্যাতনামা জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ উহার মর্ম্মোদ্‌ঘাটন করিতে পারেন নাই। * প্রকৃতপক্ষে এই ফলিতজ্যোতিষশাস্ত্র যে মহাত্মা বা মহাত্মাগণ কর্ত্তৃক প্রণীত হইয়াছিল, তিনি বা তাঁহারা সৌরজগতের সমস্ত শক্তিতত্ত্ব এবং গ্রহদিগের ও মানবের উপাদানশক্তি ও ভিন্ন ভিন্ন গ্রহগণের, স্থিতি, গতি, দূরত্বের সহিত মানবের জন্মকালে সংস্রব ও শক্তি নির্ণয় প্রভৃতি গূঢ়তত্ত্ব সকল আবিষ্কার করিয়া কেবল তাহার ফলগুলি লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন এবং মানবের কর, পদ, ললাট, মুখাবয়ব, মস্তিষ্কের গঠন ইত্যাদি শারীরিক চিহ্ন এবং মানসিকভাব ও ক্রিয়ার লক্ষণদ্বারা ফলাফল নির্ণয়ের কতকগুলি অপেক্ষাকৃত সহজ সঙ্কেত প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। ঐ সাঙ্কেতিকবিদ্যাই আমাদের ফলিতজ্যোতিষশাস্ত্র ও সামুদ্রিক গণনা ইত্যাদি; কিন্তু ঐ আবিষ্কারকালে আবিষ্কৃত বিষয়ের গূঢ়কারণ কিছুমাত্র ব্যক্ত করেন নাই। যেন মানবজগতে ঐ গূঢ়কারণ ব্যক্ত না করাই তাঁহাদের অভিপ্রায় ছিল। কেবল জ্যোতিষ-

* ভাটপাড়া নিবাসী জনৈক জ্যোতির্ব্বিদকে আমি ঐ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করায় তিনি বহু চিন্তায় স্থির করিতে না পারিয়া অন্যান্য প্রধান জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণের সহিত ঐ বিষয়ের মীমাংসা করিয়া আমাকে তাহার মর্ম্ম বলিবেন, বলেন; তৎপর বর্ষে আমার সহিত সাক্ষাৎ হইলে তিনি সরলভাবে স্বীকার করিলেন যে, তিনি বিশেষ চেষ্টা, যত্ন ও অন্যান্য জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণের সহিত তর্কদ্বারাও নাক্ষত্রিক দশার প্রকৃত মর্ম্মোদ্‌ঘাটন করিতে পারেন নাই।

শাস্ত্র নহে, সমস্ত শাস্ত্রের অভ্যন্তরে যে গূঢ়তত্ত্ব অন্তর্নিহিত আছে, তাহা গাঢ় আবরণে আবরিত রাখা প্রাচীন ঋষিগণের যে উদ্দেশ্য ছিল, তাহা স্পষ্ট উপলব্ধি হয়। তাহার কারণ নির্ণয় আমাদের এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নহে; ফলিত-জ্যোতিষের সার মর্ম্মালোচনার নিমিত্ত আমরা এই প্রস্তাবের অবতারণা করিয়াছি।

ফলিতজ্যোতিষের প্রত্যেক ব্যাপারের পৃথক্ পৃথক্ ভাবে মর্ম্মোদ্ঘাটন ও তাহার পরস্পরের সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া সরল তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা অতীব কঠিন—অসম্ভব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কারণ প্রত্যেক গ্রহ ও তাহার উপাদান এবং শক্তি নির্ণয়ান্তে পরস্পরের মধ্যে সম ও বিষমজাতীয় শক্তি, পরস্পরের দূরত্ব ও গতি, স্থিতি অনুযায়ী অনুকূল ও প্রতিকূল শক্তির তারতম্য এবং মানবের শারীরিক ও মানসিক উপাদান ও শক্তি ও শারীরিক ও মানসিক প্রত্যেক বৃত্তি ও তাহার উদ্যম ও ক্রিয়ার সহিত গ্রহগণের প্রত্যেক ব্যাপারের সংস্রব ও সম্বন্ধ নির্ণয় এবং বাহ্য মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ সকল আবিষ্কার ও অবধারণ ব্যতীত ফলিত-জ্যোতিষের প্রত্যেক ব্যাপারের মর্ম্মোদ্ঘাটন করা যাইতে পারে না; উহা সিদ্ধ মহাত্মাগণ ব্যতীত অন্য কর্ত্তৃক সম্ভবে না। তবে ঐ ফলিত-জ্যোতিষশাস্ত্র অমূলক কিম্বা সমূলক ও তাহার সার মর্ম্ম কি, তাহা নির্ণয় করা আমাদের এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য। সংক্ষেপতঃ গ্রহশক্তি ও মানব-শক্তির মধ্যে "অনুকূল ও প্রতিকূল শক্তির সংঘর্ষণই মানবজীবন"। ঐ অনুকূল ও প্রতিকূল শক্তির ন্যূনাতিরেক ও তারতম্যানুসারে মানবের শরীর, মন, বুদ্ধি ও সমস্ত শারীরিক ও মানসিকবৃত্তি উৎপন্ন হইয়াছে। জীবনীশক্তি যে উহার সম্পূর্ণ অধীন, তাহা বলা বাহুল্য।

এক্ষণে ঐ সকল শক্তিতত্ত্ব নির্ণয়ের পূর্ব্বে জ্যোতিষের মতে সাধারণতঃ গ্রহ কয়েকটীর লক্ষণ নির্ণয় ও তাহার সহিত পৌরাণিক রহস্য-ভেদ আবশ্যক। জ্যোতিষের মতে সাধারণতঃ চন্দ্র, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র শুভগ্রহ এবং রবি, মঙ্গল, শনি, রাহু পাপগ্রহ বলিয়া গণনীয়; কিন্তু উহাদের স্থিতি, গতি, দূরত্ব প্রভৃতি পরস্পরের অবস্থা ভেদে শক্তির ন্যূনাতিরেক ও অনুকূল-প্রতিকূলতার তারতম্যানুসারে, কখন কখন উভয় শুভগ্রহ বা পাপগ্রহের মধ্যেও পরস্পরের প্রতিকূল শক্তির উদ্রেক হেতু শত্রুভাব স্থিরীকৃত হয়। যথা শতভিষানক্ষত্রে, কুম্ভ রাশিতে ও রাহুর দশায় জন্মকালীন লগ্নে চন্দ্র থাকিলে, চন্দ্রের সহিত পাপগ্রহ শনি রাহুর সমভাব, বুধ শুক্রের সহিত রাহুর মিত্রভাব হয়। আবার যে শুভগ্রহ পুত্র স্থানে ও ধ্বংস স্থানে শুভ, সেই গ্রহ হয়ত ভ্রাতৃস্থানে অশুভ হয়; কিন্তু ঐরূপ স্থলে প্রায় শুভগ্রহ স্থল বিশেষে অশুভ হইলেও ঠিক্ স্বয়ং অশুভ বলা যায় না। অন্যান্য স্থানে অন্য পাপগ্রহের সংস্রবহেতু তাহার সংঘর্ষণে অশুভত্বে পরিণত হয়। সাধারণতঃ জ্যোতিষের মতে চন্দ্র মনের অধিপতি, বৃহস্পতি বুদ্ধির অধিপতি ইত্যাদি; আবার শারীরিক সম্বন্ধে চন্দ্র জীবনীশক্তির বৃহস্পতি পুত্রের অধিপতি, রাহু ধ্বংসাধিপতি ইত্যাদি; কিন্তু স্থলবিশেষে উহাদের ক্রিয়া বিভিন্ন প্রকারেও হয়। এই স্থানে কিঞ্চিৎ পৌরাণিক বিষয় বর্ণনা করিয়া, দর্শন ও তন্ত্রশাস্ত্রোক্ত চন্দ্র এবং বৃহস্পতির গুণ এবং শক্তি-তত্ত্ব সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিব। পৌরাণিক মতে বৃহস্পতি দেবগুরু এবং দেবতাদিগের উপদেষ্টা; চলিত কথায় বলে "বুদ্ধিতে বৃহস্পতি"। শুক্রাচার্য্য অসুরদিগের গুরু এবং উপদেষ্টা; চন্দ্রে আলোক এবং অন্ধকার উভয়ই আছে। কোন কোন

পুরাণের মতে মৃত্যুন্তে মানবাত্মা পরলোক গমন ও তথায় দণ্ড বা পুরস্কারান্তে কর্ম্মফলানুসারে এই পৃথিবীতে পুনর্জ্জন্মের নিমিত্ত চন্দ্রলোকে গমন করে; তথা হইতে জীবনীশক্তি প্রাপ্ত হইয়া, ঐ শক্তি পৃথিবীতে প্রায় উদ্ভিদাদি কি ফলাদির সহিত সংমিশ্রিত হয়। ঐ উদ্ভিদ ও ফলাদি মাতা পিতা ভক্ষণ করায়, ঐ শক্তি মাতা পিতার শোণিত-শুক্রের সহিত সংমিশ্রিত হইলে, মাতা পিতার ঐ শোণিত ও শুক্রসংযোগে জীবের জন্ম হয়। এদিকে চন্দ্র ওষধিপতি; উদ্ভিদাদি চন্দ্র হইতে জীবনীশক্তি প্রাপ্ত হইয়া বর্দ্ধিত হইতে থাকে। আবার পিতৃলোক চন্দ্রের জ্যোতিতে বাস করেন, ইহা হিন্দুশাস্ত্র-সম্মত। তাত্বিক মণ্ডলীর মতে চন্দ্র জীবের ভাণ্ডার (Store of life)। একজন ইংলিসম্যান্ মিঃ সিনেট্‌কে তাহার কারণ নির্দ্দেশ ও পরিষ্কার ব্যাখ্যা করিয়া দিবার জন্য অনুরোধ করেন, তদুত্তরে তাত্বিকগণ প্রকাশ করিয়াছেন যে, তাঁহাদের উপদেষ্টা মহাত্মা এক্ষণে উপরোক্ত বিষয়টীর মর্ম্মোদ্ঘাটন করিতে অস্বীকার করিয়াছেন, (ক) যাহা হউক, তদ্বিষয়ে আলোচনা আমাদের এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নহে। চন্দ্র জীবন এবং মনের অধিপতি, রাহু ধ্বংসাধিপতি; পৌরাণিক মতে রাহু চন্দ্রকে গ্রাস করিয়া থাকেন; যদিও উহা চন্দ্রগ্রহণ অবলম্বনে বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু উহার মধ্যেও প্রাকৃতিক সত্য অন্তর্নিহিত আছে। এক মৌলিকশক্তি হইতে যে শারীরিক ও মানসিকবৃত্তি এবং শক্তি উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রবন্ধে বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে। জীবনীশক্তি হ্রাস হইলে মানসিক বলের হ্রাস হয়, ইহা প্রত্যক্ষীকৃত ও সর্ব্ববাদিসম্মত। অতএব চন্দ্র, মন ও জীবনের অধিপতি হওয়া যুক্তিবিরুদ্ধ নহে। মানবের একাধারে জীবনীশক্তি ও মানসিকবল উভয়ই আছে; চন্দ্র ঐ উভয় শক্তির ভাণ্ডার স্বরূপ হওয়া অস্বাভাবিক নহে

দেবগুরু বৃহস্পতি বুদ্ধির অধিপতি; মানবীয় সদ্বৃত্তি যে অধিকাংশ চৈতন্যের তৈজসশক্তি বা সত্বগুণসম্ভূত ও দেবজাতীয় এবং অসদ্বৃত্তি যে রাজসিক ও তামসিকশক্তিজাত ও অসুরজাতীয়, তাহা পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রবন্ধে পরিষ্কাররূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। অতএব অসদ্বৃত্তি দমন ও সদ্বৃত্তির সামঞ্জস্য-রক্ষাকর্ত্তা বৃহস্পতি, উহাই সদ্বুদ্ধি বা মহত্ব। সদ্‌বুদ্ধি সৃষ্টিকারি-শক্তির অনুকূল ভিন্ন প্রতিকূল হইতে পারে না; অতএব বৃহস্পতি পুত্রের অধিপতি হওয়া অসম্ভব নহে। যাহা হউক, জন্ম হইতে মৃত্যুপর্য্যন্ত গ্রহগণের সহিত মানবশক্তি ও বৃত্তির আদান প্রদান ও গ্রহদিগের সহিত মানবশক্তি ও বৃত্তির আকর্ষণ, বিক্ষেপণ সংশ্লেষণ, বিশ্লেষণ, পরস্পরের মধ্যে প্রবৃত্তি ও উৎসাহ ইত্যাদি লইয়াই ফলিতজ্যোতিষ। এক সময়ে অল্পাংশ শুভগ্রহ অধিকাংশ পাপগ্রহ মানবশক্তির উপর প্রবল হইলে, পাপগ্রহের মধ্যে নিধন-শক্তি, জীবনীশক্তিকে আকর্ষণ করিতে থাকে। নিধন-শক্তি জীবনীশক্তির বিষম জাতীয় সন্দেহ নাই। ঐ আকর্ষণে জীবনীশক্তি হ্রাস ও উপাদানের সামঞ্জস্যের অভাবহেতু মানব ঘোর পীড়াগ্রস্ত হইয়া পড়ে। জীবনীশক্তির অনুকূল শুভগ্রহ ঐ ধ্বংসশক্তি আকর্ষণ ও মানবের জীবনীশক্তি বিক্ষেপণ করায়, ঐ আকর্ষণ-বিক্ষেপণ ক্রিয়াহেতু ধ্বংসশক্তি কর্ত্তৃক মানবের জীবনীশক্তি সম্পূর্ণ গ্রাসিত হইবার পূর্ব্বে আর একটী জীবনীশক্তির অনুকূল শুভগ্রহ উপস্থিত হইয়া ঐ ধ্বংসশক্তিকে পূর্ণবেগে আকর্ষণ ও মানবের জীবনীশক্তি, ধ্বংস

(ক) See Five essays on Theosophy.

শক্তি হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিলে, মানব সে যাত্রা রক্ষা পায়। তদ্ভিন্ন মানবের একটী স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি আছে। যদিও ঐ স্বাধীন শক্তি মানসিকবৃত্তি ও গ্রহশক্তির অধীন হইয়া পড়ে, তথাচ মানব স্বীয় যুক্তি ও সদসদ্‌বিবেচনাদ্বারা স্বাধীনভাবে কার্য্য করিতে পারে; উহাই পুরুষকার। পুরুষকারে প্রবৃত্তি হইলে সদ্‌বৃত্তি ও শুভগ্রহ সকল তাহার অনুকূল হয়; অতএব পুরুষকারদ্বারা অনুকূলশক্তির তেজ বর্দ্ধিত হওয়ায় পাপগ্রহের প্রতিকূলশক্তির বিরুদ্ধে কার্য্য করিতে ও প্রতিকূল শক্তিকে পরাজয় করিতে সক্ষম হয়। আবার নিজকার্য্যদোষে অনুকূল-শক্তি ধ্বংস হওয়ায়, গ্রহদিগের মধ্যে প্রতিকূল গ্রহশক্তিঅধিক কার্য্যকরী হয়; এজন্য কোষ্ঠীর নির্ণীত মৃত্যুকালের পূর্ব্বে বা পরেও মৃত্যু সংঘটিত হয়। ইহকালের কর্ম্মফলদ্বারা নির্ণীত গ্রহফলের ব্যতিক্রম ও ন্যূনাতিরেক হইতে পারে। সাবিত্রীকর্তৃক সত্যবানের জীবন রক্ষা সম্বন্ধীয় উপাখ্যানের মূলে সত্য নিহিত আছে। পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফলের সহিত গ্রহাদির যে বিশেষ সম্বন্ধ, তাহাই অদৃষ্ট; তদ্ভিন্ন মানবের স্বাধীন শক্তিবলে (অবশ্যই গ্রহাদির উত্তেজনায় মনোবৃত্তি উত্তেজিত ও বুদ্ধিও তদনুরূপ হয় ও স্বাধীন শক্তি পরিচালনেও প্রতিবন্ধক হয়) ইহ জীবনের কার্য্যদ্বারা (পুরুষকারদ্বারা) যে অদৃষ্ট বা গ্রহশক্তি কথঞ্চিৎ দমিত ও প্রশমিত হইতে পারে, তাহা পূর্ব্বে কথঞ্চিৎ প্রদর্শিত হইয়াছে। যেমন পাপগ্রহকর্তৃক জীবনীশক্তি আকর্ষণকালে কিঞ্চিৎ জীবনীশক্তি থাকিতে শুভগ্রহ উপস্থিত হইয়া পাপগ্রহকে কার্য্য হইতে বিরত করায়, যেরূপ পার্থিব ঔষধাদি ব্যবহারদ্বারা জীবনীশক্তির বৃদ্ধিহেতু অবস্থাভেদে পাপগ্রহের আকর্ষণ হইতেও মানব কচিৎ অব্যাহতি পাইতে পারে * সেইরূপ সৎক্রিয়াদ্বারা শারীরিক ও মানসিক তেজ বর্দ্ধিত ও অদৃষ্ট বা কুগ্রহ দমিত ও প্রশমিত হয়, ঐ সৎক্রিয়াই পুরুষকার; অতএব ইহ জীবনের কর্ম্মফলের সহিতও গ্রহগণের সম্বন্ধ ও সংস্রব আছে। ক্রমশঃ—

শ্রীশশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

* নিধনশক্তি কর্তৃক নির্দ্দিষ্ট যে সময় মধ্যে ষোল-আনা জীবনীশক্তি গ্রাসিত হইবে, সেই সময় জীবনী-শক্তিপূরক ঔষধাদি দ্বারা এক আনা জীবনীশক্তি বর্দ্ধিত হইলে ঐ এক আনা জীবনীশক্তি থাকিতে নির্দ্দিষ্ট সময় অতীত হওয়ায়, অথবা অনুকূল গ্রহশক্তি কর্তৃক নিধন-শক্তি বিতাড়িত বা সৎক্রিয়াদ্বারা নিধনশক্তি দমিত হইলে, ক্রমে জীবনীশক্তি পুনঃ পরিবর্দ্ধিত হয়।

আত্মানাত্মবিবেকঃ।

(পূর্ব্বতোনুবৃত্তঃ)

জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি কানি?

জ্ঞানেন্দ্রিয় সকল কি?

শ্রোত্র-ত্বক্-চক্ষু-জিহ্বা ঘ্রাণাখ্যানি (১)

শ্রবণ, ত্বক্, চক্ষু, জিহ্বা ও নাসিকা এই পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের নাম জ্ঞানেন্দ্রিয়।

(১) জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি। শ্রোত্রত্বক্ চক্ষুর্জ্জিহ্বা ঘ্রাণাখ্যানি। এতান্যাকাশাদীনাং সাত্ত্বিকাংশেভ্যো ব্যস্তেভ্যঃ পৃথক্ ক্রমেণোৎপদ্যন্তে।

বেদান্তসারে।

শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষু, জিহ্বা এবং ঘ্রাণকে জ্ঞানেন্দ্রিয় কহে। এই সকল জ্ঞানেন্দ্রিয় পৃথক্ পৃথক্ আকাশাদির সাত্ত্বিক অংশ হইতে উৎপন্ন হয়।

"তত্র বৈকারিকাদহঙ্কারাৎ তৈজসসহায়াৎ তল্লক্ষণান্যেব বৈকাদশেন্দ্রিয়াণ্যুৎপদ্যন্তে তদ্‌যথা—শ্রোত্রত্বক্ চক্ষুর্জ্জিহ্বা ঘ্রাণবাগ্ঘস্তোপস্থপায়ুপাদমনাংসীতি।"

সুশ্রুতঃ শারীরস্থানে প্রথমোঽধ্যায়ে।

তৈজস সহায়ে অহঙ্কারের বিকার হইতে সেই লক্ষণযুক্ত একাদশ ইন্দ্রিয় উৎপন্ন হইয়াছিল। তাহা এই শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষু, জিহ্বা, ঘ্রাণ, বাক্, হস্ত, উপস্থ, পায়ু, পাদ ও মন।

"তত্র পূর্ব্বাণি পঞ্চবুদ্ধীন্দ্রিয়াণি ইতরাণি পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়াণি। উভয়াত্মকং মনঃ।"

ঐ ঐ

ইহার মধ্যে পূর্ব্ব পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় ও অন্য পাঁচটি কর্ম্মেন্দ্রিয়। মন উভয়াত্মক।

"কর্ম্মেন্দ্রিয়বুদ্ধীন্দ্রিয়ৈরান্তরমেকাদশম্।"

সাংখ্যদর্শনে ২ অধ্যায়ে ১৯।

প্রবচনভাষ্যং। একাদশেন্দ্রিয়াণি দর্শয়তি। কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি বাক্‌পাণি পাদপায়ূপস্থানি পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়াণি চ চক্ষুশ্রোত্রত্বগ্রসনঘ্রাণাখ্যানি পঞ্চ। এতৈর্দ্দশভিঃ সহান্তরং মন একাদশকমেকাদশেন্দ্রিয়মিত্যর্থঃ।

একাদশ ইন্দ্রিয় প্রদর্শন করিতেছেন। বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ, এই পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও চক্ষু, শ্রোত্র, ত্বক্, রসন, ঘ্রাণ, এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়।

এই একাদশ ইন্দ্রিয়ের স্থান গোলক নহে, তাহাই কহিতেছেন।

"অতীন্দ্রিয়মিন্দ্রিয়ং ভ্রান্তানামধিষ্ঠানে।"

সাংখ্যদর্শনে ২ অঃ ২৩।

প্রবচনভাষ্যং। গোলকজাতমেবেন্দ্রিয়মিতি নাস্তিকমতমপাকরোতি। ইন্দ্রিয়ং সর্ব্বমতীন্দ্রিয়ং ন তু প্রত্যক্ষং ভ্রান্তানামেব ত্বধিষ্ঠানে গোলকে তাদাত্ম্যেনেন্দ্রিয়মিত্যর্থঃ অধিষ্ঠানমিত্যেব পাঠঃ।

নাস্তিকেরা কহিয়া থাকেন যে ইন্দ্রিয় সকল গোলকজাত, এই সূত্রে সেই মত নিরাস করিতেছেন। সকল ইন্দ্রিয়ই অতীন্দ্রিয়—প্রত্যক্ষ নহে। কেবল ভ্রান্ত মনুষ্যগণই গোলকের অধিষ্ঠানে ইন্দ্রিয় শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকেন, অর্থাৎ তাঁহারা ইন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষ স্বীকার করেন। কিন্তু মন যে ইন্দ্রিয় বলিয়া কথিত হইল, তাহা উভয়াত্মক। ইহা সুশ্রুতও বলিয়াছেন ও মহর্ষি কপিলও কহিয়াছেন, যথা—

"উভয়াত্মকং মনঃ।

সাংখ্যদর্শনে ২ অধ্যায় ২৬।

প্রবচনভাষ্যং। একস্যৈব মুখ্যেন্দ্রিয়স্য মনসোঽন্যে দশশক্তিভেদা ইত্যাহ। জ্ঞানকর্ম্মেন্দ্রিয়াত্মকং মনঃ ইত্যর্থঃ।

এক মনই মুখ্য ইন্দ্রিয়; অন্য দশবিধ ইন্দ্রিয়ই সেই মুখ্য ইন্দ্রিয়রূপী মনের বিশেষ শক্তি। এক মনই জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় এই উভয়াত্মক।

এক্ষণ দশ ইন্দ্রিয়ের কার্য্য কহিতেছেন,—

"রূপাদি রসমলান্ত উভয়োঃ।"

ঐ ২ অধ্যায়ে ২৮।

প্রবচনভাষ্যং। অন্নরসানাং মলঃ পুরীষাদিঃ। তথা রূপরসগন্ধস্পর্শশব্দাবক্তব্যাদাতব্যগন্তব্যানন্দয়িতব্যোৎস্রষ্টব্যাশ্চোভয়োর্জ্ঞান কর্ম্মেন্দ্রিয়য়োর্দ্দশবিষয়া ইত্যর্থঃ। আনন্দয়িতব্যং চোপস্থস্যোপস্থান্তরং বিষয় ইতি।

অন্নরসের মল পুরীষাদি। রূপগ্রহণাদি মল নিঃসারণপর্য্যন্ত সমুদায়ই উভয় ইন্দ্রিয়ের কার্য্য। রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ, বাক্য গ্রহণীয়, গন্তব্য, আনন্দনীয়, উৎস্রষ্টব্য,

এই কার্য্যগুলি উভয় জ্ঞান ও কর্ম্মেন্দ্রিয়ের দশটি বিষয়।

শ্রোত্রং ত্বক চক্ষুষী জিহ্বা নাসিকা চৈব পঞ্চমী।
শব্দাদীনামবাপ্ত্যর্থং বুদ্ধিযুক্তানি বক্ষ্যতে ॥"

মার্কণ্ডেয় পুরাণে ৪৫ অঃ ৫১।

শ্রোত্র, ত্বক্‌, চক্ষু, জিহ্বা, নাসিকা, এই পঞ্চ ইন্দ্রিয় বুদ্ধিযুক্ত হইয়া শব্দাদি গ্রহণ করিয়া থাকে।

ত্বক্‌ চক্ষুর্নাসিকাজিহ্বা শ্রোত্রমত্র চ পঞ্চমম্।
শব্দাদীনামবাপ্ত্যর্থং বুদ্ধিযুক্তানি বৈ দ্বিজ ॥

বিষ্ণুপুরাণে ১ম অংশে ২ অ, ৪৪।

শ্রোত্রং ত্বক্‌চক্ষুষীজিহ্বাঘ্রাণকেন্দ্রিয় পঞ্চকম্।
কর্ণাদি গোলকস্থং তচ্ছব্দাদিগ্রাহকং ক্রমাৎ।
সৌক্ষ্ম্যাৎ কার্য্যানুমেয়ং তৎ প্রায়োধাবেৎ বহির্ম্মুখম্ ॥৩

পঞ্চদশী ভূতবিবেকে।

শ্রবণ, ত্বক্‌, চক্ষু, জিহ্বা, নাসিকা, এই পঞ্চেন্দ্রিয় গোলকস্থ কর্ণাদি ক্রমান্বয়ে শব্দাদি গ্রহণ করে: এই সকল ইন্দ্রিয় অত্যন্ত সূক্ষ্ম, সুতরাং তাহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায় না; কেবল কার্য্যদ্বারা অনুমিত হয়। তাহারা প্রায়ই বাহ্যবিষয়-গ্রহণে ধাবমান হয়।

"ঘ্রাণরসনা চক্ষুত্বক্‌ শ্রোত্রাণীন্দ্রিয়াণি ভূতেভ্যঃ ॥

ন্যায়দর্শনে ১ অধ্যায়ে ১ আহ্নিকে ১২।

ঘ্রাণ, রসনা, চক্ষু, ত্বক ও শ্রোত্র ইন্দ্রিয় সকল ভূত হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। "গোলকেভ্যোঽতিরিক্তানীন্দ্রিয়াণি।"

সাংখ্যদর্শনে ৫ম অধ্যায়ে ১০৪ সূত্রভাষ্যে শ্রীবিজ্ঞানভিক্ষুঃ

ইন্দ্রিয় সকল গোলক হইতে অতিরিক্ত।

"ইন্দ্রিয়াণাং পৃথগ্‌ ভাবাদ্‌ বুদ্ধিবিক্রিয়তে হ্যতঃ।
শৃণ্বতী ভবতি শ্রোত্রং স্পৃশতী স্পর্শ উচ্যতে ॥ ৪ ॥
পশ্যতী ভবতে দৃষ্টী রসতী রসনং ভবেৎ।
জিঘ্রতী ভবতি ঘ্রাণং বুদ্ধির্বিক্রিয়তে পৃথক্‌।
ইন্দ্রিয়াণি তুতান্যাহুস্তেষ্বদৃশ্যোঽধিতিষ্ঠতি ॥ ৫ ॥"

শ্রীমহাভারতে শান্তিপর্ব্বণি ২৪৭ অধ্যায়ে।

ইন্দ্রিয়গণের পৃথক্‌ ভাববশতঃ বুদ্ধি বিকারপ্রাপ্ত হয়, তজ্জন্য বুদ্ধি যখন শ্রবণ করে, তখন শ্রোত্র, যখন স্পর্শ করে, তখন স্পর্শ, যখন দৃষ্টি করে, তখন দর্শন, যখন আস্বাদন করে, তখন রসনা, যখন আঘ্রাণ করে, তখন ঘ্রাণ বলিয়া কথিত হয়; তজ্জন্য বুদ্ধি পৃথক্‌ পৃথক্‌ ভাবে বিকৃত হইয়া থাকে; বুদ্ধির সেই বিকার সকলকে ইন্দ্রিয় কহে। বুদ্ধি তাহাতে অদৃশ্যভাবে বর্ত্তমান থাকে ॥ ৫ ॥

যদি কেবল মাংসাস্থি-নির্ম্মিত শ্রোত্রাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়গণদ্বারা ইন্দ্রিয় জ্ঞান হয় ও বুদ্ধির কার্য্য না থাকে, তাহাহইলে দেহের আভ্যন্তরিক শব্দাদি কি প্রকারে উপলব্ধি হয়? তজ্জন্য পঞ্চদশী কহিয়াছেন।—

"কদাচিৎ পিহিতে কর্ণে শ্রূয়তে শব্দ আন্তরঃ।
প্রাণবায়ৌ জঠরাগ্নৌ জলপানেঽন্নভক্ষণে।
ব্যজ্যন্তে হ্যান্তরস্পর্শা মীলনে চান্তরং তমঃ।
উদ্গারে রসগন্ধৌ চেত্যক্ষণোমান্তরগ্রহঃ ॥ ৫ ॥"

ইহার অর্থ এই যে কদাচিৎ কর্ণ বন্ধ করিলে, প্রাণবায়ু ও জঠরাগ্নিতে বিদ্যমান যে আন্তরিক শব্দ, তাহা শ্রবণ করা যায়। জলপানে ও অন্নভক্ষণে আভ্যন্তরিক স্পর্শ অনুভব করা যায়। চক্ষু মুদ্রিত করিলেও অন্তরের অন্ধকার উপলব্ধি করা যায়। উদ্গার হইলে, রস ও গন্ধ গ্রহণ করা যায়। এই প্রকারে ইন্দ্রিয়গণের আন্তরিক শব্দ স্পর্শাদি অনুভবশক্তি জানিতে পারা যায়।

[পূজ্যপাদ পণ্ডিত শ্রীশশিভূষণ বন্দোপাধ্যায় মহাশয় হিন্দুপত্রিকাতে পঞ্চদশীর সুন্দর বিশদ ব্যাখ্যা করিতেছেন, সুতরাং এবিষয়ে অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন।

শ্রোত্রং ত্বক্‌ চক্ষুষী জিহ্বা ঘ্রাণমেব চ পঞ্চমম্।
বাক্‌ চ হস্তৌ চ পাদৌ চ পায়ুমেঢ্রং তথৈব চ ॥ ২৭ ॥
বুদ্ধীন্দ্রিয়াণি চৈতানি তথা কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি চ।
সম্ভূতানীহযুগপন্মনসা সহ পার্থিব ॥ ২৮ ॥

মহাভারতে শান্তিপর্ব্বণি ৩০২ অধ্যায়ে।

(বশিষ্ঠ মুনি করাল নামে রাজাকে কহিয়াছিলেন) রাজন্‌! শ্রোত্র, ত্বক্‌, চক্ষু, জিহ্বা ও ঘ্রাণ এই পঞ্চ বুদ্ধীন্দ্রিয় ও বাক্‌, হস্ত, পাদ, পায়ু ও উপস্থ এই পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় মনের সহিত যুগপৎ সম্ভূত হইয়াছে।

"তৈজসানীন্দ্রিয়াণ্যাহুর্দেবা বৈকারিকা দশ।
একাদশং মনশ্চাত্র কীর্ত্তিতং তত্ত্বচিন্তকৈঃ।
জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি পঞ্চাত্র পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়াণি চ ॥ ১৯ ॥
তানি বক্ষ্যামি তেষাঞ্চ কর্ম্মাণি কুলপাবনাঃ।
শ্রবণং ত্বক্‌চক্ষুর্জিহ্বা নাসিকা চৈব পঞ্চমী ॥ ২০ ॥
শব্দাদি জ্ঞানসিদ্ধ্যর্থং বুদ্ধিযুক্তানি পঞ্চ বৈ।
পায়ূপস্থং হস্তপাদৌ কীর্ত্তিতা বাক্‌ চ পঞ্চমী ॥
বিসর্গানন্দসিদ্ধিশ্চ গত্যুক্তি কর্ম্ম তৎ স্মৃতম্‌ ॥ ২১ ॥"

পদ্মপুরাণে আদি খণ্ডে ২ অধ্যায়ে।

শ্রোত্রেন্দ্রিয়ং নাম শ্রোত্রব্যতিরিক্ত কর্ণ শষ্কুলাবচ্ছিন্ন নভোদেশাশ্রয়ং (২) শব্দগ্রহণ-শক্তিমদিন্দ্রিয়ং শ্রোত্রেন্দ্রিয়মিতি (৩)

শ্রবণেন্দ্রিয় কাহাকে বলে?

ত্বক্ শিরাদি আকৃতিবিশিষ্ট কর্ণ হইতে ভিন্ন কর্ণছিদ্রমধ্যগত আকাশাশ্রিত শব্দগ্রহণশক্তি-বিশিষ্ট যে ইন্দ্রিয়, তাহার নাম শ্রবণেন্দ্রিয়।

ত্বগিন্দ্রিয়ং নাম ত্বগ্ ব্যতিরিক্তং ত্বগাশ্রয়-মাপাদতল মস্তকব্যাপি শীতোষ্ণাদিস্পর্শশক্তি-মদিন্দ্রিয়গ্রহণং ত্বগিন্দ্রিয়মিতি। (৪)

ত্বক্ ভিন্ন—অথচ ত্বগাশ্রিত চরণাবধি মস্তক-পর্য্যন্ত ব্যাপনশীল শীত উষ্ণাদি স্পর্শগ্রহণশক্তি-বিশিষ্ট ইন্দ্রিয়ের নাম ত্বগিন্দ্রিয়।

চক্ষুরিন্দ্রিয়ং নাম গোলকব্যতিরিক্তং গোল-কাশ্রয়ংকৃষ্ণতারকাগ্রবর্ত্তিরূপগ্রহণ-শক্তিমদিন্দ্রিয়ং চক্ষুরিন্দ্রিয়মিতি) (৫)

গোলকাকৃতি চক্ষুর আয়তন হইতে ভিন্ন—অথচ গোলকাশ্রিত কৃষ্ণবর্ণতারকার অগ্রবর্ত্তী রূপ-গ্রহণশক্তিযুক্ত ইন্দ্রিয়ের নাম চক্ষুরিন্দ্রিয়।

জিহ্বেন্দ্রিয়ং নাম জিহ্বাব্যতিরিক্ত জিহ্বা-শ্রয়ং জিহ্বাগ্রবর্ত্তি রসগ্রহণশক্তিমদিন্দ্রিয়ং জিহ্বে-ন্দ্রিয়মিতি। (৬)

(সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ত্রিবিধ মহত্তত্ত্ব হইতে বৈকারিক, তৈজস ও তামস এই ত্রিবিধ অহঙ্কার উৎপন্ন হয়; এক্ষণ রাজসিক মহত্তত্ত্ব হইতে বৈকারিক তৈজস অহঙ্কারের কার্য্য বর্ণন করিতেছেন)। তত্ত্বজ্ঞ মনীষীগণ কহিয়াছেন যে, দশ ইন্দ্রিয় ও মন একাদশ ইন্দ্রিয়, ইহার মধ্যে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়; তাহাদিগের কর্ম্ম সকল বলিব। সূত ঋষিগণকে সম্বোধন করিয়া কহিয়াছিলেন, হে কুলপাবনগণ! শ্রবণ, ত্বক্, চক্ষু, জিহ্বা, এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় বুদ্ধিযুক্ত হইয়া শব্দাদি জ্ঞান লাভ করে ও পায়ু, উপস্থ, হস্ত, পাদ ও বাক্, এই পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়; ইহাদিগের কর্ম্ম ত্যাগ, আনন্দ, সিদ্ধি, গতি ও উক্তি।

"ইন্দ্রিয়াণি দশশ্রোত্রং ত্বগ্‌দৃগ্রসননাসিকাঃ।
বাক্করৌ চরণৌ মেঢ্রং পায়ুর্দশম উচ্যতে॥"

শ্রীভাগবতে তৃতীয় স্কন্ধে ২৬ অ, ১৩।

শ্রোত্রং ত্বক্ চক্ষুষী জিহ্বা নাসাবুদ্ধীন্দ্রিয়াণি চ।
পাণি পাদৌ গুদবাক্ চ গুহ্যং কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি চ॥

গরুড়পুরাণে উত্তরার্দ্ধে ৩২ অ, ৪১।

"শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধবিষয়াঃ পঞ্চবুদ্ধি-
তদর্থানি পঞ্চবুদ্ধীন্দ্রিয়াণি"

বেদান্তদর্শনে ২অ, পাদে ৬ সূত্র, শারীরক ভাষ্যে।

শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, এই পঞ্চবিষয়ক পঞ্চ বুদ্ধি, তদর্থ পঞ্চবুদ্ধীন্দ্রিয়।

"শ্রোত্রং ত্বক্ চক্ষুষীঘ্রাণং জ্ঞানেন্দ্রিয়াণ্যথ।"

মহাভারতে শান্তিপর্ব্বণি ২১০ অ, ৩০।

(২) শষ্কুল—কর্ণছিদ্র।

(৩) "শ্রোত্রং বৈগ্রহঃ...শ্রোত্রেণ হি শব্দাঞ্ছৃণোতি।"
শ্রবণই জ্ঞান, শ্রবণের দ্বারা শব্দ সকল শুনিতে পাওয়া যায়।

"শ্রোত্রং শৃণ্বৎ সর্ব্বে প্রাণা অনু শৃণ্বন্তি।"

কৌষিতকী উপনিষৎ। ৩০২।

শ্রোত্র শ্রবণ করে, তাহা হইলে সকল প্রাণও শ্রবণ করে।

"শ্রোত্রে শব্দোপলব্ধৌ।"

গর্ভোপনিষৎ ১।

শ্রোত্রদ্বয় শব্দজ্ঞান লাভের জন্য।

(৪) "ত্বগ্ বৈগ্রহঃ ত্বচাহি স্পর্শান্ বেদয়তে।"

বৃহদারণ্যকোপনিষৎ ৩ অ, ২ ব্রাহ্মণ, ৯।

ত্বক্‌ই জ্ঞান, ত্বক্‌দ্বারা স্পর্শজ্ঞান হয়।

(৫) "প্রজ্ঞয়াচক্ষুঃ সমারুহ্য চক্ষুষাসর্ব্বাণি রূপাণ্যাপ্নোতি।"

কৌষিতকী উপনিষৎ। ৩।৬।

জ্ঞানদ্বারা চক্ষুতে সমারূঢ় হইয়া চক্ষুদ্বারা সকল রূপ দর্শন করে।

"চক্ষুর্বৈগ্রহঃ...চক্ষুষাহিরূপাণি পশ্যতি।"

বৃহদারণ্যকোপনিষৎ। ৩অ, ২,৫,

চক্ষুই জ্ঞান, চক্ষুদ্বারা রূপ দেখিতে পাওয়া যায়।

(৬) "প্রজ্ঞয়া জিহ্বাং সমারুহ্য জিহ্বয়া
সর্ব্বানন্নরসানাপ্নোতি।"

কৌষিতকী উপনিষৎ। ৩।৬।

জিহ্বা ভিন্ন—অথচ জিহ্বাশ্রয়, জিহ্বার অগ্রবর্ত্তী মধুরাদি রসগ্রহণশক্তিবিশিষ্ট যে ইন্দ্রিয়, তাহার নাম জিহ্বেন্দ্রিয়।

ঘ্রাণেন্দ্রিয়ং নাম নাসিকা ব্যতিরিক্তং নাসিকাশ্রয়ং নাসিকাগ্রবর্ত্তিগন্ধগ্রহণশক্তিমদিন্দ্রিয়ং ঘ্রাণেন্দ্রিয়মিতি। (৭)

নাসিকাব্যতিরিক্ত অথচ নাসিকার আশ্রয় নাসিকার অগ্রবর্ত্তী গন্ধগ্রহণশক্তিমান্ ইন্দ্রিয়ের নাম ঘ্রাণেন্দ্রিয়।

কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি কানি।

কর্ম্মেন্দ্রিয় সকল কি?

বাক্-পাণি-পাদ-পায়ূপস্থাখ্যানি। (৮)

জ্ঞানদ্বারা জিহ্বাতে সমারূঢ় হইয়াই জিহ্বাদ্বারা সকল অন্ন রস প্রাপ্ত হয়।

"জিহ্বাবৈগ্রহঃ...জিহ্বায়া হি রসান্ বিজানাতি।

বৃহদারণ্যকোপনিষৎ। ৩ অ, ২ ব্রাহ্মণ। ৪

(৭) "ঘ্রাণেন সর্ব্বান্ গন্ধানাপ্নোতি।"

কৌষিতকী ৩।৪।

(৮) রজোংশৈঃ পঞ্চভিস্তেষাং ক্রমাৎ কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি তু।
বাক্পাণিপাদপায়ূপস্থাভিধানানি জজ্ঞিরে॥"

পঞ্চদশী-তত্ত্ববিবেকে ২১।

আকাশাদি পঞ্চভূতের রজোগুণ হইতে যথাক্রমে বাক্য, পাণি, পাদ, গুহ্যদেশ ও উপস্থ নামে পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয় উৎপন্ন হইয়াছিল।

"কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি, বাক্পাণি পাদপায়ূপস্থানি। এতানি পুনরাকাশাদীনাং রজোংশেভ্যোব্যস্তেভ্য পৃথক্ ক্রমেণোৎপদ্যন্তে।"

বেদান্তসারে।

বাক্য, হস্ত, পদ, পায়ু ও উপস্থ, এই সকল আকাশাদির রজঃ অংশ হইতে ক্রমান্বয়ে উৎপন্ন হইয়াছে।

"পাদৌ পায়ুরুপস্থশ্চ হস্তৌ বাক্কর্ম্মণী অপি।"

শ্রীমহাভারতে শান্তিপর্ব্বণি ২১০ অ, ৩০।

পদ, পায়ু, উপস্থ, হস্ত, বাক্ এই সকল কর্ম্মেন্দ্রিয়।

"রাজস্তাশ্চ ক্রিয়া শক্তেরুৎপন্নানি শৃণুষ্ব মে।
শ্রোত্রং ত্বগ্রসনা চক্ষুর্ঘ্রাণশ্চৈব চ পঞ্চমম্॥

বাক্য, পাণি পাদ, পায়ু ও উপস্থ, ইহাদিগের নাম কর্ম্মেন্দ্রিয়।

জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি চৈতানি তথা কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি চ।
বাক্পাণিপাদপায়ুশ্চ গুহ্যান্তানি চ পঞ্চ বৈ॥"

শ্রীদেবীভাগবতে ৩ স্কন্ধে ৭ অ, ৬১।৬২॥

(শৈলেশনন্দিনী হিমালয়কে কহিয়াছিলেন, হে পিতঃ!) রজোগুণের ক্রিয়াশক্তি হইতে যাহা উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহা আমার নিকট শ্রবণ করুন। শ্রোত্র, ত্বক্, রসনা, চক্ষু ও ঘ্রাণ, এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও বাক্য, হস্ত, পদ, পায়ু ও গুহ্যান্ত (উপস্থ) এই পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়।

মাংসাস্থি নির্ম্মিত হস্ত পদাদিও কর্ম্মেন্দ্রিয় নহে। পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়ের স্থান কেবল হস্ত পদাদি বলিয়া উক্ত হইয়াছে, কারণ ঐ ঐ ইন্দ্রিয়দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য সাধন হয়, যথা—

পঞ্চোক্ত্যাদানগমনবিসর্গানন্দকাঃ ক্রিয়াঃ।
কৃষিবাণিজ্যসেবাদ্যাঃ পঞ্চস্বন্তর্ভবন্তি হি॥ ৬॥
বাক্পাণিপাদপায়ূপস্থৈরক্ষৈস্তৎক্রিয়াজনিঃ।
মুখাদি গোলকেম্বাস্তে তৎ কর্ম্মেন্দ্রিয় পঞ্চকম্॥ ৭॥

পঞ্চদশী ভূতবিবেকে।

কথন, গ্রহণ, গমন, ত্যাগ ও আনন্দ, এই পঞ্চবিধ কর্ম্ম বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ, এই পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়ের কার্য্য বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। কৃষি, বাণিজ্য, সেবাদি অন্যান্য ক্রিয়া সকল ঐ সকল কর্ম্মেন্দ্রিয়ের বিষয় হইলেও এই সকল বাণিজ্যাদি কার্য্য, কথনাদি পঞ্চ ক্রিয়ার অন্তর্গত। ঐ সকল পঞ্চেন্দ্রিয় মুখাদি স্থানে অবস্থিতি করে। কিন্তু ঐ সকল স্থান হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন।

"বচনাদানবিহরণোৎসর্গানন্দাঃ পঞ্চ-
কর্ম্মভেদাস্তদর্থানি চ পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়াণি।"

বেদান্তদর্শনে ২ অ, ৪ পাদে ৬ সূত্রে শারীরকভাষ্যে।

বচন, গ্রহণ, গমনাগমন, মলত্যাগ ও আনন্দ, এই পাঁচ প্রকার কর্ম্ম, এতদর্থ পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়।

"পাদৌ পায়ুরুপস্থশ্চ হস্তৌ বাক্ পঞ্চমী ভবেৎ।
গতিবিসর্গোহ্যানন্দঃ শিল্পং বাক্যঞ্চ কর্ম্ম তৎ॥"

মার্কণ্ডেয় পুরাণে ৪৫ অধ্যায়ে ৫২।

"পায়ূপস্থৌ করৌ পাদৌ বাক্ চ মৈত্রেয় পঞ্চমী।
বিসর্গশিল্পগত্যুক্তিঃ কর্ম্ম তেষাঞ্চ কথ্যতে॥"

বিষ্ণুপুরাণে প্রথমাংশে ২ অধ্যায়ে ৪৫।

বাগিন্দ্রিয়ং নাম বাগব্যতিরিক্তং বাগাশ্রয়-মষ্টস্থানবর্ত্তিশব্দোচ্চারণশক্তিমদিন্দ্রিয়ং বাগিন্দ্রিয়মিতি। (৯)

বাক্যব্যতিরিক্ত অথচ বাক্যের আশ্রয় অষ্টস্থানবর্ত্তী শব্দোচ্চারণশক্তিমান্ ইন্দ্রিয়কে বাগিন্দ্রিয় বলে।

অষ্টস্থানং নাম হৃদয়-কণ্ঠ-শির-উর্দ্ধৌষ্ঠাধরৌষ্ঠ তালুদ্বয়-জিহ্বা ইত্যষ্টস্থানানি।

হৃদয়, কণ্ঠ, মস্তক, উর্দ্ধৌষ্ঠ, অধরোষ্ঠ, তালুদ্বয় ও জিহ্বা, এই অষ্টস্থান।

পাণীন্দ্রিয়ং নাম পাণিব্যতিরিক্তং করতলাশ্রয়ং দানাদানশক্তিমদিন্দ্রিয়ং পাণীন্দ্রিয়মিতি। (১০)

কর হইতে ভিন্ন—অথচ করতলের আশ্রয়, দান-আদান-শক্তিমান্ ইন্দ্রিয়কে পাণীন্দ্রিয় বলে।

পাদেন্দ্রিয়ং নাম পাদব্যতিরিক্তং পাদাশ্রয়ং পাদতলবর্ত্তিগমনাগমনশক্তিমদিন্দ্রিয়ং পাদেন্দ্রিয়মিতি। (১১)

চরণ ভিন্ন—অথচ চরণাশ্রিত চরণতলবর্ত্তী গমনাগমনশালী ইন্দ্রিয়কে পাদেন্দ্রিয় বলে।

পায়্বিন্দ্রিয়ং নাম গুহ্যব্যতিরিক্তং গুহ্যাশ্রয়ং পুরীষোৎসর্গশক্তিমদিন্দ্রিয়ং পায়্বিন্দ্রিয়মিতি। (১২)

অপান হইতে ভিন্ন—অথচ অপানাশ্রিত মলত্যাগশক্তিবিশিষ্ট যে ইন্দ্রিয়, তাহার নাম পায়ু-ইন্দ্রিয়।

উপস্থেন্দ্রিয়ং নাম উপস্থব্যতিরিক্তং উপস্থাশ্রয়ং মূত্রশুক্রোৎসর্গশক্তিমদিন্দ্রিয়ং উপস্থেন্দ্রিয়মিতি। (১৩)

উপস্থব্যতিরিক্ত—অথচ উপস্থাশ্রয়, মূত্র-শুক্রত্যাগ-শক্তিমান্ ইন্দ্রিয়কে উপস্থেন্দ্রিয় বলে।

এতানি কর্ম্মেন্দ্রিয়াণ্যুচ্যন্তে।

ইহাদিগকে কর্ম্মেন্দ্রিয় বলে।

(পরাশর কহিলেন) হে মৈত্রেয়! পায়ু, উপস্থ, কর, পাদ ও বাক্য, এই পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়, তাহাদের কর্ম্ম সকল কহিতেছি যে—ত্যাগ, শিল্প, গতি ও উক্তি।

(৯) "প্রজ্ঞয়া বাচং সমারুহ্য বাচা সর্ব্বাণি নামান্যাপ্নোতি।"
কৌষীতকী উপনিষৎ ৩।৬।

"বাগ্‌বৈগ্রহঃ...বাচাহিনামান্যভি বদতি॥"
বৃহদারণ্যকোপনিষৎ। ৩ অ ২ ব্রাহ্মণ ৩।

বাক্যই জ্ঞান...বাক্যদ্বারা সকল নাম কহা যায়।

(১০) "প্রজ্ঞয়া হস্তৌ সমারুহ্য হস্তাভ্যাং সর্ব্বাণি কর্ম্মাণ্যাপ্নোতি।"
কৌষীতকী উপনিষৎ। ৩।৬।

"হস্তৌ বৈগ্রহঃ...হস্তাভ্যাং হি কর্ম্ম করোতি।"
বৃহদারণ্যকোপনিষৎ। ৩।২।৮।

হস্তই জ্ঞান...হস্তদ্বারা কার্য্য করা যায়।

(১১) "প্রজ্ঞয়া পাদৌ সমারুহ্য পাদাভ্যাং সর্ব্বাহিত্যা আপ্নোতি।"
কৌষীতকী উপনিষৎ। ৩।৬।

জ্ঞানদ্বারা পদ অবলম্বন করিয়া, পদদ্বয় দ্বারা সমুদায় অভিলষিত দ্রব্য প্রাপ্ত হয়।

(১২) "সর্ব্বেষাং বিসর্গাণাং পায়ুরেকায়নম্।"
বৃহদারণ্যকোপনিষদি ২। ৪ ব্রাহ্মণে ১১।
ও ঐ পুস্তককে ৪ অধ্যায়ে ৫ ব্রাহ্মণে ১২॥

শরীর হইতে সমুদায় ত্যাগ করিবার পায়ুই একমাত্র আশ্রয়।

(১৩) "প্রজ্ঞয়োপস্থং সমারুহ্যোপস্থেনানন্দং রতিং প্রজাতিমাপ্নোতি।"
কৌষীতকী ৩।৬।

জ্ঞানদ্বারা উপস্থতে সমারূঢ় হইয়া আনন্দ ও সন্তান প্রাপ্ত হয়।

"সর্ব্বেষামানন্দানামুপস্থ একায়নম্।"
বৃহদারণ্যকোপনিষৎ ২। ৪ ব্রাহ্মণে ১১
ও ঐ পুস্তকের ৪ অধ্যায়ে ৫। ১২।

সমুদায় আনন্দের উপস্থই একমাত্র আশ্রয়।

(১৪) অন্তঃকরণচতুষ্টয়াত্মা।"
রামতাপনী উত্তরভাগে ৫ খণ্ডে ১৪।

মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্ত, এই অন্তঃকরণচতুষ্টয়াত্মক।

মন আদিশ্চ————।"
সর্ব্বোপনিষৎসারে ৭।

অন্তঃকরণং নাম মনোবুদ্ধিশ্চিত্তমহঙ্কারশ্চেতি। (১৪)

মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহঙ্কারকে অন্তঃকরণ বলে।

"ভাষ্যং। মনোবুদ্ধিশ্চিত্তমহঙ্কারশ্চ।"

"মনোবুদ্ধিরহঙ্কারশ্চিত্তং করণমান্তরম্।"

বেদান্তপরিভাষায়াং প্রথমপরিচ্ছেদে।

মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্ত, ইহারাই অন্তঃকরণ।

"মনোবুদ্ধিরহঙ্কারশ্চিত্তঞ্চ।"

বেদান্তদর্শনে ২ অধ্যায়ে ৪ পাদে ৬ সূত্র শারীরকভাষ্যে।

"মনোবুদ্ধিরহঙ্কারশ্চিত্তমিতি।"

মাণ্ডুক্যোপনিষদি ৩ মন্ত্র ভাষ্যে।

"তথাত্মন উপাধিভূতমন্তঃকরণং মনোবুদ্ধির্বিজ্ঞানং চিত্তমিতি চানেকধা তত্র তত্রাভিলপ্যতে। ক্বচিচ্চ বৃত্তিবিভাগেন সংশয়াদিবৃত্তিকং মন ইত্যুচ্যতে, নিশ্চয়াদিবৃত্তিকং বুদ্ধিরিতি। তথৈবম্ভূতমন্তঃকরণমবশ্যমস্তীত্যভ্যুপগন্তব্যম্।"

বেদান্তদর্শনে ২ অধ্যায়ে ৩ পাদে ৩২ সূত্র শারীরকভাষ্যে

আত্মার উপাধি অন্তঃকরণ, মন, বুদ্ধি, বিজ্ঞান ও চিত্ত, এইরূপ অনেক নামে কথিত হয়। কোন কোন স্থলে বৃত্তি বিভাগ অনুসারে সংশয়াদি বৃত্তিককে মন কহে ও নিশ্চয়াদি বৃত্তিককে বুদ্ধি কহে। এরূপ অন্তঃকরণ আছে, ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে।

কিন্তু এবিষয়ে পঞ্চদশীর মত অন্য। পঞ্চদশীতে মনকে অন্তঃকরণ বলিয়া উক্তি করিয়াছেন এবং তাহার স্থান হৃদয়ে কহিয়াছেন, যথা—

মনোদশেন্দ্রিয়াধ্যক্ষং হৃৎপদ্মগোলকে স্থিতম্।
তচ্চান্তঃকরণং বাহ্যেষ্বস্বাতন্ত্র্যাদ্ বিনেন্দ্রিয়ৈঃ।

ভূতবিবেক ৮।

পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়ের অধ্যক্ষ মন, উহা হৃদয়ে থাকে। ঐ মনকে অন্তঃকরণ কহে। মন ইন্দ্রিয়ের সাহায্য ব্যতিরেকেও স্বয়ং স্বাধীনভাবে আন্তরিক কার্য্য করিতে পারে, কিন্তু বাহ্য বিষয়ে ইন্দ্রিয়গণ অধীন; কারণ বাহ্য বিষয়ে কোন কার্য্য করিতে হইলে, মনের সাহায্য ব্যতীত কোন কার্য্য করিতে পারে না।

বেদান্তসারে বুদ্ধি, মন, চিত্ত ও অহঙ্কারের লক্ষণ দিয়াছেন, কিন্তু চিত্ত ও অহঙ্কারকে বুদ্ধি ও মনের অন্তর্গত দুই বৃত্তি বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন, যথা—

"বুদ্ধির্নাম নিশ্চয়াত্মিকান্তঃকরণবৃত্তিঃ।
মনোনাম সঙ্কল্পবিকল্পাত্মিকান্তঃকরণবৃত্তিঃ।
অনয়োরেব চিত্তাহঙ্কারয়োরন্তর্ভাবঃ।
অনুসন্ধানাত্মিকান্তঃকরণবৃত্তিঃ চিত্তং।
অভিমানাত্মিকান্তঃকরণবৃত্তিঃ অহঙ্কারঃ।"

অস্যার্থঃ।

নিশ্চয়াত্মক অন্তঃকরণবৃত্তিকে বুদ্ধি কহে।
সঙ্কল্প বিকল্পাত্মক অন্তঃকরণ বৃত্তিকে মন কহে।
চিত্ত ও অহঙ্কার, এ উভয়ই বুদ্ধি ও মনের অন্তর্গত দুই বৃত্তি মাত্র। অনুসন্ধানাত্মক অন্তঃকরণ-বৃত্তিকে চিত্ত কহে।
অভিমানাত্মক অন্তঃকরণবৃত্তিকে অহঙ্কার বলে।

মহাভারতেও অন্তঃকরণের চারিটি বৃত্তি, এ কথা কোথাও উল্লেখ নাই; কেবল মন ও বুদ্ধির লক্ষণ আছে মাত্র।

"চক্ষুরালোচনায়ৈব সংশয়ং কুরুতে মনঃ।
বুদ্ধিরধ্যবসানায় ক্ষেত্রজ্ঞঃ সাক্ষীবৎ স্থিতঃ॥

শান্তিপর্ব্বণি ১৯৪ অধ্যায়ে।

চক্ষুদ্বারা আলোচনা করিয়া মন সংশয় করে, বুদ্ধি নিশ্চয় করিয়া থাকে; ক্ষেত্রজ্ঞ সাক্ষীর ন্যায় থাকেন।
কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতে অন্তঃকরণ চারি ভাগে বিভক্ত আছে।

"মনো বুদ্ধিরহঙ্কারশ্চিত্তমিত্যন্তরাত্মকম্।
চতুর্ধালক্ষ্যতে ভেদো বৃত্ত্যালক্ষণরূপয়া॥"

তৃতীয় স্কন্ধে ২৬ অধ্যায়ে ১৪।

মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, চিত্ত এই চারিটী অন্তরিন্দ্রিয়। যদিও অন্তঃকরণ একমাত্র অন্তরিন্দ্রিয় বটে, কিন্তু বৃত্তিভেদে ঐ চারি ভাগে বিভক্ত হইয়াছে।

কিন্তু সাংখ্যদর্শনে অন্তঃকরণের তিন বৃত্তি কহিয়াছেন—

"ত্রয়াণাং স্বালক্ষণ্যম্"।

দ্বিতীয়োধ্যায়ে ৩০।

উহার ভাবার্থ। বুদ্ধি, অহঙ্কার ও মন, ইহারা অন্তঃকরণের বৃত্তি। বুদ্ধির বৃত্তি অধ্যবসায়, অহঙ্কারের বৃত্তি অভিমান, মনের বৃত্তি সঙ্কল্প ও বিকল্প। কার্য্য করিবার ইচ্ছাকে সঙ্কল্প ও সংশয়কে বিকল্প কহে।

মনঃস্থানং গলান্তং। (১৫)

কণ্ঠমধ্যে মনের স্থান।

বুদ্ধের্ব্বদনম্।

বুদ্ধির স্থান বদন।

চিত্তস্য নাভিঃ।

চিত্তের স্থান নাভি।

অহঙ্কারস্য হৃদয়ং।

অহঙ্কারের স্থান হৃদয়।

অন্তঃকরণচতুষ্টয়স্য বিষয়াঃ সংশয় নিশ্চয় ধারণাভিমানাঃ। (১৬)

অন্তঃকরণচতুষ্টয়ের বিষয় এই—সংশয়, নিশ্চয়, ধারণা ও অভিমান।*

ক্রমশঃ—

শ্রীবিধুভূষণ দেব।

(১৫) "মনঃস্থানং গলান্তং বুদ্ধের্ব্বদনমহঙ্কারস্য হৃদয়ং চিত্তস্য নাভিরিতি।" শারীরকোপনিষৎ।

(১৬) "সংশয়ো নিশ্চয়ো গর্ব্বঃ স্মরণং বিষয়া ইমে।" বেদান্ত পরিভাষায়াং ১ পরিচ্ছেদে।

* সংশয়, নিশ্চয়, গর্ব্ব ও স্মরণ, এই গুলি মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্তের বিষয়; কিন্তু বুদ্ধির ধর্ম্ম এই—

"সংশয়োথ বিপর্য্যাসো নিশ্চয়ঃ স্মৃতিরেব চ।"

শ্রীভাগবতে ৩ স্কন্ধে ২৬ অ, ৩১।

(কপিলদেব দেবহুতিকে কহিয়াছিলেন—মা!) সংশয়, মিথ্যা জ্ঞান, নিশ্চয় ও স্মৃতি, এই সকল বুদ্ধির ধর্ম্ম।

যজুর্ব্বেদ।

অশ্বমেধপ্রকরণ

২২শ অধ্যায়।

৯—১

তৎসবিতুর্ব্বরেণ্যম্ভর্গো দেবস্য ধীমহি। ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ ॥৯॥

বঙ্গার্থ। যিনি সৎকার্য্যানুষ্ঠানের জন্য প্রকর্ষভাবে আমাদিগকে বুদ্ধিবৃত্তি প্রেরণ করেন, আমরা সেই বিজ্ঞানানন্দ-স্বভাব-জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মের সর্ব্বজন-পূজনীয় পাপনাশকারী তেজ ধ্যান করি।

(এইটি গায়ত্রী মন্ত্র; পূর্ব্ব পূর্ব্বসংখ্যার হিন্দু-পত্রিকায় অনেকবার ইহার বিস্তৃত ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। ৩য় বর্ষ, হিন্দুপত্রিকা, "সন্ধ্যামন্ত্র ব্যাখ্যা" ১৫১ ও ২৩২ পৃষ্ঠা দেখুন)

হিরণ্যপাণিমূতয়ে সবিতারমুপহ্বয়ে। সচেত্তা দেবতাপদম্ ॥১০॥

ব্যাখ্যা। অহং উতয়ে অবনায় পালনের জন্য হিরণ্যপাণি সবিতারমুহ্বয়ে অনুগামি আহ্বান করি। সঃ সবিতা চেত্তা চেতয়িতা, দেবতা পদং জ্ঞানিনাম স্থানং।

বঙ্গার্থ। আমি পালনের জন্য হিরণ্যপাণি সবিতাকে আহ্বান করি; তিনি চেতয়িতা, দেবতা ও জ্ঞানিদিগের আশ্রয় স্থান।

দেবস্য চেততো মহীম্প্রসবিতুর্হবামহে। সুমতিং সত্যরাধসম্ ॥১১॥

পদপাঠঃ। দেবস্য। চেততঃ। মহীম্। প্রসবিতুঃ। হবামহে। সুমতিং। সত্যরাধসম্।

ব্যাখ্যা। বয়ং চেততঃ জানতঃ সবিতুঃ দেবস্য মহীম্ মহতীং সত্যরাধসং সুমতিং

শোভনাং বুদ্ধিং প্রহ্বামহে প্রার্থয়ামহে। সত্যমনশ্বরং রাধো ধনং যস্মাত্তাম যদ্বা সত্যং রাধয়তি সাধয়তি সা সত্যরাধাস্তাম্।

বঙ্গার্থ। আমরা সেই সর্ব্বজ্ঞ সবিতৃ দেবতার নিকট সত্যরক্ষিণী মহতী সুমতি প্রার্থনা করি।

সুষ্টুতিং সুমতী বৃধো রাতিং সবিতুরীমহে। প্রদেবায় মতীবিদে ॥১২

পদপাঠঃ। সুষ্টুতিং। সুমতী বৃধঃ। রাতিং। সবিতুঃ। ঈমহে। প্র। দেবায়। মতীবিদে।

ব্যাখ্যা। বয়ং সবিতুর্দ্দেবায় সবিতুর্দ্দেবস্য (ষষ্ঠ্যর্থে চতুর্থী) সুষ্টুতিং (সু-স্তুতিং) শোভনাং স্তুতিং রাতিং দানং প্র ইমহে প্রকর্ষেণ যাচামহে কীদৃশস্য সবিতুঃ সুমতীবৃধঃ শোভনাং মতিং বর্ধয়তি সুমতিবৃৎ তস্য তথা মতীবিদে সর্ব্বেষাং মতিং বেত্তি! (মতি ও সুমতি সংহিতানুরোধে দীর্ঘ)

বঙ্গার্থ। আমরা সুমতি বর্দ্ধক ও মতিবিৎ সবিতৃদেবের নিকট শোভনা স্তুতিরূপ ধন প্রকর্ষভাবে যাচ্ঞা করি।

রাতিং সৎপতিম্মহে সবিতারমুপহ্বয়ে। আসবন্দেব বীতয়ে ॥ ১৩ ॥

পদপাঠঃ। রাতিং। সৎপতিং। মহে। সবিতারম্। উপহ্বয়ে। আসবং। দেবতীতয়ে।

ব্যাখ্যা। দেববীতয়ে দেবানাং তর্পনায় রাতিং দদাতি রাতিঃ তম্ সৎপতিং সতাং পালকম্ আসবম্ আভিমুখ্যেন সৌতি কর্ম্মণ্যনুজানাতি আসবন্তম সবিতারম্ অহং উপহ্বয়ে আহ্বয়ামি মহে পূজয়ামি।

বঙ্গার্থ। দেবতাদিগের তৃপ্তির জন্য সর্ব্বকর্ম্মকুশল সজ্জন-পালক ও দাতা সবিতৃদেবকে আমি আহ্বান করি ও পূজা করি।

দেবস্য সবিতুর্মতিমাসবং বিশ্বদেব্যম। ধিয়া ভগম্মনামহে ॥ ১৪ ॥

পদপাঠঃ। দেবস্য। সবিতুঃ। মতিম্। আসবম্। বিশ্বদেব্যম্। ধিয়া। ভগম্। মানামহে।

ব্যাখ্যা। সবিতুর্দেবস্য মতিং প্রতি বয়ং ধিয়া আসবম আসৌতি কর্ম্মণ্যনুজানাতি আসবন্তম বিশ্বদেব্যমদেবেভ্যো হিতম্ভগং ঐশ্বর্য্যং মনামহে যাচামহে।

বঙ্গার্থ। সবিতৃদেবের মতির নিকট সর্ব্বকর্ম্মকুশল এবং দেবহিত ঐশ্বর্য্য আমরা বুদ্ধির দ্বারা প্রার্থনা করি।

২২ কণ্ডিকা।

আব্রহ্মণব্রাহ্মণো ব্রহ্মবর্চ্চসী- জায়তামারাষ্ট্রে রাজন্যঃ শূরইষব্যোতিব্যাধীমহারথো জায়তান্দোগ্ধী ধেনুর্বোঢ়ানড়ানাশুঃ সপ্তিঃ পুরন্ধির্য্যোষাজিষ্ণু রথেষ্ঠাঃ সভেয়ো যুবাস্য যজমানস্য বীরো জায়তান্নিকামে নিকামে নঃ পর্জ্জন্যো বর্ষতু ফলবত্যো ন ওষধয়ঃ পচ্যন্তাং যোগক্ষেমো নঃ কল্পতাম্ ॥ ২২ ॥

পদপাঠঃ। আ। ব্রহ্মণ। ব্রাহ্মণঃ। ব্রহ্মবর্চ্চসী। জায়তাম। আ। রাষ্ট্রে। রাজন্য। শূরঃ। ইষব্যা। অতিব্যাধী। মহারথঃ। জায়তাম্। দোগ্ধী। ধেনুঃ। বোঢ়া। অনড্বান্। আশুঃ। সপ্তিঃ। পুরন্ধিঃ। যোষা। জিষ্ণুঃ। রথেষ্ঠাঃ। সভেয়ঃ। যুবা। অস্য। যজমানস্য। বীরঃ। জায়তাম। নিকামে। নঃ। পর্জ্জন্যঃ। বর্ষতু। ফলবত্যঃ। নঃ। ওষধয়ঃ। পচ্যন্তাং। যোগক্ষেমো। নঃ। কল্পতাম্।

ব্যাখ্যা। হে ব্রাহ্মণ, রাষ্ট্রে-অস্মদ্দেশে ব্রহ্মবর্চ্চসী যজ্ঞাধবনশীলো ব্রহ্মণঃ আজায়তাম্। শূরঃ পরাক্রমী, ইষব্যঃ ইষৌ কুশলঃ, অতিব্যাধী অত্যন্তং বিধ্যতীত্যতিব্যাধী শত্রু ভেদনশীলঃ মহারথঃ একঃ সহস্রং জয়তি স মহারথঃ রাজন্যঃ ক্ষত্রিয়ঃ আজয়তাম্। দোগ্ধ্রী দুগ্ধ পূরয়িত্রী আজয়তাম্। অনড়ান্ বৃষভো বোঢ়া বহনশীলো জায়তাম্। সপ্তিরশ্ব আশুঃ শীঘ্রগামী—যোষা স্ত্রী পুরন্ধিঃ পুরং শরীরং সর্ব্বগুণসম্পন্নং দধাতি পুরন্ধিঃ। রথে তিষ্ঠতি, রথেষ্ঠাঃ রথে স্থিতো যুযুৎসুর্নরোঃ জিষ্ণু জয়শীলো জায়তাম্। অস্য যজমানস্য যুবা সমর্থঃ সভেয়ঃ সভায়াং যোগ্যো বীরঃ পুত্রো জায়তাম্। পর্জ্জন্যো নিকামে নিকামে নিতরাং বর্ষতু। নোঽস্মাকমোষধয়ঃ যবাদ্যাঃ ফলবত্যঃ ফলযুক্তাঃ পচ্যন্তাং স্বয়মেব পক্কা ভবন্তু। নোঽস্মাকং যোগক্ষেমঃ অলব্ধলাভো যোগঃ লব্ধস্য পরিপালনং ক্ষেমঃ কল্পতাং কৢপ্তো ভবতু।

বঙ্গার্থ। হে ব্রহ্মণ! আমাদিগের রাষ্ট্রে ব্রহ্মবর্চ্চসম্পন্ন (যজ্ঞাধ্যয়নশীল) ব্রাহ্মণ জন্ম গ্রহণ করুন, অস্ত্রবিদ্যা-নিপুণ, শত্রু-দমনকারী, মহারথ (এক সহস্র রথীকে যিনি জয় করেন, তিনি মহারথ) পরাক্রমশালী ক্ষত্রিয় জন্মগ্রহণ করুন্, ধেনু সকল দুগ্ধবতী হউক, বৃষভেরা ভারবহনশীল হউক, অশ্ব সকল বেগগামী হউক, স্ত্রীগণ সর্ব্বগুণসম্পন্ন শরীর ধারণ করুন্, রথিগণ জয়শীল হউন্, যজমানের সমর্থ (যুবা) সুসভ্য ও বীর পুত্র জাত হউক, পর্জ্জন্য যথেষ্ট বারি বর্ষণ করুন্. ওষধিগণ ফলবতী হউক্ ও উত্তম পক্কদশা প্রাপ্ত হউক এবং আমাদের যোগ-ক্ষেম (অলব্ধ বস্তুর লাভ ও লব্ধ বস্তুর রক্ষণ) সুসম্পন্ন হউক।

আমিত্বের-প্রসার।

(ক্ষত্রিয়।)

যদি জীবন কুসুমকে পূর্ণরূপে বিকসিত করিতেও না পার, যদি বিশ্বজীবনের সহিত তোমার ব্যক্তিগত জীবনের বিরোধ সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করিতেও সমর্থ না হও, যদি ব্রাহ্মণ না হইতেও পার, তাহাহইলে অন্ততঃ ক্ষত্রিয়ত্ব অধিকার করিতে কৃতসঙ্কল্প হও। ভারতের দুর্গতি অপনয়নের জন্য ব্রাহ্মণেরও যেরূপ প্রয়োজন, ক্ষত্রিয়েরও তদ্রূপ প্রয়োজন রহিয়াছে। ব্রাহ্মণের জ্ঞাননিষ্ঠা ও ক্ষত্রিয়ের কর্ম্মনিষ্ঠাই ভারতমাতার মুখ উজ্জল করিয়াছিল; কিন্তু ভারতে সাত্ত্বিকজ্ঞানবিজ্ঞানসম্পন্ন ব্রাহ্মণ বা রাজসিক কর্ম্মিষ্ঠ ক্ষত্রিয়, ইহাদিগের কেহই নাই; জ্ঞান ও কর্ম্ম, এই উভয় হইতেই বঞ্চিত হইয়া সমগ্র ভারতবাসী তমোগুণসম্পন্ন আলস্য ও প্রমাদপূর্ণ শূদ্রে পরিণত হইয়াছে। ভারতবাসী যেরূপ জ্ঞান-বিজ্ঞান, শমদমাদি হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছেন, তদ্রূপ শৌর্য্য-বীর্য্য, উৎসাহ-উদ্যমাদি হইতেও ভ্রষ্ট হইয়াছেন। নামে ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য, কিন্তু কার্য্যতঃ সকলেই শূদ্র। কি আর্য্যাবর্ত্ত, কি দাক্ষিণাত্য, তমোগুণ সর্ব্বত্রই স্বীয় অধিকার বিস্তার করিয়াছে। ধনী বা দরিদ্র, সন্ন্যাসী বা গৃহস্থ, সকলেই ধ্বংসশক্তির করালকবলে পতিত হইয়াছে। নব নব ব্যাধির রূপ ধারণ করিয়া তমঃশক্তি

লোকালয়সমূহ নিবিড় কাননে পরিণত করিতেছে, কিন্তু নিরুদ্যম শূদ্র ভারতবাসী তাহাতে কটাক্ষপাতও করিতেছে না! অনাবৃষ্টি বা অতিবৃষ্টির মূর্ত্তি ধারণ করিয়া তমঃশক্তি শস্যাদির ধ্বংস সাধন করিতেছে; কিন্তু শূদ্র ভারতবাসী জড়বৎ নিশ্চেষ্ট ও নিষ্ক্রিয়। যখন ভারতে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় ছিলেন, তখন জ্ঞানী ব্রাহ্মণ তমঃশক্তির বিবিধ উপদ্রব নিরাকরণের উপায় উদ্ভাবন করিতেন এবং কর্ম্মী ক্ষত্রিয় তাহা কার্য্যে পরিণত করিতেন। ঔষধাদি আবিষ্কার করিতেন ব্রাহ্মণ, কিন্তু উহার বহুল বিস্তার করাইতেন ক্ষত্রিয়; সরোবর কূপাদি খননের প্রকৃষ্ট রীতি উদ্ভাবন করিতেন ব্রাহ্মণ, কিন্তু পর্জ্জন্যদেব বারিবর্ষণ না করিলে, ঐ সমুদায় জলাশয় খনন করাইতেন ক্ষত্রিয়; আবার পর্জ্জন্যদেব অধিক বারিবর্ষণ করিলে, জলনির্গমের উপায় উদ্ভাবন করিতেন ব্রাহ্মণ এবং উহা কার্য্যে পরিণত করিতেন ক্ষত্রিয়। নূতন নূতন অস্ত্র বিজ্ঞানবলে আবিষ্কার করিতেন ব্রাহ্মণ, কিন্তু ঐ অস্ত্রদ্বারা যুদ্ধ করিতেন ক্ষত্রিয়। ব্রাহ্মণ ছিলেন জ্ঞানবীর, ক্ষত্রিয় কর্ম্মবীর। জ্ঞান ও কর্ম্মের প্রভাবেই ভারত উন্নতি-শিখরে আরোহণ করিয়াছিল, উহাদের অভাবেই ভারত অবনতির অধস্তলপ্রদেশে পতিত হইয়াছে। সুতরাং পতিত ভারতকে পুনরুন্নত করিতে হইলে যেমন ব্রাহ্মণ চাই, তদ্রূপ ক্ষত্রিয়ও চাই। ক্ষত্রিয়ত্ব ও ব্রাহ্মণত্ব পরস্পর সাপেক্ষ; ব্রাহ্মণ না থাকিলে ক্ষত্রিয় থাকিতে পারে না, ক্ষত্রিয় না থাকিলে ব্রাহ্মণ থাকিতে পারে না। যখন ভারতে কর্ম্মের অবহেলা আরম্ভ হইল, যখন কর্ম্মের সাহায্য অপেক্ষা না করিয়া, জ্ঞানই সমস্ত ভার স্বীয় স্কন্ধে লইলেন, যখন ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়-ধ্বংসসাধনে প্রবৃত্ত হইলেন, তখনই কর্ম্মের সাহায্য ব্যতীত জ্ঞান কেবল বাগ্বিতণ্ডায় পরিণত হইল; তখনই ভারতের অবনতি আরম্ভ হইল। ভারতের উন্নতিসাধন করিতে যেমন জ্ঞানের আবশ্যক, তেমনই কর্ম্মের আবশ্যক, যেমন ব্রাহ্মণের আবশ্যক, তেমনই ক্ষত্রিয়ের আবশ্যক। জ্ঞান ও কর্ম্মের সামঞ্জস্য সংস্থাপিত হইলেই ভারতের ভবিষ্যৎ আশাপ্রদ হইবে।

রাজসিকভাবই উন্নতিশীল সাধনে ক্রমে সাত্ত্বিকভাবে পরিণত হয়; ক্রিয়াশীল রজশক্তিই সত্ত্বশক্তিতে পরিণত হয়। তামসিকশক্তি ইহাদের বিরোধিশক্তি; এই শক্তি রজঃ ও সত্ত্বের ধ্বংস সাধন করে। ফুল্ল ফুল ফুলের সাত্ত্বিক অবস্থা, কিন্তু ক্রিয়াশীলা রজঃশক্তি তমঃশক্তিকে পরাভব করিতে না পারিলে, ফুল এই সাত্ত্বিক অবস্থা প্রাপ্ত হইতে পারে না। যে ফুলে তমঃশক্তি অধিক, সে ফুল বিকশিত হয় না,—সে মুকুলেই শুষ্কতা প্রাপ্ত হয়। জড়জগৎ অপরিবর্ত্তনীয় নিয়মের অধীন; তাহাদের সাত্ত্বিক, রাজসিক বা তামসিকশক্তির ক্ষয়বৃদ্ধি করিবার সামর্থ্য নাই, কিন্তু মানবের ইচ্ছাশক্তি থাকায়, মানব ইচ্ছানুসারে শক্তিবিশেষের হ্রাস ও বৃদ্ধি করিতে পারেন। ইচ্ছাশক্তির প্রভাবে তিনি তমঃশক্তি পরাভব করিয়া রজ ও সত্ত্বশক্তি বৃদ্ধি করিতে পারেন। কিন্তু সকলেরই জানা উচিত যে, তম-শক্তি সত্ত্বশক্তির ধ্বংস ভিন্ন কখন উহার বৃদ্ধি করে না। কোন কার্য্য না করিলে, কিম্বা ভিক্ষাবৃত্তির দ্বারা জীবন ধারণ করিলে, কিম্বা বৃক্ষতলে অলসভাবে জীবন যাপন করিলে, সাত্ত্বিকতা লাভ করা যায় না। উহা সমুদায়ই তামসিক। মনু বলেন "যাচিষ্ণুতা" "তামসং গুণলক্ষণম্"। গীতায় দেখিবেন "অলসঃ" "বিষাদী" "দীর্ঘসূত্রী" কর্ত্তা তামস। বস্তুর ধ্বংস করিয়া বস্তুর বিকাশ করা যায় না। কার্য্য না করিয়া কখনও সাত্ত্বিকতা প্রাপ্ত হওয়া যায় না। রজও যেরূপ ক্রিয়াশীল,

সত্ত্বও তদ্রূপ ক্রিয়াশীল; প্রভেদ এই যে—রজশক্তি অধিক থাকিলে কার্য্যের অসামঞ্জস্য ("কর্ম্মণামশমঃ"—গীতা) উপস্থিত হয়, সত্ত্বশক্তি উহার সামঞ্জস্য স্থাপনা করে। বালক ব্যায়াম করিতে আরম্ভ করিল, কিন্তু দিবা রাত্রি—সময় অসময় নাই, সকল সময়েই ব্যায়াম করিতেছে। এটি কার্য্যের অসমতা। পিতা মাতা তাহার ব্যায়ামকাল নির্দ্ধারণ করিয়া দিলেন। সত্ত্ব রজকে এইরূপে নিয়মিত করে। রজ সত্ত্বদ্বারা নিয়মিত হইলেই উত্তম ফল-প্রাপ্তি হয়। এই জন্যই ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণানুগত ছিলেন। নবীনের ক্রিয়াশক্তি এবং প্রবীণের জ্ঞানশক্তির সম্মিলন যেরূপ সুফলপ্রদ, তদ্রূপ ক্ষত্রিয়ের ক্রিয়াশক্তি এবং ব্রাহ্মণের জ্ঞানশক্তির সম্মিলনও সুফলপ্রদ। কিন্তু যৌবনে যে ব্যক্তি কোন কার্য্য না করে, সে কথনও বার্দ্ধক্যে জ্ঞানের অধিকারী হয় না। কার্য্যদ্বারাই জ্ঞানলাভ হয়, রজদ্বারাই সাধনোৎকর্ষে সত্ত্বের লাভ হয়; ক্ষত্রিয় হইতে পারিলেই ব্রাহ্মণ হওয়া সুসাধ্য হয়। একেবারে কেহ ব্রাহ্মণ হইতে পারে না।

"ন কর্ম্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে।"

অর্থাৎ পুরুষ কর্ম্মানুষ্ঠান না করিলে, জ্ঞান (নিষ্ক্রিয়তা—বৈরাগ্য) লাভ করিতে পারে না।

"নৈষ্কর্ম্ম্যং" অর্থে "জ্ঞানযোগেন নিষ্ঠা"।

"নিষ্ক্রিয়াত্মস্বরূপেণৈবাবস্থিতিম্॥"

জ্ঞানযোগের দ্বারা যে নিষ্ঠা, নিষ্ক্রিয়াত্মস্বরূপে যে অবস্থিতি, তাহাকে 'নৈষ্কর্ম্ম্য' বলা যায়। ব্রহ্মত্ব-প্রাপ্তি হইলে, মানবের কর্ম্ম থাকে না; কিন্তু উপাধিবিশিষ্ট জগতে মানব কর্ম্ম ব্যতীত থাকিতে পারে না; সুতরাং যে পর্য্যন্ত মুক্তি না হয়, সে পর্য্যন্ত কর্ম্ম করিতেই হইবে। কর্ম্ম ব্যতীত মুক্তিলাভের সম্ভাবনা নাই। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ইহাই গীতায় বহু স্থানে বহুবিধভাবে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন।

"ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ। কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম্মসর্ব্বঃ প্রকৃতিজৈগু ণৈঃ॥" গীতা।৩।৫

কেহ কখন কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ক্ষণমাত্রও অবস্থান করিতে পারে না; ইচ্ছা না করিলেও প্রকৃতিজাত গুণসমুদায়ই সকলকে কর্ম্মে বাধ্য করে। অতএব তামসিক আলস্য পরিত্যাগ করিয়া নিয়তই কর্ম্ম কর; হে ভারতবাসি! তুমি কর্ম্ম করিতে আরম্ভ করিলেই, মাতৃভূমির বর্ত্তমান দুর্দ্দশা থাকিবে না।

"নিয়তং কুরুকর্ম্মত্বং কর্ম্ম জ্যায়ো হ্যকর্ম্মণঃ। শরীরযাত্রাপি চ তেন ন প্রসিধ্যেদকর্ম্মণঃ॥" গীতা ৩।৮

তুমি নিয়ত কর্ম্মানুষ্ঠান কর; কর্ম্ম না করা অপেক্ষা কর্ম্ম করাই শ্রেষ্ঠ; আর কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হইলে তোমার জীবন-যাত্রাও নির্ব্বাহ হইবে না।

আলস্যই ভারতবর্ষের সর্ব্বনাশের মূল। তমঃশক্তিই সমগ্র ভারতবর্ষে ব্যাপ্ত হইয়াছে। অতএব হে ভারতবাসি! তুমি সত্ত্ব-শাসিত রজশক্তির দ্বারা তমঃশক্তির নাশ করিয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত হও। যদি এই উপাধিগ্রস্ত ক্ষুদ্র "আমি" কে প্রসারিত করিতে চাও, যদি এই মায়া-প্রপঞ্চ অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মানন্দ সম্ভোগ করিতে চাও, যদি দুঃখজনক সীমাবিশিষ্ট "অল্প" পরিত্যাগ করিয়া নিত্যানন্দ অসীম "ভূমা" অধিকার করিতে চাও, এক কথায়—যদি আমিত্বের প্রসার করিতে চাও, ভগবান্ কৃষ্ণের উপদেশ

স্মরণ করিয়া নিয়ত কর্ম্ম করিতে থাক। যদি জীবনমুক্ত হইতে চাও, ব্রাহ্মণ হও; যদি ব্রাহ্মণ হইতে চাও, ক্ষত্রিয় হও; যদি ক্ষত্রিয় হইতে চাও, নিয়ত কর্ম্ম-যোগে প্রবৃত্ত থাক।

(কস্যচিদ্ পরিব্রাজকস্য)

মণিরত্নমালা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

মূল—১৩

বিদ্যা হি কা ব্রহ্মগতিপ্রদা যা, বোধো হি কো যস্তু বিমুক্তিহেতুঃ। কো লাভ আত্মাবগমো হি যো বৈ। জিতং জগৎ কেন মনোহি যেন॥

শিষ্য প্রশ্ন করিলেন (৩৬) বিদ্যা কাহাকে কহে? গুরু উত্তর করিলেন, যাহাদ্বারা জীব "ব্রহ্মগতি" বা ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হয়, তাহাকে বিদ্যা বলে। এই বিদ্যার নাম ব্রহ্মবিদ্যা বা অধ্যাত্মবিদ্যা। ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যা। ভগবান্ স্বয়ং বলিয়াছেন—"অধ্যাত্মবিদ্যা বিদ্যানাং" (অহং) বিদ্যা সকলের মধ্যে আমি অধ্যাত্ম-বিদ্যা। (গীতা)

শৌনক মহর্ষি অঙ্গিরাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি জানিলে সমস্তই জানিতে পারা যায়—অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞ হওয়া যায়? তদুত্তরে অঙ্গিরা বলিয়াছিলেন—"দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে"—বিদ্যা দুই প্রকার জানিবে। "তত্রাপরা ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্ববেদঃ শিক্ষাকল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি। অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে" ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ ও অথর্ব্ববেদ, এই বেদচতুষ্টয় ও শিক্ষাশাস্ত্র, কল্প (সূত্রগ্রন্থ) ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ ও জ্যোতিষ, বেদের ছয়টি অঙ্গ; ইহারা সমস্তই অপরা, অর্থাৎ ধর্ম্মাধর্ম্ম-সাধন ও তৎফল বিষয়ক (লৌকিক) বিদ্যা (অবিদ্যান্তর্ব্বর্ত্তিনী অশ্রেষ্ঠ-বিদ্যা) আর যে বিদ্যাদ্বারা অক্ষর পরব্রহ্মকে জানা যায়, তাহার নাম পরাবিদ্যা বা ব্রহ্মজ্ঞান।

(মুণ্ডকোপনিষদ্)

"অনিত্যাশুচিদুঃখানাত্মসু নিত্যশুচি সুখাত্ম-খ্যাতিরবিদ্যা।" (পাতঞ্জলদর্শন)

অনিত্য, অশুচি, দুঃখ ও অনাত্মপদার্থের উপর যথাক্রমে নিত্য, শুচি, সুখ ও আত্মরূপ জ্ঞান হওয়ার নাম অবিদ্যা। অর্থাৎ যে বস্তুর যাহা প্রকৃতস্বরূপ নহে, তাহাতে তদ্বোধক জ্ঞান হওয়ার নাম অবিদ্যা। পরাবিদ্যাই উক্ত অবিদ্যাকে বিনাশ করিয়া জীবের মোক্ষপ্রাপ্তির কারণ হইয়া থাকে। মনুষ্য যাবৎ এই পরা-বিদ্যা লাভ করিতে না পারে, তাবৎ তাহাকে অবিদ্যার বশবর্ত্তী থাকিয়া মৃত্যুময় সংসারে কেবল যাতায়াত করিতে হয়। (১) অপরা বিদ্যা ব্রহ্মপ্রাপ্তির প্রত্যক্ষ কারণ না হইলেও উহা পরাবিদ্যা লাভ বিষয়ে বিশিষ্ট সাহায্য করিয়া থাকে। বিষ্ণুপুরাণে বলিয়াছেন,—

"দ্বে ব্রহ্মণী বেদিতব্যে শব্দব্রহ্মপরঞ্চ যৎ।
শব্দব্রহ্মণি নিষ্ণাতঃ পরব্রহ্মাধিগচ্ছতি॥"

'ব্রহ্ম দুই প্রকার জানিবে—প্রথম শব্দ-ব্রহ্ম (বেদ), দ্বিতীয় পরব্রহ্ম; শব্দব্রহ্মকে জানিলে তবে পরব্রহ্মকে জানিতে পারা যায়। সুতরাং বেদাদি শাস্ত্রের অনুশীলন সর্ব্বথা কর্ত্তব্য। আবার ভাগবতে বলিতেছেন,—

শব্দব্রহ্মণি নিষ্ণাতো ন নিষ্ণায়াৎ পরে যদি
শ্রমস্তস্য শ্রমফলোহ্যধেনুমিব রক্ষতঃ

যদি কোন ব্যক্তি অধ্যয়নাদি দ্বারা শব্দ-ব্রহ্মের পারগামী হয়, অথচ পরব্রহ্মের ধ্যানাদি না করে, শব্দব্রহ্মে অভিজ্ঞ পাণ্ডিত্যাভিমানী সেই পুরুষের শাস্ত্রে যে শ্রম, তাহা কেবল বন্ধ্যা-গোরক্ষণের ন্যায় শ্রম-ফল মাত্র। সে শ্রম পুরুষার্থ-পর্য্যবসায়ী নহে। সুকৃতী মানব সদ্‌গুরুর সন্নিধানে "নিত্যানিত্য-বস্তু-বিবেক" "ইহামুত্র-ফলভোগ-বিরাগ" "শমদম-উপরতি-তিতিক্ষাশ্রদ্ধা-সমাধান" ও "মুমুক্ষুত্ব" এই "সাধন চতুষ্টয়" সম্পন্ন হইয়া বাস করিলে, কালে তাঁহার প্রসাদে পরাবিদ্যা লাভ করিবার যোগ্য হইতে পারেন।

বিদ্যার স্বরূপ।

১। বিদ্যাত্মনি ভিদাবাধঃ। (ভাগবত)

আত্মাতে অভেদ জ্ঞানের নাম বিদ্যা—অর্থাৎ যত জীবদেহ, তত আত্মা নহে; আত্মা এক মাত্র। জগতের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র নানা ভাবের পদার্থ সমূহে একমাত্র পরমাত্মাকে পৃথক্ পৃথক্-রূপে নানাভাবে অবস্থিত বোধ না করিয়া, অবিভক্ত সর্ব্বময়রূপে অবস্থিত বোধ করাই বিদ্যা।

২। "নাহং দেহশ্চিদাত্মেতি বুদ্ধির্বিদ্যেতি ভণ্যতে"

(অধ্যাত্ম রামায়ণ),

অর্থাৎ পঞ্চমহাভূতসম্ভব বিকারী পরিণামী এই স্থূল শরীর "আমি" নহে। নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-সচ্চিদানন্দ আত্মাই "আমি" এই প্রকার বুদ্ধিকে বিদ্যা কহে (১)।

৩। জ্ঞাতৃজ্ঞেয়াদ্যুপাধিস্তু যদা নশ্যতি সত্তমাঃ।
সর্ব্বৈক-ভাবনাবুদ্ধিঃ সা বিদ্যেত্যভিধীয়তে॥
(নারদীয়পুরাণ)

হে সাধুশ্রেষ্ঠগণ! যখন জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয়রূপ উপাধি বা ভেদ-বুদ্ধি বিনষ্ট হইয়া যায়, তখন জ্ঞানের পূর্ণবিকাশে নিখিল জগৎ ব্রহ্মময় বলিয়া প্রতীয়মান হয় এবং জ্ঞেয় এক অদ্বিতীয় পূর্ণব্রহ্ম সাধকের সম্মুখে বিরাজ করিতে থাকেন। যাহা হইতে মানব এই প্রকার সর্ব্বোৎকৃষ্ট সংস্কার লাভ করে, সেই "সর্ব্বৈক-ভাবনা" বুদ্ধিকে (২) বিদ্যা কহে।

ব্রহ্মবিদ্যা সমাবিদ্যা ব্রহ্মবিদ্যা সমাক্রিয়া।
ব্রহ্মবিদ্যা সমং জ্ঞানং নাস্তি নাস্তি কদাচন॥
(তন্ত্র)

ভগবান্ শিব বলিয়াছেন,—"ইহা স্থির জানিও যে ব্রহ্মবিদ্যার তুল্য বিদ্যা নাই, ব্রহ্ম-বিদ্যার তুল্য ক্রিয়া নাই এবং ব্রহ্মবিদ্যার তুল্য বিদ্যা নাই-নাই-নাই"। ব্রহ্মবিৎ ব্যক্তিকেই প্রকৃত বিদ্বান্ বলিয়া নিরালম্বোপনিষদে উল্লেখ করিয়াছেন।

(১) অবিদ্যাবশগা যে তু নিত্যং সংসারিণশ্চতে।
বিদ্যাভ্যাসরতা যে তু নিত্যমুক্তাস্ত এব হি॥
(অধ্যাত্ম রামায়ণ)

(১) অহং দেবো ন চান্যোঽস্মি ব্রহ্মৈবাহং ন শোকভাক্।
সচ্চিদানন্দরূপোঽহং নিত্যমুক্তস্বভাববান্॥
(আহ্নিকতত্ত্ব)

আত্মা এবং ব্রহ্ম একই পদার্থের বোধক।

(২) জ্ঞানং জ্ঞেয়ং তথা জ্ঞাতা ত্রিতয়ং ভাতি মায়য়া।
বিচার্য্যমানে ত্রিতয়ে আত্মৈবৈকোঽবশিষ্যতে॥
জ্ঞানমাত্মৈব চিদ্রূপো জ্ঞেয়মাত্মৈব চিন্ময়ঃ।
বিজ্ঞাতা স্বয়মেবাত্মা যো জানাতি স আত্মবিৎ॥
(মহানির্ব্বাণ তন্ত্র)

অভেদ-প্রত্যয়ো যস্তু জগতাং পরমাত্মনা।
সৈবভক্তিরিতিজ্ঞেয়া দেবানামপি দুর্লভা॥
(বেদান্ত)

"সর্ব্বান্তরস্থং সচ্চিদ্রূপং পরমাত্মানং যো বেত্তি স বিদ্বান্"।

"সর্ব্বভূতের অন্তরে স্থিত সৎস্বরূপ ও চৈতন্য-স্বরূপ পরমাত্মাকে যিনি জানেন, তিনিই বিদ্বান্"। পরমাত্মা বা ব্রহ্মকে জানিতে পারিলে, প্রাপ্ত হইলে বা তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ করিলে, জীব কর্ম্মবন্ধবিনির্মুক্ত হইয়া নির্ব্বাণ মুক্তিলাভ করে।

তমেব বিদ্বানত্যেতি মৃত্যুং পন্থা ন চেতরঃ।
জ্ঞাত্বা দেবং পাশহানিঃ ক্ষীণৈঃ ক্লেশৈর্নজন্মভাক্ ॥
(পঞ্চদশী)

তাঁহাকে জানিয়াই লোকে মৃত্যুর পথ হইতে রক্ষা পায়, অর্থাৎ মুক্তিলাভ করে; মুক্তিলাভের অন্য পথ আর নাই। সেই দেবকে জানিলেই সংসার-বন্ধন শিথিল হয়, সমস্ত ক্লেশ বিনষ্ট হয় এবং পুনর্জ্জন্ম নিবারিত হয়। বিদ্যাদ্বারাই সেই অক্ষর পরব্রহ্মকে জানিতে পারা যায় বলিয়া বিদ্যাভ্যাসে যত্নবান হওয়া মুমুক্ষু ব্যক্তির অবশ্য কর্ত্তব্য। (৩৭) বোধ (জ্ঞান) কি? যাহা বিমুক্তির কারণ তাহাকেই জ্ঞান কহে।

মুক্তি—"মুক্তির্হিত্বান্যথারূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ।" (ভাগবত)

"স্বরূপাবস্থিতির্মুক্তিস্তদ্ভ্রংশোঽহনন্তবেদনম্ ॥"
(যোগবাশিষ্ঠ)

আত্মা অন্যথারূপ পরিত্যাগ করিয়া যে আপন স্বরূপে অবস্থিতি করে, এই স্বরূপাবস্থিতির নাম মুক্তি; আর অহংজ্ঞানের বশবর্ত্তী হইয়া যে বহুত্বভাবের মনন করে, অর্থাৎ অহং-মমাদিজ্ঞানদ্বারা আমি সুখী, আমি দুঃখী, আমার দেহ, ইত্যাদিরূপ যে চিন্তা করে, তাহারই নাম বন্ধন। আত্মার নিরাকার ও নিঃসঙ্গভাবে এবং অখণ্ডরূপে অবস্থানের নাম স্বরূপাবস্থিতি বা ব্রহ্মভাব এবং প্রকৃতির সংসর্গহেতু অন্যথা-রূপে অর্থাৎ সাকার ও সসঙ্গভাবে এবং খণ্ড-রূপে অনন্তমূর্ত্তিতে অবস্থানের নাম জীবভাব।

রজ্জুসর্পজ্ঞানমিবাদ্বিতীয়ে সর্ব্বানুস্যূতে সর্ব্বময়ে ব্রহ্মণি দৈবে তির্য্যক্ সুরনরস্ত্রীপুরুষবর্ণাশ্রমবন্ধমোক্ষাদি নানাকল্পনাজ্ঞানমজ্ঞানম্।
(নিরালম্বোপনিষদ্)

"রজ্জুতে যে প্রকার সর্পভ্রম হয়, সেইরূপ এই বিশ্বব্যাপী একমাত্র সত্যস্বরূপ ব্রহ্মপদার্থে পশুপক্ষী—সুরনরাদি এবং স্ত্রী-পুরুষ, বর্ণাশ্রম ও বন্ধমোক্ষাদি সমুদায় বিষয়কে সত্য বলিয়া যে জ্ঞান, তাহার নাম অজ্ঞান বা অবিদ্যা।"

"পরমাত্মা অবিদ্যা বা অজ্ঞানদ্বারা কলঙ্কিত হইয়া ভ্রমবশতঃ জীবাত্মা নাম গ্রহণ করিয়া বন্ধনদশা প্রাপ্ত হয়।" বিদ্যা বা জ্ঞানরূপ অসি-দ্বারা অজ্ঞানমূলক এই বন্ধন ছেদন করিয়া, আত্মার স্বাধীনতা সম্পাদন করিতে পারিলেই মুক্তিলাভ হয়। (ক্রমশঃ)

শ্রীপাঁচকড়ি চট্টোপাধ্যায়
(পূর্ব্বনপাড়া)

আর্ত্তত্রাণনারায়ণস্তোত্রম্।

(পূর্ব্বতোনুবৃত্তম্)

যোদ্ধাসৌ ভুবনত্রয়ে মধুপতির্ভর্ত্তা নরাণাং বলে, রাধায়া অকরোদ্রতে রতিমনঃ পূর্ত্তিং সুরেন্দ্রানুজঃ। যো বা রক্ষতি দীনপাণ্ডুতনয়ান্ নাথেতি ভীতিং গতা, নার্ত্তত্রাণপরায়ণঃ সুভগবান্ নারায়ণো মে গতিঃ॥ ১২॥

যিনি ত্রিভুবনমধ্যে অদ্বিতীয় যোদ্ধা, যিনি মধুপতি, যিনি মনুষ্য সকলের ভরণকর্ত্তা, যিনি শ্রীরাধার সকলপ্রকার মনস্কামনা পূর্ণ করিয়াছিলেন, যিনি সুরেন্দ্রানুজ, পাণ্ডুপুত্রগণ ভীত হইয়া "নাথ" এই বলিয়া যাঁহার শরণাপন্ন হইয়াছিলেন, সেই আর্ত্তত্রাণপরায়ণ নারায়ণ আমার গতি॥ ১২॥

যঃ সান্দীপনিদেশতশ্চ তনয়ং লোকান্তরাৎ সন্নতং, চানীয়প্রতিপাদ্য পুত্রমরণাদুজ্জৃম্ভমানার্ত্তয়ে। সন্তোষং জনয়ন্নমেয় মহিমা পুত্রার্থসম্পাদনাদার্ত্তত্রাণপরায়ণঃ সভগবান্ নারায়ণো মে গতিঃ (১)॥ ১৩॥

যিনি (স্বীয় গুরু) সান্দীপনী মুনির আদেশে মৃত্যুলোক হইতে তাঁহার পুত্রকে আনয়ন করিয়া পুত্রের মৃত্যুবশতঃ কাতর পিতার সন্তোষ উৎপন্ন করিয়াছিলেন, সেই অমেয় মহিমাসম্পন্ন আর্ত্তত্রাণপরায়ণ নারায়ণ আমার গতি॥ ১৩॥

যন্নামস্মরণাদঘৌঘসহিতো বিপ্রঃ পুরাজামিলঃ প্রাণান্মুক্তিমশেষিতা মনু চ যঃ পাপৌঘদাবার্ত্তিযুক্। সদ্যো ভাগবতোত্তমাত্মনি মতিং প্রাপাম্বরীষাভিধশ্চার্ত্তত্রাণপরায়ণঃ সভগবান্ নারায়ণো মে গতিঃ॥ ১৪॥

[বিপ্র অজামীল জীবদ্দশায় অত্যন্ত পাপাসক্ত ছিলেন, কিন্তু মৃত্যুকালে স্বীয় পুত্র নারায়ণ নাম করিয়া দেহত্যাগ করেন। নামের গুণে তাঁহাকে আর পাপ ভোগ করিতে হয় নাই; অপিতু তিনি বিষ্ণুলোকে গমন করিয়াছিলেন।] তজ্জন্য শ্রীকৃষ্ণনামের মাহাত্ম্য এত! এই নাম হেলাবশতঃ উচ্চারণ করিলেও অশেষ পাপ নষ্ট করে যথা—

"সাঙ্কেত্যং পারিহাস্যং বা স্তোভং হেলনমেব বা।
বৈকুণ্ঠনামগ্রহণমশেষাঘহরং বিদুঃ॥"

শ্রীভাগবতে ৬ স্কন্ধে ২ অধ্যায়ে।

"নামৈকং যস্য বাচিশরণপথগতং শ্রোত্রমূলং গতং বা। শুদ্ধং বাশুদ্ধবর্ণং ব্যবহিতরহিতং তারয়ত্যেব সত্যং॥

"পদ্মপুরাণে ব্রহ্মখণ্ডে ২৫ অধ্যায়ে।

অন্যত্র। "নামসঙ্কীর্ত্তনং বিষ্ণোর্হেলয়া কলিবর্দ্ধনঃ। কৃত্বাস্বরূপতাং যাতি ভক্তিযুক্তঃ পরং ব্রজেৎ॥" শ্রীহরিভক্তিবিলাসে ১১শ বিলাসে ২১৯ শ্লোক লিঙ্গপুরাণ ধৃতবচনং।

[এক্ষণ সেই অজামীলোপাখ্যানে শ্রীকৃষ্ণানুগ্রহ বর্ণন করিতেছেন] পূর্ব্বকালে অজামিল নামে পাপাত্মা ব্রাহ্মণ মৃত্যুকালে (স্বীয় পুত্র) "নারায়ণের" নাম করিয়া দেহত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার সমুদায় পাপ ধ্বংস হইয়া যায়; পরে সেই ব্রাহ্মণ অম্বরীষ নামে পরম ভাগবত হইয়া পরমেশ্বরে চিত্ত সমর্পণ করিয়াছিলেন; তাহাতে নারায়ণ তাঁহাকে মুক্তিপ্রদান করিয়াছিলেন। সেই আর্ত্তত্রাণপরায়ণ নারায়ণ আমার গতি॥ ১৪॥

যো রক্ষদ্ রসনাদিনিত্যরহিতং বিপ্রং কুচৈলাভিধং দীনাদ্দীনশ্চকোরপালনপরঃ শ্রীশঙ্খচক্রোজ্জ্বলঃ। তজ্জীর্ণাম্বরমুষ্টিমাত্র পৃথুকনাদায় ভুক্ত্বা

(১) গুরু ন উপাখ্যান দশমস্কন্ধে ৪৫ অধ্যায়ে আছে।

ক্ষণাদার্ত্তত্রাণপরায়ণঃ সভগবান্ নারায়ণো মে, গতিঃ ॥ ১৫ ॥ *

এক্ষণ সুদামের প্রতি অনুগ্রহ বর্ণন করিতেছেন। যিনি দীনহইতে দীনব্যক্তিরূপচকোরের পালনকর্ত্তা, সেই শঙ্খচক্রধারী উজ্জ্বলমূর্ত্তি নারায়ণ নিত্যবসনাদিবিহীন কুচৈলনামে ব্রাহ্মণকে রক্ষা করিয়াছিলেন, তাঁহার জীর্ণবস্ত্র হইতে, মুষ্টিমাত্র চিঁড়া গ্রহণ করিয়া তৎক্ষণাৎ ভক্ষণ করিয়াছিলেন। আর্ত্তত্রাণপরায়ণ সেই ভগবান নারায়ণ আমার গতি।

যৎকল্যাণগুণাভিরামমমলং মন্ত্রাণি সংশিক্ষতে যৎ সংশেতি পতিপ্রতিষ্ঠিতমিদং বিশ্বং বদত্যাগমঃ। যো যোগীন্দ্রমনঃ সরোরুহতমঃ প্রধ্বংসবিদ্ভানুমানার্ত্তত্রাণপরায়ণঃ সভগবান্ নারায়ণো মে গতিঃ ॥ ১৬ ॥

যাঁহার কল্যাণে মনোরম নির্ম্মল গুণ প্রাপ্ত হওয়া যায়, যাঁহাহইতে মন্ত্র সকল শিক্ষা করা যায়, আগম যাঁহাহইতে এই বিশ্ব প্রতিষ্ঠিত বলিয়াছেন; যিনি যোগীন্দ্রগণের মনঃ পদ্মের অন্ধকারনাশক ভানুস্বরূপ। আর্ত্তত্রাণপরায়ণ সেই ভগবান নারায়ণ আমার গতি ॥ ১৬ ॥

কালিন্দীহ্রদয়াভিরামপুলিনে পুণ্যে জগন্মঙ্গলে চন্দ্রাম্ভোজবটে পুটে পরিসরে ধাত্রা সমারাধিতে। শ্রীরঙ্গে ভুজগেন্দ্রভোগশয়নে শেতে সদা যঃ পুমানার্ত্তত্রাণপরায়ণঃ সভগবান্ নারায়ণো মে গতিঃ ॥ ১৭ ॥

যমুনার মধ্যবর্ত্তী মনোহর জগন্মঙ্গল পুণ্যপুলিনে চন্দ্র ও পদ্মদ্বারা শোভিত যে বিস্তীর্ণ স্থানে ব্রহ্মা যাঁহাকে আরাধনা করিয়াছিলেন, যিনি শ্রীরঙ্গে অনন্ত শয্যায় শয়ন করিয়া থাকেন, আর্ত্তত্রাণ-পরায়ণ সেই ভগবান নারায়ণ আমার গতি ॥ ১৭ ॥

বাৎসল্যাদভয়প্রদানসময়াদার্ত্তার্ত্তিনির্ব্বাপণা দৌদার্য্যাদঘশোষণাদগণিত শ্রেয়ঃ পদপ্রাপণাৎ। সেব্যঃ শ্রীপতিরেব সর্ব্বজগতামেতে হিতৎ সাক্ষিণঃ, প্রহ্লাদশ্চ বিভীষণশ্চ করিরাট্ পাঞ্চাল্যহল্যা ধ্রুবাঃ ॥

ইতি শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যবিরচিতমার্ত্তত্রাণপরায়ণ-নারায়ণস্তোত্রং সম্পূর্ণম্।

শ্রীকৃষ্ণ বাৎসল্যবশতঃ, অভয়প্রদান প্রতিজ্ঞাবশতঃ, আর্ত্তব্যক্তির দুঃখদূরীকরণবশতঃ ঔদার্য্যবশতঃ, পাপনাশকরণবশতঃ ও অসংখ্য মঙ্গলপদ দানবশতঃ সকলের পূজনীয়। এই সকল তাহার সাক্ষী,—প্রহ্লাদ, বিভীষণ, গজেন্দ্র, পাঞ্চালী, অহল্যা ও ধ্রুব ॥ ১৮ ॥

শ্রীবিধুভূষণ দেব।

অনুবাদ সম্পূর্ণ

* শ্রীভাগবতে ১০ম স্কন্ধে ৮০ অধ্যায়ে "চিপীটক উপাখ্যানম্"।

গঙ্গাষ্টকস্তোত্রম্।

ভগবতিভবলীলা-মৌলিমালে তবাম্ভঃ
কণমনুপরিমাণং প্রাণিনো যে স্পৃশন্তি।
অমর-নগরনারীচামরগ্রাহিণীনাং
বিগতকলিকলঙ্কাতঙ্কমঙ্কে লুঠন্তি ॥ ১ ॥

হে ভগবতি! তুমি মহাদেবের মস্তকের লীলার মালার স্বরূপ; তোমার জলের কণা-পরিমাণ যে প্রাণী স্পর্শ করেন, তিনি বিগত-পাপ হইয়া চামরব্যজনকারিণী অমর নগরের নারীগণের অঙ্কে বাস করেন। (আর তাঁহাকে এ ভবকারাগারে আসিতে হয় না) ॥ ১ ॥

ব্রহ্মাণ্ডং খণ্ডয়ন্তী হরশিরসিজটাবল্লিমুল্লাসয়ন্তী, স্বর্লোকাদাপতন্তী কনকগিরিগুহাগণ্ডশৈলাৎ স্খলন্তী। ক্ষৌণীপৃষ্ঠে লুঠন্তী দুরিতচয়চমূং নির্ভরং ভর্ৎসয়ন্তী, পাথোধিং পূরয়ন্তী সুর-নগর-সরিৎ পাবনী নঃ পুনাতু ॥ ২ ॥

তুমি ব্রহ্মার কমণ্ডলু হইতে নির্গত হইয়া, মহাদেবের মস্তকের জটাসমূহকে উল্লাস প্রদান করিয়া, স্বর্গ হইতে পতিত হইয়া, সুবর্ণময় সুমেরুপর্ব্বতের গুহার গণ্ডশৈল হইতে নির্গত হইয়া, ধরণী-পৃষ্ঠে পতিত হইয়া, সমুদায় পাপ ধ্বংস করিয়া, সমুদ্র পূর্ণ করিয়া, সুরনগরকে পবিত্র করিতেছ; তুমি আমাদিগকে পবিত্র কর ॥ ২ ॥

মজ্জন্মাতঙ্গকুম্ভচ্যুত-মদমদিরামোদমত্তালি-জালং, স্নানৈঃ সিদ্ধাঙ্গনানাং কুচযুগবিলসৎ-কুঙ্কুমাসঙ্গপিঙ্গং। সায়ং প্রাতর্মুনীনাং কুশ-কুসুমচয়ৈশ্ছন্নতীরস্থ নীরং, পায়ান্নো গাঙ্গমম্ভঃ করিকরভকরাক্রান্তরং হস্তরঙ্গম্ ॥ ৩ ॥

তোমার জলে হস্তীগণ স্নানকালীন কুম্ভ হইতে মদ ক্ষরণ করে, তাহাতে মধুকরগণ উন্মত্ত হয়; তোমার জল সিদ্ধাঙ্গনাগণের কুচযুগল হইতে বিগলিত কুঙ্কুমের সঙ্গবশতঃ পিঙ্গলবর্ণ হইয়াছে; সায়ংকালে ও প্রাতঃকালে মুনিগণের কুশ ও কুসুমসমূহে ব্যাপ্ত তীরস্থ গঙ্গাজল আমাদিগকে রক্ষা করুন। সেই গঙ্গার তরঙ্গে হস্তী, হস্তীশাবকের শুণ্ডদ্বারা আস্ফালিত হইতেছে ॥ ৩ ॥

আদাবাদি পিতামহস্য নিয়মব্যাপারপাত্রে জলং পশ্চাৎ পন্নগশায়িনো ভগবতঃ পাদোদকং পাবনম্। ভূয়ঃ শম্ভুজটাবিভূষণমণির্জহ্নোর্মহর্ষে-রিয়ং কন্যাকল্মষনাশিনী ভগবতী-ভাগীরথী-ভূতলে ॥ ৪ ॥

তুমি প্রথমে ব্রহ্মার কমণ্ডলে নিয়মিত ব্যাপারে ছিলে, পরে ভগবান্ অনন্তের পবিত্র পাদোদকরূপে ছিলে; পুনরায় শম্ভুর জটা-বিভূষণ হইয়াছিলে, পশ্চাৎ মহর্ষি জহ্নুর কন্যারূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলে; পরে ভগীরথ তোমাকে ভূতলে আনয়ন করিয়াছিলেন; তজ্জন্য তোমাকে পাপনাশিনী ভগবতী ভাগী-রথী কহিয়া থাকে ॥ ৪ ॥

শৈলেন্দ্রাদবতারিণীনিজজলে মজ্জজ্জনোত্তারিণী, পারাবারবিহারিণী ভবভয়শ্রেণীসমুৎসারিণী। শেষাঙ্গৈরনুকারিণী হরশিরো বল্লী-দলাকারিণী, কাশীপ্রান্তবিহারিণী বিজয়তে গঙ্গা-মনোহারিণী ॥ ৫ ॥

তুমি হিমালয় হইতে অবতীর্ণ হইয়া, নিজ জলে যে ব্যক্তি অবগাহন করে, তাহাকে ত্রাণ কর; তুমি সাগরবিহারিণী; সংসারের সমস্ত ভয় নাশ কর, তুমি সর্পের ন্যায় বক্রগামিনী, মহাদেবের মস্তকে পত্রদলের ন্যায় অবস্থিতি কর; তুমি কাশী-প্রান্ত-বিহারিণী সেই মনোহারিণী গঙ্গা জয়যুক্তা হও ॥ ৫ ॥

কুতোবীচির্বীচিস্তব যদি, গতা লোচনপথং
ত্বমা পীতাপীতাম্বরপুরনিবাসং বিতরসি। ত্বদুৎ-
সঙ্গে গঙ্গে পততি যদি কায়স্তনুভৃতাং, তদা
মাতঃ শাতক্রতবপদলাভোপ্যতি লঘুঃ॥ ৬॥

যদি কোন লোক তোমার তরঙ্গ দর্শন করে, কিম্বা তোমার জল পান করে, তাহা হইলে তুমি তাহাকে শ্রীকৃষ্ণের নিবাসে (বৈকুণ্ঠে) বাস বিতরণ কর। হে গঙ্গে! যদি জীবের দেহ তোমার উৎসঙ্গে পতিত হয়, তাহাহইলে ইন্দ্রত্বপদ-লাভও তাহার নিকট তুচ্ছ বলিয়া বোধ হয়॥ ৬॥

ভগবতি-তবতীরে নীরমাত্রাশনোঽহং
বিগতবিষয়তৃষ্ণঃ কৃষ্ণমারাধয়ামি।
সকলকুলষভঙ্গে স্বর্গসোপানসঙ্গে-
তরলতরতরঙ্গে দেবি গঙ্গে প্রসীদ॥ ৭॥

হে ভগবতি! তোমার তীরে কেবলমাত্র জল পান করিয়া ও বিষয়-তৃষ্ণা দূর করিয়া কৃষ্ণকে আরাধনা করিতেছি। তুমি সমুদায় পাপ নাশ কর, তুমি স্বর্গের সোপানস্বরূপ, হে তরলতরঙ্গে দেবি গঙ্গে! আমার প্রতি প্রসন্না হও॥ ৭॥

মাতঃ! শাম্ভবিশম্ভুসঙ্গমিলিতে মৌলৌ নিধায়াঞ্জলিং, ত্বত্তীরে বপুষোঽবসানসময়ে নারায়ণাঙ্ঘ্রিদ্বয়ম্। সানন্দং স্মরতো ভবিষ্যতি মম প্রাণপ্রয়াণোৎসবে, ভূয়াদ্ভক্তিরবিচ্যুতা হরিহরাদ্বৈতাত্মিকা শাশ্বতী॥ ৮॥

মাতঃ! শাম্ভবি! তুমি শম্ভুসঙ্গ-মিলিতা হইয়াছ। মস্তকে অঞ্জলি বদ্ধ করিয়া এই প্রার্থনা করিতেছি যে, দেহাবসান সময়ে তোমার তীরে থাকিয়া যেন নারায়ণের পদদ্বয় স্মরণ করিতে পারি; আমার প্রাণ-প্রয়াণ সময়ে আনন্দ সহকারে যেন নারায়ণ স্মরণ করিতে পারি ও যেন অদ্বৈতাত্মিক হরিহরে আমার অবিচ্যুতা শাশ্বতী ভক্তি লাভ হয়॥ ৮॥

গঙ্গাষ্টকমিদং পুণ্যং যঃ পঠেৎ প্রযতো নরঃ।
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তো বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি॥ ৯॥

ইতি শ্রীভগবানশঙ্করাচার্য্য-বিরচিতং
গঙ্গাষ্টকস্তোত্রং সম্পূর্ণম্।

যে ব্যক্তি যত্নপূর্ব্বক এই পবিত্র গঙ্গাষ্টক পাঠ করেন, তিনি সমুদায় পাপ হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া বিষ্ণুলোকে গমন করেন॥ ৯॥

শ্রীবিধুভূষণ দেব।

কেনোপনিষৎ

ওঁ

কেনেষিতং পততি প্রেষিতং মনঃ
কেন প্রাণঃ প্রথমং প্রৈতি যুক্তঃ।
কেনেষিতাং বাচমিমাং বদন্তি
চক্ষুঃ শ্রোত্রং ক উ দেবো যুনক্তি॥ ১॥

অন্বিতব্যাখ্যা। ঈষিতং (ইচ্ছাময়ং) মনঃ কেন প্রেষিতং (প্রেরিতং সৎ) পততি (স্ববিষয়ং ধাবতি) প্রাণঃ কেন যুক্তঃ সন্ প্রথমং প্রৈতি (ব্যাপ্রিয়তে) কেন ঈষিতাং ইমাং বাচং বদন্তি। বাচমিতি কর্ম্মেন্দ্রিয়োপলক্ষণম্। উ (ভোঃ) কো দেবঃ চক্ষুঃ শ্রোত্রং যুনক্তি (প্রেরয়তি) চক্ষুঃ শ্রোত্রমিতি জ্ঞানেন্দ্রিয়োপলক্ষণম্।

অনুবাদ। আত্ম-জিজ্ঞাসু শিষ্য আচার্য্য-সমীপে সমাগত হইয়া বলিলেন,—গুরুদেব! ইচ্ছাময় মন কাহার প্রেরণায় বিষয়ে ধাবিত হয়? প্রাণাদি পঞ্চ বায়ু কাহার চালনায় প্রথমে চলিত হয়? বাগিন্দ্রিয় কাহার নিয়োগে

এই বাক্য বলিয়া থাকে? কোন্ দেব চক্ষু-শ্রোত্র প্রভৃতি জ্ঞানেন্দ্রিয়কে বিষয়গ্রহণে প্রেরণ করেন?

শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং মনসো মনো যদ্
বাচো হ বাচং স উ প্রাণস্য প্রাণঃ।
চক্ষুষশ্চক্ষুরতিমুচ্য ধীরাঃ
প্রেত্যাস্মাল্লোকাদমৃতা ভবন্তি॥ ২॥

অন্বিতব্যাখ্যা। যৎ (যস্মাৎ) উ (ভোঃ) স আত্মা শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং (শব্দব্যঞ্জকং) মনসঃ মনঃ বাচঃ বাচং (প্রথমার্থে দ্বিতীয়া ছান্দসী) প্রাণস্য প্রাণঃ। চক্ষুষঃ চক্ষুঃ (অর্থাৎ আত্মানং শ্রোত্রাদিবিলক্ষণত্বেন বিদিত্বা) অতিমুচ্য (শ্রোত্রাদৌ আত্মভাবং পরিত্যজ্য) ধীরাঃ (পণ্ডিতাঃ) অস্মাৎ লোকাৎ (মমতারূপাৎ) প্রেত্য (ব্যাপৃত্য) অমৃতাঃ (অমরণধর্ম্মাণঃ) ভবন্তি॥ ২॥

অনুবাদ। আচার্য্য বলিলেন,—বৎস! আত্মাই মনঃ প্রভৃতির নিয়ন্তা, সেই প্রসিদ্ধ আত্মা কর্ণের কর্ণ, মনের মন, প্রাণের প্রাণ ও চক্ষুর চক্ষু। পণ্ডিতেরা কর্ণাদিতে আত্মবুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া, ঐহিক মমতা পরিহারপূর্ব্বক অমরতা লাভ করেন॥ ২॥

বিষদীকরণ। আমি শুনি, আমি মানি, আমি শ্বাস ফেলি, আমি দেখি—ইত্যাদিপ্রকারে প্রায়শঃ সকলে কর্ণাদিতে আমিত্ব (আত্মত্ব) আরোপ করিয়া থাকে; এক আমিকে বহুরূপী করে। তাহার স্বরূপ চেনা ভার হইয়া উঠে। তদনুসারে সাধারণে সমস্ত ক্রিয়া আত্মার উপর অর্পণ করে। বস্তুতঃ আমি (আত্মা) শুনি না, মনন করি না, দেখি না, এক কথায়—কিছুই করি না। কর্ণাদি সব করিয়া থাকে, কিন্তু আমার অসহায়তায় কর্ণাদিও কিছু করিতে পারে না। আমার (আত্মার) অধিষ্ঠানে মন ইচ্ছাময় হইয়া মনন করে, প্রাণ প্রবাহিত হয়, বাগিন্দ্রিয় কথা বলে, শ্রোত্রাদি স্বকার্য্যে ব্যাপৃত হয়। তাই আচার্য্য বলিতেছেন, তিনি শ্রোত্রের শ্রোত্র, মনের মন ইত্যাদি। প্রদীপ যেমন স্বয়ং প্রকাশমান হইয়া অপরকে প্রকাশ করে, সেইরূপ স্বতঃপ্রকাশমান আত্মাও শ্রোত্রাদির প্রকাশক। চক্ষু-শ্রোত্রাদি তাঁহারই সাহায্যে বিষয় গ্রহণ করে।

আত্মাকে পৃথক্‌রূপে যখন অনুভব করিতে পারি না, তখন চক্ষুশ্রোত্রাদির অতিরিক্ত আত্মা স্বীকার করা কিরূপে যুক্তিসঙ্গত হয়? এ আপত্তি যুক্তিযুক্ত নয়। সকলেই অনুভব করিয়া থাকেন, অগ্নি আর কাষ্ঠ এক বস্তু নয়। উভয়ে বিলক্ষণধর্ম্মা, বিভিন্ন বস্তু; কেননা অগ্নির দাহিকা-শক্তি আছে, দাহ্য কাষ্ঠের তাহা নাই। অথচ লৌকিক অগ্নি কখনও কাষ্ঠাদি দাহ্যবস্তু ব্যতীত থাকে না; তাই বলিয়া বলিব কি অগ্নি ও কাষ্ঠ এক বস্তু? ইহা বোধ হয় কেহ স্বীকার করিবেন না। সেইরূপ জাগ্রৎ ও স্বপ্নের অবস্থায় চৈতন্যের (আত্মার) ইন্দ্রিয়ের সহিত উপলব্ধি হয়। ইন্দ্রিয় ব্যতীত উপলব্ধি হয় না বলিয়া কি ইন্দ্রিয় ও আত্মা এক বস্তু বলা উচিত? যেমন কাষ্ঠ অগ্নিরহিত হয়, সেইরূপ ইন্দ্রিয়ও আত্মারহিত হয়; কিন্তু যেমন অগ্নি কাষ্ঠরহিত হয় না, সেইরূপ আত্মাও জাগ্রৎ-স্বপ্নাবস্থায় ইন্দ্রিরহিত হয় না। আবার যেমন বিদ্যুৎ ও সূর্য্যে বহ্নি দাহ্য ব্যতীত থাকে, সেইরূপ সুষুপ্ত্যবস্থায় ও তুরীয়াবস্থায় আত্মা ইন্দ্রিয় ব্যতীত থাকে। ইত্যাদি যুক্তিবলে আত্মাকে অগ্নিবৎ স্বতন্ত্র বস্তু বলাই যুক্তিসঙ্গত। যোগীরা আত্মসাক্ষাৎকার লাভ করিয়া থাকেন, সে তত্ত্ব যুক্তি-গম্য নয়—গুরূপদেশ-লভ্য।

ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি ন বাগ্‌গচ্ছতি নো মনো
ন বিদ্ম ন বিজানীমো যথৈতদনুশিষ্যাদন্যদেব।

তদ্বিদিতাদথো অবিদিতাদধি ইতি শুশ্রুম
পূর্ব্বেষাং যে নস্তদ্ব্যাচক্ষিরে ॥ ৩ ॥

অন্বিতব্যাখ্যা। চক্ষুঃ তত্র (ব্রহ্মণি) ন গচ্ছতি, বাগ্ ন গচ্ছতি, মনো ন গচ্ছতি; অতএব ব্রহ্ম ঈদৃশমিতি ন বিদ্মঃ, ন চ বিজানীমঃ; যথা এতৎ ব্রহ্ম অনুশিষ্যাৎ তৎ (ব্রহ্ম) বিদিতাৎ (ব্যাকৃতাৎ জগতঃ) অবিদিতাৎ (অব্যাকৃতাদ্ বিদ্যালক্ষণবীজভূতাৎ চ) অধি (অন্যৎ) ইতি পূর্ব্বেষাং (আচার্য্যাণাং সকাশাৎ) অনুশুশ্রুম যে তৎ (ব্রহ্ম) নঃ (অস্মান্) ব্যাচক্ষিরে (ব্যাখ্যাতবন্তঃ)।

অনুবাদ। সেই ব্রহ্ম চক্ষুর গোচর নন। বাক্য এবং মনের বিষয় নন। (গুণক্রিয়াবিশেষণে) তাঁহাকে বুঝিতে পারি না। কি ভাবে উপদেশ দিতে হয়, তাহাও জানি না। তিনি ব্যাকৃত জগৎ এবং অব্যাকৃত (বীজভূত প্রকৃতি) হইতে পৃথক্—এইমাত্র গুরুর নিকট শুনিয়াছি, যে সকল গুরু আমার সকাশে ব্রহ্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন ॥ ৩ ॥

আভাষ। এই কথা বিস্তৃতরূপে বলিতেছেন—

যদ্বাচানভ্যুদিতং যেন বাগ্ অভ্যুদ্যতে।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥ ৪ ॥

অন্বিতব্যাখ্যা। যৎ ব্রহ্মবাচা (বাগিন্দ্রিয়েণ) অনভ্যুদিতং (অপ্রকাশিতং) যেন ব্রহ্মণা বাগ্ অভ্যুদ্যতে (উচ্চার্য্যতে) ত্বং তদেব ব্রহ্ম বিদ্ধি (জানীহি) ইদং ন। যৎ ইদং (আত্মবুদ্ধ্যা) উপাসতে ॥ ৪ ॥

অনুবাদ। বাগিন্দ্রিয় যাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে না, বরং বাগিন্দ্রিয় যাঁহার কৃপায় প্রকাশ পায়, তুমি তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে। বাগিন্দ্রিয় ব্রহ্ম নয়, লোক যাহাকে (আত্মবুদ্ধিতে) উপাসনা করে। অর্থাৎ লোক ভ্রান্তিবশতঃ "আমি বলি" এই উপলব্ধিবলে বাগিন্দ্রিয় আত্মা ভাবিয়া কাজ করে ॥ ৪ ॥

বিষদীকরণ। যাহার রূপ বা গুণ বা ক্রিয়া আছে, বাগিন্দ্রিয় তাহারই পরিচয় দিতে পারে। কিন্তু যিনি নীরূপ, নির্গুণ ও নিষ্ক্রিয়, বাক্য তাঁহাকে কিরূপে প্রকাশ করিবে? অথবা ভগবানের রূপ, গুণ ও ক্রিয়া অলৌকিক, লৌকিক বাক্যে তাহার পরিচয় দেওয়া অসম্ভব। তাই শ্রুতি বলিতেছেন "যদ্বাচানভ্যুদিতম্"। শ্রুত্যন্তরেও আছে—"যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।" ইতি। এহেন ব্রহ্মের অধিষ্ঠানে বাক্ উচ্চারিত হয়। সেই ব্রহ্মই আত্মা; বাগিন্দ্রিয় বা অন্য ইন্দ্রিয় আত্মা নয়। আমরা বলি, আমরা দেখি, ইত্যাদি প্রয়োগ লাক্ষণিক। নতুবা ইন্দ্রিয়কে আত্মা বলিলে ইন্দ্রিয়ের বিনাশে আত্মার বিনাশ স্বীকার করিতে হয়, অথচ ইন্দ্রিয়রহিত হইয়াও অনেকে জীবিত থাকে ॥ ৪ ॥

যন্মনসা ন মনুতে যেনাহুর্ম্মনোমতম্।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥৫॥

অনুবাদ। মনের দ্বারা যাঁহার মনন (জ্ঞান) হয় না; প্রত্যুত যাঁহার অধিষ্ঠানে মন মননে সমর্থ হয়, বলিয়া থাকেন, তুমি তাঁহাকে ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে। মন ব্রহ্ম নয়, লোকে যাহাকে (মনকে) (আত্মভাবে) উপাসনা করে।

বিষদীকরণ। মনও আত্মা হইতে পারে না, ইহার বিস্তৃত সমালোচনা ভাষাপরিচ্ছেদের "মনোঽপি ন তথা জ্ঞানাদ্যনধ্যক্ষং তদা ভবেৎ—এই কারিকার স্থলে দেখিবে। সঙ্ক্ষেপে এই মাত্র বলি—আত্মা কর্ত্তা-করণ নয়। চৈতন্যহীন মন জ্ঞানের করণ, কর্ত্তা হইতে পারে না। কর্ত্তা ও করণ এক বস্তু হয় না ॥ ৫ ॥

যচ্চক্ষুষা ন পশ্যতি যেন চক্ষুংষি পশ্যতি।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥ ৬ ॥

অনুবাদ। চক্ষুদ্বারা যাঁহার প্রত্যক্ষ হয় না, চক্ষু যাঁহার অধিষ্ঠানে দেখিয়া থাকে, তাঁহা-

কেই তুমি ব্রহ্ম জানিবে। চক্ষু ব্রহ্ম নয়, লোকে যাহাকে (চক্ষুকে) আত্মভাবে উপাসনা করে॥ ৬॥

যৎ শ্রোত্রেণ ন শৃণোতি যেন শ্রোত্রমিদং শ্রুতম্।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে॥ ৭॥

অনুবাদ। কর্ণের দ্বারা যাঁহাকে জানা যায় না; প্রত্যুত যাঁহার অধিষ্ঠানে কর্ণ শ্রবণ করে, তুমি তাঁহাকে আত্মা (ব্রহ্ম) জানিবে। এ শ্রোত্র ব্রহ্ম নয়; কিন্তু লোকে শ্রোত্রকেও আত্মভাবে উপাসনা করে॥ ৭॥

যৎ প্রাণেন ন প্রাণিতি যেন প্রাণঃ প্রণীয়তে।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে॥ ৮॥

অনুবাদ। প্রাণের দ্বারা প্রাণক্রিয়া হয় না; যাঁহার অধিষ্ঠানে প্রাণক্রিয়া সম্পন্ন হয়, তুমি তাঁহাকেই আত্মা বলিয়া জানিবে; প্রাণ আত্মা নন; কিন্তু লোকে প্রাণকেও আত্মভাবে উপাসনা করে। (পরম পূজ্যপাদ মহামহোপাধ্যায় শঙ্করাচার্য্যদেব প্রাণশব্দের অর্থ 'প্রাণেন্দ্রিয়' করিয়াছেন)॥ ৮॥

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ স্মৃতিতীর্থ।

"বৈরাগ্যমেবাভয়ম।"

জগতে সকল পদার্থই ভীতি-সমন্বিত। যে দিকে দৃষ্টিপাত করি, সেই দিকেই ভয়। মৃত্যুভয় নাই, এমন লোক অতি বিরল। এই সংসার ছাড়িয়া যাইতে হইবে, এই ভয় মানবের মনে সাধারণতঃ সদাই জাগরূক। বাল্যকাল হইতে বৃদ্ধকাল পর্য্যন্ত মানুষ কোন না কোন প্রকার ভয়ে কম্পিত রহিয়াছে। যাহারা সুখ-স্বচ্ছন্দে পুত্র-পরিবারাদি লইয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছেন, তাঁহারাও ভয়ের হস্ত এড়াইতে পারেন না। যে মুহূর্ত্তে একটি পুত্র ভূমিষ্ঠ হইল, সেই মুহূর্ত্ত হইতে পিতামাতার মনে সন্তান সম্বন্ধীয় বিবিধ ভয়ের সঞ্চার হইতে লাগিলে। পুত্রের একটু সামান্য কোন পীড়াদি হইলেই তাঁহাদের অন্তঃকরণে কি মহদ্ভয় না উপস্থিত হয়! এইরূপ পুত্রাদির অমঙ্গলাশঙ্কা কোন পিতামাতাই সমগ্র জীবনের কোন অংশেও পরিত্যাগ করিতে পারেন না।

মানব যাহাতে যত বৃহতী আশা পোষণ করে, তাহাতে তাহার তত ভয়ের কারণ উপস্থিত হয়। অপুত্রক ব্যক্তি অনেক আশায় পুত্র লাভার্থ ব্যগ্র হন। পুত্র তাঁহার কুল-গৌরব রক্ষা করিবে, পুত্রদ্বারা তাঁহার কীর্ত্তি পরিরক্ষিত ও পরিবর্দ্ধিত হইবে, পারত্রিক মঙ্গল হইবে, এইরূপ বিবিধ আশায় উৎফুল্ল হইয়া, ভগবদিচ্ছায় পুত্র লাভ করিলে, তিনি যেন স্বর্গ হাতে পান! কিন্তু পুত্র সম্বন্ধে যে বিষয়ে যত আশা স্থাপন করেন, সেই বিষয়ে আবার তত ভয়েরও অনুভূতি ভোগ করেন। পুত্রের আয়ু—আরোগ্য—বল, বিদ্যা—বুদ্ধি—জ্ঞান, ধন—যশ—প্রভুত্ব, ইত্যাদি সম্বন্ধে যত আশা স্থাপন করেন, আবার তত্তৎসম্বন্ধীয় বিঘ্ন-সম্ভাবনায় তত আশঙ্কাও অনুভব করেন।

গৃহস্থ হৃদয়ে বৃহতী আশা পোষণ করিয়া ঘর বাঁধিলেন, কিন্তু ঘর বাঁধিয়াই অমনি অগ্নি, ঝঞ্ঝাবাত ও ভূকম্পনাদির ভয়ে ভীত হইলেন! ধনী বহু ক্লেশে যে ধন সঞ্চয় করিয়াছেন, দস্যু-চৌরাদি হইতে সর্ব্বদাই সেই ধনের জন্য ভীত হইতেছেন। কেবল দস্যু-চৌরাদি নহে, স্বজনগণ হইতেও সে আশঙ্কা উৎপন্ন হয়; এই জন্য শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন,—

"পুত্রাদপি ধনভাজাং ভীতিঃ।"

ধনী বা নির্ধন কেহই ভয় হইতে মুক্ত নহেন। রোগীর মৃত্যু-ভয়, নিরোগীর রোগ-ভয়। যৌবনে জরার ভয়, জরায় মরার ভয় সর্ব্বদাই মানুষকে ব্যাকুল করিয়া থাকে। মানুষ সর্ব্বদাই সভয়। স্বপনে—জাগরণে কোন অবস্থাতেই ভয় তাঁহাকে পরিত্যাগ করে না। দিবস—যামিনী সর্ব্বদাই ভয়াকুল। কখন কি হয়, কি জানি, কি হয়, এই ভয়ে প্রত্যেক ঐহিক বিষয়ে সর্ব্বদাই তাহার মন বিক্ষেপগ্রস্ত হয়। এই জন্যই আর্য্য কবি বলিয়াছেন—

"ভোগে রোগভয়ং কুলে চ্যুতিভয়ং বিত্তে নৃপালাদ্ভয়ং। মানে দৈন্যভয়ং গুণে খলভয়ং রূপে তরুণ্যাভয়ং। শাস্ত্রে বাদীভয়ং বলে রিপু-ভয়ং কায়ে কৃতান্তাদ্ভয়ং। সর্ব্বং বস্তু ভয়ান্বিতং ভুবি নৃণাং বৈরাগ্যমেবাভয়ং।"

অর্থাৎ ভোগবিলাসের মধ্যেও রোগের আশঙ্কা উপস্থিত, কুলগৌরব থাকিলে গৌরব-হানির আশঙ্কা আছে, লুব্ধ নৃপতি সর্ব্বদাই বিত্তবানের আশঙ্কার কারণ হইয়া থাকেন; সম্ভ্রান্তের সর্ব্বদাই সম্ভ্রমহানির আশঙ্কা আছে, গুণী ব্যক্তি সর্ব্বদাই খল কর্ত্তৃক অনিষ্টগ্রস্ত ও নিন্দিত হওয়ার আশঙ্কাযুক্ত থাকেন, রূপ-বানের রূপেও যুবতীজন কর্ত্তৃক ভয়ের কারণ থাকে, শাস্ত্র-বিচার বিষয়ে শাস্ত্রীর বাদী কর্ত্তৃক পরাভবের আশঙ্কা আছে, বল বিষয়ে বলবানের শত্রু কর্ত্তৃক পরাভব-ভীতি রহিয়াছে, শরীর ধারণ করিলেই মরণের ভয় রহিয়াছে। এই জগতে সর্ব্ব পদার্থেই মানবগণের ভয়ের কারণ বিদ্যমান।

জগতে সর্ব্ব পদার্থই যদি "ভয়ান্বিত" হইল, তবে মানুষের নির্ভীক অবস্থা প্রাপ্ত হইবার কি কোন সম্ভাবনা নাই? ভয়ের কারণ সমুদয় বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে আমরা দেখিতে পাই, যেখানে কামনা—যেখানে আসক্তি, সেই খানেই ভয়। যেখানে আসক্তি নাই, সেখানে ভয়ও নাই। অদ্য একটী বৃক্ষের বীজ রোপণ করিলাম; রোপণ করিয়াই যদি উহাকে স্বার্থের চক্ষে দেখিতে আরম্ভ করি, তাহা-হইলেই আমার হৃদয়েও সঙ্গে সঙ্গে ভয়ের বীজ রোপণ করিতে হয়। যত বীজ অঙ্কুরিত—পরি-বর্দ্ধিত হইয়া ক্রমে ক্রমে পত্র-পুষ্প-ফল-সমন্বিত হইতে লাগিল, সঙ্গে সঙ্গে আমার হৃদয়-নিহিত ভয়-বীজও পরিবর্দ্ধিত ও বিস্তারিত হইতে লাগিল। এই বৃক্ষের ফল আমি বা আমরা সম্ভোগ করিব, ইত্যাকার আশা থাকিলে, ইহার বিনাশজনিত ফলভোগ-নৈরাশ্যাশঙ্কাও উহার সঙ্গে সঙ্গে বর্ত্তমান থাকে। আর এইরূপ আশা না থাকিলে আশঙ্কাও থাকে না। এই প্রকার প্রত্যেক বিষয়েই চিন্তা করিয়া দেখিলে উপলব্ধি হয় যে, আশা ও আশঙ্কা পরস্পরের নিত্যসহচরী হইয়া মানবের চিত্তক্ষেত্রে নির-ন্তর বিচরণ করে। যেখানে আশা নাই, সেখানে আশঙ্কাও নাই। অতএব আশাবিহীনতাই আনন্দ ও অভয়প্রদ; এই জন্য শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—

"আশা হি পরমং দুঃখং।
নৈরাশ্যং পরমং সুখং॥"

মহাত্মা শঙ্করাচার্য্যও স্পষ্টাক্ষরে বলিয়া-ছেন,—"সুখদা নিরাশা"। আশান্বিত ব্যক্তি জগতের কাছে দীন ভিখারী! যে আশার দাস, সে জগতের দাস; কিন্তু আশা যার দাসী, জগৎ তার দাস!

"আশাদাসী কৃতা যেন তস্য দাসায়তে জগৎ।"
আশাকে যে করিয়াছে দাসী আপনার,
তাহার দাসত্ব করে সমগ্র সংসার।

কথাটী সম্পূর্ণ ঠিক্। সামান্য সামান্য সাংসা-রিক বিষয়েও আমরা একটু নিঃস্বার্থতা—

নিষ্কামতা সাধন করিতে পারিলে, এ সত্যের স্বর্গীয় সৌরভ অনুভব করিতে পারি।

"সতু ভবতি দরিদ্রঃ যস্য তৃষ্ণা বিশালা।
মনসি চ পরিতুষ্টে কোঽর্থবান্ কো দরিদ্রঃ॥"
বিশাল-বাসনা যার, তাকেই দরিদ্র গণি।
তৃপ্তি-পরিতুষ্ট মনে কে দরিদ্র কেবা ধনী?

দরিদ্র কে? যে অভাবগ্রস্ত। বাসনা জন্মে কি জন্য? অভাব পূরণের জন্য। "স্বভাবতঃ অভাব হইতেই বাসনার সৃষ্টি। যাহার বাসনা যত অধিক, তাহার অভাব-বোধ তত অধিক; সুতরাং যাহার অভাব যত, তাহার দারিদ্র্য তত, ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। অতএব বাসনাধীনই দরিদ্র। বাসনার বিশালতায় মহা-রাজাধিরাজের রত্ন-রচিত বেশ-ভূষার অন্তরালেও মূর্ত্তিমান দরিদ্রতা লুক্কায়িত থাকে! এই বিষয়-বাসনা বা অনিত্যাসক্তিই মানবকে দীন—দুর্ব্বল—সুতরাং সর্ব্বদা ভয়াতুর করিয়া রাখিয়াছে। এহেন সর্ব্বলোক-সংপীড়ক ভয়ের এক মাত্র প্রতিবিধান বৈরাগ্য—অর্থাৎ বিষয়-বিরাগ বা বাসনা-ত্যাগ।

প্রিয়-নাশের সম্ভাবনাই ভয়ের জনয়িত্রী। যাহার প্রিয়াপ্রিয় দুইই সমান, তাহার আর ভয় কি? অনিত্যেরই ত নাশ হয়; অনিত্যে যাহার স্বার্থ-বুদ্ধি নিবদ্ধ নহে, তাহার আর ভয় কি? বিনশ্বরে যে বদ্ধ নহে, সেই বিনাশের ভয় জয় করিতে পারিয়াছে। এই জন্যই শাস্ত্র এ জগতের সমস্ত বাসনার বিষয়কে 'ভয়ান্বিত' বর্ণনা করিয়া অবশেষে তারস্বরে বলিয়াছেন "বৈরাগ্যমেবাভয়ম্।"

বৈরাগ্যই নিশ্চয় ভয়-শূন্য। বৈরাগ্যই ইহজগতে অভয় লাভের অনন্য-উপায়। অভয়ই মোক্ষ, সুতরাং বৈরাগ্যেই মোক্ষ। অভয় ভগবানের অভয়-পদে, সুতরাং সে পদ লাভ হয় বৈরাগ্যেরই পথে।

এই বৈরাগ্য বাহিরের বস্তু নয়। বিষয়ের বিরাগ বাহির দেখিয়া বুঝা যায় না। যাহার কৌপীন-করঙ্গ ভিন্ন জগতে 'আমার' বলিতে আর কিছুই নাই, সে উহা লইয়াই ঘোর বিষয়ী হইতে পারে; আবার সসাগরা-ধরাপতি অশেষবিষয়াধিশ্বর জনকরাজাও বলিতে পারেন, "মিথিলায়াং প্রদগ্ধায়াং নমে দহ্যতে কিঞ্চন।"

বৈরাগ্য লাভে "বৈরাগী" আখ্যাধারী গৃহাশ্রমত্যাগী সন্ন্যাসীরই কেবল মাত্র অধিকার নহে;—সাধিতে পারিলে, গৃহীও সেই একমাত্র অভয়প্রদ বৈরাগ্য-বৈভব-লাভে কৃতার্থ হইতে পারেন। গৃহী ব্যক্তি সতত ভয়-সঙ্কুল অনিত্য বিষয় রাশির মধ্যে অবস্থিতি করিতে বাধ্য হইয়াও, নিত্যধন ভগবানের অভয়চরণে একটু চিত্ত রাখিতে পারিলে, বৈরাগ্য আপনি আসিয়া আদরে তাঁহার অভয়-ক্রোড়ে সাধককে তুলিয়া লন। সংসারীর পক্ষে সংসারের কর্ত্তব্যকার্য্যে অবহিত থাকিয়া, কর্ম্ম-যোগ অব্যাহত রাখিয়া, বৈরাগ্যের অভ্যাস ও অনুশীলন আবশ্যক। বৈরাগ্য অন্তরের ত্যাগ, সুতরাং বাহিরের ত্যাগেই তৎ সাধন সম্ভাবিত নহে। প্রকৃত বৈরাগ্যের বিন্দুমাত্রও ভয়-ভঞ্জন-বিষয়ে মহাশক্তিসম্পন্ন। বৈরাগ্য-দুর্গের প্রান্তসীমা আশ্রয় করিতে পারিলেও এ মহা-ভয়াবহ সংসার-সংগ্রামে নিরাপদ বা নির্ভয় হওয়া যায়। এই জন্যই (উপসংহারে আবার বলি) কৃপাময় আর্য্যশাস্ত্র ভব-ভয়-ভীত জীবের প্রতি কৃপা করিয়া ঘোষণা করিয়াছেন;—

"বৈরাগ্যমেবাভয়ম্।"

(কস্যচিদ্ পরিব্রাজকস্য।)

কর্ম্মফল বা পুনর্জ্জন্মতত্ত্ব।

পুনর্জ্জন্মসম্বন্ধীয় প্রশ্ন ও তাহার মীমাংসা সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন; ইহা কেবল জড়বাদিদিগের সহিত বিরোধ নহে। আত্মবাদিদিগের মধ্যেও হিন্দুব্যতীত প্রায় অন্য অধিকাংশ ধর্ম্মাবলম্বিগণ ঈশ্বর—পরলোক স্বীকার করিলেও জন্মান্তর স্বীকার করেন না। যাহা হউক, সর্ব্বাগ্রে জড়বাদিদিগের সহিত উক্ত বিরোধের মীমাংসা প্রয়োজন; তদ্দ্বারা উপরোক্ত বিষয়ের ভিত্তি সংস্থাপিত হইলে, তৎপরে অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বিগণের সহিত মীমাংসা সহজ হইবে। ইতিপূর্ব্বে 'তড়িৎ-শক্তি' শীর্ষক প্রবন্ধে * শক্তিতত্ত্ব মীমাংসাকালে শক্তি হইতে বস্তুর উৎপত্তি ও শক্তিই আদি, প্রমাণিত হইয়াছে। জড়শক্তির সহিত চিচ্ছক্তির যে পার্থক্য, ইহা সকলেরই স্বীকার করিতে হইবে † জড়শক্তির মধ্যে চৈতন্য অন্তর্নিহিত থাকিলেও, চিচ্ছক্তির কোন লক্ষণ প্রকাশ নাই; কিন্তু জড়বাদিগণ তর্ক করিবেন যে, "জড়ের বিকৃতি এবং অনাবিষ্কৃত কোন নির্দ্দিষ্ট নিয়মের অধীন জড়শক্তির সংযোগ-বিয়োগ ও রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলস্বরূপ চৈতন্য বা চিচ্ছক্তি বিকাশিত হয়; তদ্ভিন্ন চিৎ বা চৈতন্য বলিয়া স্বতন্ত্র কোন পদার্থ নাই, ইত্যাদি। জড়বাদীদিগের কথিত মত ঐরূপ অনাবিষ্কৃত নিয়মাধীনরূপে সংযোগ-বিয়োগ ও রাসায়নিক ক্রিয়া-ফলে চৈতন্যের বিকাশ হয়, ইহা স্বীকার করিলেও * চৈতন্য ও জড়শক্তি এক হইতে পারে না। চৈতন্য বা চিচ্ছক্তি জ্ঞাতা (কর্ত্তা) এবং জড়শক্তি জ্ঞাত (কর্ম্ম)। অগ্নির দাহিকাশক্তি আছে, চৈতন্যশক্তি ঐ দাহিকাশক্তি অনুভব করিতেছে; ঐ অনুভূত বিষয় ও অনুভবকর্ত্তা এক নহে; তবে জড়বাদীগণ এই তর্ক করিতে পারেন যে, জড়ের মধ্যে অবিকাশিত 'গুহ্যচিচ্ছক্তি, যখন সংযোগ, বিয়োগ ও রাসায়নিক ক্রিয়া-ফলে বিকাশিত হয়, তখন উহা জড় হইতে পৃথক্ নহে এবং পৃথক্ হইলেও জড়শক্তি আদি, চিচ্ছক্তি তাহার ফলস্বরূপ। ইহার সংক্ষেপ-উত্তর এই যে, জড়শক্তি হইতে প্রকৃতপক্ষে চিচ্ছক্তির বিকাশ হয় না; চিচ্ছক্তি হইতে জড়শক্তির বিকাশ হয়, কিন্তু পরস্পর পরস্পরের কারণ। প্রথমতঃ অগ্নির যে দাহিকাশক্তি আছে, কে বলিল? বা কি প্রকারে প্রকাশিত হইল? জ্ঞান ও অনুভূতির সৃষ্টি না হইলে, জ্ঞাত ও অনুভূত বিষয়ের কখনই অস্তিত্ব সম্ভাবিত নহে; যাহা হউক, উভয়ে উভয়ের কারণ-স্বরূপ, এইজন্য হিন্দুদিগের কোনমতে চৈতন্য, কোনমতে অব্যক্ত মূলা প্রকৃতি আদি। কিন্তু উভয়ই একমেবাদ্বিতীয় অব্যক্তের অব্যক্ত কারণের কারণ অনাদি পরব্রহ্ম হইতে আদিতে বিকাশিত হয়। সাংখ্যদর্শনের মতে আদি

* ১৩০১ সালে "অনুসন্ধান" নামক পত্রিকায় আমার রচিত "তড়িৎশক্তি" শীর্ষক প্রবন্ধে শক্তিতত্ত্ব আলোচিত হইয়াছিল; উক্ত পত্রিকা দ্রষ্টব্য।

† শক্তি এক ভিন্ন দুই নহে। শক্তিই ব্রহ্মের অঘটন-ঘটন-পটীয়সী মায়া; উহা ত্রিগুণান্বিতা। এই ত্রিগুণের মধ্যে সত্ত্ব-প্রধানাশক্তিই চিচ্ছক্তি; যেহেতু সত্ত্বগুণ হইতে চৈতন্যের বিকাশ হয়; তমোগুণপ্রধানাশক্তিই জড়শক্তি; যেহেতু তমোগুণ হইতে চৈতন্য আবরিত হন বা চৈতন্যের অবিকাশ হয়। অতএব চিৎ ও জড়শক্তির পার্থক্য কথিত হইয়াছে।

* হিন্দু-পত্রিকায় ১৩০২ বঙ্গাব্দের পৌষ হইতে চৈত্র সংখ্যা পত্রিকায় আমার কৃত পঞ্চদশীর ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

† উক্ত পত্রিকায় ঐ সনের বৈশাখ সংখ্যার পত্রিকায় ঐ পঞ্চদশীর প্রথম ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

প্রধানা মূল-প্রকৃতি। কিন্তু বেদান্তের মতে যে মহাচৈতন্য আদি, তাহা তড়িৎতত্বে দর্শান হইয়াছে। যাহা হউক, প্রাকৃতিকশক্তি কি চিচ্ছক্তি আদি, উহার নিশ্চিত সিদ্ধান্ত অতীব কঠিন; যেহেতু জ্ঞাতা ব্যতীত জ্ঞাতবস্তুর বিকাশ অসম্ভব। পক্ষান্তরে, জ্ঞাতব্য বিষয় না থাকিলে, জ্ঞাতা পুরুষ কি অনুভব করিবেন? উহা নিশ্চিত হউক বা নাই হউক, জ্ঞাতা ও জ্ঞাত বা অনুভবকর্ত্তা ও অনুভূত বিষয়ের পৃথক্ অস্তিত্ব সাব্যস্ত হইতেছে।

মৎকৃত ভিন্ন ভিন্ন প্রবন্ধে দর্শান হইয়াছে যে, প্রাকৃতিকশক্তি ও চিচ্ছক্তির সামঞ্জস্যের ফলই মানবাত্মা। মানবের প্রত্যেক কার্য্য মন ও বুদ্ধি-মূলক; সুতরাং মন ও বুদ্ধির ক্রিয়া প্রাকৃতিক শক্তিজাত; কিন্তু ঐ মন ও বুদ্ধি চৈতন্য হইতে বিকশিত হয়। আপনার জ্ঞান ও অনুভবশক্তি না থাকিলে, আপনার নিকট আপনার কোন ক্রিয়ার বিকাশ সম্ভবে না ও আপনার কোন ক্রিয়ার উপর কোন আধিপত্য থাকিতে পারে না। অগ্নির দাহিকাশক্তি আছে বটে, কিন্তু অগ্নির কোন স্বাধীনতা নাই, অগ্নি স্বভাবের অধীন; কিন্তু মানব কেবল স্বভাবের অধীন নহে; মানব নিজের জ্ঞান—অনুভূতি হইতে স্বাধীনভাবে কার্য্য করিতে পারে। অবশ্যই ক্রিয়ার প্রবৃত্তি প্রাকৃতিকশক্তি হইতে উৎপন্ন বটে, কিন্তু তাহার বিচারকর্ত্তা স্বয়ং প্রকৃতি নহে, জ্ঞাতা অনুভবকর্ত্তাই নিঃস্বার্থ-বিচারকর্ত্তা; কিন্তু প্রবৃত্তি-সংযোগহেতু বিচার নিঃস্বার্থ হয় না। প্রবৃত্তি ও উদ্যম প্রকৃতি-মূলক। জড়শক্তির মধ্যেও উদ্যম ও প্রবৃত্তি আছে, তবে তাহা স্বভাবের অনুগামী; কিন্তু মানবে চিচ্ছক্তির সহিত প্রাকৃতিকশক্তির সামঞ্জস্যহেতু প্রকৃতির উদ্যম ও প্রবৃত্তি ঠিক্ স্বভাবের অনুগামী নহে, উহা বিবেক-মূলক, কিন্তু বিবেক প্রবৃত্তির অনুগামী এবং প্রবৃত্তিও বিবেকের অনুগামী। ফলে চিচ্ছক্তির সাহায্যে মানবের প্রাকৃতিকশক্তি উন্নীত ও অবিদ্যার হ্রাস হইলে স্বাধীন ক্ষমতা উৎপন্ন হয়। মহাচৈতন্য অনন্ত-জ্ঞানময়, প্রকৃতি শক্তিময়ী, অবিদ্যা অজ্ঞান-রূপিণী। প্রবৃত্তি ও জড়ীয় উদ্যম, জ্ঞানকে স্বাভিমুখে আকর্ষণ করে, আবার জড়ীয় প্রবৃত্তি ও উদ্যমকে চিচ্ছক্তি তাঁহার জ্ঞানাভিমুখী করিতে থাকেন। ঐ উভয়শক্তির সংঘর্ষণ-ফলে ষড়-শক্তি * কথঞ্চিৎ বিকাশিত ও স্বাভাবিক প্রবৃত্তির মধ্যে বিচারশক্তি উৎপন্ন হয়; সুতরাং ঐ বিচারশক্তির ক্রিয়াও প্রকৃতিজাত। চিচ্ছক্তি প্রকৃতির উত্তেজক মাত্র। ভগবদ্গীতায় কার্য্যের মুখ্য কর্ত্তা প্রকৃতি বলিয়া বর্ণিত আছে। এই স্থানে ভগবদ্গীতার নিম্নোক্ত কবিতা কয়েকটী দ্রষ্টব্য। এতদ্দ্বারা উপরোক্ত বিষয়টী অপেক্ষাকৃত স্পষ্টীকৃত হইবে।

"প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে॥"

৩ অ, ২৭ শ্লোক।

(ক) বঙ্গানুবাদ। প্রকৃতির গুণরাশি সমস্ত কর্ম্মানুষ্ঠানের মূল। অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা পুরুষ মনে করে আমিই কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেছি॥২৭

"ন কর্ত্তৃত্বং ন কর্ম্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ।
ন কর্ম্মফলসংযোগং স্বভাবস্তু প্রবর্ত্ততে॥"

৫ অ, ১৪ শ্লোক।

জগৎপ্রভু, লোকের দেহাদির কর্ত্তৃত্ব বা কর্ম্ম উৎপন্ন করেন না অথবা কর্ম্মফল-সম্বন্ধও রচনা করেন না। অজ্ঞানরূপা মায়াই সমস্ত কার্য্যে কর্ত্তাদিরূপে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে॥ ১৪॥

(ক্রমশঃ—)

* জ্ঞানশক্তি, ইচ্ছাশক্তি, ক্রিয়াশক্তি, কুণ্ডলিনীশক্তি, মাতৃকাশক্তি এবং মূলা-পরাশক্তি, এই ষড়শক্তির অঙ্কুর মানবে আছে; ক্রমে উহা বিশদ ও স্পষ্টীকৃত হইবে।

শ্রীশ্রীহরিঃ।
১৮৪৭ সালের ২০ আইনমতে রেজিষ্ট্রীকৃত।

হিন্দু-পত্রিকা।

৪র্থ বর্ষ, ৪র্থ খণ্ড, ৫ম ও ৬ষ্ঠ সংখ্যা, | ১৩০৪ সাল, ১৮১৯ শকাব্দা, | ভাদ্র ও আশ্বিন।

জ্যোতিষ-তত্ত্ব।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর).

গ্রহ-ফলের সহিত পিতা, মাতা, ভ্রাতা এবং স্ত্রীপুত্রাদির শুভাশুভের কারণ নির্ণয়।

এক্ষণে একটী গুরুতর আপত্তি উত্থিত হইতে পারে যে, গ্রহগণের সহিত শরীর ও মনের সম্বন্ধ থাকায়, তদ্দ্বারা নিজের শারীরিক ও মানসিক শুভাশুভ নির্ভর করে, কিন্তু ভ্রাতা, পত্নী, মাতা, পিতা প্রভৃতি ও (সন্তানের জন্মের পর) সন্তান সন্ততির শুভাশুভের সহিত কি সম্বন্ধ ও সংস্রব? অবশ্যই ধন, আয়, ব্যয়, ধর্ম্ম, কর্ম্ম, সমস্তেরই শরীর, মন, বুদ্ধির সহিত সম্পূর্ণ সংস্রব আছে, কিন্তু নিজের শারীরিক ও মানসিকশক্তি ও বৃত্তিমূলক ক্রিয়ার সহিত পত্নী, ভ্রাতা, মাতা, পিতা, আত্মীয়-বন্ধু ও পূর্ব্বজাত সন্তান সন্ততির শুভাশুভের কি গূঢ় সংস্রব? উক্ত সংস্রব ও সম্বন্ধ-বিচার-নির্ণয়ের পূর্ব্বে স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, জন্মান্তরীণ কর্ম্মফলানুসারে লগ্ন, ধন, ভ্রাতা, বন্ধু, পুত্র, বিদ্যা, পত্নী, ধ্বংস, কর্ম্ম, আয়, ব্যয়-স্থানীয় গ্রহ সকল নির্ণীত—অর্থাৎ কর্ম্মফলানুসারে গ্রহ সকল যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট ও কার্য্যানুবর্ত্তী হয়। প্রথমতঃ সন্তান সম্বন্ধে পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ জন্মান্তর স্বীকার না করিলেও পিতা, পিতামহের পাপপুণ্য (কর্ম্মফল) যে পুত্রপৌত্রাদিতে অর্শে, ইহা স্বীকার করেন।

"The Buddhist believes, as well as the modern philosophers that each generation is the heir to the consequences of the virtues and sins of the preceeding generation" অমিতাহারী, মদ্যপায়ী, ঘোর ইন্দ্রিয়াসক্ত ও কুপ্রবৃত্তিশালী যে ব্যক্তি স্বীয় কার্য্যদোষে জীবনীশক্তি ও মানসিক বল উভয়ই নষ্ট করিয়াছে, তাহার সন্তান সচরাচর তৎপিতৃগুণাবলম্বী হইবে এবং পিতৃকার্য্য ও স্বীয় কার্য্যদোষে অচিরাৎ মানবলীলা সম্বরণ করিবে কিম্বা পীড়াগ্রস্ত অথবা অন্যরূপে বিপন্ন হইবে, তাহার আর সন্দেহ নাই। চোরের পুত্র কদাচিৎ সাধু হয়। মাতাপিতার শারীরিক ও মানসিক আচরণ

সন্তানগণ প্রায় অনুসরণ করেন। মাতাপিতার সৎ বা অসদৃষ্টান্ত অনুসারে সন্তানের চরিত্র গঠিত হইয়া থাকে; তদ্ভিন্ন কতকগুলি সংক্রামকরোগ যে বংশপরম্পরাগত ভোগ করিতে হয়, ইহা সকলেই অবগত আছেন। জন্মান্তর স্বীকার করিলে, মানুষ স্বীয় স্বীয় কার্য্যহেতু সদৃশ বীর্য্যে জন্মগ্রহণ করে; বলিতে হইবে।

মানব স্বীয় কর্ম্মফলের অধীন বটে, কিন্তু ঐ কর্ম্মফলানুসারে সমস্ত মানব একটী অব্যক্ত প্রাকৃতিক নিয়মসূত্রে গ্রথিত। মানববুদ্ধি অজ্ঞানমিশ্রিত (অনন্তজ্ঞানের ছায়া মাত্র) হইলেও যখন সেই মানববুদ্ধি দ্বারা সভ্য গভর্ণমেণ্টের বিশাল সাম্রাজ্য একটী ন্যায়সূত্রে গ্রথিত হইয়া প্রায় সর্ব্বত্রই সর্ব্ববিষয়ে সামঞ্জস্য সংরক্ষিত ও তদ্দ্বারা বিশাল ভূভাগ শাসিত হয়। যখন মনুষ্য-বুদ্ধি-প্রসূত সভ্য-রাজনীতিদ্বারা শাসনযন্ত্রের এই প্রকার গঠন, এইপ্রকার বৈচিত্র্যহীনতা ও বিপুল সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে অলৌকিক একতা; যখন একই যন্ত্রস্থ সুরসংযোগে সর্ব্বত্র নিনাদিত; বিশাল সাম্রাজ্য এক কেন্দ্রে আকর্ষিত ও সেই কেন্দ্রস্থিত সমগ্র পরমাণু একত্রে সংশ্লিষ্ট হইয়া যেন মাধ্যাকর্ষণে সমগ্র সাম্রাজ্য শাসনযন্ত্রের কেন্দ্রাভিমুখে আকৃষ্ট হয়, (ইহা নিতান্ত কাল্পনিক নহে; বর্ত্তমান বৃটিষ-শাসন এই অপূর্ব্ব গভীর নীতি-নৈপুণ্যের উদাহরণস্থল), তখন সেই অনন্তবিশ্ব যে অব্যক্ত শক্তিদ্বারা সংরক্ষিত ও ন্যায়সূত্রদ্বারা গ্রথিত আছে, সেই শক্তি ও ন্যায়সূত্রের যে সর্ব্বত্র সামঞ্জস্য নাই, ইহা কখনই সম্ভব হইতে পারে না। ইহলোক ও পরলোকব্যাপী সেই অব্যক্ত অনন্ত ন্যায়ের সুসামঞ্জস্য সর্ব্বত্র বিদ্যমান। ঐশিক আইন যে নির্দ্দোষ বা সর্ব্বথা সুসঙ্গত ও সামঞ্জস্যসম্পন্ন, তৎপক্ষে সন্দেহ নাই। যখন বাহ্যপ্রকৃতি অনুসারে অধিকাংশস্থলে পিতাপুত্র সমগুণ ও সমধর্ম্মাবলম্বী হয় ও আকৃতি-প্রকৃতিগত সৌসাদৃশ্য দেখা যায়, তখন উভয়ের মধ্যে জন্মান্তরীণ কার্য্যফলের যে সৌসাদৃশ্য আছে, ইহা যুক্তিবিরুদ্ধ নহে; উভয় বস্তু এক গুণবিশিষ্ট হইলে পরস্পরের সামঞ্জস্য সংরক্ষিত হয়, বিভিন্ন জাতীয় বস্তুর মধ্যে সেইরূপ সামঞ্জস্য দেখা যায় না। মাতা, পিতা, পুত্র, ভ্রাতা, পত্নীর পরস্পরের মধ্যে ইহজীবনে স্ব স্ব কর্ম্মফলের সামঞ্জস্য হইতে প্রতীয়মান হয় যে, ইহারা অবশ্যই একটী অব্যক্ত কর্ম্ম-সূত্রে গ্রথিত, ঐ কর্ম্ম-সূত্র ইহ-পরলোকব্যাপী। অবশ্যই প্রত্যেক মানবের স্বাধীন কার্য্যের ফল পৃথক্ পৃথক্। পিতা, ভ্রাতা, পত্নী, পুত্র, পরস্পর কর্ম্মসূত্রে সংস্পৃষ্ট থাকিলেও ইহাদের পরস্পরের স্বাধীন কার্য্যফলে পৃথক্ পৃথক্ সূত্র প্রস্তুত হইতেছে। প্রত্যেকের ভিন্নপ্রকার উন্নতি বা অবনতি দ্বারা উহারা ভিন্ন পথাবলম্বী হয় বটে, তবে কোন্ কালে কোন্ মানবের কর্ম্মসূত্রের আকর্ষণে কোন্ মানবের কর্ম্মসূত্র আকর্ষিত হইবে, তাহা সেই সূত্র-প্রণেতা সর্ব্বনিয়ন্তা ব্যতীত কেহই অবধারণ করিতে পারে না।

যে অবস্থায় উভয়ের কর্ম্মফলের সৌসাদৃশ্য-হেতু এক মানবাত্মা অন্য মানবশক্তির আকর্ষণে আকর্ষিত ও সেই মানবশক্তির বা মানবীয় শুক্র-শোণিতের সহিত সংমিশ্রিত হইয়া ইহ-জগতে পুনঃ মানবরূপে অবতীর্ণ হয়, সেই অবস্থা সঙ্গত ও কর্ম্মফলানুরূপ ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় গ্রহাদির সহিত সংস্পৃষ্ট ও তদনুসারে মাতাপিতার শারীরিক মানসিক অবস্থা ও নবোৎপন্ন শক্তি সংমিশ্রণে ঐ মাতাপিতার জীবনীশক্তি, জননশক্তি ও মানসিকবৃত্তি হ্রাস-বৃদ্ধি ইত্যাদি সমস্ত কার্য্য-কারণ সংযোজিত হয়। তাহাহইতেই ফলিতজ্যোতিষপ্রণেতাগণ ভূমিষ্ঠ হওয়ার কালে গ্রহাদির সংস্রব ও সম্বন্ধ স্থির

করিয়া, সহজ সঙ্কেতস্বরূপ ঐ লগ্ন, ধন, ভ্রাতা, বন্ধু প্রভৃতি স্থান নির্ণয় করতঃ ঐ ঐ ঘরে গ্রহগণের স্থিতি-গতি অনুসারে কতকগুলি ফল সিদ্ধান্ত করিয়া গিয়াছেন। দুই কারণে ভ্রাতৃস্থান মন্দ হইতে পারে; এক পিতৃমাতৃ-বিয়োগহেতু বা পিতা-মাতার জননশক্তি হ্রাস বা অভাবহেতু। জননশক্তি হ্রাস বা অভাবেরও দুইপ্রকার ফল; যথা জননশক্তি হ্রাসহেতু সন্তান জন্মিতে পারে না এবং জন্মিলেও জননশক্তিহ্রাসের সহিত উৎপন্ন সন্তানের জীবনীশক্তির বিশেষ সংস্রব থাকায় ঐ সন্তান অল্পকালেই নষ্ট হয়। এই হ্রাস-বৃদ্ধি যে গ্রহাদির স্থিতি, গতি ও দূরত্বের সহিত সংস্রবযুক্ত, তাহার আর সন্দেহ নাই; কিন্তু সচরাচর লোক বাহ্যদৃষ্টিদ্বারা কিছুই বুঝিতে পারে না। যমজ সন্তান একই সময়ে গর্ভস্থ হয়, তবে তাহাদের মধ্যে একটী অল্পজীবী এবং অপরটী দীর্ঘজীবী হওয়ার কারণ কি? মাতা-পিতার সহিত নবাগত সন্তানদ্বয়ের সংস্রব—অথচ উহাদের পৃথক্ কর্ম্মফলানুরূপ গর্ভস্থ হওয়ার কালে মাতা-পিতার জননশক্তি ও গর্ভস্থ সন্তানদ্বয়ের মধ্যে স্থায়িত্ব, ক্ষণভঙ্গুরত্ব ইত্যাদি কারণ-মূলে বীজ বিভক্ত হয়; উভয়ের জন্মকালীন লগ্ন ও গ্রহগণের সম্বন্ধ ও সংস্রব তদনুগামী অনিবার্য্য ফলস্বরূপী গড়ে এক এক লগ্ন ২ ঘণ্টা (প্রায় ৫ দণ্ড)। প্রথম প্রসূত সন্তান পূর্ব্ব শুভ লগ্নের ৫ মিনিট বাকী থাকিতে ভূমিষ্ঠ হইলে, তাহার লগ্নানুসারে তাহার লগ্নস্থানীয় ও নিধনস্থানীয় গ্রহশক্তি তাহার জীবনীশক্তির সম্পূর্ণ অনুকূল ও ৫ মিনিট পরে তৎপর লগ্নের প্রথমে যে যমজ ২য় সন্তান জন্মিবে, তাহার লগ্নস্থ ও ধ্বংসস্থানীয় গ্রহশক্তি তাহার জীবনীশক্তির সম্পূর্ণ প্রতিকূল হইতে পারে, কিন্তু অন্যান্য শুভগ্রহাদি উক্ত ৫ মিনিট কালে ঠিক যথাবস্থায় থাকিতে পারে, না থাকিতেও পারে এবং শেষোক্ত সন্তানের আরও অনুকূল হইতে পারে। ঐ দুই যমজ সন্তান সমভাবে পালিত ও শিক্ষিত হয়। এস্থলে জ্যোতির্ব্বিদ্ ভিন্ন কে বলিতে পারে, যে তাহার একটী যৌবনে পিতা, মাতা ও ভ্রাতার মনে ক্লেশ দিয়া এবং বিবাহ হইলে, সেই নবীনা পত্নীকে চিরজীবনের জন্য অকূল সমুদ্রে ভাসাইয়া ইহজীবন পরিত্যাগ করিয়া যাইবে? কিন্তু জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ বলিতে পারেন, নাক্ষত্রিক দশানুসারে উহার তনু ও নিধন ভাবের গ্রহ ও বর্ষাধিপ এবং কেতুচক্র অনুসারে ত্রিপাপবর্ষ ও বর্ষগণনা এবং দৃষ্টিস্ফুটগণনা অনুসারে নিধন-ভাবে গ্রহসকলেই নিধনস্থানে বিরুদ্ধ হইলেই নিশ্চয় পরমায়ু শেষ হইবে। যমজ সম্বন্ধে লগ্ন-বিভিন্নতাস্থলে একটী সুন্দর গণনা আছে, বাহুল্যভয়ে বিবৃত করিলাম না। ঐ গণনা অনুসারে একটীর ২৯ বৎসর পর্য্যন্ত বিশেষ আশঙ্কা। ভ্রাতা ও সন্তানের শুভাশুভ সম্বন্ধে বোধ হয় অধিক বলিবার আবশ্যক নাই। পত্নী সম্বন্ধে এই পর্য্যন্ত বলিলে যথেষ্ট যে, গ্রহের বলাবল ও সংস্থান অনুসারে শরীরস্থ পদার্থ বিশেষ দূষিত ও বিষাক্ত হইতে পারে এবং পত্নীর সহিত শারীরিক ও মানসিক বৃত্তিবিশেষের বিশেষ সম্বন্ধ আছে। ঐ সম্বন্ধ হইতে একের কার্য্যকালে অন্যের দৈহিক অনিষ্ট অবশ্যম্ভাবী, এই মীমাংসা প্রকৃতি-সঙ্গত, কিছুই অস্বাভাবিক নহে। কিন্তু বিবাহ, রাজ্যলাভ বা সম্পত্তিলাভ, গৃহলাভ, বস্ত্রলাভ, জলাশয় ও তীর্থলাভ, অপমৃত্যু প্রভৃতি কতকগুলি বিষয় জ্যোতিষগণনার দ্বারা স্থিরীকৃত হয়। যদিও আপাততঃ উহার বিজ্ঞানসম্মত সাক্ষাৎ কারণ নির্ণয় করা যায় না, কিন্তু কর্ম্মফলের সহিত মানব এবং সৌরজগতস্থ গ্রহদিগের সম্বন্ধ যাঁহারা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপ নির্ণয় করিয়াছেন ও পূর্ব্বাধ্যায়ের লিখিতমত

ভূত-ভবিষ্যৎ যাঁহাদিগের নিকট প্রত্যক্ষবৎ, ঐশী আইনের প্রতিপৃষ্ঠার প্রতিঅক্ষর যাঁহাদিগের নিকট পরিচিত, তাঁহাদের নিকট মানবজীবনের ক্ষুদ্র-বৃহৎ সমস্ত কার্য্য নখদর্পণের ন্যায় হইবে, তাহার আর বিচিত্র কি? মানবজীবন কর্ম্মফলানুসারে সেই সর্ব্বনিয়ন্তার ন্যায়-সূত্ররূপ ঐশী নিয়ম বা আইনের অধীন। ব্যবস্থাপকের আইনের কূট অর্থ যেরূপ উচ্চতম বিচারালয়ে অবস্থার অসামঞ্জস্যহেতু অর্থান্তরিত ও ব্যাখ্যাত হইলে, তৎপরিবর্ত্তে ব্যবস্থাপকগণ পূর্ব্বব্যবস্থা রূপান্তরিত করিয়া অবস্থাসঙ্গত নূতন বিধি প্রণয়ন করেন, সেইরূপ ঐশী নিয়ম বা আইন ইহজীবনে পুরুষকারদ্বারা সংশোধিত হইলে, তৎসঙ্গত কার্য্যানুরূপ নূতন ফল সংযোজিত হয়। মহাত্মাগণ অন্তঃশক্তিবলে ঐ আইনের প্রতি অক্ষর অবগত আছেন ও তাহার অতীত, বর্ত্তমান ও ভাবী কার্য্যকারণ-সম্ভূত-ফলও তাঁহাদের নিকট অস্পষ্টীকৃত নহে।

গ্রহগণের গতির সহজ দৃষ্টান্ত, দৈহিক ও মানসিক মহামারী।

উপরোক্ত বর্ণনানুসারে ফলিতজ্যোতিষ কাল্পনিক নহে। তবে সাধারণ ব্যক্তিগণের বুঝিবার নিমিত্ত আরও দুই একটি সহজ দৃষ্টান্ত আবশ্যক। সকলেই অবগত আছেন, চন্দ্রের আকর্ষণে সমুদ্রে জোয়ারের উৎপত্তি হয়, চন্দ্র-উদয়ে কুমুদ, সূর্য্য-উদয়ে পদ্ম প্রস্ফুটিত হয়; একাদশী হইতে অমাবস্যা বা পূর্ণিমা পর্য্যন্ত চন্দ্রের আকর্ষণে সমুদ্রস্থ জলের ন্যায় শরীরের রসও বর্দ্ধিত হয়। এই জন্যই একাদশীর উপবাস অমাবস্যা ও পূর্ণিমার নিশিপালনের ব্যবস্থা আছে। আবার প্রত্যেক তিথি অনুসারে খাদ্যের নিষেধ-বিধি যাহা আছে, তাহাও এইক্ষণে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানানুমোদিত। ইহাদ্বারা চন্দ্র-সূর্য্যের সহিত পৃথিবীর ও পৃথিবীস্থ মানবের শারীরিক-মানসিক সম্বন্ধ ও সংস্রব আছে, তাহা এক্ষণে প্রায় সর্ব্ববাদিসম্মত। বৈজ্ঞানিকগণ ইহাও স্বীকার করেন যে, অনাচ্ছাদিত স্থানে দীর্ঘকাল চন্দ্ররশ্মি উপভোগদ্বারা মানবের মনের বিকৃতি হয় ও উন্মাদ-রোগের সূত্র হয়। তদ্ভিন্ন বাসন্তিক চন্দ্র বা শরচ্চন্দ্র হইতে যে কোন কোন মনোবৃত্তির উত্তেজনা হয়, তাহা প্রত্যক্ষ এবং সমস্ত কবিগণ একবাক্যে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। যদি চন্দ্র-সূর্য্যের সহিত মানবের এই সকল ব্যাপারের সম্বন্ধ ও সংস্রব থাকে, তবে ঐ চন্দ্রসূর্য্য ও অন্যান্য গ্রহগণের সহিত মানবের শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক সমস্ত সম্বন্ধ ও সংস্রব যে নাই, কে বলিতে পারে? যখন ফলিতজ্যোতিষের গণনার ফল অনেক স্থানে প্রত্যক্ষ খাটে এবং পূর্ব্ববর্ণিত মত উহা যুক্তি-বহির্ভূতও নহে, তখন আমাদের প্রত্যক্ষ প্রমাণ করিবার ক্ষমতা নাই বলিয়া অবিশ্বাস করা কখনই যুক্তিসঙ্গত নহে।

তদ্ভিন্ন অন্য আর একটী দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে; ঐ দৃষ্টান্তটী আমাদের মতের সম্পূর্ণ অনুকূল। এই পৃথিবীস্থ বায়ুমণ্ডলে অম্লজান, যবক্ষারজান, জলজান, অঙ্গার, গন্ধক প্রভৃতির ন্যায় আবিষ্কৃত ও অনাবিষ্কৃত বহুবস্তু উপাদান (Elements) অবস্থিত আছে।

কোন কোন সময়ে বিসূচিকা, বসন্ত ও অন্যান্য পীড়ার মহামারী (Epidemic) দেশব্যাপী হইয়া উঠে, উহা যে আকাশস্থ বায়বীয় অদৃশ্য কুপদার্থ বা মানবপ্রকৃতির প্রতিকূল শক্ত্যাধিক্যের ফল, তাহা বিজ্ঞানবিদ্গণ স্বীকার করিয়া থাকেন; বাস্তবিক ঐ সকল দেশব্যাপী মহামারী প্রধানতঃ বায়বীয় দূষিত পদার্থের ফল ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। যেমন বায়বীয় দূষিত পদার্থ দ্বারা ঐ সকল দেশব্যাপী পীড়া সম্ভব, সেইরূপ এক এক সময় ঐ সকল আকাশস্থ ঔপাদানিক শক্তির আধিক্যহেতু সাধারণতঃ মানবসমাজের এক মনোবৃত্তি উত্তেজিত হইয়া দেশব্যাপী ধর্ম্ম-বিপ্লব, সমাজ-বিপ্লব বা সমরানল প্রজ্জলিত হইয়া উঠে। একই সময়ে সমাজস্থ একরূপ মনোবৃত্তি উত্তেজিত হওয়ার কারণ কি? ইহারই নাম মানসিক মহামারী (Mental epidemic,) ইতিহাসে ইহার বহুতর দৃষ্টান্ত আছে। ঐ সকল প্রতিকূল ঔপাদানিক শক্তির আধিক্য ও প্রবলতার হেতু কি কেহ নির্ণয় করিতে পারেন? উহাও গ্রহবিশেষের গতির ফল; মানববৃত্তির সহিত গ্রহশক্তির সামঞ্জস্য ও অসামঞ্জস্য সম্বন্ধে পূর্ব্বে প্রমাণ করিয়াছি। কোন কোন গ্রহ পৃথিবীর নিকট দিয়া গমনের সময় তজ্জাতীয় উপাদান ও আকাশস্থ উপাদানের সহিত সংঘর্ষণ উপস্থিত হওয়ায় ঐ সংঘর্ষণ হেতু তাহার প্রবল প্রবাহ পার্থিব বায়ুমণ্ডলাভিমুখী, হয়। ঐ প্রবাহ ঐ বায়ুমণ্ডলের সহিত সংমিশ্রিত হইয়া বায়ুমণ্ডলের একটী প্রবাহ পৃথিব্যাভিমুখী হয়; তদ্দ্বারা শারীরিক বা মানসিক মহামারী উপস্থিত হয়। ইহার একটী সরল দৃষ্টান্ত এই, সকলই অবগত আছেন যে, বৃহৎ ষ্টীমার প্রবলবেগে চলিয়া গেলে নদীতে একটী প্রবাহ বা তুফান উপস্থিত হইয়া তরঙ্গাঘাত হইতে থাকে। ঘূর্ণবায়ুর বিষয় সকলেই অবগত আছেন; এই সম্বন্ধে আর অধিক বর্ণনার দ্বারা প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করা অনাবশ্যক। যাহা হউক, ফলিত-জ্যোতিষ অমূলক নহে। আর্য্যদিগের চিকিৎসা-শাস্ত্রে (নিদানে) উন্মাদ-রোগ কয়েক ভাগে বিভক্ত আছে ও তাহার লক্ষণও ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বর্ণিত আছে। ঐ রোগ প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত, ১ শরীরজ, ২ গ্রহাক্রান্ত; শরীরজ অর্থে—শরীর দূষিত হইয়া ঐ পীড়ার উৎপত্তি হয়, ইহার অনেক কারণ আছে, ঐ সকল কার্য্যকারণ নির্ণয় এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নহে। গ্রহাক্রান্ত উন্মাদরোগের মধ্যে অনেক অবান্তর ভাগ আছে, যথা—দেবগ্রহাক্রান্ত গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, পিশাচ-গ্রহাক্রান্ত ইত্যাদি, সাধারণ লোকে ঐ সকল পীড়াকে "ভূতে পাওয়া" বলে। নিদানে ঐ দেবাদি গ্রহাক্রান্ত কেবল লক্ষণানুসারে নির্ণীত হয়, যে সকল উন্মাদ বা বায়ুগ্রস্ত রোগী কেবল পূজা-অর্চ্চনাদিতে প্রবৃত্ত হয়, তাহাদিগকে দেবগ্রহাক্রান্ত, আর উচ্ছৃঙ্খল, অনাচারী (অর্থাৎ বিষ্ঠা, মূত্র প্রভৃতিতে ঘৃণা রহিত) ইত্যাদি রোগীকে পিশাচ-গ্রহাক্রান্ত, সর্ব্বদা বেশ-বিন্যাসে রত, ইন্দ্রিয়াসক্ত ইত্যাদিকে গন্ধর্ব্ব-গ্রহাবিষ্ট কহে। ঐ গ্রহাবিষ্ট বা গ্রহাক্রান্ত উন্মত্ততার প্রকৃত তাৎপর্য্য কি? ইতিপূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে, গ্রহগণের গতি, স্থিতি, নৈকট্য ও অন্যান্য কারণে পার্থিব বায়ুর সহিত শরীরের প্রতিকূল বাষ্পীভূত পদার্থ সংমিশ্রিত হইয়া বিসূচিকা, বসন্ত প্রভৃতি মহামারী দেশব্যাপী হইয়া উঠে; কিন্তু ঐ মহামারী দেশব্যাপী হইলেও সকলেই যে ঐ পীড়ায় আক্রান্ত হয়, এরূপ নহে; যাহাদের শারীরিক পদার্থ কিঞ্চিৎ দূষিত হয়, পূর্ব্বোক্ত কুবাষ্প ঐ দূষিত পদার্থের সহিত সংমিশ্রিত হইয়া শরীরের অন্যান্য পদার্থ দূষিত করিয়া দিয়া পূর্ব্বোক্ত রোগাকারে পরিণত

হয়। শারীরিক পদার্থের সহিত যেরূপ পূর্ব্বোক্ত বিসূচিকা প্রভৃতির কারণীভূত কুবাষ্পের সম্বন্ধ ও সংস্রব আছে, সেইরূপ মানসিক উপাদানের সহিত সূক্ষ্মতর তজ্জাতীয় ভিন্ন ভিন্ন প্রতিকূল তত্ত্ব বা শক্তির সম্বন্ধ আছে। মানসক্ষেত্রের পূর্ব্বোক্ত প্রতিকূল তত্ত্বই দেবাদি গ্রহাংশ, ঐ সকল তত্ত্ব পূর্ব্ববর্ণিতমত গ্রহাদির গতি-স্থিতি প্রভৃতির সংস্রব হইতে পার্থিব সূক্ষ্মতর বায়ুর সহিত সংমিশ্রিত হইয়া ব্যক্তি-বিশেষের মন আক্রমণ করে, কিন্তু পূর্ব্বোক্তমত মানসিক উপাদান কিঞ্চিৎ দূষিত না হইলে, ঐ সকল তত্ত্ব মনের উপর হঠাৎ আধিপত্য করিতে পারে না। শরীরের সহিত মনের নিত্য সম্বন্ধ আছে, ; শারীরিক পদার্থ কোন কারণবশতঃ দূষিত হইলে, মানসিক উপাদানও কিঞ্চিৎ দূষিত হইতে পারে ; এই দূষিত উপাদান অবলম্বন করিয়া পূর্ব্বোক্ত প্রতিকূল তত্ত্ব আশ্রয় করে। নলরাজার দেহে কলি-প্রবেশ ও শ্রীবৎস রাজার দেহে শনি-প্রবেশের উপাখ্যান সকলেই অবগত আছেন ; উহা অমূলক নহে, উহার বৈজ্ঞানিক রহস্য পরে প্রদর্শিত হইবে।

(ক্রমশঃ—)

শ্রীশশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

কর্ম্মফল বা পুনর্জ্জন্মতত্ত্ব।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

"নাদত্তে কস্যচিৎ পাপং ন চৈব সুকৃতং বিভুঃ।
অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ॥"

৫ অ, ১৫ শ্লোক।

পরমেশ্বর কোন জীবের পাপ বা পুণ্য গ্রহণ করেন না। অবিদ্যাবৃত জ্ঞানে জীব মোহমুগ্ধ হইয়া থাকে॥ ১৫॥

"মহাভূতান্যহঙ্কারো বুদ্ধিরব্যক্তমেবচ।
ইন্দ্রিয়াণি দশৈকঞ্চ পঞ্চ চেন্দ্রিয়গোচরাঃ॥"

১৩ অ, ৫ শ্লোক (ক)।

পঞ্চ মহাভূত, অহঙ্কার, বুদ্ধি, অব্যক্ত শ্রোত্রাদি দশ ইন্দ্রিয়, মন, শ্রোত্রাদির পঞ্চ বিষয়॥ ৫॥

"ইচ্ছা দ্বেষঃ সুখং দুঃখং সংঘাতশ্চেতনাধৃতিঃ।
এতৎ ক্ষেত্রং সমাসেন সবিকারমুদাহৃতম্॥"

১৩ অ, ৬ শ্লোক।

ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ, সংঘাত, চেতনা ও ধৃতি, সংক্ষেপতঃ এতাবৎ বিকারযুক্ত পদার্থই ক্ষেত্র নামে কথিত হইয়া থাকে॥ ৬॥

"প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব বিদ্ধ্যনাদী উভাবপি।
বিকারাংশ্চ গুণাংশ্চৈব বিদ্ধিপ্রকৃতি সম্ভবান্॥"

১৩ অ, ১৯ শ্লোক।

প্রকৃতি-পুরুষ, এ উভয়ই অনাদি ; বিকার-সমূহ ও গুণসমূহ প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন, ইহা তুমি বিদিত হও॥ ১৯॥

"কার্য্যকারণকর্ত্তৃত্বে হেতুঃ প্রকৃতিরুচ্যতে।
পুরুষঃ সুখদুঃখানাং ভোক্তৃত্বে হেতুরুচ্যতে॥"

১৩ অ, ২০ শ্লোক।

প্রকৃতিই ক্রিয়াশক্তির মূল এবং পুরুষ সুখ-দুঃখের ভোগের কারণ বলিয়া কথিত হইয়াছে॥ ২০॥

"পুরুষঃপ্রকৃতিস্থো হি ভুঙ্ক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্।
কারণং গুণসঙ্গোঽস্য সদসদ্যোনি জন্মসু॥"

১৩ অ, ২১ শ্লোক।

এই ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ মায়ারূপা প্রকৃতিতে অবস্থিত হইয়া সেই প্রকৃতিজনিত সুখদুঃখাদি ভোগ করিয়া থাকেন। ত্রিগুণাত্মিকা প্রক-

তির সহিত তাদাত্মসম্বন্ধ জন্যই পুরুষের সৎ ও অসৎ যোনিতে জন্ম লইতে হয়॥ ২১ ॥

"উপদ্রষ্টানুমন্তা চ ভর্ত্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ।
পরমাত্মেতি চাপ্যুক্তো দেহেঽস্মিন্ পুরুষঃ পরঃ॥"
১৩ অ, ২২ শ্লোক।

এই দেহে বিদ্যমান্ থাকিয়াও পরমপুরুষ সর্ব্বথা স্বতন্ত্র; কারণ তিনি উপদ্রষ্টা ও অনুমন্তা, তিনি ভর্ত্তা, ভোক্তা ও মহেশ্বর এবং শ্রুতিতে তিনি পরমাত্মা বলিয়া ব্যাখ্যাত হইয়াছেন॥২২॥

"প্রকৃত্যৈব চ কর্ম্মাণি ক্রিয়মানানি সর্ব্বশঃ।
যঃ পশ্যতি তথাত্মানমকর্ত্তারং স পশ্যতি॥"
১৩ অ, ২৯ শ্লোক। (ক)

মায়া-প্রকৃতিই সমস্ত কার্য্য করিয়া থাকেন, যে বিবেকী পুরুষ ইহা বুঝিয়া ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মাকে অকর্ত্তা বলিয়া দর্শন করেন, তিনিই সম্যগ্-দর্শী॥ ২৯॥

কর্ম্মফল দুইপ্রকার, যথা—স্বাভাবিক ও মনুষ্যের স্বাধীন ক্রিয়াজাত। স্বাভাবিক ক্রিয়া-ফলে স্বভাবের উন্নতি-অবনতি হয়। যেমন ভূমির উৎপাদিকাশক্তি ও বৃষ্টির জলপ্রপাত ইত্যাদি স্বাভাবিক কর্ম্মফলে ধান্যপ্রভৃতি উদ্ভি-দের উৎপত্তি ও তাহার উৎকর্ষ-অপকর্ষ নির্ভর করে; ঐ উদ্ভিদের মধ্যে প্রবৃত্তি ও উদ্যমের অঙ্কুর থাকিলেও ঐ অঙ্কুর সম্পূর্ণ তমোগুণাবৃত উহাতে জ্ঞানশক্তি না থাকায় স্বাধীন ক্ষমতা নাই; উহারা সম্পূর্ণভাবে স্বভাবের অধীন। পশু, পক্ষী, প্রভৃতি জীবের ক্রিয়া কিয়ৎ-পরিমাণে স্বাধীন-ক্ষমতামূলক বলিয়া লক্ষিত হয় বটে, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে উহা তাহা-দের সেরূপ স্বাধীন-ক্ষমতামূলক নহে; তাহাদের স্বভাবজাত প্রবৃত্তি অনুযায়ী কার্য্য হয়। তাহাদের জ্ঞানের কিঞ্চিৎ অঙ্কুর আছে বটে, কিন্তু তাহার বিকাশ অতি অল্প, এজন্য স্বভাবের প্রতিকূলে কার্য্য করিবার কিম্বা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি ও উদ্যম-স্রোত-নিবৃত্তি করিবার শক্তি নাই। উদ্ভিদ্ বা অন্য জীব-জন্তু (উত্তেজকস্বরূপ কূটস্থ চৈত-ন্যের পরোক্ষ জ্যোতিঃসংযোগে) সাক্ষাৎ প্রাকৃতিকশক্তি হইতে উৎপন্ন, কিন্তু উহাদের উদ্যম (Energy) শেষ হইলে, ঐ বস্তু বা জৈবী-শক্তি * পুনঃ প্রকৃতি-মাতার গর্ভস্থ বা প্রকৃ-তিতে লীন হয়। অবশ্যই স্বাভাবিক কর্ম্মফলে প্রকৃতির স্বাভাবিক উন্নতি হইতে থাকে বটে, কিন্তু বস্তু বা জৈবীশক্তির স্বাধীন ক্ষমতা না থাকায় কার্য্যক্ষেত্রে উহাদের উদ্যম শেষ হইলে (মৃত্যু হইলে) কোন কোন মতে উহাদের আত্মার † আর পৃথক্ অস্তিত্ব (Identity) থাকে না। স্বভাবের প্রবৃত্তি ও উদ্যম স্বভা-বেই লীন হয়, তবে উত্তেজক চিৎশক্তির সাহায্যে বা সংঘর্ষণে মূলপ্রাকৃতিকশক্তির ক্রমোন্নতি হইতে থাকে। প্রকৃতির ঐ উন্নতির এক এক সোপান অতিক্রম দ্বারা এক এক শ্রেণীস্থ উদ্ভিদ্ ও জীবের উৎপত্তি হয়।

চৈতন্য ও জড়শক্তি পরস্পরের ক্রমিক সংঘর্ষণে পৃথিবীতে জৈবতত্ত্বের বিকাশ হয় এবং জীবের অন্তরানুভূতির উৎপত্তি হয়।

* এই জৈবীশক্তি অর্থে আত্মা বা কূটস্থ চৈতন্য নহে, জীবনীশক্তি Life principal বুঝাইবে। কূটস্থ চৈতন্য সর্ব্ব বস্তুর অভ্যন্তরে আছে, তবে সকল বস্তুতে তাহার বিকাশ নাই। মৃৎ-পর্ব্বতাদিতে আদৌ বিকাশ নাই; ইতর জীব-জন্তুতে অল্প বিকাশ আছে মাত্র। মানব-বুদ্ধিই উহার চিম্নি বা দর্পণস্বরূপ; ঐ দর্পণে যে উহার প্রতিবিম্বের বিকাশ হয়, ঐ প্রতিবিম্বই মানবাত্মা।

† এস্থলে 'আত্মা' অর্থে কূটস্থ চৈতন্য নহে, জান্তব-শক্তি (Animal force) বুঝিতে হইবে। ইহাই মনুর ভূতাত্মা। বিগত বর্ষের হিন্দু-পত্রিকার শেষসংখ্যায় পঞ্চ-দশীর ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

আভ্যন্তরীণ চিৎশক্তির সাহায্যে ঐ অনুভূতি ক্রমে উন্নত ও বিশদ হইতে থাকে এবং তৎসহ সদসদ্বৃত্তির বিকাশ হয় *। ঐ সদসদ্বৃত্তির সহিত পুনঃ চিৎ-জ্যোতিঃসম্মিলনে ও সংমিশ্রণে যুক্তি ও বিবেকের বিকাশ হয়, অর্থাৎ স্বভাবজাত সদসদ্বৃত্তি এবং চৈতন্যজাত জ্ঞানের সম্মিলনের ও সামঞ্জস্যের ফলস্বরূপ মানব-বুদ্ধির উৎপত্তি হয়। শাস্ত্রীয় ভাষায় উহাকে 'বিজ্ঞানময় কোষ' কহে; প্রকৃতপক্ষে ঐ বুদ্ধি-তত্ত্ব বা বিজ্ঞানময় কোষই মানবতত্ত্ব। ঐ বুদ্ধিতত্ত্ব বিকাশের পূর্ব্বে চিৎ বা জ্ঞানজ্যোতির প্রত্যক্ষভাবে বিকাশ হয় না। পশুজগতে উহা উত্তেজক স্বরূপে প্রকৃতির অন্তর্ভূত থাকিয়া ঐ প্রাকৃতিক উদ্যম ও প্রবৃত্তির বিকাশ করিয়া দেয়, অর্থাৎ প্রাকৃতিক উদ্যম এবং প্রবৃত্তির অভ্যন্তরে ক্রমে অস্পষ্ট জ্ঞান ও অনুভূতিরূপ চিদগ্নি প্রধূমিত হইতে থাকে, তাহারই ফলস্বরূপ পশু-জগৎ। ঐ প্রধূমিত চিদগ্নি প্রজ্বলিত হইলেই অবিদ্যার গভীর অন্ধকার মধ্যে তাহার জ্যোতি ক্রমে ভাসমান হয়, কিন্তু ঐ জ্যোতি অন্ধকার-সংমিশ্রিত আলোকের ন্যায় ("মেটে জ্যোৎস্না"র ন্যায়) প্রতীয়মান হয়; উহা নির্ম্মল আলোকের সহিত সংমিশ্রিত বা সম্মিলিত হইতে পারে না। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, সত্ত্বগুণময়ী চিৎশক্তিই ঐশ্বরীশক্তি ও তমোগুণময়ীশক্তিই জড়শক্তি এবং ঐ সত্ত্ব-তমোমিশ্রিত রজঃপ্রধানাশক্তিই জৈবীশক্তি। প্রকৃতির সত্ত্বগুণ হইতে জ্ঞানময়, বুদ্ধিতত্ত্বের রজোগুণ হইতে প্রবৃত্তিময়, জীবতত্ত্বের তমোগুণ হইতে পাঞ্চভৌতিক দেহের বিকাশ হয়। উক্ত পাঞ্চভৌতিক দেহে যতদিন সত্ত্বগুণের বিকাশ না হয়, ততদিন বুদ্ধিতত্ত্বের বিকাশ হয় না, কিন্তু উক্ত জড়দেহাশ্রিত সত্ত্বগুণ, রজস্তমমিশ্রিত মলিন বিধায় ঐ বুদ্ধিতত্ত্ব জড়শক্তি ও চিচ্ছক্তির মধ্যবর্ত্তী স্বরূপ মানব-বুদ্ধিতে পরিণত হয়। ঐ জড়দেহের গুণ, উদ্যম এবং প্রবৃত্তি অনুসারে বুদ্ধিরও তারতম্য হয়; প্রবৃত্তি ও ঐ বুদ্ধির তারতম্যানুসারে প্রত্যেকের স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীন বিবেকশক্তির উৎপত্তি হয়। ঐ অস্তিত্ব-স্বাতন্ত্র্য ও বিবেকই অহংতত্ত্ব বা আমিত্ব। সমগ্র জগৎ যাঁহার বিরাট দেহ, সমগ্র ক্রিয়াশক্তি, প্রবৃত্তি এবং উদ্যম যাঁহার প্রাণ বা জীবন এবং বুদ্ধিতত্ত্ব-সমষ্টি যাঁহার মহা আমিত্ব, সেই মহাপুরুষের ক্ষুদ্র অংশই ব্যষ্টি-পুরুষরূপ মানব। তদ্ধেতু ইহলোকে অন্যান্য জীবের ন্যায় মানব কেবল স্বভাবের অধীন নহে, স্বভাবসংমিশ্রিত বিবেকশক্তির অধীন। তবে পূর্ব্বোক্ত মহাপুরুষ বিশুদ্ধ সত্ত্বময় সমষ্টি-বুদ্ধিতত্ত্ব বিধায় তিনি পূর্ণ স্বাধীন, স্বভাব তাঁহার সম্পূর্ণ অধীন; কিন্তু মানববুদ্ধি জড়দেহাশ্রিত এবং রজস্তমমিশ্রিত বিধায় সম্পূর্ণ স্বাধীন নহে, স্বভাবেরও অধীন। উক্ত মহাপুরুষ সম্পূর্ণ স্বাধীন বিধায় স্বভাবজাত কর্ম্মফল তাঁহাতে সংযোজিত হয় না, কিন্তু মানব স্বাধীন হইয়াও স্বীয় প্রকৃতিজাত কর্ম্মের অধীন বিধায় তাহাতে কর্ম্মফল সংযোজিত হয়; অতএব প্রত্যেক মানবের স্বাভাবিকপ্রবৃত্তিসংমিশ্রিত জ্ঞানের তারতম্যানুসারে প্রত্যেকের স্বাধীন কার্য্য ও তাহার ফল স্বতন্ত্র হওয়ায়, ঐ কর্ম্মফলে প্রত্যেক মানবাত্মার আধ্যাত্মিক উন্নতি বা অবনতি অবশ্যম্ভাবী। ব্যক্তি বিশেষের

* পূর্ব্বোক্ত অনুভূতি এবং সদসদ্বৃত্তি মনোময় কোষান্তর্গত। পশুদিগের ঐ মনোময় কোষের অঙ্কুর আছে; ঐ অঙ্কুর ক্রমে চিৎ-জ্যোতির আভাসে বিশদ ও পরিস্ফুট হইলে, বিজ্ঞানময়কোষের বিকাশ হয় এবং পূর্ব্বোক্ত কূটস্থ চৈতন্য ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষরূপে বিজ্ঞানময় কোষে প্রতিবিম্বিত হয়; ঐ বিজ্ঞানময় কোষই ক্ষেত্রজ্ঞের সহচর; ঐ কোষসহ ক্ষেত্রজ্ঞ অন্তরে ভ্রমণ করেন; ক্রমে ঐ কোষ পরিস্ফুট হইলে, আনন্দময়ের বিকাশ হয় ও জীব মুক্ত হয়েন।

কর্ম্মফল মানব-সাধারণ্যে অর্থাৎ সমাজে কিয়ৎ-পরিমাণ সংযোজিত হইলেও * মানবাত্মার পৃথক্ অস্তিত্ব অর্থাৎ স্বাভাবিক প্রবৃত্তি-অনুরূপ পৃথক্ পৃথক্ বুদ্ধিতত্ত্ব—তদ্ধেতু পৃথক্‌ব্যক্তিনিষ্ঠত্ব (Individuality) থাকায় প্রত্যেক মানব স্বীয় স্বীয় পাপ-পুণ্যের দায়ী হয়।

সমষ্টি-শক্তিসমন্বিত বিরাট পরমাত্মা ও মন-বুদ্ধি-সমন্বিত ব্যষ্টি মানবাত্মা উভয়েরই স্বতন্ত্র কর্ম্ম আছে। মানবের কর্ম্ম ঈশ্বরের কর্ম্মের অন্তর্গত হইলেও মানবের কর্ম্মে কিয়ৎ পরিমাণ স্বাধীনতা আছে। ঈশ্বরের কর্ম্মই প্রাকৃতিক নিয়ম বা ঐশিক আইন; অতএব ব্যষ্টি-মানবাত্মা স্বীয় কর্ম্মদ্বারা ঐ প্রাকৃতিক নিয়মের বা ঐশিক আইনের পোষকতা বা তাহা ব্যতিক্রম করিতে শক্ত। মানব স্বীয় চেষ্টা (পুরুষকার) দ্বারা প্রাকৃতিক নিয়মের অগ্রে অগ্রে গমন করিতে পারে ও স্বাভাবিক কাল-পরিমিতির পূর্ব্বেও সুফল ফলাইতে পারে এবং প্রাকৃতিক নিয়ম লঙ্ঘনদ্বারা পশ্চাৎপদ হইয়া—এমন কি, স্বীয় মানবাত্মার ধ্বংস—অর্থাৎ স্বীয় আত্মার † সাত্ত্বিক অস্তিত্ব পর্য্যন্ত লোপ করিতে পারে।

উপরোক্ত মীমাংসা কোন ধর্ম্মের বিরোধী নহে। সর্ব্বধর্ম্মেই মানবের কর্ম্মফলে আত্মার উন্নতি-অবনতি স্বীকৃত আছে, কিন্তু হিন্দুধর্ম্ম ব্যতীত অন্যান্য ধর্ম্মতত্ত্বে ঐ উন্নতি-অবনতির ক্রম ও প্রণালীসকল আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে ন্যায়-বিচারমূলক বলিয়া বোধ হয় না। শক্ত্যুপহিত মহাচৈতন্য বা অনন্ত ঈশ্বর নির্ম্মলজ্ঞান ও বিচার-শক্তিসম্পন্ন। এই বিশ্বরাজ্যের যে দিকে দৃষ্টি করা যায়, সেই দিকেই মূর্ত্তিমান্ অনন্ত ন্যায় ও বিচার বিরাজিত। তারপর মনুষ্যের এই বিচারশক্তি কোথা হইতে উৎপন্ন হইল? এই যে মানব-সমাজে ব্যবস্থাপ্রণেতা "লেজিস্‌লেটিভ্ কাউন্সিল" ন্যায় ও যুক্তিমূলক আইন প্রণয়ন করিতেছেন, উচ্চতম বিচারালয়ের বিচারপতিগণ আইন ও ন্যায়-সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া ন্যায়ের গভীর ও সূক্ষ্মতম ভাব ব্যাখ্যা করিতেছেন, প্রাচীনকালে মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, নারদ, পরাশর প্রভৃতি ন্যায়মূলক ব্যবস্থা সকল প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন, গ্রীক ও রোমের প্রাচীন মৌলিক আইনের সারস্বরূপ "জুরিজ্‌প্রুডেন্স" পাশ্চাত্য-জাতির আইনের ভিত্তিস্বরূপ অবস্থান করিতেছে, ঐ সকল ন্যায় ও যুক্তিপূর্ণ আইন মনুষ্য-বুদ্ধি ও বিচার-প্রসূত; ঐ মনুষ্যবুদ্ধি ও বিচার অজ্ঞানক্ষেত্রে জ্ঞানের কিঞ্চিৎ জ্যোতিঃবিকাশ মাত্র। যখন অজ্ঞানমিশ্রিত জ্ঞানের সামান্য জ্যোতিঃ হইতে মানব-কৃত ন্যায় ও বিচার চতুর্দ্দিকে জাজ্বল্যমান, তখন সেই নির্ম্মল অনন্ত-জ্ঞানমূলক ন্যায়-বিচারের কি কোন অঙ্গহানি হইতে বা কোন অংশে অভাব থাকিতে পারে?

মুসলমান, ইহুদী, খৃষ্টান প্রভৃতিও পরলোক স্বীকার করেন বটে, কিন্তু পুনর্জ্জন্ম স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে মৃত্যুর পর মানবাত্মা বিচারকাল পর্য্যন্ত স্তম্ভিত থাকে, সৃষ্টির শেষে বিচারান্তে পরলোকে দণ্ডিত বা পুরস্কৃত হয়। উপরোক্ত মতটী আমাদের ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে ন্যায়-মূলক বলিয়া বোধ হয় না; প্রথমতঃ একটী

* আইনের সংসৃষ্ট ও অসংসৃষ্ট দায়িত্বের (Joint and several liablity) ন্যায় ব্যক্তিগত কর্ম্মফল সমাজে কিয়ৎ পরিমাণ অর্শিলেও কর্ম্মকর্ত্তা যে তাঁহার কৃতকার্য্যের নিমিত্ত স্বয়ং পৃথক্ দায়ী, তৎপক্ষে সন্দেহ নাই।

† এস্থলে আত্মা অর্থে বিজ্ঞানময় কোষ-সংযুক্ত আত্মা। ঐ বিজ্ঞানময় কোষই উচ্চমনাঙ্গ বুদ্ধি—অর্থাৎ আত্মার ধ্বংস অর্থে বুদ্ধির ধ্বংস বুঝিতে হইবে।

মানবের ইহ জীবনের উর্দ্ধসংখ্যা ১০০ বৎসরের কর্ম্মফল অনন্তকাল ভোগ করা বিচার-সঙ্গত নহে। কাহারও অতি শৈশবে, কাহারও যৌবনকালে মৃত্যু হয়; তাহাদের অতি অল্প-কালের কার্য্যহেতু অসীম অনন্তকাল তাহার ফলভোগ হওয়া অতীব ন্যায়বিগর্হিত। ইহার মধ্যে শিশু, অশিক্ষিত ও বিচারবিহীনলোক আছে, ইহাদের জ্ঞান-বুদ্ধি কিছুই নাই বলিলেই হয়; ইহাদের কার্য্যের ফলাফল বোধই নাই। ঈশ্বর তাহাদিগকে সেই শক্তি দেন নাই, অথচ সেই সেই বুদ্ধিহীন নিরীহ লোক বুঝিতে না পারিয়া যে সকল কার্য্য করে, তাহার জন্য পর-লোকে দণ্ডের তারতম্য হইলেও অনন্তকাল তাহার ফলভোগ করা কি ভয়ঙ্কর কঠিন কথা দ্বিতীয়তঃ পুনর্জ্জন্ম স্বীকার না করিলে, পুন-র্জ্জন্মের কর্ম্মফলে ইহজীবনের সুখ-দুঃখ, উন্নতি-অবনতি কি ফলাফল সম্ভব নহে। মনে করুন, একজন নিরীহ ভদ্রলোক, কিন্তু অর্থ-সামর্থ্যহীন, অন্য লোক তাঁহার উপর অত্যাচার করিয়া তাঁহাকে সর্ব্বস্বান্ত ও পথের ভিখারী করিল, রাজদ্বারে মিথ্যা অভিযোগ করিয়া তাঁহাকে দীর্ঘকাল কারাদণ্ড ভোগ করাইল, তাঁহার নির্দ্দোষী পরিবারবর্গকে গৃহ হইতে বিতাড়িত করায়, তাহারা অন্নাভাবে প্রাণত্যাগ করিল, অথবা ঐ অন্নাভাবে বেশ্যাবৃত্তি বা অন্য দুষ্কর্ম্ম করিতে বাধ্য হইল এবং ঐ কারাগারস্থ ব্যক্তি কষ্ট সহ্য করিতে না পারিয়া কারাগারে প্রাণ ত্যাগ করিল; কিন্তু ঐ অত্যাচারকারী ক্রমে পরস্বাপহরণ করিয়া ধনৈশ্বর্য্যসম্পন্ন হইয়া সুখ-স্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করিতে লাগিল; অতএব ঈশ্বরের ন্যায়-রাজ্যে বিনা কারণে ঐ নির্দ্দোষী ব্যক্তি বিনাপরাধে ঘোর বিপন্ন হওয়া ও অত্যাচারী সহস্র পাপকার্য্য করিয়া পরম সুখ-সম্ভোগ করা কি বিচার ও ন্যায়সঙ্গত? ইহার সঙ্গতহেতু কেহ বলিতে পারেন? যদি কেহ বলেন যে, বিপন্ন ব্যক্তি নিজের বুদ্ধিহীনতা প্রযুক্ত বিপন্ন হইয়াছে এবং অত্যাচারী তাহার কূটবুদ্ধি ও চতুরতাহেতু সুখসমৃদ্ধি ভোগ করি-তেছে; উহাই ইহজীবনের কর্ম্মফল। আমরা তদুত্তরে এই বলিতে পারি যে, ঐ বুদ্ধিহীনতা কি তাহার নিজ অপরাধ? ঈশ্বর তাহাকে যেরূপ বুদ্ধি দিয়াছেন, সে তাহার অপব্যবহার করে নাই, অথচ সে বিপন্ন এবং প্রকৃতি বা ঈশ্বরদত্ত সূক্ষ্মবুদ্ধিবিশিষ্ট ব্যক্তি ঐ বুদ্ধির অপ-ব্যবহার ও দুষ্কর্ম্ম করিয়া জনসমাজে ধনী, মানী ও খ্যাত্যাপন্ন, ইহা কি ন্যায়-বিচার-মূলক? বলিতে পারেন যে, অত্যাচারীর ফল-ভোগ প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে তাহার পুত্র-পৌত্রাদি অবশ্যই করিবে ও নির্দ্দোষী বিপন্ন ব্যক্তির পুত্রপৌত্রাদিও তাহার পিতৃপুণ্যবলে তাহার ফলভোগ করিবে। ইহজগতের কর্ম্ম-সূত্র সূক্ষ্মভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিলে, কর্ম্মফল বংশানুক্রমিক সংক্রামিত হইতে পারে, ইহা স্বীকার্য্য; অনেকস্থলে ঐরূপ ফল সংযোজিত হইতে দেখা যায়, কিন্তু সর্ব্বস্থলে ঠিক্ ঐরূপ ঘটে না। যাহা হউক, সর্ব্বস্থানে ঐ নিয়ম প্রযোজ্য স্বীকার করিলেও উহা ন্যায়মূলক বলা যাইতে পারে না। উহাদিগের পুত্রপৌত্র উহা-দিগের পাপপুণ্যের ফলভোগ করিলেও ঐ নির্দ্দোষী ব্যক্তি নিরপরাধে ঘোর বিপন্ন ও অত্যাচারগ্রস্ত হওয়াও ঘোর পাপী অত্যাচারী সমাজে প্রতিষ্ঠালাভ ও সুখসম্ভোগ করা কখন ন্যায়-বিচারমূলক নহে। উপযুক্ত শিক্ষিত ধার্ম্মিক ব্যক্তি যত্ন ও চেষ্টাসত্ত্বেও চিরকাল কষ্টে কালাতিপাত করিয়া প্রাণত্যাগ করিল; অন্য অশিক্ষিত অধার্ম্মিক ব্যক্তি সামান্য যত্ন ও চেষ্টা-দ্বারা প্রভূত সম্পত্তিশালী হইয়া ইহজীবনে সুখসম্ভোগ করিয়া, দম্ভের সহিত ইহজীবন

অতিবাহিত করিল; ঐ উভয় ব্যক্তির ইহজীবনের কর্ম্মফলের কারণ এস্থলে নির্ণয় করা কঠিন। কেহ বলিতে পারেন যে, ঐ অশিক্ষিত অধার্ম্মিক ব্যক্তি অল্প যত্ন-চেষ্টায় প্রকৃতি-সঙ্গত উন্নতির পথটী প্রাপ্ত হইয়াছিল, শিক্ষিত ধার্ম্মিক ব্যক্তি যত্ন-চেষ্টাসত্ত্বেও তাঁহার স্বভাবসঙ্গত উপায় নির্ণয় করিতে পারেন নাই; প্রকৃতি-দত্ত বুদ্ধির যথাযথ ব্যবহার করিতে না পারিলে সে তাহার ফলভোগী করিবে; ঈশ্বর তাহার জন্য দায়ী নহেন। ইহার উত্তর এই যে, প্রকৃতিদত্ত কূটবুদ্ধি পরিচালনে সামান্য আয়াস ও যত্নে যথেষ্ট উন্নতি করা এবং শিক্ষিত ধার্ম্মিক ভদ্রলোকের সরলবুদ্ধি পরিচালনে প্রকৃতিসঙ্গত উপায় উদ্ভাবন করিতে না পারিয়া চিরজীবন কষ্টভোগ করা ঈশ্বরের ন্যায়রাজ্যের বিচারসঙ্গত নহে। একটী বালক জন্মাবধি নীরোগ, বলিষ্ঠ, বুদ্ধিমান, সুচতুর, ন্যায়পরায়ণ প্রভৃতি সর্ব্বগুণসম্পন্ন; তাহার নিজের কোন কার্য্যফল ব্যতীত হঠাৎ বিসূচিকা পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া প্রাণ ত্যাগ করিল। ইহাতে তাহার মাতাপিতার বা তাহার নিজের কোন কর্ম্মফল দেখা যায় না। যদি বলেন যে কারণে দেশে বিসূচিকা পীড়ার উদ্ভব হয়, তাহার স্বদেশীয়গণ সেই কারণ আবিষ্কার ও দূর করিতে না পারায় তাহাদের স্বীয় কর্ম্মফলে স্বদেশের মধ্যে যাহার প্রকৃতির সহিত ঐ পীড়ার প্রকৃতির সামঞ্জস্য হইবে, সেই আক্রান্ত ও কালগ্রাসে পতিত হইবে, ইহা স্বীকার করিলেও যখন ইহজীবনের কার্য্যের ফল ইহজীবনেই শেষ হইবে, বলা হয়, সেস্থলে প্রকৃতির ঐরূপ বৈষম্য কখনই ন্যায়সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। ইহজীবনের কার্য্যফল যে ইহজীবনেই কতক ভোগ হয়, তাহা আমরা স্বীকার করি। ইহলোক এবং পরলোক যে একই নিয়মাধীন, উহা আমরা প্রমাণ করিতে বা দর্শাইতে ক্রটী করি নাই; যাহাহউক পুনর্জ্জন্ম স্বীকার না করিলে সকলস্থানে মানবের কর্ম্মানুযায়ী ফলের সামঞ্জস্য রক্ষিত হয় না; তদ্ধেতু অনন্ত-ন্যায়-বিচারকের ন্যায়বিচারের মূলে কুঠারাঘাত করা হয়। অবশেষে বিপক্ষবাদীরা এই একটী গুরুতর তর্ক তুলিতে পারেন যে, অন্যান্য জীবজন্তু যখন সম্পূর্ণরূপ প্রকৃতির অধীন, তখন তাহারা পাপপুণ্যের দায়ী নহে। মানবের বিচারশক্তি ও কিয়ৎপরিমাণ স্বাধীনতা ও ধর্ম্মাধর্ম্ম-জ্ঞান থাকায় কর্ম্মানুযায়ী ফল, পাপপুণ্যের দায়িত্ব, পরলোকে কর্ম্মফলের বীজ-প্রস্তুতি ও পরজন্মে তাহার ফলোৎপত্তি ইত্যাদি কেবল মানবেই প্রযোজ্য, অন্যান্য জীবে প্রযোজ্য নহে। তবে বলবান্ ব্যাঘ্র, নির্দ্দোষী অজ, মেষ, মৃগ প্রভৃতির অকারণে যে প্রাণ ধ্বংস করে, ইহা স্বাভাবিক; কাহারো কর্ম্মফল নহে। এস্থলে ন্যায়বিচার কোথায় রহিল? প্রকৃতির এরূপ অসামঞ্জস্যের কারণ কি? ইহার উত্তর কিছু কঠিন, ইহা সম্যক্‌রূপে আধ্যাত্মিক দর্শনশাস্ত্রোক্ত গুরুতর তর্কের মীমাংসার উপর নির্ভর করে। প্রথমতঃ পশুজগতে কর্ম্মফল ও পুনর্জ্জন্ম নাই, ইহা বিবেচনা করা অতীব ভ্রমজনক; যদিও থিয়সফিষ্টগণের মতে মানবের ন্যায় পশুজগতে ব্যক্তিনিষ্ঠ কর্ম্মফল প্রযোজ্য নহে; স্বভাবতঃ জাতিনিষ্ঠ কর্ম্মফল প্রযোজ্য, কিন্তু সূক্ষ্মভাবে পর্য্যালোচনা করিলে, ঐ জাতিনিষ্ঠ-কর্ম্মফল ব্যক্তিনিষ্ঠত্বের সমষ্টি স্বরূপ; অর্থাৎ প্রত্যেক জীবের স্বীয় কর্ম্মফলানুযায়ী উন্নতি-অবনতি আছে; তবে উহা স্বাভাবিক নিয়মানুযায়ী ইহলোক ও পরলোকব্যাপী প্রাকৃতিক সামঞ্জস্য ও ক্রমোন্নতিসাধক জগৎস্রষ্টার মৌলিক নিয়ম। পশুজগৎ— এমন কি—পক্ষী, কীট, পতঙ্গ ও উদ্ভিদ-রাজ্য পর্য্যন্ত ঐ মৌলিক নিয়মের বহির্ভূত নহে।

এস্থলে ঐ অজ, মেষ, মৃগ, সিংহ, ব্যাঘ্র প্রভৃতির কর্ম্মফল ও পুনর্জ্জন্মসম্বন্ধে সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ বিবৃত করা আবশ্যক, নচেৎ উপরোক্ত তর্কের সর্ব্বাঙ্গীন সুন্দর মীমাংসা হইতে পারে না।

এস্থলে স্মরণ রাখা উচিত যে, ব্যষ্টি মানব অনন্ত সৃষ্টিকরীশক্তির অনুকরণে সৃষ্ট। ঐ সৃষ্টিকরীশক্তি হইতে অবনমন (Descending cycle) ও উন্নয়ন (Ascending cycle) ও তাহার প্রণালী সম্বন্ধে অনুসন্ধান পত্রিকায় আমার রচিত "জ্ঞানযোগ—অন্তর্জ্জগৎ" শীর্ষক প্রবন্ধে পরিষ্কাররূপে বর্ণনা করিয়াছি; উহাই প্রকৃতির কার্য্য। সেই কার্য্যের গতি মানববুদ্ধিতে নিতান্ত বক্র বলিয়া উপলব্ধি হয়, কিন্তু গাঢ় চিন্তা করিয়া দেখিলে স্পষ্ট উপলব্ধি হইবে যে, এই অনন্তজগৎ অনন্ত ন্যায়-ভিত্তির উপর একটী নির্দ্দিষ্ট নিয়মাধীনে শাসন করিতে হইলে প্রকৃতির ক্রিয়ার গতি কিঞ্চিৎ বক্র ব্যতীত কখনই সরলভাবে সামঞ্জস্য রক্ষিত হইতে পারে না। একভাবে চৈতন্য ও প্রকৃতি * পরস্পর বিরোধী, এই বিরোধীশক্তির সংঘর্ষণেই এই বিস্তৃত অনন্ত বিশ্বের বিকাশ হইয়াছে। ঐ বিরোধী শক্তি শত শত যুগ যুগান্তে স্ব স্ব ক্রিয়ানুষ্ঠান ও ক্রিয়া সম্পন্ন করার পর পরস্পরের সামঞ্জস্য সম্ভব। ইহার মধ্যে এক এক শ্রেণীর বস্তু-শক্তির ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে অবনতি ও উন্নতির সম্ভাবনা। মানবকুলের অস্তিত্ব হইতে মানবকুলের শেষ বা মুক্তিকাল অনন্ত সৃষ্টির একটী আবর্ত্তন। প্রকৃতির উদ্যম ও তাহার অত্যুচ্ছ্বাস ও হ্রাস ও পুনরুচ্ছ্বাস হইতে ক্রমে সামঞ্জস্যের প্রবৃত্তির উৎপত্তি হয়।

* প্রকৃতি মূলশক্তি হইলেও উহার বিকাশ অবিদ্যামিশ্রিত; অতএব চৈতন্য এবং অবিদ্যা পরস্পর বিরোধী; ঐ অবিদ্যা নাশ হইলে, প্রকৃতির বিশুদ্ধ শক্তির সহিত চৈতন্যের সংমিশ্রণই জাগতিক একতা বা ঈশ্বরত্ব প্রাপ্তি।

ঐ প্রকৃতির উদ্যম ও প্রবৃত্তি জ্ঞান—ও অনুভূতির সহিত সংযুক্ত হইয়া জীব-জগৎ উৎপন্ন হয়। ঐ প্রবৃত্তি ও তদনুভূতি হইতে আসক্তির উৎপত্তি হয়; ঐ আসক্তির প্রথম বিকাশ বাসনা এবং বাসনার বিকাশ লোভ, কাম, ক্রোধ, অহঙ্কার, ঈর্ষা, হিংসা, সুখ, দুঃখ, ভয়, নিষ্ঠুরতা প্রভৃতি; ঐ বাসনা ও তজ্জাত বৃত্তিবিশেষের উদ্যম ও উচ্ছ্বাস ও তাহার হ্রাসবৃদ্ধির ফল হইতে ভিন্ন ভিন্ন জীবের উৎপত্তি; কিন্তু মনুষ্যের পূর্ব্বে পশু-জগতে ঐ সকল বৃত্তির যথাযথ স্ফূরণ, অনুশীলন ও সামঞ্জস্য যে নাই, তাহার কারণ পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে, এজন্য ঐ সকল বৃত্তিবিশেষের উচ্ছ্বাস নিবারণের শক্তি পশুদিগের না থাকায়, এক এক বৃত্তির অত্যুচ্ছ্বাসবশতঃ ক্রমে তাহার উদ্যম (Energy) হ্রাস হয়, তদ্ধেতু অনন্তাকাশে ঐ জীবশক্তি অন্য প্রকার ভিন্ন ভিন্ন জীবশক্তির সহিত সংমিশ্রিত ও সততই ভিন্ন ভিন্ন জীবে পরিণত হয়। মনে করুন, সৃষ্টিপরম্পরা-ক্রমে একাধারে লোভ, ক্রোধ, অহঙ্কার, নিষ্ঠুরতা, হিংসাবৃত্তির উচ্ছ্বাস ও অত্যুচ্ছ্বাস হইতে ব্যাঘ্রের উৎপত্তি হইল। ঐ ব্যাঘ্র অতি দুরন্ত, সহস্র সহস্র জীবের প্রাণ বধ করিয়া তাহার লোভ, হিংসা প্রভৃতি বৃত্তিসকলের চরিতার্থতা সাধন করিতে লাগিল, তৎপ্রযুক্ত অন্তর্জ্জগৎ ঐ প্রবৃত্তির উদ্যম(Energy) ক্রমে হ্রাস বা বৃদ্ধি হওয়ায়, ঐ সকল বৃত্তির তারতম্যানুসারে ব্যাঘ্র, অপেক্ষাকৃত উচ্চশ্রেণীর ব্যাঘ্র বা সিংহযোনিতে উৎপন্ন হইতে পারে, উপরোক্ত বৃত্তির স্ফূরণের সহিত অন্তর্জ্জগতের নিয়মানুসারে বুদ্ধির অঙ্কুর উৎপন্ন ও তদাভাস কিঞ্চিৎ বিকাশিত হয় বটে, কিন্তু উপরোক্ত বৃত্তির চরিতার্থতাহেতু উহার বেগের অপেক্ষাকৃত হ্রাস না হইলে, ঐ বুদ্ধি স্বাধীনভাবে কার্য্য করিতে পারে না। ক্রমজন্মান্তরে উপরোক্ত বেগের হ্রাস

হইলে, বুদ্ধি কিঞ্চিৎ বিকাশিত ও তদনুরূপ বৃত্তির সহিত সংমিশ্রিত ও অন্য জীববিশেষে পরিণত হয়। অবশ্যই সকল ব্যাঘ্রের সমাবস্থা হইতে পারে না। উৎকৃষ্ট, নিকৃষ্ট, গম্ভীরতা, চঞ্চলতা ইত্যাদি অনুসারে প্রবৃত্তি ও উদ্যম-শক্তির বৃদ্ধি এবং উন্নতি অবনতি হয়, আবার নির্দ্দোষী অজ, মেষ, মৃগ প্রভৃতির হিংসাবৃত্তির বিকাশ অতি অল্প, নাই বলিলেই হয়। তাহাদের অন্যান্য স্বাভাবিক বৃত্তিরও পূর্ণ উচ্ছ্বাস না হওয়ার ক্রমে তাহার বিকাশ হওয়াই সম্ভব। ঐ সকল পশু ক্রমে স্বকীয় বৃত্তির ক্রম-বিকাশ-হেতু জন্মজন্মান্তরে মহিষ, অশ্ব, হস্তীতে পরিণতির সম্ভাবনা। উপরোক্ত বর্ণনাগুলিই যে ঠিক্, তাহা নহে, তবে এক একটী দৃষ্টান্ত স্বরূপ প্রদত্ত হইল, ইহাই পশুজাতির কর্ম্মফল; কিন্তু পশুজাতির স্বকীয় কর্ম্মফল নহে। প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে ঐ প্রকার ফল সংঘটিত হয়। ঐ প্রাকৃতিক নিয়মও সেই অনন্ত ঈশ্বরের ন্যায়-বিচারের অধীন। এই পশুজগতে বৃত্তির উচ্ছ্বাস ও হ্রাস-বৃদ্ধি হইতে ক্রমে সংযোগ-বিয়োগ ও বৃত্তি সকল পরিপুষ্ট ও উত্তেজক চিচ্ছক্তি-সাহায্যে সামঞ্জস্যাভিমুখী হয়। অবশেষে স্বয়ং চিচ্ছক্তির বিকাশহেতু জ্ঞান স্বাধীনভাবে বিকাশিত হয়। পশুজগতের চরমোন্নতি হইতে যে মানবের সৃষ্টি, তাহা প্রায় সর্ব্ববাদীসম্মত। হিন্দুমতে মানবের নিম্নেই পশুশ্রেষ্ঠ বা পশুরাজ সিংহের স্থান। নৃসিংহ অবতারেই তাহার উৎকৃষ্ট প্রমাণ। কিন্তু রামায়ণে মানবের নিম্নেই বানরজাতি বলিয়া বোধ হয়। পাশ্চাত্য পণ্ডিত ডারুইনের মতেও মানবের নিম্নে বানরের অবস্থান। এক্ষণে বানর হইতে কি সিংহ হইতে মানবকুলের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার মীমাংসা আমাদের এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নহে এবং ঐ মীমাংসাও সহজ নহে। সিংহের মহত্ত্ব ও তেজস্বিতা ও বানরের বোধাধিকার ও কার্য্যকুশলতা দৃষ্টি করিলে সিংহ কি বানর যে মানবকুলের অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী, তাহা নির্ণয় করা অতীব কঠিন; তবে বনমানুষ, উল্লুক প্রভৃতি যে বানরের উন্নতাবস্থা, ইহা অনুমান করা যাইতে পারে, কিন্তু বনমানুষ ও উল্লুকের শক্তি ও অন্তর্বৃত্তির সহিত সিংহশক্তির সম্মিলন হইতে প্রথম অসভ্য মানব বা রাক্ষসকুলের সৃষ্টি অসম্ভব নহে * উহা আমাদের বর্ত্তমান আলোচ্য নহে এবং উহার মীমাংসা আমাদের ক্ষমতার অতীত; আমরা কেবল কর্ম্মফল নির্ণয় জন্য কতকগুলি অনুমান ও উপমানের উপর নির্ভর করিয়া পশুজগতের উন্নতি-অবনতিসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বর্ণনা করিতে বাধ্য হইলাম। ফলে উপরোক্ত বর্ণিত বিষয়গুলির স্পষ্ট প্রমাণাভাব; তবে এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে যে, বস্তুর রাসায়নিক সংযোগ-সংশ্লেষণ দ্বারা যে শক্তি উৎপন্ন হয়, তাহার ক্রিয়ান্তে ঐ শক্তি অবশ্যই আকাশস্থ শক্তির সহিত সংমিশ্রিত হয় * শক্তির কখনই ধ্বংস নাই, তবে ক্রিয়াজনিত হ্রাস-বৃদ্ধি ও ভিন্নাকারে পরিণতির সম্ভাবনা বটে। যাহা হউক, কর্ম্মফলই পুনর্জ্জন্মের হেতুভূত। জন্মান্তরীণ কর্ম্মফল স্বীকার না করিলে, জগতের অবনতি ও উন্নতি-সম্বন্ধে প্রাকৃতিক নিয়ম এবং শক্তির ও সমস্ত

* থিয়সফিষ্টগণের মতে স্থূলদেহ ও উহার আদর্শ সূক্ষ্মদেহ, প্রাণ এবং ইচ্ছাপ্রমুখ কামনা প্রভৃতি বৃত্তির পূর্ণ বিকাশ হইলে, মানবমস্তিষ্কের উপাদান প্রস্তুত হয় এবং তাহাতে মানসপুত্রের (মানবতত্ত্বের) বিকাশ হয়, অর্থাৎ মানবজাতি উৎপন্ন হয়।

* মিঃ টিণ্ডাল এবং ক্রুমের প্রাকৃতিক বিজ্ঞান হইতে ডাক্তার ঋালজারের উদ্ধৃত বিষয়—যাহা বিগত বর্ষের বঙ্গীয় থিয়সফিক্যাল্ সোসাইটীর সাম্বাৎসরিক অধিবেশনের বক্তৃতায় প্রকাশিত হয়, তাহা দ্রষ্টব্য।

জাগতিক ব্যাপারের সামঞ্জস্য সংরক্ষিত হয় না। বিশেষতঃ সর্ব্বনিয়ন্তা জগৎপিতার ন্যায়-শক্তির লেশ ও মানবের ধর্ম্মবন্ধনের মূলে কুঠারাঘাত করা হয়। পক্ষান্তরে জন্মান্তর স্বীকার করিলে প্রাকৃতিক নিয়ম এবং মৌলিক শক্তি ও জাগতিক সমস্ত ব্যাপার ও ক্রিয়া এবং অনন্তজ্ঞানময় জগদীশ্বরের ন্যায়-বিচারের সর্ব্বসামঞ্জস্য রক্ষিত হয়। জন্মান্তর ও পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফলানুযায়ী উন্নতি ও অবনতিসম্বন্ধে ভগবদ্‌গীতার নিম্নোক্ত কবিতা কয়েকটী অতি সারপূর্ণ ও প্রকৃতিসঙ্গত, আমাদের উপরোক্ত মীমাংসার সম্পূর্ণ প্রতিপোষক।

"অযতিঃশ্রদ্ধয়োপেতো যোগাচ্চলিতমানসঃ।
অপ্রাপ্য যোগসংসিদ্ধিং কাং গতিং কৃষ্ণ গচ্ছতি॥"
৬ অ, ৩৭ শ্লোক।

হে কৃষ্ণ! যিনি শ্রদ্ধাবান্ হইয়াও যোগসাধনে বিশেষ যত্ন করেন নাই অথবা যোগ সাধন করিতে করিতে চিত্ত-চাঞ্চল্যদোষে ভ্রষ্ট হইয়াছেন, তিনি যোগসিদ্ধিলাভ না করিয়া কিপ্রকার গতি প্রাপ্ত হইবেন॥ ৩৭॥

"প্রাপ্যপুণ্যকৃতাং লোকানুষিত্বা শাশ্বতীঃ সমাঃ।
শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে॥"
৬ অ, ৪১ শ্লোক।

যোগভ্রষ্ট পুরুষ পুণ্যাত্মাদিগের প্রাপ্যলোক লাভ করিয়া তথায় বহুবর্ষ নিবাস করেন এবং তদনন্তর পৃথিবীতে পবিত্র শ্রীমন্তের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন॥ ৪১॥

"অথবা যোগিনামেব কুলে ভবতি ধীমতাং।
এতদ্ধি দুর্লভতরং লোকে জন্ম যদীদৃশং॥"
৬ অ, ৪২ শ্লোক।

অথবা যোগভ্রষ্ট পুরুষ ব্রহ্মবিদ্যাবিশিষ্ট যোগীর গৃহে জন্মগ্রহণ করেন, এরূপ জন্ম জগতে দুর্ল্লভ॥ ৪২॥

"তত্র তং বুদ্ধিসংযোগং লভতে পৌর্ব্বদেহিকং।
যততে চ ততো ভূয়ঃ সংসিদ্ধৌ কুরুনন্দন॥"
৬ অ, ৪৩ শ্লোক।

হে কুরুনন্দন! যোগভ্রষ্ট পুরুষ জন্মগ্রহণ করিলে তাঁহার পূর্ব্বদেহের সংস্কারানুরূপ জ্ঞানসাধিনী বুদ্ধি লাভ করেন এবং তদনন্তর মুক্তির নিমিত্ত অধিকতর যত্ন করিতে থাকেন॥ ৪৩॥

"পূর্ব্বাভ্যাসেন তেনৈব হ্রিয়তে হ্যবশোঽপি সঃ।
জিজ্ঞাসুরপি যোগস্য শব্দব্রহ্মাতিবর্ত্ততে॥"
৬ অ, ৪৪ শ্লোক।

যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি যত্ন না করিলেও পূর্ব্বাভ্যাস বশতঃ তাঁহার প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। আত্মতত্ত্বজ্ঞানের জিজ্ঞাসু হইলে, বেদোক্ত কর্ম্মফলের অপেক্ষা অধিকতর ফললাভ করিয়া থাকে॥৪৪॥

"প্রযত্নাদ্ যতমানস্তু যোগী সংশুদ্ধকিল্বিষঃ।
অনেক জন্মসংসিদ্ধস্ততো যাতি পরাং গতিং॥"
৬ অ, ৪৫ শ্লোক।

যে যোগীপুরুষ পূর্ব্বযত্ন হইতেও অধিক প্রযত্ন করেন এবং নিষ্পাপ হইয়া জন্মজন্মান্তরীয় পুণ্যফলে এইরূপ জন্মগ্রহণ করেন, সাধন পরিপাকদ্বারা তিনি মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন॥৪৫॥

প্রাচীন হিন্দুদিগের মধ্যে জন্মান্তর ও জন্মান্তরীণ কর্ম্মফলের প্রতি অটল বিশ্বাস ছিল; ঐ বিশ্বাস নিতান্ত অমূলক নহে, আধ্যাত্মিকবিজ্ঞানসম্মত। প্রাচীনদিগের ঐ বিশ্বাস এরূপ বদ্ধমূল ছিল যে, প্রাচীন কবিগণ কাব্যাদির মধ্যেও উহা সন্নিবিষ্ট করিতে ক্রটী করেন নাই।

যথা—তাং হংসমালাঃ শরদীব গঙ্গাং
মহৌষধিং নক্তমিবাত্মভাসঃ।
স্থিরোপদেশামুপদেশকালে
প্রপেদিরে প্রাক্তনজন্মবিদ্যাঃ॥
কুমারসম্ভব ১ স্বর্গ ৩০ শ্লোক (ক)

(ক) অনুবাদ। পূর্ব্বজন্মে তিনি যে উপ-

দেশ পাইয়াছিলেন, তাহা তাঁহার অন্তরে স্থির হইয়াছিল, কোনমতেই বিনষ্ট হয় নাই। এক্ষণে উপদেশ পাইবামাত্র পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত বিদ্যাসমূহ শরৎকালে হংসমালা যেমন গঙ্গাকে এবং রাত্রিতে স্বকীয় দীপ্তি যেমন মহৌষধিকে প্রাপ্ত হয়, তেমনি তিনি উমাকে প্রাপ্ত হইলেন।

আবার দার্শনিকগণ—এমন কি স্বয়ং গৌতম বুদ্ধও জন্মান্তর ও কর্ম্মফল স্বীকার করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমাদিগের স্বজাতি বিজ্ঞ পণ্ডিতপ্রবর মহামাননীয় মিঃ রমেশচন্দ্র দত্ত মহোদয় গৌতম বুদ্ধের ঐ মতটী অনুমোদন করেন নাই। অবশ্য পুনর্জ্জন্ম ও জন্মান্তরীণ কর্ম্মফল সাধারণের পক্ষে প্রত্যক্ষ-প্রমাণসিদ্ধ নহে বটে, কিন্তু অনেকস্থলে আনুমানিক ও ঔপমানিক প্রমাণ, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ গ্রাহ্য ও অনুমোদন করিয়া গিয়াছেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিত বেন্থাম প্রভৃতির প্রমাণবিষয়ক মৌলিক তত্ত্ব দ্রষ্টব্য। জন্মান্তরীণ কর্ম্মফল যে আনুমানিক ও ঔপমানিক প্রমাণসিদ্ধ ও যুক্তি-পূর্ণ, তাহা আমরা দর্শাইয়াছি, তবে উহা আধুনিক কৃতবিদ্যসমাজে আদৃত হইবে কিনা, জানিনা। যাহাহউক, আমরা জন্মান্তরীণ কর্ম্ম-ফল সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি। (ক্রমশঃ)

শ্রীশশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

আত্মানাত্মবিবেকঃ।

(পূর্ব্বতোনুবৃত্তঃ)

প্রাণাদি বায়ুপঞ্চকং নাম প্রাণাপানব্যানো-দানসমানাঃ। (১)

প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান ও সমান নামে পঞ্চ বায়ু।

তেষাং স্থানবিশেষা উচ্যন্তে।

তাহাদের স্থানবিশেষ কথিত হইতেছে।

হৃদি প্রাণো গুদেঽপানঃ সমানো নাভি-সংস্থিতঃ। উদানঃ কণ্ঠদেশস্থো ব্যানঃ সর্ব্ব-শরীরগঃ॥

হৃদয়ে প্রাণ, গুহে অপান, সমান নাভিদেশে, কণ্ঠদেশে উদান ও ব্যানবায়ু সর্ব্বশরীরে থাকে।

তেষাং বিষয়াঃ।

তাহাদিগের বিষয় কথিত হইতেছে।

(১) "তৈঃ সর্ব্বৈঃ সহিতৈঃ প্রাণো বৃত্তিভেদাৎ স পঞ্চধা।
প্রাণোঽপানঃ সমানশ্চোদানব্যানৌচ তে পুনঃ॥"
পঞ্চদশী তত্ত্ববিবেক ২২।

আকাশাদি পঞ্চভূতের রজোগুণ একত্রিত হইলে প্রাণ উৎপন্ন হয়। ঐ প্রাণ কার্য্যভেদে পাঁচ প্রকার যথা প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান।

"প্রাণোপানশ্চ ব্যানশ্চ সমানোদানবায়বঃ।"
শ্রীদেবীভাগবতে ৩ স্কন্ধে ৭ অ, ৩৩।

"প্রাণোপানঃ সমানশ্চ উদানো ব্যান এব চ।
নাগঃ কূর্ম্মশ্চ কৃকরো দেবদত্তো ধনঞ্জয়ঃ॥
* * * *
প্রয়াণং কুরুতে তস্মাৎ বায়ুঃ প্রাণ ইতি স্মৃতঃ।
অপানয়ত্যপানস্তু আহারাদীন্ ক্রমেণ চ॥
ব্যানো ব্যানাময়ত্যঙ্গং ব্যাধ্যাদীনাং প্রকোপকঃ।
উদ্বেজয়তি মর্ম্মাণি উদানোঽয়ং প্রকীর্ত্তিতঃ॥
সমং নয়তি গাত্রাণি সমানঃ পঞ্চবায়বঃ।
উদ্গারে নাগ আখ্যাতঃ কূর্ম্ম উন্মীলনে তু সঃ॥
কৃকরঃ ক্ষুতকায়ৈব দেবদত্তো বিজৃম্ভণে।
ধনঞ্জয়ো মহাঘোষঃ সর্ব্বগঃ সমৃতেঽপি হি॥"
লিঙ্গপুরাণে ৮ অধ্যায়ে।

প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান, নাগ, কূর্ম্ম, কৃকর, দেবদত্ত ও ধনঞ্জয়। যে বায়ু ঊর্দ্ধে গমন করেন,

প্রাণঃ প্রাগ্‌গমনবান্‌।

প্রাণবায়ু পূর্ব্বদিকে গমন করেন।

অপানোঽবাগ্‌গমনবান্‌।

অপানবায়ু অধোদিকে গমন করেন।

উদান উর্দ্ধগমনবান্‌।

উদান বায়ু উর্দ্ধদিকে গমন করেন।

সমানঃ সমীকরণবান্‌।

সমানবায়ু ভুক্ত অন্নাদিকে একত্র অবস্থান করান।

ব্যানো বিশ্বগ্‌গমনবান্‌।

ব্যানবায়ু সর্ব্বদেহে গমন করেন।

এতেষামুপবায়বঃ পঞ্চ।

ইহাদিগের পঞ্চ উপবায়ু।

নাগঃ কূর্ম্মশ্চ কৃকরো দেবদত্তো ধনঞ্জয়ঃ।

নাগ, কূর্ম্ম, কৃকর, দেবদত্ত ও ধনঞ্জয়।

এতেষাং বিষয়াঃ।

ইহাদিগের বিষয় কথিত হইতেছে।

নাগাদুদ্গীরণঞ্চাপি কূর্ম্মাদুন্মীলনন্তথা।

ধনঞ্জয়াৎ পোষণঞ্চ দেবদত্তাচ্চ জৃম্ভণম্‌॥

কৃকরাচ্চ ক্ষতং জাতমিতি যোগবিদো বিদুঃ॥

নাগ উদ্গীরণকরং।

নাগবায়ুরদ্বারা উদ্গীরণ হয়।

কূর্ম্ম উন্মীলনকরং।

কূর্ম্ম বায়ুর শক্তিতে চক্ষুরাদির উন্মীলন হয়।

ধনঞ্জয়ঃ পোষণকরঃ।

ধনঞ্জয়ের শক্তিতে পোষণ করে।

দেবদত্তো জৃম্ভণকরঃ।

দেবদত্ত বায়ুতে হাই তোলে।

তাহাকে প্রাণ বলে, ভুক্ত আহারাদিকে ক্রমে নীচে আনয়ন করেন, তজ্জন্য অপান, অঙ্গকে সঙ্কোচ করেন, তজ্জন্য ব্যান কথিত হন, ইনি রোগাদিকে বৃদ্ধি করেন। মর্ম্ম ক্লেশদায়ক বায়ুকে উদান কহে। সমুদায় গাত্রকে সমভাবে রাখেন, তজ্জন্য সমান। উদ্গারের বায়ুর শক্তিকে নাগ কহে, চক্ষুরাদি উন্মীলনকারী বায়ুকে কূর্ম্ম, ক্ষুত (হাঁচ)-কারী বায়ুকে কৃকর, হাইতোলা কার্য্যে বায়ুর শক্তিকে দেবদত্ত, মহাশব্দকারী বায়ুকে ধনঞ্জয় বলে, ঐ বায়ু মৃতকালেও সমুদায় শরীর ব্যাপিয়া থাকে।

প্রাণো প্রাণো সমানশ্চ উদানো ব্যান এব চ।

নাগঃ কূর্ম্মশ্চ কৃকরো দেবদত্তো ধনঞ্জয়ঃ।

গরুড়পুরাণে উত্তরার্দ্ধে ৩২ অ, ৪৩।

বেদান্তসারে এইরূপ——

বায়বঃ। প্রাণাপানব্যানোদান সমানাঃ।

বায়ু পঞ্চ—প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান ও সমান।

প্রাণো নাম—প্রাগ্‌গমনবান্‌ নাসাগ্রস্থানবর্ত্তী।

উর্দ্ধে গমনশীল নাসিকার অগ্রস্থানবর্ত্তী বায়ুকে প্রাণ বলে।

নিম্নে গমনশীল পায়ু আদি স্থান স্থায়ী বায়ুকে অপান বলে।

ব্যানো নাম বিশ্বগ্‌গমনবানখিলশরীরবর্ত্তী।

সর্ব্বনাড়ীতে গমনশীল সমুদায় শরীরস্থিত বায়ুকে ব্যান বলে।

উদানঃ কণ্ঠস্থানীয়ঃ উর্দ্ধগমনবানুৎক্রমণ বায়ুঃ।

উর্দ্ধগমনশীল কণ্ঠস্থানীয় উৎক্রমণ বায়ুকে উদান বলে।

সমানঃ শরীরমধ্যগতাশিতপীতান্নাদি সমীকরণকরঃ।

শরীর মধ্যগত ভুক্ত—পীত অন্ন-জলাদির সমীকরণ-কারী বায়ুকে সমান বলে।

সমীকরণন্তু পরিপাককরণং রসরুধিরশুক্রপুরীষাদিকরণং।

পরিপাককরণকে অর্থাৎ রস, রুধির, শুক্র, পুরীষাদি-করণকে সমীকরণ কহে।

শ্রীভগবদ্‌গীতার ৪ অধ্যায়ের ২৭ শ্লোকের শ্রীধর স্বামী-পাদের টীকাতে দশ বায়ুর বিষয় বর্ণিত আছে।

কেচিত্তু নাগকূর্ম্মকৃকরদেবদত্তধনঞ্জয়াখ্যাঃ পঞ্চান্যে বায়বঃ সন্তীত্যাহুঃ।

সাংখ্যমতাবলম্বী আচার্য্যগণ কহেন যে নাগ, কূর্ম্ম কৃকর, দেবদত্ত ও ধনঞ্জয় নামক আরও পঞ্চবায়ু আছে।

তত্র নাগঃ উদ্গীরণকরঃ।

উদ্গীরণকারী বায়ুকে নাগ কহে।

কূর্ম্মবিমীলনাদিকরঃ।

চক্ষু উন্মীলনাদি কারী বায়ুকে কূর্ম্ম কহে

কৃকরঃ ক্ষুৎকরঃ।

কৃকর বায়ুতে হাঁচি হয়।

কৃকরঃ ক্ষুধাকরঃ।

ক্ষুধাকারী বায়ুকে কৃকর বলে।

দেবদত্তঃ জৃম্ভণকরঃ।

জৃম্ভণকারী বায়ুকে দেবদত্ত কহে।

ধনঞ্জয়ঃ পোষণকরঃ।

পোষণকারী বায়ুকে ধনঞ্জয় কহে।

মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে ১৮৫ অধ্যায়ে দশ বায়ুর বিষয় সবিস্তারে বর্ণিত আছে। ঐ অধ্যায়ে বায়ু সম্বন্ধে শেষ শ্লোক এই—

প্রস্থিতা হৃদয়াৎ সর্ব্বে তির্য্যগূর্দ্ধমধস্তথা।
বহন্ত্যন্নরসান্নাড্যো দশপ্রাণপ্রবোদিতাঃ॥

নাড়ী সকল এই কথিত দশবিধ বায়ুদ্বারা চালিত হইয়া তির্য্যক্, ঊর্দ্ধ ও অধোভাগে হৃদয় হইতে প্রস্থান করিয়া অন্নরস সকলকে বহন করিয়া থাকে। "হৃদয় হইতে" কারণ হৃদয়ে প্রাণ সকল থাকে, যথা,——

"হৃদিপ্রাণাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ"

শিব-উপনিষৎ ৩।

"যদ্বৈ প্রাণিতি স প্রাণঃ"

ছান্দোগ্যোপনিষৎ ১ম প্রপাঠকে ৩ খণ্ডে ৩।

উহার ভাষ্য এই—

যদ্বৈ পুরুষঃ প্রাণিতি মুখনাসিকাভ্যাং বায়ুং বহির্নিঃসারয়তি স প্রাণাখ্যো বায়োর্ব্বৃত্তিবিশেষঃ।

লোক মুখ-নাসিকাদ্বারা যে বায়ু বর্হিগত করে, সেই বায়ুকে প্রাণ বলে।

"প্রজ্ঞয়াপ্রাণং সমারুহ্য প্রাণেন সর্ব্বান্ গন্ধানাপ্নোতি।"

কৌষীতকী ৩।৬।

"বহিরন্তং গতে প্রাণে"।

মুক্তিকোপনিষৎ।

"ঊর্দ্ধংপ্রাণমুন্নয়ত্যপানং প্রত্যগস্যতি।"

কঠোপনিষৎ পঞ্চমীবল্লী ৩।

ভাষ্য। ঊর্দ্ধং হৃদয়াৎ প্রাণং উন্নয়তি ঊর্দ্ধং গময়তি তথাপানং প্রত্যগধোঽস্যতি ক্ষিপতি।

"যোয়মবাঙ্ সংক্রামত্যেষ বাবসোঽপানঃ।"

মৈত্রী উপনিষৎ ২।৬।

পায়ূপস্থেঽপানং চক্ষুঃ শ্রোত্রে মুখনাসিকাভ্যাং প্রাণঃ স্বয়ং প্রতিষ্ঠতে মধ্যে তু সমানঃ। এতদ্ধ্যেতদ্ধুতমন্নং সমন্নয়তি।"

প্রশ্নোপনিষৎ, তৃতীয়ঃ প্রশ্নঃ ৫।

পায়ু ও উপস্থে অপান বায়ু। প্রাণ বায়ু চক্ষুঃ ও কর্ণে থাকিয়া মুখ ও নাসিকাদ্বারা বহির্গমন করিয়া থাকে। প্রাণ ও অপানের মধ্যে সমান বায়ু এই বায়ু ভুক্ত পীত অন্ন জলাদিকে সমতায় আনয়ন করে।

"অপানমুৎসর্গে।"

গর্ভোপনিষৎ ১।

মল মূত্র পরিত্যাগের জন্য অপানবায়ুর শক্তি আবশ্যক করে।

"———অপানস্তু পুনর্গুদে।"

অমৃতবিন্দূপনিষৎ ৩৪॥

গুহ্যে অপান বায়ু থাকে।

ব্যানঃ সর্ব্বেষু চাঙ্গেষু সদা ব্যাবৃত্ত্যতিষ্ঠতি॥

অমৃতবিন্দূপনিষৎ ৩৫।

ব্যান বায়ু সর্ব্বদা সকল অঙ্গে ব্যাপিয়া থাকে।

"যোঽস্য প্রাঙ্ সুষিঃ স প্রাণঃ।"

ছান্দোগ্যোপনিষৎ ৩ প্রপাঠকে ১৩ খণ্ডে ১।

হৃদয়ের প্রাক্ অর্থাৎ পূর্ব্বদ্বার ছিদ্র দিয়া গমন করেন, তজ্জন্য প্রাণ কহে।

"যোঽস্য দক্ষিণঃ সুষিঃ স ব্যানঃ।" ঐ ঐ ঐ ২।

হৃদয়ের দক্ষিণদিকের দ্বার ছিদ্র দিয়া নানারূপ গমন করেন, তজ্জন্য ব্যান।

"যোঽস্য প্রত্যঙ্ সুষিঃ সোঽপানঃ।" ঐ ঐ ঐ ৩।

হৃদয়ের পশ্চিমদিকের দ্বার ছিদ্র দিয়া গমন করেন, তজ্জন্য অপান বায়ু। ইহার ভাষ্য, পরে বলিয়াছেন।

মূত্রপুরীষাদিকে অধোদিকে অপনয়ন করে, তজ্জন্য এই বায়ুকে অপান কহে।

"যোঽস্যোদঙ্ সুষিঃ স সমানঃ।"

হৃদয়ের উত্তর দিকের দ্বার ছিদ্র দিয়া যে বায় গমন করেন, তাহাকে সমান কহে। ইহার ভাষ্য এই—

"সোঽশিত পীতে সমং নয়তীতি সমানঃ।"

সেই বায়ু ভুক্ত ও পীত দ্রব্যের সমতা সাধন করে, তজ্জন্য "সমান" বলিয়া উক্ত হয়।

এই সকল জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অধিপতি দিগাদি। তাহা বিশেষরূপে কহিতেছেন।

দিগ্বাতার্কপ্রচেতোশ্বিবহ্নীন্দ্রোপেন্দ্রমৃত্যুকাঃ।
তথা চন্দ্রশ্চতুর্ব্বক্ত্রো রুদ্রঃ ক্ষেত্রজ্ঞ ঈশ্বরঃ।
বিশিষ্টো বিশ্বস্রষ্টা চ বিশ্বযোনিরযোনিজঃ।
ক্রমেণ দেবতাঃ প্রোক্তাঃ শ্রোত্রাদীনাং যথা ক্রমাৎ॥ (২)

শ্রোত্রের অধিষ্ঠাত্রীদেবতা দিক্, ত্বকের বায়ু, চক্ষুর সূর্য্য, জিহ্বার বরুণ, নাসিকার অশ্বিনীকুমার, বাক্যের অগ্নি, হস্তের ইন্দ্র, চরণের বিষ্ণু, গুহ্যের মৃত্যু, উপস্থের প্রজাপতি, মনের চন্দ্র, অহঙ্কারের রুদ্র, বুদ্ধির অধিপতি ক্ষেত্রজ্ঞ ঈশ্বর, যিনি চৈতন্যস্বরূপ, যিনি বিশ্বের স্রষ্টা, যিনি অযোনি অর্থাৎ অনাদি। শ্রোত্রাদির যথাক্রমে দেবতা সকল উক্ত হইল।

"অথ যোঽস্যোর্দ্ধঃ সুষিঃ স উদানঃ।" ঐ ঐ ঐ ৪।
হৃদয়ের উর্দ্ধদিকের দ্বার-ছিদ্র দিয়া গমন করেন তজ্জন্য উদান নামে অভিহিত হন।

(২) "অথ বুদ্ধের্ব্রহ্মা। অহঙ্কারস্যেশ্বরঃ। মনসশ্চন্দ্রমাঃ। দিশঃ শ্রোত্রস্য। ত্বচো বায়ুঃ সূর্য্যশ্চক্ষুষোঃ। রসনস্যাপঃ। পৃথিবীঘ্রাণস্য। বচসোঽগ্নিঃ। হস্তয়োরিন্দ্রঃ। পাদয়োর্বিষ্ণুঃ। পায়োর্মিত্রম্। প্রজাপতিরুপস্থস্যেতি।"
শুশ্রুতে শারীরস্থানে প্রথমোঽধ্যায়ে।

শুশ্রুত ইন্দ্রিয়গণের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার বিষয় এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন যথা,—

বুদ্ধির ব্রহ্মা, অহঙ্কারের রুদ্র, মনের চন্দ্র, শ্রবণের দিক্ সকল, ত্বকের বায়ু, চক্ষুর সূর্য্য, জিহ্বার বরুণ, ঘ্রাণের পৃথিবী, বাক্যের অগ্নি, হস্তের ইন্দ্র, পদের বিষ্ণু পায়ুর মিত্র ও উপস্থের প্রজাপতি।

এ বিষয়ে মহাভারতে শান্তিপর্ব্বে ৩১৩ অধ্যায়ে বহু বিস্তার-বর্ণন আছে।

দিশো বায়ুশ্চ সূর্য্যশ্চ বরুণশ্চাশ্বিনাবপি।
জ্ঞানেন্দ্রিয়াণাং পঞ্চানাং পঞ্চাধিষ্ঠাত্রীদেবতাঃ॥৩৬॥
চন্দ্রো ব্রহ্মা তথা রুদ্রঃ ক্ষেত্রজ্ঞশ্চ চতুর্থকঃ।
ইত্যন্তঃকরণাখ্যস্য বুদ্ধ্যাদেশ্চাধিদৈবতম্॥
চত্বার্য্যেব তথা প্রোক্তাঃ কিলাধিষ্ঠাতৃদেবতাঃ॥ ৩৭॥
শ্রীমদ্দেবীভাগবতে ৩ স্কন্ধে ৭ অধ্যায়ে।

দিক্, বায়ু, সূর্য্য ও বরুণ ও অশ্বিনীকুমারদ্বয় পঞ্চ-জ্ঞানেন্দ্রিয়ের পঞ্চ অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। চন্দ্র, ব্রহ্মা, রুদ্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ ইঁহারা অন্তঃকরণাখ্য বুদ্ধ্যাদির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা।

তস্যাগ্নিরাস্যং নির্ভিন্নং লোকপালো বিশৎপদম্।
বাচা স্বাংশেন বক্তব্যং যয়াসৌ প্রতিপদ্যতে॥ ১২॥
নির্ভিন্নং তালু বরুণো লোকপালো বিশদ্ধরেঃ।
জিহ্বয়াংশেন চ রসং যয়াসৌ প্রতিপদ্যতে॥ ১৩॥
নির্ভিন্নে অশ্বিনৌ নাসে বিষ্ণোরাবিশতাং পদম্।
ঘ্রাণেনাংশেন গন্ধস্য প্রতিপত্তির্যতো ভবেৎ॥ ১৪॥
নির্ভিন্নে অক্ষিণী ত্বষ্টা লোকপালো বিশদ্বিভোঃ।
চক্ষুষাংশেন রূপাণাং প্রতিপত্তির্যতো ভবেৎ॥ ১৫।
নির্ভিন্নান্যস্য চর্ম্মাণি লোকপালোনিলো বিশৎ।
প্রাণেনাংশেন সংস্পর্শং যেনাসৌ প্রতিপদ্যতে॥ ১৬॥
কর্ণাবস্য বিনির্ভিন্নৌ ধিষ্ণ্যং স্বং বিবিশুর্দ্দিশঃ।
শ্রোত্রেণাংশেন শব্দস্য সিদ্ধিং যেন প্রপদ্যতে॥ ১৭॥
+ + + + + + ॥
মেঢ্রং তস্য বিনির্ভিন্নং স্বধিষ্ণ্যং ক উপাবিশৎ।
রেতসাংশেন যেনাসাবানন্দং প্রতিপদ্যতে॥ ১৯॥
গুদং পুংসো বিনির্ভিন্নং মিত্রো লোকেশ আবিশৎ।
পায়ুনাংশেন যেনাসৌ বিসর্গং প্রতিপদ্যতে॥ ২০॥
হস্তাবস্য বিনির্ভিন্নাবিন্দ্রঃ স্বর্পতিরাবিশৎ।
বার্ত্তয়াংশেন পুরুষো যয়াবৃত্তিং প্রপদ্যতে॥ ২১॥
পাদাবস্য বিনির্ভিন্নৌ লোকেশো বিষ্ণুরাবিশৎ।
গত্যা স্বাংশেন পুরুষো যয়া প্রাপ্যং প্রপদ্যতে॥ ২২॥
+ + + + ॥
হৃদয়ং চাস্য নির্ভিন্নং চন্দ্রমাধিষ্ণ্যমাবিশৎ।
মনসাংশেন যেনাসৌ বিক্রিয়াং প্রতিপদ্যতে॥ ২৪॥
আত্মানং চাস্য নির্ভিন্নমভিমানোবিশৎ পদম্।
কর্ম্মণাংশেন যেনাসৌ কর্ত্তব্যং প্রতিপদ্যতে॥ ২৫॥
সত্ত্বং চাস্য বিনির্ভিন্নং মহান্ ধিষ্ণ্যমুপাবিশৎ।
চিত্তেনাংশেন যেনাসৌ বিজ্ঞানং প্রতিপদ্যতে॥ ২৬॥
শ্রীভাগবতে ৩ স্কন্ধে ৬ অধ্যায়ে।

সেই বিরাটপুরুষের মুখ জন্মাইলে, লোকপাল অগ্নি নিজ শক্তি বাক্যের সহিত তাহাতে প্রবেশ করিলেন,

জীব বাক্যদ্বারা শব্দ উচ্চারণ করে ॥ ১২ ॥ তাঁহার তালু আবির্ভূত হইলে, লোকপাল বরুণ নিজ শক্তি জিহ্বার সহিত তাহাতে প্রবেশ করিলেন। জীব জিহ্বাদ্বারা রস গ্রহণ করে॥ ১৩॥ তাঁহার নাসিকাদ্বয় উদ্ভূত হইলে, অশ্বিনীকুমারদ্বয় স্বীয় শক্তি ঘ্রাণের সহিত তাহাতে প্রবেশ করিলেন। জীব ঘ্রাণদ্বারা গন্ধ গ্রহণ করে॥১৪॥ তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় উৎপন্ন হইলে, লোকপাল আদিত্য স্বীয় শক্তি দর্শন সহিত তাহাতে প্রবিষ্ট হইলেন; জীব চক্ষুদ্বার রূপ গ্রহণ করেন ॥ ১৫ ॥ তাঁহার চর্ম্ম প্রকটিত হইলে, লোকপাল বায়ু স্বীয় শক্তি প্রাণের সহিত তাহাতে প্রবেশ করিলেন; জীব প্রাণদ্বারা স্পর্শানুভব করে ॥ ১৬ ॥ তাঁহার কর্ণ জন্মাইলে, দিক্ সকল স্বীয় শক্তি শ্রোত্রের সহিত তাহাতে প্রবেশ করিল; শ্রোত্রদ্বারা শব্দজ্ঞান হয় ॥ ১৭ ॥ + ÷ + ÷ ॥ তাঁহার মেঢ্র আবিষ্কৃত হইলে, প্রজাপতি স্বীয় শক্তি শুক্রের সহিত তাহাতে প্রবেশ করিলেন; মেঢ্রদ্বারা আনন্দানুভব হয় ॥ ১৯ ॥ তাঁহার গুহ্য প্রকটিত হইলে, লোকেশ মিত্র নিজ শক্তি পায়ুর সহিত তাহাতে প্রবেশ করিলেন, যদ্দারা জীব মলত্যাগ করে ॥ ২০ ॥ তাঁহার হস্তদ্বয় উৎপন্ন হইলে, স্বর্গপতি ইন্দ্র স্বীয় ক্রয়বিক্রয়াদি-শক্তির সহিত তাহাতে প্রবেশ করিলেন; জীব হস্তদ্বারা জীবিকা উপার্জ্জন করে ॥ ২১ ॥ তাঁহার পদ উৎপন্ন হইলে, লোকেশ বিষ্ণু স্বীয় শক্তি গতির সহিত তাহাতে প্রবেশ করিলেন; গতিদ্বারা প্রাপ্যবস্তু লাভ করা যায় ॥ ২২ ॥ × × ÷ × ॥ তাঁহার হৃদয় উদ্ভিন্ন হইলে, চন্দ্র নিজ শক্তি মনের সহিত তাহাতে প্রবেশ করিলেন, মনদ্বারা সঙ্কল্প করা যায় ॥ ২৪ ॥ তাঁহার অহঙ্কার উৎপন্ন হইলে, রুদ্র নিজ শক্তি কর্ম্মের সহিত তাহাতে প্রবেশ করিলেন; জীব কর্ম্মদ্বারা কর্ত্তব্যের জ্ঞানলাভ করে ॥ ২৫ ॥ তাঁহার বুদ্ধি প্রকটিত হইলে, ব্রহ্মা নিজ শক্তি চিত্তের সহিত তাহাতে প্রবিষ্ট হইলেন; জীব চিত্তদ্বারা বিজ্ঞান লাভ করে ॥ ২৬ ॥ কিন্তু এই মতের সহিত ঐতরেয়োপনিষদের কিছু পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়; যথা—

অগ্নির্বাগ্ ভূত্বা মুখং প্রাবিশদ্বায়ুঃ প্রাণো ভূত্বা নাসিকে প্রাবিশদাদিত্যশ্চক্ষুর্ভূত্বাঽক্ষিণী প্রাবিশদ্দিশঃ শ্রোত্রং ভূত্বা কর্ণৌ প্রাবিশন্নোষধিবনস্পতয়ো লোমানি ভূত্বা ত্বচম্প্রাবিশংশ্চন্দ্রমা মনো ভূত্বা হৃদয়ং প্রাবিশন্ মৃত্যুরপানো ভূত্বা নাভিং প্রাবিশদাপো রেতো ভূত্বা শিশ্নং প্রাবিশৎ ॥ প্রথমাধ্যায়ে দ্বিতীয়খণ্ডে ৪।

অগ্নি বাক্য হইয়া মুখে প্রবেশ করিয়াছিলেন, বায়ু প্রাণ হইয়া নাসিকাদ্বয়ে প্রবেশ করিয়াছিলেন, আদিত্য চক্ষু হইয়া চক্ষুর্দ্বয়ে প্রবেশ করিয়াছিলেন, দিক্ শ্রবণ হইয়া কর্ণে প্রবেশ করিয়াছিলেন, ওষধি ও বনস্পতি সকল লোম হইয়া চর্ম্মে, চন্দ্র মন হইয়া হৃদয়ে প্রবেশ করিয়াছিলেন। মৃত্যু অপান হইয়া নাভিতে প্রবেশ করিয়াছিলেন, জল রেত হইয়া উপস্থে প্রবেশ করিয়াছিলেন।

উপরোক্ত ঐ মন্ত্রগুলি ঐতরেয় আরণ্যকের দ্বিতীয় আরণ্যকে চতুর্থ অধ্যায়েও আছে।

"চন্দ্রমা মনসো জাতশ্চক্ষোঃ সূর্য্যো অজায়ত।
মুখাদিন্দ্রশ্চাগ্নিশ্চ প্রাণাদ্বায়ুরজায়ত" ॥ ১৩ ॥

ঋগ্বেদসংহিতায়াং অষ্টমোষ্টকে ৪ অ, ১৯ বর্গে ১০ মণ্ডলে।

শ্রীসায়নভাষ্যং। প্রজাপতের্ম্মনসঃ সকাশাৎ চন্দ্রমা জাতশ্চক্ষোশ্চক্ষুষঃ সূর্য্যোপ্যজায়ত অস্য মুখাদিন্দ্রশ্চাগ্নিশ্চ দেবাবুৎপন্নৌ অস্য প্রাণাদ্বায়ুরজায়ত।

প্রজাপতির মন হইতে চন্দ্র জন্মিয়াছিলেন, চক্ষু হইতে সূর্য্য জন্মিয়াছিলেন; ইহার মুখ হইতে ইন্দ্র ও অগ্নি দেবদ্বয় উৎপন্ন হইয়াছিলেন; ইহার প্রাণ হইতে বায়ু জন্মিয়াছিলেন।

"———দিশঃ শ্রোত্রাৎ———" ॥ ৪ ॥ ঐ ঐ ঐ

প্রজাপতির শ্রোত্র হইতে দিক্ সকল উৎপন্ন হইয়াছিল। অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কোন উল্লেখ নাই। কিন্তু যজুর্ব্বেদে কোন কোন বিষয়ে পার্থক্য আছে, যথা—

চন্দ্রমা মনসো জাতশ্চক্ষোঃ সূর্য্যো অজায়ত।
শ্রোত্রাদ্বায়ুশ্চ প্রাণশ্চ মুখাদগ্নিরজায়ত ॥

শুক্লযজুর্ব্বেদস্য বাজসনেয়ি সংহিতায়াং ৩১ অধ্যায়ে ১২ ॥

পদপাঠঃ।

চন্দ্রমা মনসো জাতশ্চক্ষোঃ সূর্য্যো অজায়ত।
শ্রোত্রাদ্বায়ুশ্চ প্রাণশ্চ মুখাদগ্নিরজায়ত ॥ ১২ ॥

মহীধরের ভাষ্যার্থ। প্রজাপতির মন হইতে চন্দ্র জন্মিয়াছিলেন, চক্ষু হইতে সূর্য্য জন্মিয়াছিলেন, শ্রোত্র হইতে বায়ু ও প্রাণ ও মুখ হইতে অগ্নি জন্মিয়াছিল।

ইহার পর মন্ত্রে——"দিশঃ শ্রোত্রাৎ——" আছে। আর কিছু অঙ্গদেবতা বর্ণন নাই। অন্য কোন উপনিষদে ইন্দ্রিয়গণের বিষয়ে উল্লেখ পাই নাই;

এতৎ সর্ব্বং মিলিতং লিঙ্গশরীরমিত্যুচ্যতে। (৩)

এই সকল মিলিত হইয়া লিঙ্গশরীর নামে কথিত হয়।

তথাচোক্তং।

শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে—

পঞ্চপ্রাণোমনোবুদ্ধিদশেন্দ্রিয়সমন্বিতম্।
অপঞ্চীকৃতভূতোত্থং সূক্ষ্মাঙ্গং ভোগসাধনম্॥ (৪)

পঞ্চপ্রাণ, মন, বুদ্ধি পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়, এই দশ ইন্দ্রিয় ও যাহা পঞ্চীকৃত পৃথিব্যাদি পঞ্চভূত হইতে উৎপন্ন না হইয়াছে, এরূপ ভোগের সাধনকে সূক্ষ্মশরীর কহে।

লীনমর্থং গময়তীতি ব্যুৎপত্ত্যা লিঙ্গমিত্যুচ্যতে।(৫)

ব্রহ্মাত্মৈক্যস্বরূপ যে লয়বিশিষ্ট অর্থ, তাহাকে প্রাপ্ত করান, এই ব্যুৎপত্তিদ্বারা লিঙ্গশব্দ কথিত হয়।

শীর্য্যতে ইতি ব্যুৎপত্ত্যা শরীরমিত্যুচ্যতে। (৬)

শীর্ণ হন, এই ব্যুৎপত্তিদ্বারা শরীরশব্দ বাচ্য হয়।

কথং শীর্য্যতে ইতি চেৎ।

যদি বল, কিপ্রকারে শীর্ণ হয়?

অহং ব্রহ্মাস্মীতি জ্ঞানেন শীর্য্যতে। (৭)

আমি ব্রহ্ম, এইরূপ ব্রহ্মেতে আত্মাতে অভেদ জ্ঞান হইলে শীর্ণ হয়॥

কেবল মহাভারতে শান্তিপর্ব্বে ২১০ অধ্যায়ে এই পাওয়া যায় যে,—

বিদ্যাৎ তু ষোড়শৈতানি দৈবতানি বিভাগশঃ।
দেহেষু জ্ঞানকর্ত্তারমুপাসীনমুপাসতে॥ ৩৩॥
তদ্বৎ সোমগুণাজ্জিহ্বা গন্ধস্ত পৃথিবীগুণঃ।
শ্রোত্রং নভোগুণশ্চৈব চক্ষুরগ্নের্গুণস্তথা॥ ৩৪॥
স্পর্শং বায়ুগুণং বিদ্যাৎ সর্ব্বভূতেষু সর্ব্বদা॥ ৩৫॥

দশ ইন্দ্রিয়, মন ও পঞ্চভূত, এই ষোড়শ পদার্থকে বিভাগক্রমে দেবতা বলিয়া জ্ঞান করিবে; দেহ-মধ্যে অধ্যাসীন জ্ঞানকর্ত্তাকে মনুষ্যগণ উপাসনা করিয়া থাকে। জলের কার্য্য জিহ্বা, পৃথিবীর কার্য্য নাসিকা, আকাশের কার্য্য শ্রোত্র, তেজের কার্য্য চক্ষু এবং বায়ুর কার্য্য ত্বক্, ইহা সর্ব্বভূতে বর্ত্তমান আছে জানিবে।

"মনঃ শব্দেন তদধিষ্ঠাতা চন্দ্র উচ্যতে।"

শ্রীভাগবতে ১০ স্কন্ধে, ২৯ অ, ৩ শ্লোকে বৈষ্ণবতোষণী।

মনঃ শব্দে (জগৌকলং বামদৃশাং মনোহরং) মনের অধিষ্ঠাতা চন্দ্র উক্ত হইয়াছে।

"নসঃ প্রাণা দিশঃ শ্রোত্রাৎ স্পর্শাদ্ বায়ুর্মুখাচ্ছিখী।
মনসশ্চন্দ্রমা জাতশ্চক্ষুষশ্চ দিবাকরঃ।

যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতৌ ৩ অধ্যায়ে।

নাসিকা হইতে প্রাণ, শ্রোত্র হইতে দিক্, স্পর্শ হইতে বায়ু, মুখ হইতে অগ্নি, মন হইতে চন্দ্র, চক্ষু হইতে সূর্য্য উৎপন্ন হইয়াছেন।

(৩) বেদান্তপরিভাষায়াং প্রথম পরিচ্ছেদে ২৪।

(৪) "বুদ্ধিকর্ম্মেন্দ্রিয়প্রাণপঞ্চকৈর্মনসাধিয়া।
শরীরং সপ্তদশভিঃ সূক্ষ্মং তল্লিঙ্গমুচ্যতে॥"

পঞ্চদশী তত্ত্ববিবেক ২৩।

পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ প্রাণ, মনঃ ও বুদ্ধি, এই সপ্তদশ অবয়বে সূক্ষ্ম শরীর হয়; তাহাকেই লিঙ্গ শরীর কহে।

"এতৎ কোষত্রয়ং মিলিতং সৎসূক্ষ্মশরীরমিত্যুচ্যতে।"

বেদান্তসারে।

পূর্ব্বোক্ত মনোময়, প্রাণময় ও বিজ্ঞানময়কোষকে সূক্ষ্ম শরীর কহে।

(৫) লিঙ্গং=[লিগি (গতিঃ)=অচ্]

(৬) শরীরং=[শৄ (ছেদনং)—ঈরণ্]=রোগাদিনা শীর্য্যতে ইতি শরীরং।

(৭) "গুরুণা বোধিতো জীবোঽহং ব্রহ্মাস্মি বাহ্যতঃ।
মুচ্যতেঽসারসংসারাদ্ ব্রহ্মজ্ঞো ব্রহ্মতদ্ ভবেৎ॥"

অগ্নিপুরাণে ৩৭৬ অধ্যায়ে ২৪।

জীব বাহ্যতঃ গুরুর দ্বারা "আমি ব্রহ্ম হই" এইরূপে জ্ঞান লাভ করিয়া, অসার সংসার হইতে মুক্তি লাভ করে ও ব্রহ্মজ্ঞ হইয়া ব্রহ্মপদপ্রাপ্ত হয়।

"ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥"

মুণ্ডকোপনিষৎ ২ মুণ্ডকে ২ খণ্ডে ৮।

'আমি ব্রহ্মস্বরূপ' এই জ্ঞান হইলে অবিদ্যা-জনিত হৃদয়গ্রন্থি বিনাশ পায়, সর্ব্বসংশয় দূর হয়; তাহাহইলে সেই আত্মজ্ঞানীর পূর্ব্বজন্মের কর্ম্ম সকলও ক্ষয় হয়।

দহভস্মীকরণে ইতি ব্যুৎপত্যা লিঙ্গদেহস্য পৃথিবী পুরঃসরং ক্ষয় ইত্যুচ্যতে।

দহধাতুর অর্থ ভস্মীকরণ, এই ব্যুৎপত্তিদ্বারা লিঙ্গদেহের পৃথিবী পুরঃসর ক্ষয় হয়।

কথং ?

কিজন্য ?

বাগাদ্যাকারেণ পরিণামো বৃদ্ধিঃ। (৮)

বাক্যাদি আকারদ্বারা লিঙ্গশরীরের বৃদ্ধি

তৎ সঙ্কোচো নাম জীর্ণতা।

বাক্যাদির সঙ্কোচ হইলে লিঙ্গদেহের জীর্ণতা হয়।

কারণশরীরং নাম শরীরদ্বয়হেত্বনাদ্যনির্ব্বাচ্যং সাভাসং ব্রহ্মাত্মৈকত্বজ্ঞান নিবর্ত্ত্যমজ্ঞানং কারণশরীরমিত্যুচ্যতে। (৯)

স্থূল ও সূক্ষ্মশরীরদ্বয়ের হেতু অনাদি অনির্ব্বাচ্য সাভাস ব্রহ্মেতে আত্মাতে যে একত্ব-জ্ঞান, তাহারদ্বারা অজ্ঞান নিবৃত্ত হইলে, তাহাকে কারণশরীর কহে।

তথাচোক্তং—

অনাদ্যবিদ্যা নির্ব্বাচ্যা কারণোপাধিরুচ্যতে।
উপাধি ত্রিতয়াদন্যমাত্মানমবধারয়েৎ॥

শাস্ত্রান্তরে উক্ত হইয়াছে যে, শরীরের তিন উপাধি এই, অনাদি, অবিদ্যা (অজ্ঞান) ও অনির্ব্বচনীয়, এই তিনটী কারণ শরীরের উপাধি। এই উপাধিত্রয় হইতে যাহা ভিন্ন, তাহাকে আত্মা বলিয়া অবধারণ করিবে।

শীর্য্যতে ইতি ব্যুৎপত্যা শরীরং কথমিতি চেৎ। (১০)

শীর্ণ হয়, এই ব্যুৎপত্তিদ্বারা শরীর কিপ্রকারে হয়, যদি এই আশঙ্কা হয়, তদুত্তরে বলিতেছেন—

ব্রহ্মাত্মৈকত্বজ্ঞানেন শীর্য্যতে।

ব্রহ্মেতে আত্মার একত্বজ্ঞানদ্বারা শীর্ণ হয়।

দহ ভস্মীকরণ ইতি ব্যুৎপত্যা কারণশরীরস্য পৃথিবী পুরঃসরং ক্ষয় ইত্যুচ্যতে।

দহধাতুর অর্থ ভস্মীকরণ, এই ব্যুৎপত্তিদ্বারা কারণশরীরের পৃথিবী পুরঃসর ক্ষয় হয়, ইহা উক্ত হইতেছে।

অনৃত জড়দুঃখাত্মকমিত্যুক্তং।

মিথ্যা জড় এবং দুঃখাত্মক, ইহা উক্ত হইল।

কালত্রয়েঽবিদ্যমানবস্তু অনৃতমিত্যুচ্যতে।

ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান, এই তিন কালে যে বস্তু বিদ্যমান থাকে না, তাহাকে অনৃত বলে।

জড়ং নাম স্ববিষয়-পরবিষয়-জ্ঞানরহিতং বস্তুজড়মিত্যুচ্যতে। (১১)

স্ববিষয়ে ও পরবিষয়ে জ্ঞানরহিত বস্তুকে জড় কহে।

(৮) ইহার বৃহৎ উপাখ্যান মহাভারতে শান্তিপর্ব্বে ৩২০ অধ্যায়ে সুলভা ও জনক সংবাদে আছে।

(৯) "অবিদ্যাবশগস্ত্বন্যস্তদ্বৈচিত্র্যাদনেকধা।
সা কারণশরীরং স্যাৎ প্রাজ্ঞস্তত্রাভিমানবান্॥"
পঞ্চদশী তত্ত্ববিবেকে ১৭।

অবিদ্যার বশবর্ত্তী অন্য (অর্থাৎ চৈতন্য ব্যতিরিক্ত অন্য) অর্থাৎ জীব। সেই জীব অবিদ্যাভূত বৈচিত্র্যবশতঃ অর্থাৎ অবিদ্যার নির্ম্মলতা ও মালিন্যের তারতম্যবশতঃ দেব ও তির্য্যগাদি অনেক প্রকার রূপ প্রাপ্ত হয়। সেই অবিদ্যাকেই কারণ-শরীর কহে; সেই কারণশরীরে অভিমানী জীবকে প্রাজ্ঞ কহে।

নৃসিংহতাপনী উত্তরভাগে প্রথম খণ্ডে ৩ শ্লোকে "ত্রিশরীর" শব্দের ভাষ্যে যথা,—

"ঈক্ষণাবস্থং প্রলয়াবস্থঞ্চ বহির্মুখং
সদাত্মকং কারণং কারণশরীরমুচ্যতে।"

ঈক্ষণাবস্থ, প্রলয়াবস্থ ও সদাত্মক বহির্মুখ কারণকে কারণ-শরীর কহে।

(১০) শীর্য্যতে তত্ত্বজ্ঞানেন নশ্যতীতি শরীরং স্যাৎ।
পঞ্চদশী তত্ত্ববিবেকে ১৭ শ্লোক টীকা।

(১১) বেদান্তসারে "অবস্তুর" লক্ষণে অজ্ঞানাদি সকল জড়সমূহ অবস্তু বলিয়াছেন।

"অজ্ঞানাদি সকল জড়সমূহঃ অবস্তু।
সদসৎজ্ঞানশূন্যতাকে অজ্ঞান কহিয়াছেন।

দুঃখং নাম অপ্রীতিরূপং বস্তুদুঃখমিত্যুচ্যতে ।(১২)

প্রীতি-শূন্য যে পদার্থ, তাহার নাম দুঃখ।

সমষ্টি ব্যষ্ট্যাত্মকমিত্যুক্তং কা সমষ্টিঃ কা ব্যষ্টিঃ। (১৩)

সমষ্টি ও ব্যষ্টিরূপ উক্ত হইয়াছে, এক্ষণে কি ও কি ব্যষ্টি, তাহার বিষয় কহিতেছেন—

যথা বনস্য সমষ্টির্যথা বৃক্ষস্য ব্যষ্টির্জলসমূহস্য ষ্টির্জলস্য ব্যষ্টিস্তদনেকশরীরস্য সমষ্টিরেক শরীরস্য ব্যষ্টিঃ।

যেরূপ বৃক্ষ সকলের সংক্ষেপ-কথনকে বৃক্ষ-সমষ্টি কহে ও এক বৃক্ষকে বহু বৃক্ষের বিস্তর-কথনকে বৃক্ষ-ব্যষ্টি কহে ও জলসমূহের সংক্ষেপ-কথনকে জলসমূহের সমষ্টি ও এক জলাশয়ের বহুরূপ-কথনকে জলের ব্যষ্টি কহে, তদ্রূপ অনেক শরীরের সংক্ষেপ-কথনকে শরীরের সমষ্টি ও এক শরীরের বিস্তার-কথনকে শরীরের ব্যষ্টি কহে। (ক্রমশঃ)

শ্রীবিধুভূষণ দেব।

---

(১২) যদ্ যদ্ প্রিয়ং যস্য সুখং যদাহু
স্তদেব দুঃখং প্রবদন্ত্যনিষ্টম্ ॥"

শান্তিপর্ব্বণি ২০১ অ, ১০।

যাহার যে যে দ্রব্য প্রিয়, তাহাতেই সুখ ও যাহার যাহা অপ্রিয়, তাহাতেই তাহার দুঃখ বলিয়া কথিত হইয়া থাকে।

(১৩) সমষ্টি ও ব্যষ্টির লক্ষণ পূর্ব্বে হিন্দু-পত্রিকা-প্রকাশিত বিষয়ে দিয়াছি।

"বায়ুরেব ব্যষ্টির্বায়ুঃ সমষ্টিঃ।"

বৃহদারণ্যকোপনিষৎ ৩ অ, ৩ ব্রা, ২।

বায়ুই ব্যষ্টি ও বায়ুই সমষ্টি।

"সমষ্টিরীশঃ সর্ব্বেষাং স্বাত্মতাদাত্ম্য বেদনাৎ।
তদভাবাৎ ততোঽন্যে তু কথ্যন্তে ব্যষ্টিসঙ্গয়া ॥"

পঞ্চদশী তত্ত্ববিবেকঃ ২৫।

হিরণ্যগর্ভ ঈশ্বর সকল লিঙ্গশরীরোপাধিবিশিষ্ট তৈজস জীবগণের সহিত আপনার একাত্মভাব অবগত আছেন, এই জন্য তাঁহাকে সমষ্টি বলে; কিন্তু ঈশ্বর ব্যতীত অন্যের (জীবের) ঐরূপ একাত্মভাবের জ্ঞান নাই, এই জন্য ঐ তৈজসজীবকে ব্যষ্টি বলে।

ভক্তি-প্রসঙ্গ।

"সা পরানুরক্তিরীশ্বরে।"

ঈশ্বরের প্রতি প্রীতি-প্রবাহের নাম ভক্তি। সে প্রবাহ অনন্ত ভাব-সাগরে মিশিয়াছে ভক্তি অন্তরের বস্তু, হৃদয়-মন্দিরের অমূল্য কহিনুররত্ন। এ রত্ন চোরে চুরি করিতে পারে না, বিতরণেও বিতরিত—বিলুপ্ত হয় না। অনেকে বলিতে পারেন, আমরা সান্ধ্যাহ্নিক করি, যথাশক্তি বৈধকার্য্যের অনুষ্ঠান করি, ঈশ্বরকে শ্রদ্ধা করি, মানি ও ভালবাসি; অতএব আমরা ঈশ্বর-ভক্ত। একটু দুরভিমান পরিহার করিলে বেশ বুঝিতে পারা যায়, এ শ্রদ্ধার, এ মানার ও এ ভালবাসার গভীরতা সসীম; কিন্তু ঈশ্বরকে শ্রদ্ধা, মানা ও ভালবাসা অসীম। মুখে, পিতাকে পিতৃসম্ভাষণ করিলে এবং চব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয়—উপাদেয় বস্তু ভোজন করাইলেই পিতৃভক্তি হয় না। যে পুত্র পিতার আদেশ স্বতএব সানুরাগে শিরোধার্য্য করে, পিতার সুখের তরে আত্মবিসর্জ্জন করে, পিতার ভালবাসার সহিত সমস্ত ভালবাসার সামঞ্জস্য সম্পাদন করে, পিতৃমতের অবিরোধে বিষয়-সেবা না করে, পিতার মননে আত্ম-

মনন ডুবাইয়া দেয়, সেই পুত্র শ্রদ্ধাবান ও ভক্তিমান। সেইরূপ যে সর্ব্বদা শ্রদ্ধার সহিত ঈশ্বরের আদেশ প্রতিপালন করে, যাহার হৃদয় ঈশ্বরের প্রেম-সুধার স্বর্গীয় নেশায় বিভোর থাকে, যাহার চক্ষু ঈশ্বরের রূপ দেখিতে ব্যগ্র হয়, যাহার কর্ণ ঈশ্বর-কীর্ত্তির কীর্ত্তন শুনিতে ভালবাসে, যাহার নাসিকা ঈশ্বরের অর্চ্চনায় উপহৃত পুষ্প-চন্দন ধূপাদির সৌরভে আমোদ লাভ করে, যাহার ত্বক্ ঈশ্বর-ভক্তের চরণ-রেণু স্পর্শে কৃতার্থতা লাভ করে, যাহার রসনা ঈশ্বরে নিবেদিত নৈবেদ্যের রসাস্বাদে চরিতার্থ ও তাঁহার কথা-কীর্ত্তনে কৃতার্থ হয় এবং যাহার মন ঈশ্বরের মননে—নিদিধ্যাসনে থাকিতেই ভালবাসে, সেই ব্যক্তি ঈশ্বরকে শ্রদ্ধা করে, মানে ও ভালবাসে। ঈশ্বর-ভক্ত হস্ত-পদাদি কর্ম্মেন্দ্রিয়ও ঈশ্বর-সন্তোষ-উদ্দেশে পরিচালিত করেন। ভাসা—ভাসা বাহ্যক্রিয়ায় ঈশ্বরে ভক্তি করা হয় না; "তস্মিন্ প্রীতি, তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব" এই মহাবাক্যই ভক্ত-জীবনের মূলমন্ত্র।

এখন বলিতে পার, ঈশ্বরের আদেশ কি? তাঁহার কার্য্য কি? এবং তাঁহার কিসে সন্তোষ? হিন্দু বলেন, শাস্ত্রোক্ত বিধি-বাক্যই ঈশ্বরের আদেশ। খ্রিষ্টীয় সম্প্রদায় বলেন, বাইবেলের উপদেশ ঈশ্বরের আদেশ। এইরূপ সকলেই স্ব স্ব ধর্ম্মানুশাসন-শাস্ত্রকে ঈশ্বরাদেশ বলিয়া বিশ্বাস করেন। আমরা ঘোর মূর্খ, কাহার কথায় বিশ্বাস করি? কিন্তু হায়! বিশ্বাসের দৃঢ়তার জন্য দর্শনশাস্ত্রের কূটতর্কের আশ্রয় লইতে হয় না। আপনার সরল হৃদয়কে জিজ্ঞাসা করিলে ঠিক উত্তর পাওয়া যায়। "স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্ম ভয়াবহঃ" স্থান ও সমাজভেদে অধিকার ও শাস্ত্র ভিন্ন হইলেও গীতার এই মহাবাক্য সমগ্র মানবজাতির পক্ষেই সাধারণ-সত্য।

তুমি ভৃত্য, ঈশ্বর প্রভু, কেবল প্রভু-কার্য্যের জন্য জীবন উৎসর্গ কর। ভূত-পতির কার্য্যে খাটিতে আসিয়া কেবল "ভূতের বেগার" খাটিয়া যাইও না। আহার-বিহারাদি ভৌতিক কার্য্যও প্রভুর উপর সমর্পণ করিতে হয়। প্রভুকার্য্য সাধিতে প্রভুর প্রসাদে উদর পূর্ণ কর, যদি বিবাহাদি স্বতঃসাংসারিক কার্য্য প্রভু-কার্য্যের বিরোধী মনে কর, তবে সেটি তোমার ভ্রম। আত্ম-কর্ত্তৃত্ব-বুদ্ধি-বিরহে ভক্তের সকল কার্য্যই প্রভুর কার্য্যে পরিণত হয়। অপিচ, প্রবৃত্তি-মার্গ-গত ভাবেও বুঝা যায় যে, বিনা পরীক্ষায় পুরস্কারের আশা বৃথা। প্রলোভনের মধ্যে থাকিয়া যে অবিচলিত থাকে, সেই প্রকৃত ধীর ভক্ত; অতএব কালিদাস বলিয়াছেন—

"বিকারহেতৌ সতি বিক্রিয়ন্তে
যেষাং নচেতাংসি তয়েব ধীরাঃ।"

বিকারের হেতু বর্ত্তমান থাকিতে যাহাদের চিত্ত বিকৃত না হয়, তাহারাই ধীর। আর এক কথা,—স্বামী, স্ত্রী, উভয়ে মিলিত হইয়া পরস্পরের সহায়তায় কঠিন ও কোমল গুণ যোগ-পূর্ণতায় প্রভুকার্য্যই ভাল হইবে বিবেচনায় দার-পরিগ্রহ করিতে পার। দম্পতির প্রেমের পুতলি পুত্রের দ্বারা প্রভুকার্য্য সাধনরূপ মুখ্য প্রয়োজনের জন্য স্ত্রী-প্রসঙ্গ করিতে পার; যাঁহাদের প্রসাদে প্রভুকার্য্য সম্পাদন করিতেছি, ঈশ্বর-গত-সত্ত্ব সেই পিতৃলোকের ঋণমুক্তির উপায় পুত্র; অতএব পুত্রোৎপাদনও প্রভু-কার্য্য। অপত্যোৎপাদন ভিন্ন সৃষ্টি-প্রবাহ থাকে কৈ? ফল কথা, কি অন্তর্জগতের, কি বাহ্যজগতের, কি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের, কি কর্ম্মেন্দ্রিয়ের, আমাদের সর্ব্বগত ভোগ-ব্যাপারই ভগবানে নিবেদিত করিয়া প্রসাদস্বরূপ গ্রহণ করিতে পারিলেই কৃতার্থতা লাভ হয়। ঈশ্বরোপাসনার সার রহস্যই এই তত্ত্বে নিহিত।

সন্ধ্যাদি অথবা নমাজ প্রভৃতি জাতি ও

সমাজ-ভেদে তত্তৎ অধিকারীর যে কোন উপাসনা ভক্তিপূর্ব্বক অনুষ্ঠিত হয়, তাহাতেই ঈশ্বরের অনুগ্রহ লাভ করা যাইতে পারে। কিন্তু সাবধান! ভক্তির ভিত্তি যেন অন্তর্নিহিত বিষয়-বালুকাময়-প্রদেশে কাঁচা-গাঁথনীতে স্থাপিত না হয়, তাহা হইলে ভোগবাসনা-ভূকম্পনে তোমার সাধের সাধন-প্রাসাদ ভাঙ্গিয়া চুরমার হইবে! তুমি নিরাশ্রয় হইবে।

যদি বল আমি সংসারী হিন্দু, হিন্দুশাস্ত্রানুসারী কার্য্যকলাপ খুঁটিয়া করিতে হইলে, পরিবার-প্রতিপালন প্রভৃতি সাংসারিক আত্মকার্য্য কিছুই করা হয় না। ঐ তো ভুল। ঐ খানেই ধাঁধাঁ! এটী আমার কার্য্য, ওটী প্রভুর কার্য্য, এইরূপে কার্য্যের পৃথক্ অস্তিত্ব স্বীকার কর কেন? প্রভুর অন্নে ক্ষুধা-নিবৃত্তি কর, প্রভুর বস্ত্রে লজ্জা-নিবারণ কর, প্রভুর কৃপায় বিপদ হইতে মুক্তি লাভ কর, তবে কেন প্রভুর অন্ন খাইয়া, প্রভুর বস্ত্র পরিয়া, অবিপন্নাবস্থায় আপন সাংসারিক কার্য্য প্রভুকার্য্য হইতে ভিন্ন মনে কর? তুমি যদি চতুর হও বা প্রকৃত প্রভুভক্ত ভৃত্য হও, তবে প্রভুর কার্য্যে আপন কার্য্য চালিয়া মিশাইয়া দাও। প্রভুর গার্হস্থ্য উপাসনায় শ্রী-সুলক্ষণ জন্য অনন্ত, অঙ্গুরীয়ক প্রভৃতি ধারণ কর, নূতন বস্ত্র পরিধান কর এবং চন্দন-চর্চ্চিত শরীরে সাত্বিকবিলাসিতা বিকাশ কর। "প্রভুর সংসার" সেবার তরে অর্থোপার্জ্জন কর, প্রভুর অনন্ত শক্তি বুঝিবার জন্য বাল্যে বিদ্যাভ্যাস কর। প্রভু-সৃষ্টি রক্ষার জন্য যৌবনে স্ত্রী-গ্রহণ কর। চরমে প্রভুতে আত্মসমর্পণ করিবার জন্য বার্দ্ধক্যে মুনিবৃত্তি অবলম্বন কর।

প্রভুকার্য্য বহুল; সমস্ত খুঁটিয়া করিতে পারিবনা ভাবিয়া ক্ষান্ত হইও না; পক্ষপাতশূন্য প্রভু প্রসন্ন হইয়া কার্য্যভার কমাইয়া বা তোমার উপযোগী করিয়া দিবেন; প্রভুভক্ত ভৃত্যের চিরকাল চা-বাগানের কুলির ন্যায় ভৌতিক খাটনি খাটিতে হয় না। তাই উত্তমাধিকারী অনেক নিত্য-নৈমিত্তিক ক্রিয়া হইতে অব্যাহতি পাইয়াছেন।

"বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মাচারশাস্ত্র-যন্ত্রেণ যন্ত্রিতঃ।
নির্গতোঽসি জগজ্জালাৎ পিঞ্জরাদিব কেশরী॥"

কেশরী যেমন পিঞ্জর হইতে নির্গত হইয়া স্বচ্ছন্দে বিহার করে, তুমিও সেইরূপ এক্ষণে বর্ণাশ্রমোচিত বৈধক্রিয়া হইতে নির্গত হইলে।

প্রভুর আদেশ-অপেক্ষায় যে সাধক নিষ্ক্রিয় ভাবে থাকে, সে ঘোর মূর্খ। শাস্ত্রই প্রভুর আদেশ। যে অধিকারীর যে জাতীয় কর্ত্তব্য শাস্ত্র-বিহিত, তাহাই তাহার পক্ষে প্রভু-কার্য্য। অধিকার-ভেদে বিধি-নিষেধ বিস্তর রহিয়াছে। স্বকর্ত্তৃত্ব-বোধ-রাহিত্যই সেই অসংখ্য বিধি-নিষেধ-বিপ্লবে উত্তীর্ণ হওয়ার একমাত্র উপায়। সূক্ষ্মদৃষ্টির সৎকার্য্যই হউক, আর স্থূলদৃষ্টির অসৎকার্য্যই হউক, যদি আপনার আমিত্বময় দুরভিমান পরিহার করিয়া প্রাণপণে প্রভুকার্য্য-বুদ্ধিতে করিতে পার, তাহাহইলে নিশ্চিতই ভৃত্যগত-প্রাণ প্রভু প্রীত হইবেন। ভক্ত গোপনে ভক্তবৎসল ভগবানকে পাইয়া মনের কথা বলিয়াছিলেন।—

"জানামি ধর্ম্মং ন চ মে প্রবৃত্তি-
র্জানাম্যধর্ম্মং ন চ মে নিবৃত্তিঃ।
ত্বয়া হৃষীকেশ! হৃদিস্থিতেন
যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি॥

হে ইন্দ্রিয়-চালক! অন্তর্যামিন্! ধর্ম্ম কি, জানি; কিন্তু ধর্ম্মাচরণে প্রবৃত্তি হয় না। অধর্ম্ম কি, তাহাও জানি, কিন্তু তাহা হইতেও নিবৃত্ত হইতে পারি না। এরূপ কেন হয়, আমি কিছুই জানি না। তুমি হৃদয়-মন্দিরে বসিয়া যেরূপ আদেশ করিতেছ, সেইরূপই করিতেছি। যে ভৃত্য প্রভুকে হৃদয়ে বসাইয়া

এরূপ আব্দার করিতে পারে, বুঝিতে হইবে সে ভৃত্য প্রভুর বড়ই "পেয়ারা"। আর সে ভক্তের হৃদয় যে স্বভাবতঃ অধর্ম্মের দিকে আকৃষ্টই হইতে পারে না, ইহাই এস্থলে অন্তর্নিহিত রহস্য।

যদি প্রেমময় পরমেশ্বরকে প্রাণের সহিত ভালবাসিতে চাও, তবে প্রাণের কবাট খুলিয়া একবার বল দেখি,—

"প্রাতরুত্থায়সায়াহ্নং সায়াহ্নাৎ প্রাতরন্ততঃ।
যৎ করোমি জগন্মাতস্তদেব তব পূজনম্॥"

মা! তুমি জগতের মা, আমিও জগৎ-ছাড়া নই; আমারও মা; তাই বলি, হে জগন্মাতঃ! প্রাতঃকাল হইতে সায়াহ্ন এবং সায়াহ্ন হইতে প্রাতঃকাল, এই চব্বিশ ঘণ্টায় যা কিছু করি, সে সব তোমারই পূজা! কি মনোহর! কি মোহহর! ধন্য হিন্দুশাস্ত্র! এই এক তত্ত্বেই ভক্তির চরমোৎকর্ষ সাধিত—নবধা-ভক্তির শেষ লক্ষণ আত্মনিবেদন সম্পাদিত।

আত্মনিবেদনের ভাব-ভরে ভক্ত গাইল, "হরি বল্‌রে মন আমার! সুখের নিধি পেইছি বুকে দুখের ধার ধারিনে আর" হৃদয় খুলিয়া গেল! তাহার হৃদয়ে উদয় হইবার জন্য ভক্তবৎসল লোলুপ হইলেন! আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তাঁহার আসন টলিল, বুঝি বা বৈকুণ্ঠের বাস উঠিল! সর্ব্বভক্তি-নিকষ-রূপী নারদঋষি গতিক দেখিয়া যেন বিস্মিত-স্মিত মুখে বলিলেন, সে কি ঠাকুর! তুমি যোগীর ধন, যোগ-দুর্লভ। কত শত-সহস্র বর্ষ কঠোর তপশ্চর্য্যা করিয়া অনেকে অনেক জন্মেও তোমায় লাভ করিতে পারে না, আজ কিনা একজন যে সে লোকের একটু "খাম্ খেয়ালী" কথায় আর স্থির থাকিতে পারিতেছ না!" ভগবানও বিশ্ববিমোহন হাসি হাসিয়া শাস্ত্র-সুধা-কণ্ঠে বলিলেন,—

"নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ে নচ।
মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ।"

হে নারদ! আমি বৈকুণ্ঠে থাকি না, যোগিগণের হৃদয়েও থাকি না; আমার ভক্ত তন্ময়ভাবে যখন যেখানে আমাকে গায়—যেখানে যে ভাবে আমাকে চায়, আমি সেখানে সেই ভাবেই থাকি। যে সর্ব্বকার্য্যে আমারই পূজা করে, আমি সর্ব্বদা তার সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া তাহা গ্রহণ করিয়া তাহাকে কৃতার্থ করি।

ভক্তবৎসল ভগবান ভক্ত-শরীরে আবিষ্ট হইয়া বলিলেন, বর গ্রহণ কর। ভক্ত বলিলেন, ভক্তাধীন! তুমি কি বর দিবে? আমি বণিক নই যে তোমার বরের সহিত ভক্তির বিনিময় করিব? ভক্তির মূল্যের তুল্য তোমার ঐহিক জগতে কি বস্তু আছে? ভক্তির তুল্য-মূল্য তুমি স্বয়ং! অতএব দিলে আপনাকে দিতে পার—কোলে স্থান দিতে পার; আমি কি তাই চাই? তবে মনের কথা বলি—

"নাস্থা ধর্ম্মে ন বসুনিচয়ে নৈব কামোপভোগে।
যদ্ভাব্যং তদ্ভবতু ভগবন্! পূর্ব্বকর্ম্মানুরূপম্॥"
এতৎ প্রার্থ্যং মম বহুমতং জন্মজন্মান্তরেঽপি।
তৎপাদাম্ভোরুহযুগগতা নিশ্চলা ভক্তিরস্তু॥

হে ভগবন্! পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মফল যা হয়, হউক; এক্ষণে আর আমার সকাম-ধর্ম্ম-কর্ম্মে আস্থা নাই। সকাম-ধর্ম্মের ফল অতুল সম্পদাদিতেও আস্থা নাই। সম্পত্তির ফল কাম্যবস্তুর উপভোগেও আস্থা নাই। আস্থা কেবল নিষ্কামধর্ম্মজা অহৈতুকী ভক্তিতে। অতএব প্রার্থনা করি, যেন জন্মজন্মান্তরেও তোমার ঐ পাদপদ্মে আমার অচলা ভক্তি থাকে। (ক্রমশঃ)

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ স্মৃতিতীর্থ।
মহেশপুর।

মণিরত্নমালা।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

যে জ্ঞানদ্বারা জীব মুক্তিলাভ করিতে পারে, সেই জ্ঞানই শ্রেষ্ঠজ্ঞান; বিষ্ণুপুরাণে বলিয়াছেন—

সংজ্ঞায়তে যেন তদস্তদোষং
শুদ্ধং পরং নির্ম্মলমেকরূপম্।
সংদৃশ্যতে বাপ্যধিগম্যতে বা
তজ্জ্ঞানমজ্ঞানমতোঽন্যদুক্তম্॥

যাহাদ্বারা নির্দ্দোষ বিশুদ্ধ নির্ম্মল একরূপ পরব্রহ্মকে জানিতে পারা যায়, তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ করা যায় বা তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাই জ্ঞান ; তদ্ভিন্ন অন্যপ্রকার যে জ্ঞান, তাহা অজ্ঞান পদবাচ্য। বাহ্যিকভাবে বেদাদি শাস্ত্রজ্ঞান ও বৈষয়িকজ্ঞান অবিদ্যান্তর্গত অশ্রেষ্ঠজ্ঞান।

জ্ঞানের স্বরূপ।

অমানিত্বমদাম্ভিত্বমহিংসা ক্ষান্তিরার্জ্জবম্।
আচার্য্যোপাসনং শৌচং স্থৈর্য্যমাত্মবিনিগ্রহঃ॥
ইন্দ্রিয়ার্থেষু বৈরাগ্যমনহঙ্কারএব চ।
জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধি দুঃখদোষানুদর্শনম্॥
অসক্তিরনভিষঙ্গঃ পুত্রদারগৃহাদিষু।
নিত্যঞ্চসমচিত্তত্বমিষ্টানিষ্টোপপত্তিষু॥
ময়িচানন্যযোগেন ভক্তিরব্যভিচারিণী।
বিবিক্তদেশসেবিত্বমরতির্জ্জনসংসদি॥
অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্বং তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনম্।
এতজ্জ্ঞানমিতি প্রোক্তমজ্ঞানং যদতোঽন্যথা॥
গীতা ১৩। ৭—১১

অমানিতা, অদাম্ভিকতা, অহিংসা, ক্ষমা, সরলতা, আচার্য্যোপাসনা, শৌচ, স্থৈর্য্য, ইন্দ্রিয়-সংযম, বিষয়-বৈরাগ্য, নিরহঙ্কার, জন্মমৃত্যুজরা-ব্যাধিরূপ দুঃখসমূহের পুনঃ পুনঃ দোষপর্য্যালোচনা, পুত্র-কলত্র-গৃহাদিতে অনাসক্তি, অনভিষঙ্গ (পুত্রাদির সুখ-দুঃখে আপনাকে সুখী বা দুঃখী মনে না করা) ইষ্টানিষ্ট-লাভে সমচিত্ততা, আমাতে (পরমেশ্বরে) অনন্য-যোগদ্বারা একান্তভক্তি, নিভৃতে অবস্থান, বিষয়ীলোকের সভায় অপ্রীতি, আত্মবিষয়ক-জ্ঞানে (আত্মানাত্ম-বিচারদ্বারা আত্মজ্ঞান লাভে) একান্ত নিষ্ঠা, তত্ত্বজ্ঞানার্থ দর্শন (তত্ত্বজ্ঞানের প্রয়োজন—মোক্ষ অর্থাৎ সংসারোপরতি, এই মোক্ষের সর্ব্বোৎকৃষ্টত্ব আলোচনা) এই সমস্তই জ্ঞান বলিয়া কথিত হয়, এতদ্বিরুদ্ধ সমস্তই অজ্ঞাননামে অভিহিত হইয়া থাকে।

(৩৮) পরম লাভ কি ? আত্মাবগম, অর্থাৎ আত্মজ্ঞানই (১) সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লাভ। কারণ—

সর্ব্বেষামপি চৈতেষামাত্মজ্ঞানং পরং স্মৃতম্।
তদ্ধ্যগ্র্যং সর্ব্ববিদ্যানাং প্রাপ্যতে হ্যমৃতং ততঃ॥
(মনুসংহিতা)

আত্মজ্ঞানমিদং দেবি পরং মোক্ষৈকসাধনম্।
জানন্নিহৈব মুক্তঃ স্যাৎ সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ॥
(মহানির্ব্বাণতন্ত্র)

সর্ব্বজ্ঞানাপেক্ষা আত্মজ্ঞানই শ্রেষ্ঠ। উহা সকল বিদ্যার অগ্রগণ্য। এই আত্মজ্ঞান হইতেই জীব অমৃত—অর্থাৎ মোক্ষলাভ করে। হে দেবি! আত্মজ্ঞানমোক্ষের একমাত্র সাধন, ইহা জানিতে পারিলে জীব সত্য সত্যই মুক্ত হয়, ইহাতে কোন সংশয় নাই।

"অহমজ্ঞ ইত্যাদ্যনুভাবাৎ" "আমি অজ্ঞ, অর্থাৎ আমি কে, তাহা আমি জানি না, এই-

(১) অভেদ প্রত্যয়ো যস্ত জীবনা পরমাত্মনা।
বস্তবোধঃ সবিজ্ঞেয়ো বেদতত্ত্বাদিভির্ম্মতঃ। (স্মৃতি)

রূপ অনুভবের নাম অজ্ঞান।" আর "আমি সত্যস্বরূপ ও চৈতন্যস্বরূপ পরমাত্মা বা ব্রহ্ম" এই প্রকার জ্ঞানই আত্মজ্ঞান।

আত্মার পরমপ্রেমাস্পদত্ব।

প্রিয়োহ্যাত্মৈব সর্ব্বেষাং নাত্মনোহস্ত্যপরং প্রিয়ম্।
লোকেঽস্মিন্নাত্মসম্বন্ধাৎ ভবন্ত্যন্যে প্রিয়াঃ শিবে॥

(মহানির্ব্বাণতন্ত্র)

আত্মার্থত্বেন হি প্রেয়ান্ বিষয়ো ন স্বতঃ প্রিয়ঃ।
স্বতএব হি সর্ব্বেষামাত্মা প্রিয়তমো যতঃ॥

(বিবেকচূড়ামণি)

আত্মাই সকলের প্রিয়তম, আত্মা অপেক্ষা প্রিয়তর অন্য কোন বস্তু নাই; হে শিবে! ইহলোকে আত্মসম্বন্ধানুসারেই অপরলোকে প্রেমাস্পদ হইয়া থাকে। বিষয়সমূহ আত্মার নিমিত্তই প্রিয় হয়, কিন্তু তাহারা স্বয়ং প্রিয় নহে; আত্মা যেহেতু স্বতঃসিদ্ধ স্বভাবগুণেই সকলের প্রিয়তম হয়েন। আত্মা ভিন্ন কিছুই সৎপদার্থ নাই; ধন, ধান্য, স্বর্গ প্রভৃতি সকল অভ্যুদয়ই অজ্ঞান বিজৃম্ভিত, অনিত্য ও অসৎ; সুতরাং তাহাদের লাভ আত্মলাভের তুল্য নহে; তাই আত্মতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন,—

"আত্মলাভাৎ পরলাভাভাবাৎ"

আত্মলাভের তুল্য শ্রেষ্ঠলাভ আর কিছুই নাই। ইহাই পরম পুরুষার্থ।

"করোতু ভবনে রাজ্যং বিশত্বম্ভোধমম্বু বা।
নাত্মলাভাদৃতে জন্তুর্বিশ্রান্তিমধিগচ্ছতি॥"

(পঞ্চদশী)

মনুষ্য ভুবনে রাজত্বই করুক, মেঘমধ্যে বা জলেই প্রবেশ করুক, আত্মলাভ ব্যতিরেকে কুত্রাপি বিশ্রান্তিলাভে সমর্থ হয় না। আত্মাকে ভুলিয়া ও আত্মহারা হইয়াই মনুষ্য ত্রিতাপের নির্যাতনে নিরবচ্ছিন্ন দুঃখভোগ করে। অতএব আত্মলাভরূপ সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রয়োজন সাধনের নিমিত্ত শুভার্থী মানবগণের যত্ন করা কর্ত্তব্য। জীব আত্মজ্ঞানদ্বারাই আত্মাকে লাভ করিতে পারে বলিয়া আত্মজ্ঞান-লাভকেই আচার্য্য শ্রেষ্ঠলাভ বলিয়াছেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

"ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে।
তৎ স্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি॥"

গীতা ৪। ৩৮

ইহলোকে জ্ঞানের তুল্য শুদ্ধিকর পদার্থ আর কিছুই নাই। কর্ম্মযোগদ্বারা যোগ্যতা প্রাপ্ত হইয়া, মুমুক্ষু মানব কালে আপনা আপনিই এই আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া থাকে। ভগবান্ শিব বলিয়াছেন,—

জ্ঞানং তত্ত্ববিচারেণ নিষ্কামেনাপি কর্ম্মণা।
জায়তে ক্ষীণতমসাং বিদুষাং নির্ম্মলাত্মনাম্॥

(মহানির্ব্বাণতন্ত্র)

যাঁহারা বিদ্বান্, বিশুদ্ধচিত্ত এবং নিষ্পাপ, আত্মতত্ত্ববিচার ও নিষ্কাম-কর্ম্মানুষ্ঠানদ্বারা তাঁহাদেরই আত্মজ্ঞানের উদয় হয়। আত্মজ্ঞান যে কি দুর্লভ পদার্থ এবং উহা লাভ করিবার জন্য কিরূপ কঠোর সাধনার প্রয়োজন, তাহা ভগবদ্বাক্যে বুঝা গেল।

(৩৯) কোন্ ব্যক্তি জগৎ জয় করিয়াছেন? যিনি আপনার মনকে জয় করিয়াছেন, তিনিই জগজ্জয়ী। ত্রিলোক জয় করিয়াও যদি কেহ মনকে জয় করিতে না পারেন, তাহাহইলে তাঁহার সেই বিজয়লক্ষ্মী অচলভাবে প্রতিষ্ঠিতা হয়েন না। দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্য রাজনীতি উপদেশ দিবার সময় বলিয়াছিলেন,—

এষৈকৈব হি যোঽশক্তো মনসঃ সন্নিবর্হণে।
মহীং সাগরপর্য্যন্তাং সকথং হ্যবজেষ্যতি॥

যে রাজা একমাত্র মনকে বশীভূত করিতে না পারেন, তিনি কিরূপে এই সসাগরা পৃথিবী জয় করিতে সমর্থ হইবেন? যিনি একমাত্র মনকে জয় করিতে পারেন, জগৎ তাঁহারই

বশীভূত হয়; মন ইন্দ্রিয়গণের রাজা, সুতরাং মনকে জয় না করিতে পারিলে ইন্দ্রিয়গণ বশীভূত হয় না। ইন্দ্রিয়গণের ন্যায় দুর্নিবার্য্য ঘোর শত্রু আর নাই। মনু বলেন,—যেমন জলপাত্রে একটি মাত্র ছিদ্র থাকিলেও তদ্দ্বারাও ক্রমে পাত্রস্থ সমস্ত জল নিঃসারিত হয়, সেইরূপ অবশীভূত একটি মাত্র ইন্দ্রিয় ও মনুষ্যের সমস্ত প্রজ্ঞা ক্রমে হরণ করিয়া সর্ব্বনাশ সাধন করে। অজিতেন্দ্রিয় পুরুষের মত দীন ও দুর্ব্বল জীব জগতে আর নাই। কি বিজয়-শ্রী, কি সুখ, কি শান্তি, কি আত্মজ্ঞান, অজিতেন্দ্রিয় বলহীন পুরুষের কিছুই লভ্য নহে। ভগবান্ বলিয়াছেন,—

"নাস্তিবুদ্ধিরযুক্তস্য ন চাযুক্তস্য ভাবনা।
ন চাভাবয়তঃ শান্তিরশান্তস্য কুতঃ সুখম্॥"
"ইহৈব তৈর্জ্জিতঃ সর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ"
(গীতা)

যিনি আপনার মনকে জয় করিতে পারেন নাই, তাঁহার (আত্মবিষয়া) বুদ্ধি নাই ও ভাবনা (আত্মধ্যান) নাই। ভাবনা-শূন্য ব্যক্তির শান্তি (আত্মাতে চিত্তের উপরতি) নাই এবং শান্তিবিহীন ব্যক্তির প্রকৃত সুখ (মোক্ষানন্দ) কোথায়? যাঁহাদের মন (সর্ব্বভূতে ও ব্রহ্মে) সমভাবে স্থিত, তাঁহারা ইহলোকেই সংসার (জন্ম-মৃত্যু) জয় করিয়াছেন! মনকে জয় করিতে না পারিলে, মনুষ্য কোন প্রকার অভ্যুদয়ই লাভ করিতে পারে না। যিনি আত্মজয়ী, তিনিই বিশ্বজয়ী। মনকে জয় করিবার উপায়—

"বিষয়ান্ প্রতি ভোঃপুত্র! সর্ব্বানেব হি সর্ব্বথা।
অনাস্থা পরমা বৈষা সা যুক্তির্মনসো জয়ে॥"
(যোগবাশিষ্ঠ)

হে পুত্র! বিষয় সকলের প্রতি সর্ব্বপ্রকারেই যে অনাসক্তি, তাহাই মনোজয়ের উৎকৃষ্ট যুক্তি জানিবে (ক)। (ক্রমশঃ)

শ্রীপাঁচকড়ি চট্টোপাধ্যায়।
(পূর্ব্বনপাড়া।)

(ক) "পূর্ব্বকালে মহারাজ বলি স্বীয় পিতা মহাত্মা বিরোচনকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, হে মহামতে! আধি-ব্যাধি-বিনির্ম্মুক্ত দেশ কোথায়? এবং কি প্রকারেই বা তাহা প্রাপ্ত হওয়া যায়? বিরোচন বলিলেন, হে পুত্র! সেই দেশের নাম সর্ব্বদুঃখ-বিনাশন মোক্ষ। তথাকার রাজা সর্ব্বপদাতীত ভগবান্ আত্মা, আর তাঁহার বিচক্ষণ মন্ত্রীর নাম মন। সেই মনেই এই জগৎ পরিণতি প্রাপ্ত হয়। সেই মনকে জয় করিতে পারিলে, সমস্তই প্রাপ্ত হওয়া যায়। সেই মন্ত্রী জিত (বশীভূত) হইলে, এই অন্যের লোক সকলকেও জয় করিতে পারা যায়। অতি বলশালী সেই মন্ত্রী সুরাসুর-নাগ-যক্ষ-মহোরগ-কিন্নর ও নর সমেত এই ত্রিজগৎ অবলীলাক্রমে সর্ব্বতোভাবে বশীভূত করিয়া রাখিয়াছে। অতএব হে পুত্র! যদি তোমার মৃত্যুঞ্জয় রূপ সিদ্ধি ও শাশ্বত সুখ লাভের অভিলাষ হয়, তাহা হইলে কষ্ট-চেষ্টা দ্বারাও তাহাকে জয় করিতে যত্নশীল হও। তুমি সেই মন্ত্রিকে অতিশয় দুর্জ্জয় বলিয়া জানিবে; কিন্তু একমাত্র যুক্তি দ্বারা উহা ক্ষণ মধ্যে পরাজিত হয়।" (যোগবাশিষ্ঠ)

সনাতন-ধর্ম্ম-তত্ত্ব-জিজ্ঞাসা।

(আত্মতত্ত্ব—গুরুশিষ্য-সংবাদ)

শিষ্য। গুরুদেব! প্রণিপাত করি।

গুরু। ধর্ম্মে মতি হউক।

শিষ্য। দেব! অনেক দিন অবধি আমার মনে একটী সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে, আপনার কৃপা ব্যতিরেকে তাহার অপনোদনের আর উপায় দেখি না।

গুরু। বৎস! কি সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে, বলিতে পার।

শিষ্য। আর্য্য! ভারতবর্ষ আজ ধর্ম্মবিপ্লবে বিপ্লুত। অধুনা ভারতবর্ষ নানাধর্ম্মে পরিপূর্ণ ও নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত। এমন কি, বোধ হয় প্রত্যেকের হৃদয়-কন্দর অন্বেষণ করিলে, প্রত্যেককেই বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী পরিলক্ষিত হয়! আবার সম্প্রদায়ভেদে সকলেই নিজের ধর্ম্মকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করিয়া থাকে। সকলেই নিজের ধর্ম্মে অন্যকে দীক্ষিত করিবার জন্য নানাপ্রকার উপদেশদ্বারা প্ররোচিত করে; দুগ্ধপোষ্য বালকেও হয়ত ধর্ম্মসম্বন্ধীয় দুই একটী উপদেশ দিতে পরাঙ্মুখ হয় না! সকলেই অপরের মুখে নিজের ধর্ম্মের নিন্দা শুনিলে খড়্গহস্ত হইয়া থাকে। সুতরাং এরূপ স্থলে অল্পবুদ্ধি লোকের পক্ষে বিষম সঙ্কট উপস্থিত, কারণ কোন্ ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ, কোন্ ধর্ম্ম প্রশস্ত, তাহা নিরূপণ করা সুসাধ্য নহে। এই বিপ্লবের শান্তি-নিষ্পত্তি-তত্ত্ব জানিবার আশায় ভবদীয় চরণতলে উপনীত হইয়াছি। অতএব এক্ষণে আপনি অনুগ্রহ প্রকাশ পূর্ব্বক আমার এই চিত্তান্দোলন নিবারণ করিয়া প্রকৃত ধর্ম্ম-উপদেশে কৃতার্থ করুন।

গুরু। বৎস! মানবের ধর্ম্ম কখনও নানাপ্রকার হইতে পারে না। স্থূলদৃষ্টিতে দেখিলে, যদিও প্রত্যেক মানবের প্রত্যেক বিষয়ের পার্থক্য দেখা যায় বটে, কিন্তু উহাদের মধ্যে এমন এক গূঢ় সামঞ্জস্য রহিয়াছে যে, উহাদের ধর্ম্ম কখনওবিভিন্ন হইতে পারে না। মানবের ধর্ম্ম সর্ব্বদেশে, সর্ব্বকালে, সকলেরই এক; তবে অধিকারভেদে প্রকারভেদ স্বাভাবিক।

শিষ্য। মনুষ্যমাত্রেরই ধর্ম্ম যদি মূলতঃ এক হয়, তবে স্থূলতঃ জগতে এত অধিক ধর্ম্ম-বিতর্ক কেন? এত মতভেদ, এত সম্প্রদায়-ভেদই বা লক্ষিত হয় কেন?

গুরু। বৎস! ভ্রমর যেমন মধু অন্বেষণ করিবার সময় গুণ্ গুণ্ শব্দদ্বারা সকলকে মোহিত করে এবং যতক্ষণপর্য্যন্ত মধুপান করিতে না পায়, ততক্ষণ কেবল শব্দই করিতে থাকে, কিন্তু যখন কোন ফুলে বসিয়া মধুপানে প্রবৃত্ত হয়, তখন আর তাহার কোন শব্দই থাকে না, সেইরূপ মানুষ যতদিন পর্য্যন্ত প্রকৃত তত্ত্ব লাভ না করিতে পারে, ততদিনই কেবল অহঙ্কারে উন্মত্ত হইয়া উচ্চকণ্ঠে স্বীয় মতামত ব্যক্ত করিয়া থাকে; কিন্তু যখন প্রকৃত-তত্ত্ব লাভ হয়, তখন আর তাহার সে সকল কিছুই থাকে না। সে তত্ত্বজ্ঞানীর নিকট ধর্ম্ম-সংগ্রাম নাই, তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে মতভেদ বা সমাজাতীত সম্প্রদায়ভেদ নাই; মোহজ ভেদাভেদবোধ তাঁহাদের একেবারেই তিরোহিত।

শিষ্য। তবে কি আমার ধর্ম্ম ও একজন খৃষ্টানের ধর্ম্ম তত্ত্বতঃ এক?

* এই প্রবন্ধের কিয়দংশ ইতঃপূর্ব্বে "বেদব্যাস" পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল; এক্ষণে ইহা পরিবর্দ্ধিত ও পরিবর্ত্তিত কলেবরে এই পত্রিকায় প্রকাশ করা গেল।

গুরু। এ কথার উত্তর দিবার পূর্ব্বে আমি তোমাকে একটী প্রশ্ন করিতেছি, অগ্রে তাহার উত্তর তোমার দেওয়া আবশ্যক।

শিষ্য। আজ্ঞা করুন।

গুরু। তুমি যে বলিতেছ, "আমার ধর্ম্ম" সেই "আমি"টা কে, তাহা কি আমাকে বলিতে পার? কেননা যেমন মস্তকহীনের মস্তকবেদনা অসম্ভব, সেইরূপ "তুমি" কে, তাহা না জানিলে, সেই "তোমার" ধর্ম্ম কোথা হইতে আসিবে?

শিষ্য। দেব! আমি যদি বলি, আমি নরহরি বন্দ্যোপাধ্যায়, তাহ'লে আপনার প্রশ্নের উত্তর হয় না বটে, তাহা বুঝি; কিন্তু আমি আপনার সম্মুখেই বসিয়া আছি, এটুকু অবশ্য জানিতেছি।

গুরু। তুমি নরহরিই বটে, কিন্তু বোঝা সোজা নহে। দেখ, আমার সম্মুখে তোমার দেহ খানি ভিন্ন আর কিছুই ত দেখা যাইতেছে না। এই দেহখানি ত "তুমি" নও; তাহা হইলে দেহ থাকিতে লোকের মৃত্যু হয় কেন? তাহা হইলে ত আগুণে না পুড়িলে বা বাঘে-কুম্ভীরে না খাইলে মৃত্যুই ঘটিতে পারে না! দেহই যদি "তুমি" হইতে, তাহা হইলে যত দিন বা যতক্ষণ দেহ থাকিত, ততদিন বা ততক্ষণ "তুমি" থাকিতে। অতএব ইহাদ্বারাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, "তুমি" একটী দেহাতিরিক্ত বস্তু। দেহে যাহা বর্ত্তমান থাকিলে দেহ স্থায়ী থাকে ও যাহার অভাবে দেহ নষ্ট হইয়া যায়, তাহা ও দেহ কখনও এক বস্তু হইতে পারে না। এই জন্যই বলিতেছি যে, "তুমি" দেহ হইতে স্বতন্ত্র বস্তু; দেহ খানি "তুমি" নও। এসব প্রাচীন কথা হইলেও একালকার নবীনদের নব-শিক্ষারীর, সন্দেহ নাই। দেহাত্মবুদ্ধির আধিক্যেই নব্য-সমাজের অবনতি-আশঙ্কা।

শিষ্য। তবে আমার এই দেহের অভ্যন্তরে যে মন আছে, তাহাই "আমি" বলা যায় কি?

গুরু। তাহাও হইতে পারে না; কেননা "তুমি" যে সময় কোন বিষয়ে মনঃসংযোগ করিবার চেষ্টা করিতেছ, তখন হয়ত কতবার তোমার অনিচ্ছাসত্ত্বেও তোমার মন অন্য দিকে চলিয়া যাইতেছে; অথবা যখন কোন মন্দ বিষয় ভুলিবার চেষ্টা করিতেছ, তখন হয়ত তোমার মন পুনঃপুনঃ সেই সকল তোমার সম্মুখে আনিয়া উপস্থিত করিতেছে! কিন্তু "তুমি" ও মন যদি এক বস্তু হইতে, তাহাহইলে কখনও তোমার আত্ম ইচ্ছা ও মনের কার্য্য পৃথক্ হইতে পারিত না। ইহাদ্বারাই বুঝা যাইতেছে যে, "তুমি" ও মন কখনও এক বস্তু নহে। আর "তুমি" বলিতেছ, "তোমার" দেহ, "তোমার" মন; সুতরাং "তুমি" ও দেহ, বা "তুমি" ও মন কখনও এক বস্তু হইতে পারে না। যেহেতু "তুমি" ও "তোমার" এই দুইটি শব্দ 'কারক'-ভেদে পৃথক্ বস্তুর বাচক।

শিষ্য। (স্মিতাস্যে) তবে কি আমি এখানে নাই? ইহাও অবশ্য হইতে পারে না।

গুরু। "তুমি" এখানে নাই, ইহা যেরূপ অসম্ভব, আর যদি একজন বলে যে, 'আমার জিহ্বা আছে কি না জানি না, তাহাও সেইরূপ অসম্ভব ও অদ্ভুত হয়! লোকে যেমন কণ্ঠস্থ কনকহারের অনুসন্ধানে অন্বেষণ করিয়া থাকে, অথবা কস্তুরিকা-মৃগ যেমন স্বীয় নাভিদেশস্থ পদার্থের সুগন্ধে মোহিত হইয়া অজ্ঞানতাবশতঃ নানাস্থানে সেই পদার্থের অন্বেষণ করিয়া বেড়ায়, এসংশয়ে তোমারও সেই দশা উপস্থিত, বলা যায়।

শিষ্য। আপনার কথার অর্থ-রহস্য-ভেদ করিয়া এখনও আত্মতত্ত্বাভাস বুঝিতে সক্ষম

হইতেছি না। (স্মিতাস্যে) বলুন, "আমি" কোথায়?

গুরু। "তুমি" অবশ্যই এখানে আছে; সেই "তুমি"ই আমার সহিত কথা কহিতেছ; আমি যাহা বলিতেছি, তাহা শুনিতেছ ও বুঝিতে চেষ্টা করিতেছ।

শিষ্য। চেষ্টা মাত্র; আমি ত কিছুতেই ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না যে, "আমি" কে? আপনার কৃপায় বুঝিব, আশা করি।

গুরু। "তুমি" কে, তাহা যদি স্থির না থাকে, তবে "তোমার" ধর্ম্ম কোথায় পাইবে? কর্ত্তার অস্থিরতায় সম্বন্ধের স্থিরতা অসম্ভব।

শিষ্য। তবে অগ্রে অনুগ্রহপূর্ব্বক "আমি" কে, তাহা বুঝাইয়া, পরে "আমার" ধর্ম্ম কি, তাহা বুঝাইয়া দিতে আজ্ঞা হউক।

গুরু। অবহিত চিত্তে শ্রবণ কর। বৎস! আমার সম্মুখে তোমার যে দৃশ্যমান দেহ খানি বর্ত্তমান রহিয়াছে, ইহা তোমার স্থূল শরীর। এই শরীর ভিন্ন তোমার আরও দুইটী শরীর আছে। যথা, সূক্ষ্মশরীর ও কারণ-শরীর। যেমন লোকে বহুমূল্য ধন-রত্নাদি একটী ছোট বাক্সে রাখিয়া, সেই বাক্সটী একটী লৌহ-সিন্দুকে আবদ্ধ করে, তৎপরে সেই লৌহ-সিন্দুকটীও একটী দুর্ভেদ্য গৃহের মধ্য রাখে, সেইরূপ তোমার স্থূলদেহটী গৃহের ন্যায়, সূক্ষ্ম-শরীরটী লৌহ-সিন্দুকের ন্যায় ও কারণ-শরীরটী মহামূল্য-রত্নাধার ছোট বাক্সের ন্যায়। আর "তুমি" সেই ধন-রত্ন-সদৃশ।

শিষ্য। প্রভো! এই একটী শরীর ভিন্ন আর কোনও শরীরত প্রত্যক্ষে পাইতেছি না।

গুরু। স্থূল প্রত্যক্ষে পাইতেছ না বলিয়া যে তাহা নাই, ইহা মনে করিও না। জগতের সকল পদার্থই কি তুমি দেখিতে পাইয়া থাক?

শিষ্য। দেখিতে যাহা না পাই, তাহা শুনিতে বা স্পর্শ করিতে কিম্বা আঘ্রাণ বা আস্বাদন করিতে পারি; পদার্থ মাত্রেই পঞ্চেন্দ্রিয়ের মধ্যে কোন না কোন ইন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত হইয়া থাকে। কোন ইন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত নহে, এমন জড়সত্ব পদার্থের অস্তিত্ব আছে বলিয়া বোধ হয় না; কিন্তু সূক্ষ্ম শরীর ও কারণ-শরীর ত কোন ইন্দ্রিয়ের দ্বারাই প্রত্যক্ষ করিতে পারা যায় না।

গুরু। আচ্ছা, তোমার মনকে কোন্ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রত্যক্ষ করিয়া থাক?

শিষ্য। আজ্ঞা না, কোনও ইন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রত্যক্ষ করিতে পারি না; অথচ মনের অস্তিত্ব বুঝিতেছি।

গুরু। তবে তোমাকে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, কোন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রত্যক্ষ করা যায় না, এমন বস্তুর অস্তিত্বও জগতে জানা যায়।

শিষ্য। মন সম্বন্ধে তাহাই যেন স্বীকার করিলাম, কিন্তু সূক্ষ্মশরীর ও কারণ-শরীরের সত্ত্বাবোধ কিরূপে হইবে?

গুরু। আমি যাহা বলিতেছি, তাহা একাগ্র-চিত্তে শ্রবণ কর, ক্রমশঃ সমস্তই বুঝিতে পারিবে। অগ্রে স্থূলশরীরের বিষয় শ্রবণ কর। আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও পৃথিবী, এই পাঁচটী মহাভূতের বিভিন্ন প্রকার বিমিশ্রণে এই স্থূল শরীরটী নির্ম্মিত।

শিষ্য। 'ভূততত্ত্ব' ঠিক বুঝিতে পারি না।

গুরু। রূঢ় অর্থাৎ মূল বস্তুকে ভূত কহা যায়।

শিষ্য। আধুনিক বিজ্ঞান-গ্রন্থে পাঠ করিয়াছি যে, মূলপদার্থ প্রায় চতুঃষষ্টি প্রকার; আর্য্যশাস্ত্রানুসারে আপনি বলিলেন পাঁচটী।

গুরু। যখন স্থান ও জাতিবিশেষে মনুষ্য একেবারে অজ্ঞান ছিল; তখন মনে করিত যে, জগতের প্রত্যেক নৈসর্গিক বস্তুই এক একটী

মূলপদার্থ। যতই জ্ঞান বৃদ্ধি হইতে লাগিল, ততই মূলপদার্থের সংখ্যা হ্রাস হইতে লাগিল। কিছু দিন পূর্ব্বে আধুনিক ঐ বিজ্ঞানের মধ্যেই শতাধিক মূল পদার্থের উল্লেখ ছিল, এখন ক্রমশঃ কমিয়া চৌষট্টিতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। আবার যতই বিজ্ঞানের উন্নতি হইবে, যতই বৈজ্ঞানিক বা রাসায়নিক পরীক্ষার প্রকৃষ্ট প্রণালী আবিষ্কৃত হইবে, ততই মূলপদার্থের সংখ্যা হ্রাস হইয়া, ক্রমে ক্রমে পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত ঐ পঞ্চ-ভূতে (পঞ্চতন্মাত্রায়) দাঁড়াইবে। পূজনীয় পরমর্ষিগণ যাহা বলিয়া গিয়াছেন, তাহার ভুল অদ্যাপি কেহ ধরিতে পারে নাই। যদিও কোন বিষয় আপাত-দৃষ্টিতে ভুল বলিয়া বোধ হয়, বিশেষরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিলে, তাহাই আবার পরম সত্য বলিয়া উপলব্ধি হইয়া থাকে। মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বলিয়াছেন—

ক্ষিতির্জ্জলং তথা তেজো বায়ুরাকাশমেবচ।
এতৈঃ পঞ্চভিরাবদ্ধো দেহোঽয়ং পাঞ্চভৌতিকঃ॥

অর্থাৎ পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু ও আকাশ, এই পঞ্চভূত দ্বারা এই পাঞ্চভৌতিক দেহ উৎপন্ন হইয়াছে।

আবার এই স্থূল দেহ চারি প্রকার; যথা— অণ্ডজ, স্বেদজ, উদ্ভিজ্জ ও জরায়ুজ।

শিষ্য। তবে কি ভবদীয় মতে উদ্ভিদ্‌ও এক প্রকার জীব?

গুরু। আমার মতে কেন? পণ্ডিত সমাজে সকলেই উদ্ভিদ্‌কে জীব-বিশেষ আখ্যা দেন।

শিষ্য। উদ্ভিদ জীব কিসে, উদ্ভিদের কি দর্শন-শ্রবণ-প্রভৃতি-বিষয়িণী চৈতন্য-শক্তি আছে?

গুরু। অবশ্য আছে। কোন প্রকার উষ্ণতা বা শৈত্য-স্পর্শ হইলে উদ্ভিদ সকল গ্লানিযুক্ত ও শীর্ণ হয়; অতএব তাহাদের একরূপ স্পর্শ-শক্তি আছে, ইহা তোমাকে স্বীকার করিতে হইবে। বজ্র-নির্ঘোষাদি দ্বারা উদ্ভিদের ফল পুষ্প বিশীর্ণ হয়; সুতরাং তাহাদের একরূপ শ্রবণ-শক্তি আছে। লতাসকল বৃক্ষগণকে বেষ্টন করে ও সর্ব্বদিকেই গমন করিয়া থাকে; উদ্ভিদের আলোকাভিমুখী অঙ্গবিস্তার স্বাভাবিক, একারণে তাহাদিগকে একরূপ দর্শনশক্তিসম্পন্ন বলা যাইতে পারে; কেননা দর্শনশক্তিবিহীন হইলে কোনরূপ গমন একরূপ অসম্ভব হয়। পবিত্রগন্ধ এবং বিবিধ ধূপ দ্বারা উদ্ভিদগণ রোগহীন ও পুষ্পিত হইয়া থাকে, কাজেই উহাদের একরূপ আঘ্রাণশক্তি কল্পনা না করিবার কারণ নাই। আর যখন উহারা মূল দ্বারা রস আকর্ষণ করিয়া জীবিত থাকে, তখন একরূপ রসন-শক্তিও আছে বলিতে হইবে। এক্ষণে বিবেচনা করিয়া দেখ, উদ্ভিদ জীব মধ্যে গণ্য কি না? উদ্ভিদ্‌-জগৎ বহুতমোগুণাবৃত বলিয়া চৈতন্যের বিশদ-বাহ্য-বিকাশ-বঞ্চিত, কিন্তু অন্তঃসজ্ঞায় সুখ দুঃখ সমন্বিত, মন্বাদি আর্য্যশাস্ত্রের এই সিদ্ধান্ত।

শিষ্য। আপনার কৃপায় বুঝিলাম যে, স্থূলশরীর চারিপ্রকার।

গুরু। আহার দ্বারা এই স্থূলশরীরের উৎপত্তি, আহার দ্বারা ইহার বৃদ্ধি এবং আহারের অভাবে ইহার ক্ষয় হইয়া থাকে; এই জন্য পণ্ডিতেরা ইহাকে 'অন্নময়-কোষ' বলিয়া থাকেন। আর, এই শরীর কেবল সুখ-দুঃখাদি ভোগ করিবার নিমিত্ত; এ কারণে ইহাকে ভোগায়তন শরীরও বলে। এক্ষণে সূক্ষ্মশরীরের বিষয় বলিতেছি, শ্রবণ কর।

যে শক্তিদ্বারা দর্শন, শ্রবণ, আস্বাদন, আঘ্রাণ ও স্পর্শজ্ঞান নিষ্পন্ন হয়, সেই শক্তিকে জ্ঞানেন্দ্রিয় বলে। জ্ঞানেন্দ্রিয় পাঁচটী। যথা—চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্। আর যে শক্তি দ্বারা বাক্যকথন, বস্তু-গ্রহণ, গমন, মল-মূত্র ও শুক্রোৎসর্গ, এই সমস্ত ক্রিয়া সম্পন্ন হয়, তাহাকে কর্ম্মেন্দ্রিয় বলে। কর্ম্মেন্দ্রিয়ও পাঁচটী—

বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ। এখন বল দেখি, ইন্দ্রিয়গুলি দেখা যায় কি না?

শিষ্য। দেব! কেন দেখা যাইবে না?

গুরু। বৎস! বিবেচনা করিয়া বলিও; যাহা মুখে আসে, তাহাই বলিও না। আমি ইতঃপূর্ব্বে বলিয়াছি যে, দর্শনশক্তির নাম চক্ষু। ঐ যে তোমার ললাটের নিম্নদেশে পদ্মপর্ণাকার শ্বেতবর্ণ ক্ষেত্রে কৃষ্ণবর্ণ তারকাসমন্বিত দুইটী পদার্থ দেখা যাইতেছে, উহাই তোমার দর্শনেন্দ্রিয় বা চক্ষু নহে। তবে ঐ স্থান হইতে দর্শনশক্তির কার্য্য নির্ব্বাহ হয়, তজ্জন্য লোকে উহাকে চক্ষু বলে। প্রকৃতপক্ষে, "দর্শনশক্তির নাম চক্ষু; "শ্রবণশক্তির" নাম কর্ণ। এইরূপ দশবিধ শক্তির নাম দশটী ইন্দ্রিয়। ফলতঃ ইন্দ্রিয় সকল ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য নহে; অর্থাৎ কোন ইন্দ্রিয়ের দ্বারাই কোন ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ করা যায় না।

এই দশটী ইন্দ্রিয়ের মধ্যে জ্ঞানেন্দ্রিয়-পঞ্চক আকাশাদি ভূত-পঞ্চকের সত্ত্বাংশ হইতে এবং কর্ম্মেন্দ্রিয় পঞ্চক উহাদের রজোগুণের অংশ হইতে উৎপন্ন এবং এই স্থূল ইন্দ্রিয়-যন্ত্র-নিবহ ইহাদের তমোগুণাংশে গঠিত। এতদ্ভিন্ন এই দেহের মধ্যে প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যাননামক পঞ্চবায়ু * অবস্থানপূর্ব্বক শারীরিক কার্য্য সকল সম্পন্ন করিতেছে।

শিষ্য। প্রভো! বায়ু-পঞ্চকের মধ্যে কোন্ বায়ুদ্বারা কি কার্য্য সাধিত হয়, তাহা শুনিবার জন্য আমার আগ্রহ হইতেছে; অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাহা আমাকে বুঝাইয়া দিউন।

গুরু। প্রাণবায়ু শ্বাস-প্রশ্বাসরূপে যাতায়াত করে; অপানবায়ু অধোভাগে অবস্থানপূর্ব্বক মূত্র-পুরীষ-নির্গমাদি কার্য্য সম্পন্ন করে; সমান বায়ু উদরে থাকিয়া পরিপাকাদি সাধন করে; উদানবায়ু কণ্ঠদেশে বাস করতঃ জীবকে আহার গ্রহণাদি কার্য্যে সমর্থ করে এবং ব্যানবায়ু জীবগণের সমস্ত শরীরে অবস্থিত হইয়া স্নায়ু প্রভৃতির কার্য্য নিয়মিত করে; সুতরাং এই পঞ্চ বায়ুই জীবের শরীরে জীবনস্বরূপে অবস্থিত থাকিয়া জীব-লোক পরিচালনা করিতেছে।

আর পূর্ব্বোক্ত আকাশাদি ভূত-পঞ্চকের সত্ত্বগুণের সমষ্টি হইতে সূক্ষ্মচিদাভাস-সত্ত্বায় অন্তঃকরণের উৎপত্তি হইয়াছে। অন্তঃকরণ যখন সংশয়াত্মক ভাব ধারণ করে, তখন তাহার নাম 'মন; আর যখন অন্তঃকরণ নিশ্চয়াত্মক ভাব ধারণ করে, তখন তাহার নাম বুদ্ধি।

শিষ্য। তবে কি মহাশয়ের মতে মন ও বুদ্ধি একরূপ সূক্ষ্ম জড়ীয় চিদাভাস-শক্তিমাত্র?

গুরু। ব্যক্তিগত মতামতের অপেক্ষা কি? সামান্যতঃ বুঝ, মন ও বুদ্ধি যদি জড়ীয় শক্তিসম্বন্ধী না হইবে, তবে শরীর ক্লান্ত বা দুর্ব্বল হইলে, মন ও বুদ্ধি ক্লান্ত বা দুর্ব্বল হইয়া পড়ে কেন? বিষয় কঠিন, অথচ কথা পুরাতন; আশা করি, ক্রমে বুঝিবে। তারপর শুন, পূর্ব্বোক্ত পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় সম্বলিত সূক্ষ্ম-বায়ু-পঞ্চক-ব্যাপারই "প্রাণময় কোষ।" পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় সম্বলিত সংশয়াত্মক মনকে "মনোময় কোষ" বলে। আর উক্ত জ্ঞানেন্দ্রিয় পঞ্চকের সূক্ষ্মসত্ত্বাসহ বর্ত্তমানা যে নিশ্চয়াত্মিকা অন্তর্বৃত্তি বুদ্ধি, অর্থাৎ যাহাদ্বারা ইচ্ছাশক্তি ও কর্ত্তৃস্বরূপে জ্ঞানের শক্তি প্রকাশ পায়, তাহা "বিজ্ঞানময় কোষ" নামে অভিহিত। এই কোষত্রয়ের সমষ্টির নাম সূক্ষ্মশরীর বা লিঙ্গ-শরীর। স্বপ্নাবস্থায় স্থূল শরীরের জ্ঞান থাকে না; কিন্তু এই সূক্ষ্মশরীরের জ্ঞান সুস্পষ্ট বর্ত্তমান থাকে। এই সূক্ষ্ম শরীর ও তদন্তর্গত 'আনন্দময়কোষ' বা কারণ-

* নাগ, কূর্ম্ম, কৃকর, দেবদত্ত নামক আরও পাঁচটী উপবায়ু আছে; উদ্গার ও জৃম্ভণাদি কার্য্য সকল ইহাদের দ্বারা সম্পন্ন হইয়া থাকে।

শরীর সকল জীবের সমভিব্যাহারী হইয়া পরলোকে গমন করিয়া থাকে।

শিষ্য। পরলোক-সত্তার প্রকৃষ্ট প্রতীয়মানতা কিরূপে লাভ করা যায়?

গুরু। অগ্রে যে বিষয়ের কথা হইতেছে, তাহা শেষ হউক, তৎপরে অন্য কথার প্রসঙ্গ করিও; নচেৎ গণ্ডগোল করিয়া কিছুই বুঝিতে পারিবে না; আর হয়ত উপস্থিত বিষয়ের আলোচনা শেষ হইতে হইতে, তোমার সন্দেহও অনেক পরিমাণে নিরাকৃত হইবে। এক্ষণে কারণ-শরীরের বিষয় শ্রবণ কর।

গাঢ়তর সুষুপ্তিকালে আমাদের পূর্ব্বোক্ত স্থূল, সূক্ষ্ম, এতদুভয় শরীরের মধ্যে কোন শরীরেরই জ্ঞান থাকে না; এবিষয় তুমি কিরূপ বুঝ?

শিষ্য। আজ্ঞা! স্বপ্নবিহীন গাঢ় নিদ্রাই ত সুষুপ্তি, তখন আর জ্ঞান থাকিবে কিরূপে?

গুরু। কারণ-শরীরের বিষয় বলিতে হইলে একটু বিশেষ মনোযোগ আবশ্যক; কেননা ইহার ন্যায় দুরূহ বিষয় আধ্যাত্মিকশাস্ত্রের মধ্যে অতি অল্পই আছে। কারণ-শরীরের বিষয় শুনিতে শুনিতে এখনই এমন স্থানে পৌঁছিবে, যেখান হইতে বাক্য ও মন উভয়েই পরাভূত হইয়া ফিরিয়া আইসে। মস্তিষ্ক আর তাহা ধারণা করিতে পারে না।

শিষ্য। আপনার কথা শুনিয়া আমার যুগপৎ আনন্দ ও কৌতূহলের উদয় হইতেছে। অনুগ্রহপূর্ব্বক ইহসর্ব্বস্ব-আমাকে অধ্যাত্মোপদেশে কৃতার্থ করুন।

গুরু। তুমি বলিলে যে পূর্ণ সুষুপ্তিকালে আদৌ জ্ঞান থাকে না; কিন্তু বল দেখি, নিদ্রাভঙ্গের পর আমরা কিরূপে বুঝিতে পারি যে, "উত্তম নিদ্রা হইয়াছে ও সে সময় শান্তিতে ছিলাম"?

শিষ্য। বলিতে পারি না।

গুরু। পূর্ণ সুষুপ্তিকালে আমাদের স্থূল ও সূক্ষ্মশরীরের জ্ঞান থাকে না বটে; কিন্তু কারণশরীরের জ্ঞান থাকে। শুদ্ধ কারণ-শরীরের জ্ঞান আনন্দময়; সেই জন্য আমরা সুষুপ্তিভঙ্গের পর বুঝিতে পারি যে, "উত্তম নিদ্রানন্দ হইয়াছিল"। এই আনন্দ একটী স্বতন্ত্র বস্তু; ইহা পরস্পর সাপেক্ষ সুখও নহে, দুঃখও নহে; সুখদুঃখের অতীত নিত্য নিরপেক্ষ অবস্থা।

শিষ্য। সুখও নহে, দুঃখও নহে, এরূপ অবস্থা কিরূপ, তাহা আমার প্রতীতির অবিষয়ীভূত।

গুরু। একেবারে নহে; আচ্ছা গাঢ় নিদ্রার সময়ে তুমি কি সুখ-দুঃখ কিছু ভোগ করিয়া থাক?

শিষ্য। না; কিন্তু সুখদুঃখের অতীত অবস্থা যে আনন্দ, তাহা যে ভোগ করি, তাহারই বা প্রমাণ কি?

গুরু। তাহার প্রমাণ এই যে, নিদ্রাভঙ্গের পর ভুক্তপূর্ব্ব-নিদ্রানন্দ-জনিত তৃপ্তি-প্রবাহ আমরা স্পষ্ট অনুভব করি।

শিষ্য। বুঝিতেছি।

গুরু। এক্ষণে দেখ, ঐ যে সর্ব্বান্তর্গত আনন্দভাবে বা আনন্দময়কোষে আত্মা বিরাজিত, উহারই অন্য নাম কারণ-শরীর।

শিষ্য। এক্ষণে তিনপ্রকার শরীর ও পঞ্চকোষের বিষয় বুঝিলাম; ইহার মধ্যে কোন্‌টী "আমি"?

গুরু। ঐ আত্মাই আমি। আত্মা নিরুপাধিক পরমাত্মারই সোপাধিক অংশ; সুতরাং আত্মা-আমিই সচ্চিদানন্দ পরমাত্মা। ভগবান শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন,—

"অহং প্রাণসংজ্ঞো ন তু পঞ্চবায়ুঃ
ন বা সপ্তধাতুর্ন বা পঞ্চকোষাঃ॥

ন বাক্যানি পাদৌ ন চোপস্থপায়ুঃ।
চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহম্॥"
ইত্যাদি—

অর্থাৎ আমি প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান, এই পঞ্চপ্রাণসংজ্ঞক বায়ু নই; রস, রক্ত, মাংস, অস্থি, মেদ, মজ্জা ও শুক্র, এই সপ্তধাতু নই; অন্নময়াদি পঞ্চকোষ নই; এবং বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ ইত্যাদি ইন্দ্রিয়ও নই; কিন্তু জ্ঞানানন্দস্বরূপ যে শিব, সেই শিব-স্বরূপ "আমি"।

অতএব শরীরত্রয় ও পঞ্চকোষের মধ্যে কোনটীই "তুমি" নও। পূর্ব্বে বলিয়াছি, তোমার, স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ-শরীর যথাক্রমে ঘর, লৌহসিন্দুক ও ছোট বাক্সের ন্যায়; তুমি সেই ছোট বাক্সসদৃশ কারণ-শরীরে উপ-স্থিত রহিয়াছে। বৎস! ভগবৎকৃপায় একবার নিমিলিত নেত্রে অনন্যচিত্তে ধ্যান-নিমগ্ন হইয়া দেখিতে পারিলে, সেই অভূতপূর্ব্বদৃশ্য দেখিয়া চরিতার্থ হইতে পার; সর্ব্বদা বিষয়কর্ম্মে নিয়োজিত থাকিয়া, সাংসারিক কোলাহলের মধ্যে বিব্রত হইয়া, চিরজীবনের মধ্যে একবার যাঁহার দিকে ফিরিয়া দেখিতে অবসর পাও নাই বা অবসর পাইলেও দুর্ভাগ্যবশতঃ একবার চাহিয়া দেখ নাই, সেই চিরশান্তি-নিকেতনের দিকে চাহিয়া দেখ; পার ত আরো দেখ, আনন্দময়-কোষের সেই আনন্দের ভোক্তা আনন্দময়পুরুষ আনন্দে বিরাজমান! দেখ, নিত্যজ্ঞান ও নিত্যানন্দময় মহাপুরুষ পদ্মপত্রস্থ জলের ন্যায় নির্লিপ্তভাবে বিরাজমান! ঐ মহাপুরুষই "তুমি"। এই তুমিই দেহ-রথে রথী হইয়া তাহা পরিচালনা করিতেছ। তাই ভগবান অর্জ্জুনকে উপদেশ প্রদানকালে কহিয়াছেন—

"শ্রোত্রং চক্ষুঃ স্পর্শনঞ্চ রসনং ঘ্রাণমেব চ।
অধিষ্ঠায় মনশ্চায়ং বিষয়ানুপসেবতে॥"

অর্থাৎ এই দেহী কর্ণ, চক্ষুঃ, ত্বক্, রসনা, নাসিকা, এই সকল ইন্দ্রিয়ে এবং অন্তঃকরণে অধিষ্ঠান করিয়া বিষয় সকল উপভোগ করেন। অতএব "তুমিই" এই নবদ্বারবিশিষ্ট দেহ-পুরে অধিষ্ঠানকরতঃ সমস্তেরই কর্ত্তা ও ভোক্তা হইয়া কালাতিপাত করিতেছ। "তুমি" দেহ, মন প্রভৃতির অতিরিক্ত স্বতন্ত্র বস্তু। সেই "তুমিই" আমার কথা শুনিতেছ, তর্ক করিতেছ এবং আমি যাহা বলিতেছি, তাঁহা বুঝিতেছ। সেই "তুমি" টুকু আছে বলিয়াই তোমার শরীরের এত ব্যাপার। সেই "তুমি" টুকুর অভাবে তোমার এই শরীরের দিকে কেহ একবার ফিরিয়াও তাকাইবে না। "তুমি" চলিয়া গেলে, এই শরীর কোথায় চলিয়া যাইবে, কেহ তাহার সন্ধানও পাইবে না। এক্ষণে বুঝিতে কিছু "তুমি" কে?

শিষ্য। আজ্ঞা হাঁ, আপনার করুণায় অনেকটা বুঝিতেছি বৈ কি।

গুরু। সেই "তুমি" যখন কারণ-শরীরে প্রতিবিম্বিত হও, তখন তুমি কারণ-শরীরের অভিমান করিয়া থাক; তখন তোমার নাম "প্রাজ্ঞ"। (সুষুপ্তির বা সমাধির অবস্থায় এই-রূপ হইয়া থাকে)। সেই প্রাজ্ঞ যখন সূক্ষ্ম-শরী-রের অভিমান করেন, তখন তাঁহার নাম "তৈজস"। (স্বপ্নাবস্থা বা পরলোকের অবস্থা এই প্রকার)। আবার সেই তৈজস বা প্রাজ্ঞ যখন স্থূল-শরীরের অভিমান করিয়া থাকেন, তখন তাঁহাকে "জীব" বলে। (আমাদের জাগ্রদবস্থা এই প্রকার)।

শিষ্য। এই বিষয়টী বিশদরূপে বুঝিতে পারিলাম না।

গুরু। পূর্ব্বে বলিয়াছি, তোমার রত্ন-পূর্ণ বাক্সটী লৌহ-সিন্দুকে আবদ্ধ করিয়া গৃহমধ্যে রাখিয়া থাক। যখন এইরূপ রাখ, তখন তুমি

বলিয়া থাক, এই ঘরে আমার রত্ন আছে। আবার যখন সিন্দুকটী ঘরের বাহিরে রাখ, তখন বলিয়া থাক, ও ঘরে আমার রত্ন নাই, এই সিন্দুকে আছে। পুনরায় যখন সিন্দুক হইতে ছোট বাক্সটী বাহির করিয়া লও, তখন বলিয়া থাক, এই সিন্দুকে আমার কিছু নাই, ঐ ছোট বাক্সে সর্ব্বস্ব আছে; অথচ রত্ন পূর্ব্বেও যে স্থানে ছিল, এখনও সেই স্থানে আছে। এই একই রত্ন যেরূপ ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় ভিন্ন ভিন্ন উপাধি প্রাপ্ত হইল, তুমিও সেইরূপ ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় ভিন্ন ভিন্ন আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া থাক। এখন তোমার স্থূল-শরীরের জ্ঞান সুস্পষ্ট রহিয়াছে বলিয়া স্থূল জীব মাত্র। যখন তুমি এ শরীর ত্যাগ করিয়া সূক্ষ্ম-শরীরকে আমার শরীর মনে করিয়া, পরলোকে গমন করিবে, তখন তোমার নাম 'তৈজস'। আর যখন সুষুপ্তির বা সমাধির অবস্থায় সূক্ষ্ম-শরীরেরও অভিমান পরিত্যাগ করিয়া, আনন্দময় কোষে উপস্থিত হইয়া মাত্র কারণ-শরীরগত অবস্থায় আনন্দ উপভোগ করিবে, তখন তুমি 'প্রাজ্ঞ' নামে অভিহিত জানিবে। এক্ষণে তুমি যে কি, অন্ততঃ তাহার আভাস বুঝিয়াছকি?

শিষ্য। আপনার কৃপায় বুঝিয়াছি। এক্ষণে আমার ধর্ম্ম কি, তাহা বুঝাইয়া দিতে আজ্ঞা হউক।

গুরু। আচ্ছা! বারান্তরে তোমাকে "ধর্ম্ম" বুঝাইব।

শ্রীঅন্নদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রশ্নোত্তর-রত্নমালিকা।

কঃ খলু নালংক্রিয়তে দৃষ্টাদৃষ্টার্থসাধনপটীয়ান্।
অনয়া কণ্ঠস্থিতয়া প্রশ্নোত্তররত্নমালিকয়া॥ ১॥

এই প্রশ্নোত্তরমালা কণ্ঠে ধারণ করিলে, কোন্ দৃষ্ট-অদৃষ্টার্থ সাধনজ্ঞ ব্যক্তি না অলঙ্কৃত হইতে পারেন?

ভগবন্ কিমুপাদেয়ং গুরুবচনং (১) হেয়মপি চ কিমকার্য্যম্। কো গুরুরধিগততত্ত্বঃ শিষ্যহিতোদ্যোদ্যতঃ সততম্ (২)॥ ২॥

শিষ্য গুরুকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন—

ভগবন্! কিং উপাদেয়ং?

ভগবন্! উপাদেয় কি?

গুরুঃ। গুরুবচনং।

গুরু কহিলেন, গুরুবচন গ্রহণ করা কর্ত্তব্য।

শিষ্যঃ। হেয়মপি কিং?

শিষ্য প্রশ্ন করিলেন, কোন্ কার্য্য পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য?

গুরুঃ। অকার্য্যং।

গুরু কহিলেন—অসৎকার্য্য।

শিষ্যঃ। কঃ গুরুঃ।

---

(১) অনাদৃত্য গুরোর্বাক্যং শৃণুয়াদ্ যঃ পরাঙ্মুখঃ।
অহিতং বা হিতং বাপি রৌরবং নরকং ব্রজেৎ॥
কুলার্ণবে ১২ উল্লাসে।

হিত কিম্বা অহিত গুরুর বাক্য শ্রবণ করিবে। যে ব্যক্তি গুরুবাক্য অনাদর করিয়া পরাঙ্মুখ হয়, সে রৌরব নরকে গমন করে।

(২) শান্তং সুশীলং ধর্ম্মজ্ঞং শাস্ত্রজ্ঞং চারুদর্শনম্।
দয়ালুং পুত্রিণং দান্তং গৃহস্থং গুরুমাশ্রয়েৎ॥
বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে ৪ অধ্যায়ে।

শিষ্য প্রশ্ন করিলেন—গুরু কে ?

গুরুঃ। অধিগততত্ত্বঃ সততং শিষ্য-হিতায় উদ্যতঃ।

গুরু উত্তর করিলেন, যে, যিনি ব্রহ্মতত্ত্ব জানেন ও সর্ব্বদা শিষ্য-হিতে রত।

ত্বরিতং কিং কর্ত্তব্যং সুধিয়া সংসারসন্ততি-চ্ছেদঃ। (৩) কিং মোক্ষতরোর্বীজং সম্যগ্ জ্ঞানং ক্রিয়াসহিতম্ (৪) ॥ ৩ ॥

শিষ্য প্রশ্ন করিলেন, সুধীব্যক্তি শীঘ্র কি কার্য্য করিবে ?

গুরু। সংসারপাশ ছেদন।

শিষ্য। মোক্ষতরুর বীজ কি ?

গুরু। ক্রিয়াসহিত সম্যক্ জ্ঞান।

কঃ পথ্যতরো ধর্ম্মঃ (৫) কঃ শুচিরিহ যস্য মানসং শুদ্ধম্ (৬)। কঃ পণ্ডিতো বিবেকী (৭) কিং বিষমবধারণা গুরুষু ॥ ৪ ॥

শিষ্য। সর্ব্বাপেক্ষা হিতকর কি ?

তদ্ভিন্ন গৌতমীয় তন্ত্রে পঞ্চমাধ্যায়ে গুরুলক্ষণ সবিস্তারে বর্ণিত আছে।

(৩) কিং নামেদং ভব সুখং যেহয়ং সংসার-সন্ততিঃ।
জায়তে মৃতয়ে লোকো ম্রিয়তে জননায় চ ॥
যোগবাশিষ্ঠ বৈরাগ্যপ্রকরণে ১২ সর্গে ৭।

এ ভবসুখের নাম কি ? এই সংসার-বিস্তৃতিই বা কি ? এই সংসারে লোক মরিবার জন্য জন্ম গ্রহণ করে এবং জন্ম গ্রহণের জন্য মরিয়া থাকে।

(৪) ক্রিয়া সহিত জ্ঞানের বিষয়—হিন্দু-পত্রিকার ৩য় বর্ষ ৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

"জ্ঞানেন মোক্ষোবিজ্ঞেয়ঃ———"
বনপর্ব্বণি ১৯৯ অ ১১৭।

শরীর পক্তিঃ কর্ম্মাণি জ্ঞানন্তু পরমা গতিঃ।
কষায়ে কর্ম্মভিঃ পক্বে রসজ্ঞানে চ তিষ্ঠতি ॥ ৩৮ ॥
শান্তিপর্ব্বণি ২৬৯ অধ্যায়ে।

কর্ম্ম দ্বারা স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীর শোধন হয়। জ্ঞানই পরম গতি, অর্থাৎ জ্ঞান মোক্ষ প্রদান করে। কর্ম্ম দ্বারা চিত্ত-দোষ দূর হইলে, ব্রহ্মানন্দ অনুভব করা যায়।

(৫) একো হি জায়তে জন্তুরেক এব বিপদ্যতে।
ধর্ম্মস্তমনুযাত্যেকো ন সুহৃন্ন চ বান্ধবাঃ ॥
মৎস্যপুরাণে ২১১ অধ্যায়ে ৫।

দেহং পঞ্চত্বমাপন্নং ত্যক্ত্বা কৌ কাষ্ঠ লোষ্ট্রবৎ।
বান্ধবাবিমুখা যান্তি ধর্ম্মোযান্তমনুব্রজেৎ ॥
স্কন্দপুরাণে, কাশীখণ্ডে, পূর্ব্বভাগে, ৩৫ অ ৩৮।

"যশ্চধর্ম্মং সদারক্ষেৎ ধর্ম্মস্তং পরিরক্ষতি।"
ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে ব্রহ্মখণ্ডে ৯ম অধ্যায়ে ৯২।

"ধর্ম্ম এব প্লবো নান্যঃ স্বর্গং দ্রৌপদি গচ্ছতাম্ ॥"
মহাভারতে বনপর্ব্বণি ৩১ অধ্যায়ে ২৪ ॥

যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীকে কহিয়াছিলেন, হে দ্রৌপদি! স্বর্গে গমন করিবার ধর্ম্ম ভিন্ন আর অন্য ভেলা নাই।

মৃতং শরীরমুৎসৃজ্য কাষ্ঠ লোষ্ট্র সমংক্ষিতৌ।
বিমুখা বান্ধবা যান্তি ধর্ম্মস্তমনুগচ্ছতি ॥
মনু ৪ অ, ২৪১ ॥

মৃতং শরীরমুৎসৃজ্যাকাষ্ঠ-লোষ্ট্রসমং জনাঃ।
মুহূর্ত্তমেবরোদিত্বা ততো যান্তি পরাঙ্মুখাঃ ॥ ১৩ ॥
ঐ অনুশাসনিক পর্ব্বণি ১১১ অধ্যায়ে।

তৈস্তচ্ছরীরমুৎসৃষ্টং ধর্ম্ম একোনুগচ্ছতি।
তস্মাদ্ধর্ম্ম সহায়শ্চ সেবিতব্যঃ সদানৃভিঃ ॥ ১৪ ॥

এক এব সুহৃদ্ধর্ম্মো নিধনেপ্যনুযাতি যঃ।
শরীরেণ সমং নাশং সর্ব্বমন্যদ্ধি গচ্ছতি ॥
মনু ৮ অধ্যায়ে ১৭।

(৬) আত্মানদী-সংযম তোয়পূর্ণা সত্যহ্রদা শীলতটা দয়োর্ম্মিঃ। তত্রাভিষেকং কুরুপাণ্ডুপুত্র ন বারিণা শুদ্ধ্যতি চান্তরাত্মা ॥ ঐ

ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন করিয়া কহিয়াছিলেন যে, হে যুধিষ্ঠির! চিত্তসংযমরূপ জলপূর্ণা আত্ম-নদী, সত্যরূপ হ্রদ, শীলরূপ তট, দয়ারূপ ঢেউ, তাহাতে স্নান কর; কারণ জল দ্বারা অন্তরাত্মা শুদ্ধ হয় না।

সত্যং শৌচং মনঃ শৌচং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
সর্ব্বভূতে দয়া শৌচং জল-শৌচঞ্চ পঞ্চমম্ ॥
গরুড়পুরাণে ১১৩ অধ্যায়ে ৩৮।

(৭) আত্ম জ্ঞানং সমারম্ভস্তিতিক্ষা ধর্ম্মনিত্যতা।
যমর্থান্নাপকর্ষন্তি সবৈ পণ্ডিত উচ্যতে ॥
উদ্যোগ পর্ব্বণি ৩২ অধ্যায়ে ২০।

গুরু। ধর্ম্ম।

শিষ্য। শুচি কে?

গুরু। এ জগতে যাহার মন শুদ্ধ।

শিষ্য। পণ্ডিত কে?

গুরু। বিবেকী।

শিষ্য। বিষ কি?

গুরু। গুরুতে অবজ্ঞা।

কিং সংসারে সারং বহুসো বিচিন্ত্যমানমিদমেব।
মনুজেষু দৃষ্টতত্ত্বং স্বপরহিতায়োদ্যতং জন্ম (৮) ॥৫॥

শিষ্য। সংসারে সার কি?

গুরু। বারম্বার চিন্তা করিয়া এই সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে, যে ব্যক্তির জন্ম আপন ও পরের হিতে উদ্যত ও যিনি সমস্ত তত্ত্ব জানিয়াছেন, সেই ব্যক্তিই সার; অর্থাৎ সাধুই জগতের সারবস্তু।

মদিরেব মোহজনকঃ কঃ স্নেহঃ (৯) কেচ-দস্যবো বিষয়াঃ (১০)। কা ভববল্লী তৃষ্ণা (১১) কো বৈরী যস্ত্বনুদ্যোগঃ (১২) ॥ ৬ ॥

শিষ্য। মদিরার ন্যায় মোহজনক কে?

গুরু। স্নেহ।

শিষ্য। দস্যু কে?

গুরু। বিষয়সমূহ।

শিষ্য। সংসারের লতা কি?

গুরু। তৃষ্ণা।

শিষ্য। শত্রু কে?

---

(৮) স্বদেহে পরদেহে চ সুখদুঃখেন নিত্যশঃ।
বিচারজ্ঞো ভবেদ্ যস্তু সমুচ্চোর্ত্তৈমসা ধ্রুবম্ ॥
বরাহপুরাণে ২১৩ অ ৩২।

ন হি প্রাণাৎ প্রিয়তরং লোকে কিঞ্চ ন বিদ্যতে।
তস্মাদ্দয়াং নরঃ কুর্য্যাদ্ যথাত্মনি তথা পরে ॥
অনুশাসন পর্ব্বণি ১১৬ অধ্যায়ে ১২।

(৯) স্নেহানুবন্ধো বন্ধূনাং মুনেরপি সুদুস্ত্যজঃ॥
ভাগবতে ১০ স্কন্ধে, ৪৭ অধ্যায়ে ৫।

"স্নেহপাশসিতোমূঢ়ো ন স মোক্ষায় কল্পতে।
শান্তিপর্ব্বণি ২৮৮ অধ্যায়ে ৬।

স্নেহপাশ-বদ্ধ মূঢ়ব্যক্তি কখনও মোক্ষলাভ করিতে পারে না।

(১০) বিষং বিষয় বৈষম্যং ন বিষং বিষমুচ্যতে।
জন্মান্তরঘ্নাবিষয়া একদেশহরং বিষং॥
যোগবাশিষ্ঠে বৈরাগ্য-প্রকরণে ২৯ সর্গে ১৩।

বিষকে বিষ বলা যায় না, কিন্তু বিষয় বৈষম্যকে বিষ বলে; কারণ বিষ এক জন্ম নষ্ট করে, কিন্তু বিষয় জন্ম-জন্মান্তরকে নষ্ট করিয়া থাকে।

তজ্জন্য শ্রীচৈতন্যদেব কহিয়াছিলেন—
আকারাদপি তে ভব্যং স্ত্রীণাং বিষয়িণামপি।
যথা হের্ম্মনসঃ ক্ষোভস্তথা তস্যাকৃতেরপি ॥
চৈতন্যচরিতামৃতে মধ্য খণ্ডে, ১১ পরিচ্ছেদে ৯।

সর্পের আকার যেরূপ মনের ক্ষোভ উৎপাদন করে, তদ্রূপ স্ত্রীলোক ও বিষয়ীর আকার দেখিয়াও ভয় করিবে।

আপাতরম্যা বিষয়াঃ পর্য্যন্ত পরিতাপিনঃ॥
ভারবি, ১১ সর্গে ১২।

(১১) তৃষ্ণাতন্তুলবপ্রোতং জীবসঞ্চয়মৌক্তিকং।
যোগবাশিষ্ট বৈরাগ্য প্রকরণে ২৯ সর্গে ১৯।

তৃষ্ণারূপ সূত্রে গ্রথিত জীবসকল মুক্তার ন্যায়। তজ্জন্য তৃষ্ণা ত্যাগ করা কর্ত্তব্য।

যা দুস্ত্যজা দুর্ম্মতিভির্যান জীর্য্যতি জীর্য্যতঃ।
যো সৌ প্রাণান্তিকো রোগস্তাং তৃষ্ণাং ত্যজতঃ সুখম্ ॥

বিষ্ণুপুরাণে ৪ অংশে ১০ অধ্যায়ে ১২। ১০। মহাভারতে আদিপর্ব্বণি ৮৫ অধ্যায়ে ১৫। শান্তিপর্ব্বণি ২৭৫ অ ১২। অনুশাসনিকে ৭ অ ২২।

দুর্ম্মতি ব্যক্তিগণের যাহা দুস্ত্যজ্য, পুরুষ জীর্ণ হইলেও যাহা জীর্ণ হয় না, যাহা জীবগণের প্রাণান্তিক রোগ সেই তৃষ্ণাকে ত্যাগ করিতে পারিলেই সুখ।

এতদ্ভিন্ন যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণে বৈরাগ্য-প্রকরণে ১৭ সর্গে ও তাঁহার প্রণীত 'বৈরাগ্যশতকে' তৃষ্ণা দোষ বিশেষ, বর্ণিত আছে।

(১২) "উদ্যোগিনং পুরুষসিংহমুপৈতি লক্ষ্মী
দৈবেন দেয়মিতি কাপুরুষা বদন্তি।"
ঘটকর্পর-নীতিসারে ১৩।

গুরু। অনুদ্‌যোগ, অর্থাৎ উদ্‌যোগশূন্যতা।

কস্মাদ্ভয়মিহ মরণাৎ (১৩) দন্ধাদপি কো বিশিষ্যতে রোগী (১৪)। কঃ শূরো যো ললনা-লোচনবাণৈর্ন ব্যথিতঃ (১৫) ঃ ৭ ॥

শিষ্য। এ সংসারে কাহা হইতে ভয় পাওয়া যায়?

গুরু মরণ হইতে।

শিষ্য। অন্ধ হইতে বিশেষ কে?

গুরু। রোগী।

শিষ্য। শূর কে?

গুরু। যে ললনা-লোচন-বাণে না ব্যথিত হয়।

পাতুং কর্ণাঞ্জলিভিঃ কিমমৃতমিব যুজ্যতে সদুপদেশঃ (১৬)। কিং গুরুতায়া মূলং যদেতদ্ প্রার্থনং নাম (১৭) ॥ ৮ ॥

শিষ্য। কর্ণরূপ অঞ্জলিদ্বারা অমৃতের ন্যায় কি পান করার যোগ্য?

গুরু। সদুপদেশ।

শিষ্য। গুরুতার মূল কি?

গুরু। অপ্রার্থনা।

কিং গহনং স্ত্রীচরিতং (১৮) কশ্চতুরো যো ন খণ্ডিতস্তেন (১৯)। কিং দারিদ্র্যমতোষঃ (২০) কিং লাঘবমগুধনপরা যাচ্ঞা (২১) ॥ ৯ ॥

উদ্‌যোগং সাহসং ধৈর্য্যং বুদ্ধিঃ শক্তিঃ পরাক্রমঃ।
ষড়্‌বিধো যস্য উৎসাহ-স্তস্য দেবোঽপি শঙ্কতে ॥
গরুড়পুরাণে ১১১ অধ্যায়ে ৩২ ॥

(১৩) স্বদুঃখাচ্চ স্বমৃত্যোশ্চত্রসন্তে প্রাণিনঃ সদা।
শান্তিপর্ব্বণি ২৮৬ অধ্যায়ে।

প্রাণিগণ সর্ব্বদা দুঃখ ও মৃত্যু হইতে ভয় পায়।

(১৪) আরোগ্যাচ্চ শরীরস্য স পুনর্বিন্দতে শ্রিয়ম্।
শান্তিপর্ব্বণি ২২৭ অধ্যায়ে ৪ ॥

শরীর রোগহীন হইলে মনুষ্য লক্ষ্মী লাভ করে।

"রোগীচিরপ্রবাসী-পরান্নভোজী পরবাসশায়ী চ।
যজ্জীবতি তন্মরণং যন্মরণং সোঽস্য বিশ্রামঃ ॥"

(১৫) কান্তাকটাক্ষ বিশিখা ন খনন্তি যস্য
চিত্তং ন নির্দহতি কোপকৃশানুতাপঃ।
কর্ষন্তি ভূরিবিষয়াশ্চ ন লোভ-পাশা
লোকত্রয়ং জয়তি কৃৎস্নমিদং স বীরঃ ॥
ভর্তৃহরিঃ নীতিশতকে ৭৬ ॥

স্ত্রীর কটাক্ষবাণ যাহার চিত্ত না খনন করে, কোপ-রূপ অগ্নি-তাপ যাহার চিত্তকে না দাহ করে, অত্যন্ত বিষয় ও লোভ-পাশ যাহার চিত্ত না আকর্ষণ করে, সেই বীর সমস্ত ত্রিলোক জয় করে।

(১৬) সদা সন্তোঽভিগন্তব্যা যদ্যপ্যপদিশন্তি ন।
যা হি স্বৈর কথাস্তেষামুপদেশা ভবন্তি তাঃ ॥
যোগবাশিষ্ঠে নির্ব্বাণ-প্রকরণে।

সর্ব্বদা সাধুর নিকট গমন করিবে, যদ্যপি তাঁহারা উপদেশ না দেন, তাহা হইলেও তাঁহাদের যে স্বাভাবিক কথা, তাহাই আমাদের উপদেশ স্বরূপ হয়।

পরিচরিতব্যাঃ সন্তো যদ্যপি কথয়ন্তি ন সদুপদেশম্।
যা স্তেষাং স্বৈরঃ কথাস্তা এব ভবন্তি শাস্ত্রাণি ॥
ভর্তৃহরিঃ নীতিশতকে ১০৭।

(১৭) স্বর্গঃ কিং যদি বল্লভা নিজবধূঃ কিংবা বিভূষাবিধিঃ?
লাবণ্যং যদি কিং সুধাকরকরৈঃ শৃঙ্গারগর্ভাগিরঃ?
মৃত্যুঃ কিং যদি দুর্জ্জনেষবনতিঃ? কিং ধিক্ যদি প্রার্থনা? প্রাপ্তেষ্টঃ করিকৈতবো যদি ভবেৎ কিং কল্প-ভূমিরুহৈঃ? "———প্রার্থনা বিষম্"।
বনপর্ব্বণি ৩১২ অধ্যায়ে ৮৪। সপ্তরত্নং।

প্রভবো নাধিগন্তব্যঃ স্ত্রীণাং দুশ্চরিতস্য চ ॥
উদ্‌যোগপর্ব্বণি ৭৪ অ, ৭৩ ॥

(১৮) নাসাং কশ্চিদ্ গম্যোঽস্তি নাসাং বয়সি নিশ্চয়ঃ।
বিরূপং রূপবন্তং বা পুমানিত্যেব ভুঞ্জতে ॥
অনুশাসন পর্ব্বণি ৩৮ অধ্যায়ে ১৭।

এইরূপ স্ত্রী-চরিত্র ঐ অধ্যায়ে অনেক বর্ণিত আছে—তদ্ভিন্ন যোগবাশিষ্ঠ, রামায়ণে 'স্ত্রীজুগুপ্সা' নামে ২১ অধ্যায়ে ও ভর্তৃহরি প্রণীত 'স্ত্রীগর্হন' নামের প্রবন্ধে স্ত্রীচরিত্র বিশেষ বর্ণিত আছে।

(১৯) "স্ত্রীভিঃ কস্য ন খণ্ডিতং ভুবিমনঃ———"।
গরুড়পুরাণে ১০৯ অধ্যায় ১৮ ॥

(২০) স্বৈরথৈঃ পরিসন্তুষ্টাস্তে নরাঃ স্বর্গগামিনঃ ॥
অনুশাসনপর্ব্বণি, ১৪৪ অধ্যায়ে ৩৫ ॥

শিষ্য। গহন কি?

গুরু। স্ত্রীচরিত্র।

শিষ্য। চতুর কে?

গুরু। যে স্ত্রীচরিত্রদ্বারা খণ্ডিত না হয়।

শিষ্য। দারিদ্র্য কি?

গুরু। অসন্তোষ।

শিষ্য; লাঘব কি?

গুরু। অন্যধনাশায় যাচ্ঞা।

কিং জীবিতমনবদ্যং (২২) কিং জাড্যং পাটবেপ্যনভ্যাসঃ (২৩)। কো জাগর্ত্তি বিবেকী কা নিদ্রা মূঢ়তা জন্তোঃ ॥ ১০ ॥ (২৪)

শিষ্য। কোন্ জীবন শ্রেষ্ঠ?

গুরু। অনিন্দ্য।

শিষ্য। জড়তা কি?

গুরু। কার্য্যে অপটুতা।

শিষ্য। কে জাগে?

গুরু। বিবেকী।

শিষ্য। কি নিদ্রা?

গুরু। জীবের মূঢ়তা।

নলিনীদলগতজলবৎতরলং কিং যৌবনং ধনং চায়ুঃ। (২৫) কে শশধরকরনিকরানুকারিণঃ সজ্জনা এব ॥ ১১ ॥ (২৬)

তস্মাৎ সন্তোষমেবেহধনং পশ্যন্তি পণ্ডিতাঃ।

শান্তিপর্ব্বণি ৩৩০ অধ্যায়ে ২১।

নাস্তিবাঞ্ছত্যসংপ্রাপ্তং প্রাপ্তং ভুঙ্‌ক্তে যথাক্রমম্।
যঃ স সৌম্য সদাচারঃ সন্তুষ্ট ইতি কথ্যতে ॥

যোগবাশিষ্ঠে মুমুক্ষু প্রকরণে।

ঈর্ষী ঘৃণীত্বসন্তুষ্টঃ ক্রোধনো নিত্যশঙ্কিতঃ।
পরভাগ্যোপজীবী চ ষড়েতে নিত্যদুঃখিতাঃ ॥

উদ্‌যোগপর্ব্বণি ৮২ অধ্যায়ে ৮৯।

(২১) মুখভঙ্গ স্বরোদীনো গাত্রস্বেদো মহদ্ভয়ম্।
মরণে যানিচিহ্নানি তানিচিহ্নানি যাচতঃ।

গরুড়পুরাণে ১১৫ অধ্যায়ে ৭৭।

জগৎ পতির্হি যাচিত্বা বিষ্ণুর্বামনতাং গতঃ।
কোন্যোঽধিকতরস্তস্য যোঽর্থী যাতি ন লাঘবম্ ॥

ঐ ঐ, ৭৯।

(২২) "———অপযশো যদ্যস্তি কিং মৃত্যুনা ॥"

ষড়্‌রত্নং।

মা জীবন্ যঃ পরাবজ্ঞা দুঃখদগ্ধোপি জীবতি।
তস্যা জননিরেবাস্তু জননী ক্লেশকারিণঃ ॥

মাঘঃ ২ সর্গে ৪৫।

সাধ্বী স্ত্রীণাং দয়িতবিরহে মানিনাং মানভঙ্গে
সল্লোকানামপি জনরবে নিগ্রহে পণ্ডিতানাম্।
ন্যোগ্রকে কুটিলমনসাং নির্গুণানাং বিদেশে
ভৃত্যাভাবে ভবতি মরণং কিন্তু সম্ভাবিতানাম্।

বররুচিঃ নীতিরত্নে।

অকীর্ত্তি জীবিতং হন্তি জীবতোঽপি শরীরিণঃ ॥

বনপর্ব্বণি ২৯৯ অধ্যায়ে ২২।

(২৩) ধৃতির্দ্দাক্ষ্যং সংযমোবুদ্ধিরাত্মা ধৈর্য্যং শৌর্য্যং দেশকালা প্রমাদঃ। অল্পস্য বা বহুশো বা বিবৃদ্ধৌ ধনস্যৈতন্যষ্ট সমিন্ধনানি ॥

শান্তিপর্ব্বণি ১২০ অধ্যায়ে ৩৭।

নিরামর্ষং নিরুৎসাহং নির্বীর্য্যমরিনন্দনম্।
মাস্ম সিমন্তিনী কাচিৎ জনয়েৎ পুত্রমীদৃশম্ ॥

উদ্‌যোগপর্ব্বণি ১৩২ অ, ৩১।

(২৪) যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী।
যস্যাং জাগ্রতিভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ ॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং ২ অ, ৬৬।

(২৫) অনিত্যং যৌবনং রূপং জীবিতং রত্ন-সঞ্চয়ঃ।
ঐশ্বর্য্যং প্রিয় সম্বাসো গৃধ্যেৎ তত্র ন পণ্ডিতঃ ॥

বনপর্ব্বণি ২ অ ৪৬।

অস্থিরং জীবিতং লোকে অস্থিরং ধন-যৌবনম্ ॥

গরুড়ে ২১৫ অধ্যায়ে ২৬।

শরীরমধ্রুবং লোকে সর্ব্বেষাং প্রাণিনামিহ ॥

বনপর্ব্বণি ২০০ অধ্যায়ে ২৪।

অহোহ্যনিত্য-মানুষ্যং জলবুদ্বুদচঞ্চলম্ ॥

দ্রোণপর্ব্বণি ৭৮ অধ্যায়ে।

অনিত্যং যৌবনং রূপং জীবিতং দ্রব্য-সঞ্চয়ঃ।
আরোগ্যং প্রিয় সম্বাসো গৃধ্যেত্তেষু ন পণ্ডিতঃ ॥

স্ত্রীপর্ব্বণি ২ অ, ২৫

শিষ্য। নলিনীদলগত জলের ন্যায় তরল কি ?

গুরু। যৌবন, ধন ও আয়ু।

শিষ্য। চন্দ্রের কিরণসমূহের অনুকারী কাহারা ?

গুরু। সজ্জনগণ।

কোনরকঃ পরবশতা (২৭) কিং সৌখ্যং সর্ব্বসঙ্গবিরতির্যা। (২৮) কিং সাধ্যং ভূতহিতং (২৯) কিমুপ্রিয়ং প্রাণিনামশবঃ॥ ১২॥ (৩০)

শিষ্য। নরক কি ?

গুরু। পরবশতা।

শিষ্য। সুখ কি ?

গুরু। সর্ব্বাসক্তি-বিরতি।

শিষ্য। সাধ্য (কর্ত্তব্য) কি ?

গুরু। প্রাণীর হিত।

শিষ্য। প্রিয় কি ?

গুরু। জীবের প্রাণ।

কিং দানমনাকাঙ্ক্ষং (৩১) কিং মিত্রং যন্নিবর্ত্তয়তি পাপাৎ॥ ১৩॥ (৩২)

২৫। শান্তিপর্ব্বণি ২০৫ অ ৪। ঐ ৩৩০ অ ১৪।
সম্পদঃ স্বপ্ন সংকাশং যৌবন কুসুমোপমম্।
তড়িচ্চপল মায়ুশ্চ কস্য স্যাৎ জানতো ধৃতিঃ॥
কুলার্ণবে প্রথমোল্লাসে। গারুড়ে প্রেতখণ্ডে ৪১৫ অ ১৩
অহোরাত্রাণি গচ্ছন্তি সর্ব্বেষাং প্রাণিনামিহ।
আয়ূংষি ক্ষপয়ন্ত্যাশু গ্রীষ্মে জলমিবাংশবঃ॥
বাল্মীকিয়ে রামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে ১০৫ সর্গে ২০।
চলপত্রান্তলগ্নাম্বুবিন্দুবৎ ক্ষণ ভঙ্গুরম্।
আয়ুস্ত্যজত্য বেলায়াং কস্তত্র প্রত্যয়স্তব॥
অধ্যাত্মরামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে ৭ সর্গে ১০২।
(২৬) উদারগুণযুক্তা যে বিহরন্তীহদেহিনঃ।
ধরাতলেন্দবঃ সঙ্গাত্তু শং শীতলয়ন্তি তে॥
যোগবাশিষ্ঠে উৎপত্তিপ্রকরণে ৭ সর্গে ৬৯।
(২৭) সর্ব্বং পরবশং দুঃখং সর্ব্বমাত্মবশং সুখম্॥
গরুড়পুরাণে ১১৩ অধ্যায়ে ৬১। মনুঃ ৪ অ ১৬০।
পরেদায়ত্ততা কৃচ্ছ্রং কিন্নু দুঃখতরং ততঃ॥
বনপর্ব্বণি ১৯৩ অধ্যায়ে ১৮।
দুঃখী যতঃ পরাধীনঃ সদৈবাত্মবশঃ সুখী॥
স্কন্দপুরাণে কাশীখণ্ডে পূর্ব্বভাগে ৩৫ অ, ২৯।
"—জীবনং যস্য পরস্য সেবা।"
গরুড়ে ১১৫ অধ্যায়ে ৫।
"সেবাং লাঘবকারিণীং কৃতাধিয়ঃ স্থানেশ্বৃত্তিং বিদুঃ।
মুদ্রারাক্ষস নাটকে ৩ অঙ্কে।
(২৮) বহুভির্যোগে বিরোধো রাগাদিভিঃ কুমারী শঙ্খবৎ।
সাংখ্যদর্শনে ৪ অধ্যায়ে ৯ সূত্রে।

সঙ্গঃ সর্ব্বাত্মনাত্যাজ্যঃ সচেৎ ত্যক্তুং ন শক্যতে।
স সদ্ভিঃ সহ কর্ত্তব্যঃ সতাং সঙ্গো হি ভেষজম্॥
মার্কণ্ডেয় পুরাণে ৩৭ অধ্যায়ে ২৩।
তস্মাৎ সঙ্গং প্রযত্নেন মুমুক্ষুঃ সন্ত্যজেন্নরঃ॥
ঐ ৩৯ অধ্যায়ে ৩।
বাসে বহুনাং কলহো ভবেৎ বার্ত্তাদ্বয়োরপি।
এক এব চরেৎ তস্মাৎ কুমার্য্যা ইব কঙ্কণম্॥
শ্রীভাগবতে ১১ স্কন্ধে ৯ অধ্যায়ে ১০।
বহুনাং কলহো নিত্যং দ্বয়ো সং কথনং ধ্রুবং।
একাকীবিচরিষ্যামি কুমারী সংখ্যকো যথা॥
শান্তিপর্ব্বণি ১৭৮ অ, ১৩।
(২৯) পদ্মাকরং দিনকরো বিকচীকরোতি
চন্দ্রো বিকাশয়তি কৈরব চক্রবালম্।
নাভ্যর্থিতোঽপি জলদঃ সলিলং দদাতি
সন্তঃ স্বয়ং পরহিতেষু কৃতাভিযোগা॥
ভর্ত্তৃহরি নীতিশতকে।
এতাবৎ জন্মসাফল্যং দেহীনামিহদেহেষু।
প্রাণৈরর্থৈর্ধিয়াবাচা শ্রেয় এব চরেৎ সদা॥
শ্রীভাগবতে ১০ স্কন্ধে ২২ অধ্যায়ে ৩৫।
সন্মার্গনিরতং মর্ত্ত্যং সর্ব্বভূতহিতে রতম্।
দ্রষ্টুমিচ্ছন্তিবিবুধা উৎকৃষ্ট গুণ লোলুপাঃ॥
বৃহন্নারদীয়ে পুরাণে ১৩ অ, ১৭।
(৩০) ন হি প্রাণাৎ প্রিয়তরং লোকে কিঞ্চনবিদ্যতে।
অনুশাসনিকে পর্ব্বণি ১১৬ অ, ১২।
সর্ব্বেষামপিভূতানাং নৃপ স্বাত্মৈব বল্লভঃ।
ইতরেঽপত্য বিত্তাদ্যাস্তদ্ বল্লভতয়ৈব হি॥
দশম স্কন্ধে ১৪ অধ্যায়ে।
ন চাত্মনঃ প্রিয়ঃ কশ্চিৎ শর্ব্ব। সর্ব্বেষু বস্তুষু॥
ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে ব্রহ্মখণ্ডে ৯ অধ্যায়ে ৮৫।

শিষ্য। দান কি ?

গুরু। আকাঙ্ক্ষাশূন্য (নিঃস্বার্থ) দান।

শিষ্য। মিত্র কে ?

গুরু। যে পাপকার্য্য হইতে নিবৃত্ত করে।

কোলঙ্কারঃ শীলং (৩৩) কিং বাচাং মণ্ডনং সত্যম্। (৩৪) কিমনর্ঘফলং মানং (৩৫) সুসঙ্গতিঃ কা সুখাবহা মৈত্রী ॥ ১৪ (৩৬)

শিষ্য। অলঙ্কার কি ?

গুরু। শীল (চরিত্রবত্তা)।

শিষ্য। বাক্যের ভূষণ কি ?

গুরু। সত্য।

শিষ্য। অমূল্য ফল কি ?

গুরু। মান।

শিষ্য। সুসঙ্গতি কি ?

গুরু। সুখকরী মিত্রতা।

সর্ব্বব্যসনবিনাশে কোঽদক্ষঃ সর্ব্বথা পরিত্যাগী। (৩৭) কোঽন্ধো যোঽকার্য্যরতঃ (৩৮) কো বধিরো যঃ শৃণোতি ন হিতানি ॥১৫॥ (৩৯)

শিষ্য। সকল দুঃখ নাশে কে দক্ষ ?

বৃহদারণ্যকোপনিষদি ৪ অধ্যায়ে ৪র্থ ব্রাহ্মণে মনুষ্যের আত্মাই প্রিয়, বিশেষ বর্ণিত আছে, পুনরাবৃত্তি করা নিষ্প্রয়োজন (হিন্দু-পত্রিকা প্রথম বর্ষের ৭৪—৭৬ পৃষ্ঠা)

আত্মার্থত্বেন সর্ব্বস্য প্রীতেশ্চাত্মাঽতি প্রিয়ঃ ॥

পঞ্চদশী ব্রহ্মানন্দে আত্মানন্দ ২৭।

(৩১) দাতব্যমিতি যদ্দানং দীয়তেঽনুপকারিণে।
দেশে কালে চ পাত্রে চ তদ্দানং সাত্ত্বিকং বিদুঃ ॥
যত্তু প্রত্যুপকারার্থং ফলমুদ্দিশ্য বা পুনঃ।
দীয়তে চ পরিক্লিষ্টং তদ্দানং রাজসং স্মৃতম্ ॥

শ্রীভগবদ্ গীতায়াং ১৭ অধ্যায়ে ২০—২১।

(৩২) "স বন্ধুর্যোহিতে যুক্তঃ————"

গরুড়ে ১০০ অধ্যায়ে ১৫।

"————মিত্রেণ কিং ব্যসনকালপরাঙ্মুখেন।"

ঐ ১০৯ অধ্যায়ে ৬।

(৩৩) "————শীলং সর্ব্বস্য ভূষণম্ ॥"

গরুড়পুরাণে ১১৩ অ, ১৩।

জিতা সভা বস্ত্রবতা মিষ্টাশা গোমতাজিতা।
অধ্বাজিতো যানবতা সর্ব্বং শীলবতাজিতম্ ॥

উদ্যোগপর্ব্বণি ৩৩ অ, ৪৬ ॥

বহ্নিস্তস্য জলায়তে জলনিধিঃ কূপায়তে তৎক্ষণাৎ
মেরুঃ স্বল্পশিলায়তে মৃগপতিঃ সদ্যঃ কুরঙ্গায়তে।
ব্যালো মাল্যগুণায়তে বিষরসঃ পীযূষবর্ষায়তে
যস্যাঙ্গেঽখিল লোকবল্লভতমং শীলং সমুন্মীলতি ॥

ভর্ত্তৃহরিঃ নীতিশতকে ৮৮।

(৩৪) অশ্বমেধসহস্রঞ্চ সত্যঞ্চ তুলয়া ধৃতং।
অশ্বমেধ সহস্রাদ্ধি সত্যমেব বিশিষ্যতে ॥

আদি পর্ব্বণি ৭৪ অ, ১৩২ ॥

যস্য সত্যঞ্চ শৌচঞ্চ তস্য স্বর্গো ন দুর্ল্লভঃ।
সত্যং হি বচনং যস্য সোঽশ্বমেধাৎ বিশিষ্যতে ॥

গরুড়পুরাণে ১১৩ অ, ৩৯ ॥

তজ্জন্য আদেশ করিয়াছেন যে—
"সত্যং বদ" × × "সত্যান্নং প্রমোদিতব্যম্।"

তৈত্তিরীয়োপনিষদি একাদশোঽনুবাকঃ।

এ ভিন্ন শান্তিপর্ব্বে ১৯৯ অধ্যায়ে ৬১—৭০ শ্লোক পর্য্যন্ত সত্য-প্রশংসা বর্ণিত আছে।

(৩৫) ন হি মানপ্রদগ্ধানাং কশ্চিদস্তি সমঃ ক্বচিৎ ॥

উদ্যোগপর্ব্বণি ১২২ অ, ১৭।

অধমাধনমিচ্ছন্তি ধনমানৌ হি মধ্যমাঃ।
উত্তমা মানমিচ্ছন্তি মানো হি মহতাং ধনম্ ॥

গারুড়ে ১১৫ অ, ১৩।

যস্মিন্ দেশে ন সম্মানং ন প্রীতির্ন চ বান্ধবাঃ।
ন চ বিদ্যাগমঃ কশ্চিৎ তং দেশং পরিবর্জ্জয়েৎ ॥

গারুড়ে ১০৯—২০।

জীবিতং মানমূলং হি মানে ম্লানে কুতঃ সুখম্ ॥

গারুড়ে ১১৫—৪০।

(৩৬) শোকত্রাণং ভয়ত্রাণং প্রীতি-বিশ্বাসভাজনম্।
কেন রত্নমিদং সৃষ্টং মিত্রমিত্যক্ষরদ্বয়ম্ ॥

গারুড়ে ১১৪ অধ্যায়ে ২ ॥

(৩৭) সর্ব্বত্যাগে চ যততে দৃষ্ট্বা লোকং ক্ষয়াত্মকং।
ততো মোক্ষে প্রযততে নানুপায়াদুপায়তা ॥

বনপর্ব্বণি ২০৮ অ, ৫১।

নাস্তিবিদ্যা সমং চক্ষুর্নাস্তিবিদ্যা সমং বলম্।
নাস্তিরাগসমং দুঃখং নাস্তি ত্যাগসমং সুখম্ ॥

শান্তিপর্ব্বণি ২৭৬ অ, ৩৫ ॥

গুরু। সর্ব্বত্যাগী।
শিষ্য। অন্ধ কে?
গুরু। যে অকার্য্যে রত।

শিষ্য। বধির কে?
গুরু। যে হিত বাক্য না শুনে।

(ক্রমশঃ)
শ্রীবিধুভূষণ দেব
রাঁচি।

ন ধনেন ভবেন্মোক্ষো কর্ম্মণা প্রজয়ান বা।
ত্যাগমাত্রেণ কিন্ত্বেকে যতয়োঽশ্নন্তি চামৃতম্॥
যোগবাশিষ্ঠ বৈরাগ্যপ্রকরণে ১ সর্গে ১৫।

(৩৮) "——স বুদ্ধিমান্ যো ন করোতি পাপম্।
গরুড়পুরাণে ১১৫ অধ্যায়ে ৭১।
সে বুদ্ধিমান, যে পাপ না করে এবং বুদ্ধিমান ব্যক্তি জাগরিত (অথবা চক্ষু যুক্ত) পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

(৩৯) শ্রোতব্যং হিতকামানাং সুহৃদাং হিতমিচ্ছতা।
ন কর্ত্তব্যো হি নির্ব্বন্ধো নির্ব্বন্ধো হি ক্ষয়োদয়ঃ॥
উদ্‌যোগ পর্ব্বণি ১২২ অ, ২০।
"————পরেতকালে হি গতায়ুষোনরাঃ।
হিতং ন গৃহ্ণন্তি সুহৃদ্ভিরীরিতম্॥
বাল্মীকিয়ে রামায়ণে ১৬ সর্গে ২৩ (লঙ্কাকাণ্ডে)।

রাম-রাবণের যুদ্ধ।

শ্রীরামের জন্মের পূর্ব্বেই মহর্ষি বাল্মীকি রামায়ণ রচনা করেন। নব্য সম্প্রদায় এ কথা সম্পূর্ণ অলীক বিবেচনা করিয়া থাকেন। কিন্তু একটু চিন্তা করিয়া দেখিলেই দৃষ্ট হইবে যে, রামায়াণ যেরূপ অবতার-বিশেষের কার্য্যকলাপ বর্ণনায় রচিত হইয়াছে, তেমনি উহাতে নিত্য আধ্যাত্মিক সত্যও নিবদ্ধ আছে। আমাদের প্রত্যেক অবতারের এই একটি বিশেষত্ব পরিদর্শিত হয় যে, ব্যক্তিগত ভাবের অন্তরালেই সার্ব্বজনিক ভাব বিরাজিত রহিয়াছে।

পাঠক! চিন্তা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবেন যে, জীব মাত্রেই দশাননঁ। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য, দম্ভ, দ্বেষ, হিংসা ও পৈশুন্য, এই দশ বদন ব্যাদন করিয়া জীব বিশ্ব-সংসার গ্রাস করিবার জন্য সর্ব্বদাই ব্যাকুল রহিয়াছে। জীব মাত্রেরই যে কেবল দশটি মুখ, তাহা নহে, তাহার বিংশতি হস্তও আছে। কাম, ক্রোধাদির সৎ ও অসৎ, এই উভয় ব্যবহারই দৃষ্ট হয়। ধর্ম্মাবিরুদ্ধ কাম জগতের মঙ্গলদায়ক, ধর্ম্মবিরুদ্ধ কাম অশেষ অমঙ্গলের আকর। ক্রোধাদিও ঐরূপ ন্যায্য ও অন্যায্য ব্যবহারানুসারে মঙ্গল ও অমঙ্গলের কারণ হইয়া থাকে। এই কাম-ক্রোধাদির প্রত্যেকের ন্যায্য ও অন্যায্য ব্যবহারই জীবের বিংশতি হস্ত।

অজ্ঞ জীবের ভ্রাতা তমোরূপী কুম্ভকর্ণ। তমপ্রাধান্যে জীবের অহংজ্ঞান বা অহঙ্কার অধিক হয়। অহঙ্কার বৃহদাকার, এইজন্য কুম্ভকর্ণও বৃহদাকার। অহঙ্কার সর্ব্বদাই বিশ্ব-সংসার গ্রাস করিবার জন্য সচেষ্ট, এইজন্য দেব-নরাদি গ্রাস করিয়া উদর পূর্ণ করাই কুম্ভকর্ণের প্রধান কার্য্য ছিল। নিদ্রা আলস্যাদিই তমোগুণের কার্য্য, এইজন্য কুম্ভকর্ণও অধিকাংশ সময় নিদ্রিত থাকিত।

জীবদেহে পরমাত্মাবিরোধিনী একটি শক্তি আছে। ঐ শক্তিই কলহকারিণী নিকৃতিরূপিণী সূর্পনখা। ইনিই রাম ও রাবণে, জীব ও পরব্রহ্মে কলহ উপস্থিত করাইয়া দেন।

নিকৃতি যেরূপ জীব ও ব্রহ্মে বিবাদের

কারণ, জীবদেহে বিবেক সেইরূপ জীব ও ব্রহ্মের মিত্রতা সংস্থাপনের চেষ্টা পায়। বিভীষণই বিবেক। যখনই রাবণ কোন অন্যায় কার্য্যের সঙ্কল্প করিতেন, বিবেক বিভীষণ তাহাতে বাধা দিতেন। জীব মোহ বশতঃ বিবেকের উপদেশ গ্রহণ না করিয়া বিপদে পতিত হয়; রাবণেরও সেই দশা হইয়াছিল। অবশেষে বিবেক মোহান্ধ জীব কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া রামরূপ পরমাত্মায় আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল।

এই শোভন বর্ণ সুবর্ণকান্তি দেহই সুবর্ণ লঙ্কা। জীব-শরীরই লঙ্কা। জীব মাত্রেতেই দেব ও রাক্ষস ভাব, এই দুই ভাব আছে। ব্রহ্ম ও মায়া হইতে জীবের উৎপত্তি। মায়াই রাক্ষসী স্বরূপা। আমরা সাধারণ কথায়ও বলি "মায়া-রাক্ষসী"। নিকষাই মায়ারূপিনী; বিশ্রবা বা বিশ্বসই পরমাত্মা।

দেবগণ রাবণের সেবক ছিলেন। দেহস্থ ইন্দ্রিয়গণই দেবতা স্থানীয়। ইন্দ্রিয়গণ সর্ব্বদাই জীবের সেবা করিয়া থাকেন। পবন নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস রূপে দেহের বিশুদ্ধতা সম্পাদন করেন, বরুণ দেহ মার্জ্জন করেন। মনই দেহের চন্দ্র স্বরূপ। মস্তকে 'দ্বিদল' মধ্যে মনের বাস; চন্দ্রও রাবণের মস্তকে ছত্র-ধারণ করিতেন। চক্ষুই দেহে সূর্য্য স্বরূপ, দর্শন কার্য্য চক্ষুর দ্বারাই হয়, এইজন্য লঙ্কার পুরীদর্শক দ্বারপাল ছিলেন সূর্য্য। জীব সর্ব্বপ্রথম ব্রহ্মার নিকট হইতেই বেদজ্ঞান প্রাপ্ত হয়। লঙ্কার গুরুমহাশয়ও ব্রহ্মা। এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন দেবতা ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যে নিযুক্ত হওয়া দৃষ্ট হয়। ঐ সমস্ত বৃত্তান্তে আধ্যাত্মিক-রহস্য নিহিত আছে।

ব্রহ্মের চারিটি অবস্থা, জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি ও তুরীয়। কৃষ্ণ-অবতারে যেমন শ্রীকৃষ্ণ বাসুদেবাখ্য তুরীয় আত্মা, রামাবতারেও শ্রীরাম তদ্রূপ তুরীয় আত্মা। ঐরূপ জাগ্রদবস্থায় সঙ্কর্ষণাখ্য আত্মা লক্ষ্মণ, স্বপ্নাবস্থায় প্রদ্যুম্নাখ্য আত্মা শত্রুঘ্ন এবং সুষুপ্তাবস্থায় অনিরুদ্ধাখ্য আত্মা ভরত। কৃষ্ণাবতারে রুক্মিণী যেরূপ মূল-প্রকৃতি, রামাবতারে সীতাও সেইরূপ মূল-প্রকৃতি।

ইহা যে কেবল আমাদের কল্পনা, তাহা নহে, রামোত্তর-তাপনীয় শ্রুতি বলেন :—

> অকারাক্ষরসম্ভূতঃ সৌমিত্রির্বিশ্বভাবনং।
> উকারাক্ষরসম্ভূতঃ শত্রুঘ্নস্তৈজসাত্মকঃ॥
> প্রাজ্ঞাতকস্তু ভরতো মকারাক্ষরসম্ভবঃ।
> অর্দ্ধমাত্রাত্মকো রামো ব্রহ্মানন্দৈকবিগ্রহঃ॥
> শ্রীরামসান্নিধ্যবসাজ্জগদানন্দদায়িনী।
> উৎপত্তি-স্থিতি-সংহারকারিণী সর্ব্বদেহিনাম্॥
> সা সীতা ভবতি জ্ঞেয়া মূলপ্রকৃতি সংজ্ঞিতা।
> প্রণবত্বাৎ প্রকৃতিরিতি বদন্তি ব্রহ্মবাদিনঃ॥
>
> রামোত্তর-তাপনীয়।

ভাষ্যকার নারায়ণ উক্ত শ্রুতির ব্যাখ্যা করেন যে, প্রণব ষড়াক্ষর সম্ভূত, যথা অ, উ, ম, অর্দ্ধমাত্রা, বিন্দু ও নাদ। এই ষড়াক্ষরের প্রথম অক্ষর অ জাগ্রৎ-অভিমানী সঙ্কর্ষণ লক্ষ্মণ। দ্বিতীয়াক্ষর উ তৈজসাত্মক স্বপ্নাভিমানী প্রদ্যুম্ন শত্রুঘ্ন। তৃতীয়াক্ষর মকার প্রাজ্ঞাত্মক সুষুপ্তাভিমানী অনিরুদ্ধাখ্য ভরত। তুরীয়াবস্থায় ব্রহ্ম কৃষ্ণাখ্য রাম। বিন্দু ও নাদই মূল প্রকৃতি সীতা রুক্মিণী। এই মূল প্রকৃতিই পরমা বিদ্যা।

রামায়ণে বর্ণিত আছে, সীতা ভূমি হইতে উত্থিত হন, ইহার তাৎপর্য্য এই যে, পৃথিবী সমস্ত ধর্ম্মের আধার স্বরূপা। চিত্ত-শুদ্ধি না হইলে বিদ্যা লাভ হয় না এবং শাস্ত্র বিহিত যজ্ঞাদি কার্য্য না করিলে, চিত্ত-শুদ্ধিও হয় না, এজন্যই যজ্ঞ-ভূমি কর্ষণে সীতার জন্ম হয়। পরমযোগী জনক রাজর্ষি যজ্ঞাদি বিহিত কর্ম্ম-অনুষ্ঠানে

করিয়া সাধন বলে জ্ঞানস্বরূপা সীতাকে লাভ করিয়াছিলেন এবং সেই জ্ঞানের সাহায্যেই পরমাত্মা শ্রীরামকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

রামচন্দ্র বনে গমন করিয়া পঞ্চবটীতে বাস করিয়াছিলেন। যামল-বচনে দৃষ্ট হয় যে, নিম্ব, আমলক, শ্রীফল, বট, অশ্বথ, এই পঞ্চবট যোগীদিগের যোগসিদ্ধি প্রদান করে। যে স্থানে যোগীগণ নিয়ত যোগভ্যাস করেন, সেই স্থানেই যোগীর ধন ভগবান বিরাজমান।

রামচন্দ্র পঞ্চবটী হইতে অন্য স্থানে গমন করিলেই সীতা তত্ত্ববিরোধী মোহরূপ রাবণ কর্ত্তৃক অপহৃতা হইয়াছিলেন; অর্থাৎ যোগী যোগমার্গে সিদ্ধি প্রাপ্ত হইলেও পরমাত্মার সহিত তাঁহার সামান্য বিচ্ছিন্ন ভাব ঘটিলেই জ্ঞান অপহৃত হয়। রাবণ সন্ন্যাসীর বেশে সীতাকে অপহরণ করিয়াছিলেন, উহার তাৎপর্য্য এই যে, যে ব্যক্তির হৃদয়ে বিষয়-বাসনা প্রবল, সে ব্যক্তি সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করিয়া কেবল জ্ঞান অপহরণ করে মাত্র।

যোগের প্রধানতঃ ছয়টি অঙ্গ, যথা—আসন, প্রত্যাহার, প্রাণায়াম, ধ্যান, ধারণা, সমাধি। ইহারাই জ্ঞান প্রাপ্তির সাহায্য করিয়া থাকে। সুগ্রীবাদি প্রধান ছয় কপি এই ষড়ঙ্গ যোগ। ইহারাই জ্ঞানরূপা সীতার উদ্ধারের সাহায্য করিয়াছিলেন। সুগ্রীব রামের মিত্র, তাহাতে ও রামে অভেদাত্মা ছিল; সমাধি অবস্থায়ও জীব ও ব্রহ্মে অভেদাবস্থা হয়। সুগ্রীবই সমাধি-যোগ। আসন আয়ত্ত করিতে না পারিলে, কেহ যোগসাধনে মনঃ স্থির করিতে পারে না; মনঃস্থৈর্য্য-সাধকত্বহেতু উহাই যোগীর ভব-সমুদ্র উত্তীর্ণ হইবার সেতু স্বরূপ। নলই আসন স্থানীয়, তিনিই সেতু প্রস্তুত করিয়াছিলেন। প্রত্যাহার দ্বারা মোহাদি দমন করা যায়, এইজন্ত প্রত্যাহারস্থানীয় নীল দশাননের কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ আদি দশ শিরে পদাঘাত করিয়াছিলেন। হনুমান প্রাণায়াম স্থানীয়। প্রাণায়াম দ্বারাই জন্ম-মৃত্যুরূপ ভব সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া মানব জ্ঞান-পদবী দর্শন করিতে পারেন। হনুমানও শত-যোজন-পরিমাণ সমুদ্র পার হইয়া জ্ঞানরূপা সীতার দর্শন পাইয়াছিলেন। প্রণবের আকার অঙ্গুরীয়কের ন্যায়। প্রণবই পরমাত্মার নিজস্ব বস্তু। যে ব্যক্তি প্রাণায়াম দ্বারা প্রণব-জপ সাধন করিতে পারেন, তিনি ভগবানের নিজ জন হন। এই জন্য সীতাদেবী হনুমানের নিকট শ্রীরামচন্দ্রের অঙ্গুরীয়ক দর্শনে তাহাকে রামের নিজ জন বলিয়া জানিতে পারিয়াছিলেন। অপিচ, বায়ুসাধনার ফলই প্রাণায়ামতত্ত্ব, তাই হনুমানও পবন-নন্দন! অঙ্গদ ধারণাস্থানীয়। যে ব্যক্তির ধারণাশক্তি হইয়াছে, মোহাদি তাহার নিকট সতত তিরস্কৃত ও লাঞ্ছিত হইয়া থাকে, এই জন্য অঙ্গদ কর্ত্তৃক রাবণ মুকুটচ্যুত ও তিরস্কৃত হইয়াছিলেন।

সুষেণ ধ্যান স্বরূপ। ধ্যান-পরায়ণ যোগী কখনও কোন রোগাক্রান্ত হন না। এই জন্য সুষেণই রামায়ণে বৈদ্য বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। ধ্যান-যোগ মহৌষধেই ভবরোগ নিবারিত হয়।

চিন্তা করিয়া দেখিলে উপলব্ধি হইবে যে, রামায়ণে সর্ব্বত্রই অধ্যাত্ম-তত্ত্ব ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, বিভীষণ বিবেক-স্থানীয়। জীবের লঙ্কারূপ-দেহে যেমন মোহ বাস করে, সেইরূপ বিবেকও বাস করেন। তাহারা এক স্থানে বাস করিয়াও সর্ব্বদা শত্রুভাবাপন্ন। মোহাদির লক্ষ্য কেবল বিষয়, বিবেকের লক্ষ্য পরমাত্মা। বিবেক সর্ব্বদাই পীড়িত হইয়া থাকেন; কিন্তু বিবেক দ্বারা

জীব পরমাত্মার আশ্রয়গ্রহণ করিতে পারিলে আর মোহাদি তাহার কোন অনিষ্ট করিতে পারে না। রাবণ সর্ব্বদাই পাপকার্য্যে লিপ্ত ছিল, বিভীষণ তাহাকে সর্ব্বদাই সৎ পরামর্শ দিতেন, রাবণ তাহাতে কর্ণপাতও করিত না। অবশেষে বিভীষণ রাবণের অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া পরমাত্মা রামের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া তাহা হইতে নিষ্কৃতি পান।

সুমতি বিবেকের পত্নী, বিবেকদ্বারা পরিচালিত হইয়া সর্ব্বদা সুমতি জ্ঞানের সেবা করিয়া থাকেন। বিভীষণ-পত্নী সুমতি সরমাও অশোকবনে সীতার পরিচর্য্যা করিয়াছিলেন। সুমতি যেরূপ জ্ঞানের পরিচর্য্যা করেন, কুমতি ঈর্ষা, অসূয়া প্রভৃতিও সেইরূপ জ্ঞানকে কুপথাভিমুখে পরিচালিত করিবার চেষ্টা করে। অশোকবনে চেড়ীগণও সীতাকে সেইরূপ রাবণের বশে আনিবার জন্য বিবিধ চেষ্টা করিয়াছিল।

যোগসাধনদ্বারাই মোহাদি নষ্ট হয়। বানরগণই রাক্ষসগণের বিনাশ সাধন করে।

জীব সর্ব্বদাই মোহাদিদ্বারা আক্রান্ত হইয়া অত্যন্ত ক্লেশ অনুভব করে। সঙ্কর্ষণাখ্য জীবস্বরূপ লক্ষ্মণও রাবণের শক্তিশেলদ্বারা বিদ্ধ হইয়া অত্যন্ত কষ্ট পাইয়াছিলেন।

মোহাদির সংস্রবে জ্ঞানের মলিনতা জন্মে; কিন্তু যোগাগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিলে, ঐ মলিনতা বিনষ্ট হইয়া থাকে। সীতা জ্ঞানস্বরূপা হইলেও মোহরূপ রাবণের গৃহে বাস করিয়াছিলেন বলিয়া রামচন্দ্র তাঁহাকে উদ্ধার করিবার পর অগ্নি-পরীক্ষা করিয়াছিলেন। দেহরূপ লঙ্কায় মোহাদি প্রবল-পরাক্রান্ত হইলেও জীব বিবেকবুদ্ধিদ্বারা পরমাত্মার শরণ গ্রহণ করিলে, মোহাদির ধ্বংসসাধন করিয়া শান্তিতে বাস করিতে পারে। বিভীষণ রাবণাদির বিনাশের পর লঙ্কায় শান্তিতে রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন। যতই লোভমোহাদিদ্বারা আক্রান্ত হউক না কেন, তাহার বিবেকবুদ্ধি একেবারে কখনও বিনষ্ট হয় না; কোন না কোন সময়ে বিবেকবুদ্ধি প্রবল হয় এবং মোহাদি বিনষ্ট হয়, এই জন্য রাবণ প্রবল পরাক্রান্ত হইয়াও বিনষ্ট হইয়াছিলেন; কিন্তু আপাতদুর্ব্বল বিভীষণ অমর।

জীব সাত্ত্বিকভাবাপন্ন হইলেই ভগবানের দর্শন প্রাপ্ত হয়। কৃষ্ণাবতারে বসুদেবই সাত্ত্বিক ভাবাপন্ন জীব। পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ এই জন্যই বসুদেবের ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। শাস্ত্রাদিষ্ট ধর্ম্মাদি কার্য্য করিলেই সাত্ত্বিকভাবাপন্ন হওয়া যায়। ধৃতি, ক্ষমা, দম, অস্তেয়, শৌচ, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, ধী, বিদ্যা, সত্য, অক্রোধ, এই দশটী ধর্ম্মের লক্ষণ। এই দশবিধ লক্ষণাক্রান্ত ব্যক্তি সাত্ত্বিক ব্যক্তি। যাঁহারা এই দশবিধ ধর্ম্মের পদে গমন করেন, তাঁহারাই সাত্ত্বিকতা প্রাপ্ত হয়েন এবং সাত্ত্বিকতা প্রাপ্ত হইয়া ভগবৎ-সাক্ষাৎকার প্রাপ্ত হন। দশরথ দশবিধ ধর্ম্ম আচরণদ্বারা পরমাত্মাকে পুত্রস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি দশধর্ম্ম-রথারূঢ় হইয়া কখনও সত্বপথ হইতে স্খলিত হন নাই, এজন্য তিনি রামচন্দ্রকে পুত্রস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

রামায়ণে যেরূপ ঐতিহাসিক ঘটনা নিবদ্ধ রহিয়াছে, তদ্রূপ অধ্যাত্ম-তত্ত্বও ব্যাখ্যাত হইয়াছে। তত্ত্বজ্ঞানীদিগের নিকট রামায়ণ একখানি উৎকৃষ্ট যোগ-গ্রন্থ। ছান্দোগ্যশ্রুতির দেবাসুরসংগ্রামও যাহা, রামায়ণে রামরাবণের যুদ্ধও তাহাই। প্রতিদেহে প্রতিমুহূর্ত্তেই রামরাবণের যুদ্ধের ব্যাপার সংঘটিত হইতেছে। ভবসমুদ্রে ভাসমান দেহই লঙ্কাদ্বীপ। কাম-ক্রোধাদি অসৎ প্রবৃত্তি সর্ব্বদাই ইন্দ্রিয়সমূহকে সবলে বাধ্য

রাখিয়া জীবকে পরমাত্মা হইতে বিচ্যুত করিতেছে; কিন্তু জীব বিবেক-বুদ্ধি ও যোগের সাহায্যে অসৎপ্রবৃত্তি দমন করিয়া, পরমাত্মা-মিলন লাভ করিতে পারে। রাবণবধ ভিন্ন সীতার উর্দ্ধার হয় না; মোহবিনাশ ভিন্ন তত্ত্বজ্ঞানোদ্ধার অসম্ভব। ইহাই রামায়ণের ঐতিহাসিকতার অন্তরালস্থিত আধ্যাত্মিক উপদেশ।

(কস্যচিদ্ পরিব্রাজকস্য।)

আত্মবোধ বা মায়াবাদ।

সূচনা।

অহো! কি বিষম মরীচিকাময়ী ভ্রান্তি! কি দুঃসহ পরিতাপ! নির্ব্বোধ বালক যেমন রত্নগর্ভ সাগরের উপকূলে বসিয়া মনের আনন্দে রত্নজ্ঞান করিয়া শম্বুক সংগ্রহ করিয়া থাকে, তেমনই এই অনন্ত বিশ্বের কেন্দ্রস্থানে বসিয়া জ্ঞানাভিমানে আমি এতকাল জ্ঞানরত্ন ছাড়িয়া কেবল অজ্ঞান-ভস্ম সংগ্রহ করিয়াছি, আর পরমানন্দে তাহাই আপনার সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়াছি; বিশ্ব-উদ্ভাসক আলোকে প্রবেশ করিতে যাইয়া আমি ক্রমে গাঢ় হইতে গাঢ়তর অন্ধকারে প্রবেশ করিয়াছি! অর্থলোভে অন্ধ হইয়া অকৃত্রিম রৌপ্যচক্র জ্ঞান করিয়া অনর্থকর পারদাবৃত তাম্রচক্র আগ্রহপূর্ব্বক অঞ্চলে বান্ধিয়াছি! অগ্রে কিছুই বুঝিতে পারি নাই যে, যখন স্থির হইয়া বসিয়া আমার শ্রমলব্ধ রৌপ্যমুদ্রাকে পরীক্ষা-প্রস্তরে বাজাইতে যাইব, তখন তাহার সেই সুমধুর শব্দ বাহির হইবে না এবং দুই চারিবার ঘষামাজা করিলেই তাহার উপরের উজ্জ্বল পারদাবরণ উঠিয়া যাইবে, আর নীচে তাম্র দেখা যাইবে!

এ সকল অগ্রে কিছুই বুঝিতে পারি নাই; বুঝাও তো সহজ নহে। এই বিশ্বসংসার ঠিক একটী আদ্যন্তহীন যাদুগৃহ। ইহার কেন্দ্রস্থান সর্ব্বত্রই, কিন্তু পরিধি কোথাও দেখি না! এই যাদুগৃহে অসংখ্য সামগ্রী থরে থরে সাজানো থাকার মত বোধ হইতেছে, কিন্তু আমি কোন দ্রব্যকেই তো ভাল করিয়া দেখিতে পাইতেছি না। এই ঘরের প্রত্যেক পদার্থেরই অসংখ্য গুণ আছে বলিয়া বোধ হইতেছে, কিন্তু আমি কেবলমাত্র পাঁচটী গুণ আলো-আঁধারিতে অমনি অস্পষ্ট এবং অসম্পূর্ণরূপে যেন দেখিতে পাইতেছি, আর তাহাতেই কখনও অসীম আনন্দে পুলকিত, কখনও দুঃসহ দুঃখে সন্তাপিত হইতেছি। এদিকে এই যাদুঘরের কর্ত্তা যাদুকর যিনি, তাঁহাকে খুজিয়া পাইতেছি না। সে মহাপুরুষ যে কোথায় কোন্ কেন্দ্রস্থানে বসিয়া "রাহুচণ্ডালের হাড়" ঘুরাইয়া আমার চোখে মুখে ভেল্কি লাগাইতেছেন, তাহার কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না।—অহঙ্কারবশে ভেল্কি বুঝি বলিয়া বড়াই করিয়া থাকি, কিন্তু শতবার শত চেষ্টা করিয়াও ভব-ভেল্কীদারকে ধরিতে পারি নাই। অব্যক্তব্যক্তি সর্ব্বশক্তিমান সেই যাদুকর আমার সমগ্র বিদ্যাবুদ্ধি অতিক্রম করিয়া—আমার চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া—সমগ্র যাদুঘর জুড়িয়াই বসিয়া আছেন; আমি সমগ্র চেষ্টা করিয়াও সেই জগৎ-যাদুকরকে দেখা দূরে থাকুক, যাদুঘরের কোনও পদার্থকেই ভাল করিয়া দেখিতে পাইতেছি না এবং যাহা কিছু অস্পষ্টভাবে দেখিতে পাইতেছি, তাহাতে বুঝিতে পারিতেছি না যে, পদার্থগুলির কোনও বাস্তবিক সত্ত্বা আছে, না সবই ফাঁকি:—

"স্বয়মসিদ্ধঃ কথং পরান্ সাধয়তি।"

আমার চক্ষে যদি ভেল্কি লাগিয়া থাকে, তবে এ রহস্য-ভেদ করিয়া যাদুঘরের প্রত্যেক পদার্থকে স্বরূপতঃ দর্শন করা আমার সাধ্যাতীত। সুতরাং মায়াগৃহের মায়ার উচ্ছেদ করিবার সকল চেষ্টাই আমার বিফল হইয়াছে। অদৃষ্টপূর্ব্ব প্রদেশে, অজ্ঞাতপূর্ব্ব পদার্থ সকলের পরিচয় দিবার জন্য জ্ঞানেন্দ্রিয় নামধারী যে পাঁচজন আমার সাহায্যার্থে নিযুক্ত আছে, এবং যাহাদের অকৃত্রিম সাহায্যের ভরসায় আমি এই দুরপনেয় মায়ার উচ্ছেদ সাধন করা অল্পায়াসসাধ্য মনে করিয়াছিলাম, তাহারা এক দুর্ভেদ্য ষড়যন্ত্র করিয়া যেন আমাকে ধারাবাহিকক্রমে প্রতারণা করিয়া আসিতেছে; অথচ আমি এতদিন তাহাদের প্রতারণা বুঝিয়া উঠিতে অথবা বুঝিয়াও সেই প্রতারণা-জাল হইতে মুক্ত হইতে পারি নাই।

যে পাঁচজন আমার প্রতিকূলে ষড়যন্ত্র করিয়া আমাকে পদে পদে স্খলিতপদ করিতেছে, তাহারা আমার পরমাত্মীয়; এমন কি, তাহারা না থাকিলে আমি নিজেও থাকিতে ইচ্ছা করি না। সেই পরমপ্রিয় পাঁচটী কুটুম্বকে পরিত্যাগ করিয়া আমি ঈশ্বরত্বও কামনা করি না! মায়াগৃহের মায়ার উচ্ছেদ করিয়া আত্মরক্ষার জন্য আততায়ী প্রতারক স্বজনদিগকে বিনাশ করা কর্ত্তব্য হইলেও আমি মায়াবশতঃই তাহা করিতে পারি না। কেন না—

"দৃষ্ট্বেমান্ স্বজনান্ কৃষ্ণ-যুযুৎসূন্ সমবস্থিতান্
সীদন্তি মম গাত্রাণি মুখঞ্চ পরিশুষ্যতি।"

কৃষ্ণ হে! প্রতারণাপরায়ণ এই সকল স্বজনকে যুদ্ধেচ্ছু দেখিয়া আমার গা শিহরিয়া উঠে, মুখ শুকাইয়া যায়! কেন না—

"যেষামর্থে কাঙ্ক্ষিতং নো রাজ্যং ভোগাঃ সুখানি চ।
তইমেঽবস্থিতা যুদ্ধে প্রাণাংস্ত্যক্ত্বা ধনানি চ॥"

ইহারা সেই সকল লোক, ধন-প্রাণের আশা ত্যাগ করিয়া, আমার সহিত যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হইয়াছে, যাহাদের জন্যই আমার সমুদায় সুখভোগ এবং রাজ্যকামনা। অতএব—

"এতান্ন হন্তুমিচ্ছামি ঘ্নতোঽপি মধুসূদন!
অপি ত্রৈলোক্য-রাজস্য হেতোঃ কিন্নু মহীকৃতে॥"

হে মধুসূদন! ইহাদিগকে বধ করিলে, পৃথ্বী দূরের কথা, যদি ত্রৈলোক্যরাজ্য লাভেরও সম্ভাবনা থাকে, তথাপিও আমি ইহাদিগকে মারিতে চাই না। বরং ইহারা আমাকে মারিয়া ফেলুক, তাহাও স্বীকার্য্য। ফলতঃ কুটম্বমহাশয়দিগকে ত্যাগ করিলে আমার মোক্ষলাভ ঘটিতে পারে, কিন্তু আমি পার্থিব মায়ায় মুগ্ধ হইয়া তাহাদিগকে ছাড়িয়া থাকিতে চাই না। এই কুটম্বমহাশয়েরা সকলে সহজাত ভ্রাতা; ভাইসকলে একমত হইয়া আমাকে ক্রমাগত ঠকাইতেছে, আর আমার দুর্দ্দশা দেখিয়াও নিবৃত্ত হইতেছে না। ধূর্ত্তলোক যেমন পথভ্রান্ত পথিককে এক পথ দেখাইতে অন্যপথ দেখাইয়া আমোদপ্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ ইহারা সুখকে দুঃখ, আলোককে অন্ধকার, সত্যকে অসত্য বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে! এ অতি ভয়ানক বিশ্বাসঘাতকতা! ইহার বিদ্যমানতা আমি এতকাল বুঝিতে পারি নাই, অথবা কতকটা বুঝিয়া থাকিলেও তাহা নিবারণের উপায় উদ্ভাবন করিতে পারি নাই।

(ক্রমশঃ)

শ্রীউমেশচন্দ্র মৈত্র।

শ্রীশ্রীহরিঃ।

[১৮৪৭ সালের ২০ আইনমতে রেজিষ্ট্রীকৃত।]

হিন্দু-পত্রিকা।

৪র্থ বর্ষ, ৪র্থ খণ্ড, ৭ম ও ৮ম সংখ্যা, | ১৩০৪ সাল, ১৮১৯ শকাব্দা, | কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ।

আত্মবোধ বা মায়াবাদ

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

কপট ইন্দ্রিয়-পাঁচটীর সাহায্যে আমি বাহ্য-জগতের যে অত্যল্লাংশ বুঝিতে পারি, তাহা যে নিরপেক্ষ সত্য নহে, ইহা জানিতে পারিলে কতকটা উপকার হইবার সম্ভাবনা। অতএব একবার ইন্দ্রিয়মহাশয়দিগের সাক্ষ্য-বিশ্লেষণ করিয়া দেখিব যে, আমার ঐ সকল অন্তরঙ্গ মহাশয়েরা আমার সঙ্গে কেমন ব্যবহার করেন,—কেমন "অশ্বত্থমা হতঃ—ইতি গজঃ" করিয়া আমাকে ভ্রান্ত করিয়া ভাঁড়াইয়া থাকেন ; কপট তোষামোদকের মত কেমন কৌশলে আপনাদের অন্নদাতা মনকে তাহার সম্পদের সময় অবিরত খাম-খেয়ালী খোসগল্পে ভুলাইয়া দিয়া, বিপদের সূত্রপাতেই ক্ষিপ্রপদে সরিয়া পড়েন !

বাহ্যজগৎ।

পরিদৃশ্যমান এই জগৎ, ঊর্দ্ধ্বে সুবিস্তীর্ণ সুনীল চন্দ্রাতপতলে সমুজ্জল দীপালোকে সমুদ্দীপিত অসংখ্য হীরক ; সম্মুখে অভ্রভেদী স্তম্ভাশ্রয়ে বিজলী-বিলসিত বিচিত্র বারিদপুঞ্জ ; পদতলে জীবসঙ্কুল-বায়ুসাগরের মধ্যবর্ত্তিনী স্থাবরজঙ্গম-জননী বিপুলসৌন্দর্য্যময়ী রত্নাকরা-ম্বরা ধরণী ; চারিদিকে পিতা, মাতা, ভ্রাতা, স্ত্রী-পুত্রাদি বন্ধুবান্ধব—এ সকল সম্বন্ধে আমার যাবতীয় জ্ঞানই ইন্দ্রিয়-সাপেক্ষ। অতএব বাহ্য-জগৎ যদি বাস্তবিকই থাকে, আমি তাহাকে কেবলমাত্র সেই কয়প্রকারে জানিতে পারিতেছি, যেকয়প্রকারে জানিবার উপযোগিতা—অর্থাৎ উপযুক্ত ইন্দ্রিয়বত্তা আমার আছে। বাহ্য-জগতের অনন্ত গুণ থাকিলেও আমি কেবল মাত্র ইহার ততটী গুণ জানিতে পারি, যতটী গুণ-গ্রহণক্ষম যন্ত্রস্বরূপ ইন্দ্রিয় আমার আছে। কতটী ইন্দ্রিয় আমার আছে, তাহা এখনও স্থির বুঝিতে পারি নাই, কিন্তু সাধারণতঃ স্পষ্ট-শাস্ত্র-নির্দ্দিষ্ট আমার জ্ঞানেন্দ্রিয় পাঁচটীমাত্র আছে বলিয়া বুঝি এবং সেইজন্য বাহ্য-জগতের অসংখ্য অবস্থার মধ্যে ঐ পাঁচটী ইন্দ্রিয়দ্বারা পাঁচটী মাত্র অবস্থা জানিতে পারি বলিয়া মনে করি। স্থূলতঃ রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ, বাহ্য-জগতের এই পাঁচটী অবস্থা আমি জানিতে পারি এবং সেইজন্য বাহ্য-জগতের এই পাঁচটীমাত্র গুণ স্বীকার করি। ইহার অতিরিক্ত আর যতই গুণ বাহ্য-জগতের থাকুক না কেন, আমি সহজে তাহা বুঝিতে পারি না, সুতরাং তাহার

অস্তিত্বও স্বীকার করি না। কিন্তু ইহা অতিমাত্র সম্ভাবিত যে, জগতের অসংখ্য গুণ রহিয়াছে, আর সেই অসংখ্য গুণ গ্রহণের উপযোগী অসংখ্য ইন্দ্রিয়ও আছে, কিন্তু অনন্তকালের তুলনায় আমার নগণ্যযোগসাধন-শূন্য স্থূল ঐহিক-পরমায়ুকালের মধ্যে আমার প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের সহিত তাহার নির্দ্দিষ্ট বিষয়ের এবং বাহ্যবস্তুর প্রত্যেক গুণের সহিত তদ্গ্রাহক আমার ইন্দ্রিয়ের দেখাসাক্ষাৎ হয় নাই বলিয়া আমি এপর্য্যন্ত আমার ইন্দ্রিয়ের এবং জগতের গুণের অসংখ্যত্ব বুঝিতে পারি নাই।

যাহাহউক, সাধারণ নির্দ্ধারণানুযায়ী পঞ্চেন্দ্রিয়ের এবং জাগতিক যাবতীয় পদার্থের পঞ্চ গুণের একবার আলোচনা করিব। আমার পাঁচ ইন্দ্রিয়,—চক্ষু, কর্ণ, নাসা, ত্বক, জিহ্বা। যাহা দ্বারা আমি যাবতীয় বস্তুর রূপজ্ঞান লাভ করি, তাহা দর্শনেন্দ্রিয়; চক্ষু যাহার অধিষ্ঠানভূমি এবং চক্ষুরধিষ্ঠিত দর্শনেন্দ্রিয় দ্বারা যে জ্ঞান লাভ করি, তাহা রূপ; যাহাদ্বারা আমার শব্দজ্ঞান জন্মে, তাহা কর্ণাধিষ্ঠিত শ্রবণেন্দ্রিয় এবং শ্রবণেন্দ্রিয় দ্বারা যে জ্ঞান লাভ করি, তাহা শব্দ; যাহাদ্বারা আমার গন্ধজ্ঞান হয়, তাহা নাসিকাধিষ্ঠিত ঘ্রাণেন্দ্রিয় এবং ঘ্রাণেন্দ্রিয় দ্বারা যে জ্ঞান লাভ করি, তাহা গন্ধ। যাহাদ্বারা আমি স্পর্শানুভব করি, তাহা ত্বগধিষ্ঠিত স্পর্শেন্দ্রিয় এবং স্পর্শেন্দ্রিয় দ্বারা যে জ্ঞান জন্মে, তাহা স্পর্শ; যাহাদ্বারা রসানুভব করি, তাহা জিহ্বাধিষ্ঠিত রসনেন্দ্রিয় এবং রসনেন্দ্রিয় দ্বারা যাহা অনুভব করি, তাহা রস। প্রত্যেক ইন্দ্রিয় এবং তাহার বিষয় পরস্পর পরস্পরের পরিচায়ক। রূপের পরিচায়ক চক্ষু এবং চক্ষুর পরিচায়ক রূপ; রসের পরিচায়ক রসনেন্দ্রিয় এবং রসনেন্দ্রিয়ের পরিচায়ক রস, ইত্যাদি; সুতরাং ইন্দ্রিয় এবং বিষয়, এতদুভয়ের একের অভাবে অপরের জ্ঞান হয় না; ইহারা পরস্পর সাপেক্ষ।

পূর্ব্বোক্ত পাঁচটী ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বাহ্যজগতের অসংখ্য অবস্থার মধ্যে যে পাঁচটী মাত্র অবস্থা আমি জানিতে পারি, তাহা সুখ-দুঃখাত্মক দুইভাবে অনুভব করি। সুরূপ দর্শনে মন যেমন প্রসন্ন হয়, কুরূপ দর্শনে মন তেমনই বিষণ্ণ হয়; সুরস যেমন প্রীতিপ্রদ, কুরস তেমনই বিরক্তিকর; চন্দনের স্নিগ্ধ সৌরভে হৃদয় ও মন যেমন শীতল হয়, পুরীষের পূতিগন্ধে নাসারন্ধ্র তেমনই জ্বলিয়া যায়—মন যেন অস্থির হয়। মলয়মারুতের মৃদু প্রবাহ-সঞ্চালিত সুমধুর সঙ্গীতে শরীর ও শ্রবণ যেমন জুড়াইয়া যায়, বর্ষার করকাঘাতে ও বজ্রনিনাদে তাহারা তেমনি বিদীর্ণপ্রায় হয়; সুতরাং আমার সুখ-দুঃখ অনেকটা আমার অন্তরঙ্গ ইন্দ্রিয়মহাশয়দিগের অনুগ্রহ-নিগ্রহের উপরই নির্ভর করে। যদি আমার কোন ইন্দ্রিয়ের অভাব হয়, তবে সেই ইন্দ্রিয়-লভ্য সুখ-দুঃখেরও অভাব হয়। যখন দৃষ্টিশক্তিবিহীন হই, তখন যেমন সুরূপ-সম্ভোগে বঞ্চিত হই, তেমনি কুরূপ-দর্শনজনিত দুঃখ হইতেও মুক্ত থাকি। আবার যদি পঞ্চেন্দ্রিয়ের অতিরিক্ত আরও দুই-দশটী ইন্দ্রিয় লাভ করি, তাহাহইলে আরো ততটী সুখ-দুঃখাত্মক ভাবে হৃষ্ট ও ক্লিষ্ট হইতে বাধ্য হইব, সন্দেহ নাই।

পুনশ্চ, আমার সকল প্রকার ঐন্দ্রিয়িক-জ্ঞানই পরস্পর-বিরোধী দুইটী জ্ঞান-সাপেক্ষ। সুখ কি, তাহা না বুঝিলে, দুঃখ কি, তাহা বুঝিতে পারি না। ছোট কি, তাহা না বুঝিলে, বড় কি, তাহা বুঝিতে পারি না। যাহাকে শীত বলি, নিরবচ্ছিন্ন তাহাই যদি জন্মাবধি ভোগ করিয়া আসিতাম, তাহাহইলে আর তাহাকে শীত বলিয়া বিশেষানুভব করিতে পারিতাম না। এই যে ভূবায়ু অবিচ্ছেদে আমার স্কন্ধে মহা ভার

চাপাইয়া রাখিয়াছে, তাহা কি আমি টের পাই? পৃথিবী যে আমাকে তাহার আহ্নিক ও বার্ষিক গতিতে মহাবেগে অবিরাম ঘুরাইয়া লইয়া যাইতেছে, তাহাই কি আমি অনুভব করিতে পারি? নিবিড় নীরদাবৃত অমা-রজনীতে যখন "তিমিরে অনন্তকায় শূন্য ধরাতল" তখন কোনই রূপ দর্শন করি না; কেবল পূর্ব্বানুভূত আলোকের বিপরীত একমাত্র অন্ধকারের ভাব মনে পড়ে; কিন্তু যদি জন্মান্ধ হইতাম, তাহাহইলে আলোকেরও জ্ঞান না থাকায়, আমার মনে উহার স্বতঃ-সাপেক্ষ অন্ধকারেরও কোন ভাব প্রতিভাত হইত না। এইরূপে বুঝিতে পারি যে, আমার প্রত্যেক ঐন্দ্রিয়িক জ্ঞান পরস্পর বিরোধী দুইটী জ্ঞান-সাপেক্ষ। এই তত্ত্বটী বুঝাইবার জন্যই মুনি-ঋষিরা বলিয়াছেন, "অসতঃ সজ্জায়ত ইতি, সতো সজ্জায়ত ইতি বা।" সৎ হইতে অসতের জন্ম এবং অসৎ হইতে সতের জন্ম হয়। সদসৎ দুয়ের জ্ঞান যাহার হয় নাই, তাহার কোনটীরই জ্ঞান হইতে পারে না। পাশ্চাত্য দার্শনিকেরাও এই ভাবকে "Co-relative idea" বলেন।

ইন্দ্রিয় পরিচয়—চক্ষুরিন্দ্রিয়।

এখন ইন্দ্রিয় সকলের একবার পরিচয় করিয়া লই এবং চক্ষুরধিষ্ঠিত দর্শনেন্দ্রিয়কে ধরিয়া আলোচনা-প্রবৃত্ত হই। আমি চক্ষুরধিষ্ঠিত দর্শনেন্দ্রিয়দ্বারারূপ জ্ঞান লাভ করি, কিন্তু তাহাতে বহু অন্তরায় দেখি—

অতিদূরাৎ সামীপ্যাদিন্দ্রিয়ঘাতান্মনোঽনবস্থানাৎ সৌক্ষ্ম্যাদ্ব্যবধানাদভিভবাৎ সমানাভিহারাচ্চ।

কি না,—যে দ্রব্য দেখিব, তাহা যদি সে চক্ষু (১) হইতে অত্যন্ত দূরে (২) অথবা চক্ষুর অত্যন্ত নিকটে থাকে, তবে তাহার রূপ দেখা যায় না। (৩) চক্ষুর কোন প্রকার বিকার হইলে (৪) অথবা মন অন্য বিষয়ে ডুবিয়া গেলে আমি চক্ষুতে কিছু দেখি না। যে দ্রব্যটী দেখিব, তাহা যদি (৫) অতি ক্ষুদ্র হয় কিম্বা দ্রব্যান্তরের দ্বারা ঢাকা থাকে, তাহাহইলে আমি তাহাকে দেখিতে পাই না। আবার (৭) সূর্য্যালোকে নক্ষত্রের ন্যায় প্রবল রূপের ঔজ্জ্বল্যে ক্ষীণালোক ডুবিয়া গেলে অথবা (৮) একই রকমের দ্রব্যের সঙ্গে মিশিয়া গেলে, আমি দ্রষ্টব্য পদার্থের রূপ দেখিতে পাই না। ইহা ছাড়া (৯) দ্রষ্টব্য পদার্থটী আদ্যন্তহীন হইলে অথবা (১০) দৃষ্টিপথের বাহিরে থাকিলে, তাহার রূপ দেখা যায় না। আমি যখন শান্ত হইয়া বসিয়া আমার চক্ষুরত্নের এই সকল অক্ষমতার বিষয় চিন্তা করি, তখন বুঝিতে পারি যে, কেমন অপদার্থ শম্বুক দুটীকে আমি কেমন অযথারূপে অমূল্য রত্নজ্ঞান করিয়া থাকি! আহা কি কর্ম্মঠ সহকারী! ইনি দূরের সম্বাদ আনিবেন না; নিকটের কথাও কহিবেন না। বড়কে দেখিলে দিশাহারা হইবেন, আবার ছোট ইহাঁর নজরে ধরে না। সত্তর-আশী বৎসরের অধিক কার্য্য করেন না, তাহার মধ্যেও কতবার পীড়ায় বিদায় লইয়া থাকেন। আর যখন প্রভু মনকে অনবস্থিত দেখেন, তখন নিজে অমনি ঘুমাইয়া পড়েন। কাজের সময় একটা সামান্য (হাঁচি টিকটিকীর শব্দকে) ব্যবধান দেখিলে, ইহার বেদ পাঠ বন্ধ হয় এবং একটা বৃহদ্ব্যাপার উপস্থিত হইলে, ইনি ছোট খাটো কার্য্যগুলির কোন খোঁজই রাখেন না। আবার এদিকে এমনি 'নিশানসহী' যে, আপনার টাকাটী আর দশটী টাকার সহিত মিশান থাকিলে, তাহা বাছিয়া লইতে পারেন না; অধিকাংশসময়েই আপনার বলিয়া পরের দ্রব্য লইয়া কত অযথা বিবাদের সূত্রপাত করেন। কখনও রজ্জুকে সর্প ভ্রম করিয়া ভয় পান, কখনও

সর্পকে রজ্জুভ্রমে গলায় জড়ান; দৈ বলিয়া চূণ খাইয়া মুখ পোড়ান, অন্য সময়ে চূর্ণ ভ্রমে দধি পরিত্যাগ করেন। ইহাঁর এত দোষ, তবুও যে আমি ইহাঁকে এত আদর করি, তাহার একমাত্র কারণ এই যে, ইনি আমার একজন পরমাত্মীয়—আমার এই দেহাত্মবুদ্ধি-সর্ব্বস্বজীবনে মোহ-মগ্ন লোকযাত্রার সহজাত পরিচারক।

যে সকল স্থলে চক্ষু মহাশয় আমার কোন কার্য্য করিতে পারেন না, তাহা দেখা হইল। এখন একবার আলোচনা করিয়া দেখিব যে, যে সকল স্থলে দর্শনেন্দ্রিয় আমার রূপাদির জ্ঞান লাভের সাহায্য করেন বলিয়া মনে করি, সেই সকল স্থলে তিনি বাস্তবিকই আমার সাহায্য করেন, না আমাকে ভুলাইয়া থাকেন—একরূপ দেখাইতে অন্যরূপ দেখাইয়া দেন। চক্ষু দ্বারা আমাদের যে জ্ঞান লাভ হয়, তাহাকে আমরা রূপ বলি। রূপ, বর্ণ বা আলোক ইত্যাদি শব্দ একই পদার্থের অবস্থান্তর বুঝাইবার জন্য আমরা ব্যবহার করি। এই বর্ণ, রূপ বা আলোক সামান্যতঃ দুই প্রকারের; যথা স্বকীয় রূপ বা স্বরূপ এবং প্রাপ্তরূপ বা বিরূপ। যাহা আপনার রূপেই আপনি ভাসে, তাহা স্বরূপ; আর যাহার নিজের কোন রূপ নাই, স্বরূপ বা স্বপ্রকাশ পদার্থের নিকট হইতে রূপ ধার করিয়া তাহারই কতকটা রাখিয়া কতকটা বিলাইয়া নিজের রূপবত্তার পরিচয় দেয়, তাহা বিরূপ। সূর্য্য এবং প্রজ্জ্বলিত অগ্নি স্বরূপ বা স্বপ্রকাশ পদার্থ। কেন না, সূর্য্য বা অগ্নি এবং চক্ষু, ইহাদের মধ্যে প্রতিকূল পদার্থান্তরের ব্যবধান না থাকিলে সূর্য্য বা অগ্নির বর্ণ, রূপ বা আলোক আমরা দেখিতে পারি। কিন্তু এই বিবিধ বর্ণাম্বরা বহু ভূষিতা কুসুমকুন্তলা মহীর রূপ বিরূপ; ইহার কোন রূপই আপনার নহে, সকলই ধার-করা। তাই যখন রজনীতে সূর্য্যদেব আপনার বিশ্ববিকাশক কর প্রসারণে মহীর বিশাল বক্ষদেশ বিভাসিত করিতে বিরত থাকেন, তখন মহীর এত যে হাসিভরা মুখ, তাহা কেমন ম্লান হইয়া যায়। পুনশ্চ, যদি ঘটনাক্রমে রজনীনাথ তাহার ধার-করা করগুলি মহীর ব্যথিত বক্ষে বুলাইতে না পারেন এবং ঘনঘটাচ্ছন্ন গগণের একটী নক্ষত্রও যদি তাহার ক্ষীণ আলোকাধরে ধরণীর ললাট চুম্বন করিতে না পারে, তাহা হইলে মহীর এই চমৎকারিণী মোহিনীরূপচ্ছটা কিরূপ অরূপে পরিণত হইয়া যায়! সুসজ্জিত গৃহ দীপহীন হইলে তাহার সজ্জিত সৌন্দর্য্য কেমন এক গাঢ় তমসাবরণে ঢাকা পড়ে! আবার সুধাধবলিত গৃহ লোহিতালোকস্পর্শে যেমন লোহিত দেখায়, নীলালোক-সমাগমে তেমনি নীলাভ হইয়া থাকে। স্বপ্রকাশ আলোকের ইতর বিশেষে বিরূপ পদার্থের এমনই আশ্চর্য্য রূপান্তর হয়!!

আলোক এক প্রকার নহে; নীল, লোহিত, পীত ভেদে অমিশ্র আলোক সম্ভবতঃ তিন প্রকার হইলেও এই তিনের ন্যূনাধিক পরিমাণে মিশ্রণে রূপ অসংখ্য প্রকার। আলোক বা রূপ যদি বহু প্রকার না হইয়া এক প্রকার হইত, তাহা হইলে আমাদের সম্বন্ধে রূপ থাকা আর না থাকা সমান হইত। যেহেতু সে অবস্থায় আমরা রূপের কোন ভাবই স্পষ্টরূপে মনে ধারণা করিতে পারিতাম না। আমাদের চক্ষুর সম্মুখে যদি অবিরত কাল অবিচ্ছিন্ন লোহিত বর্ণের এমন একখানি পট ঝুলান থাকিত, যাহার আদ্যন্ত নির্দ্দেশক বর্ণান্তর নেত্রগোচর হয় না, তাহা হইলে আমরা লোহিত বর্ণের কোন ভাবই মনে ধারণা করিতে অক্ষম হইতাম। সীমাবদ্ধ রূপ ভিন্ন আদ্যন্ত রূপধারণা করা মনুষ্য-ক্ষমতার অতীত। কোন

রূপ দেখিতে হইলে সেই রূপকে সীমাবদ্ধ করিতে হইবে; তা সেই সীমা, হয় রূপান্তরের দ্বারাই করি, না হয় রূপাভাব দ্বারাই করি, একই কথা। রূপাভাবও এক প্রকার রূপ ভিন্ন আর কিছু নয়! কারণ, রূপাভাবও দর্শনেন্দ্রিয়বোধ্য এবং যাহা দর্শনেন্দ্রিয়বোধ্য, তাহাই রূপ। ফলতঃ যখনই আমাদের কোন রূপের জ্ঞান হয়, তখনই সেই রূপকে একটী বিশেষ সীমাবদ্ধ এবং সমধরাতল ক্ষেত্রাকারে দর্শন করিয়া থাকি। চক্ষু নিজে ইহার অধিক আর কোন আকারের রূপ আমাদিগকে দেখাইতে পারে না; তবে যে আমরা অনেক সময় চক্ষু দ্বারা ঘনক্ষেত্রাদির বা মসৃণ-বন্ধুরত্বাদির জ্ঞান লাভ করি, তাহা শুদ্ধ চাক্ষুষ জ্ঞানে নহে; চাক্ষুষ জ্ঞানের সহিত স্পর্শজ্ঞান ভূয়ঃ সম্মিলিত হইয়া কখন কখন এক জ্ঞান অলক্ষিত ভাবে অন্য জ্ঞান উৎপন্ন করিয়া দিয়া থাকে; কিন্তু নানা কারণে স্পর্শজ্ঞান ও রূপজ্ঞান অনেক সময় পরস্পর অযাচিত ভাবে পরস্পরের প্রতিনিধি স্বরূপ কার্য্য করিতে যাইয়া মহানিষ্ট ঘটাইয়া ফেলে। মনুষ্যের পূর্ণ আকৃতি বুঝিতে হইলে দর্শনেন্দ্রিয় এবং স্পর্শেন্দ্রিয় উভয়েরই সাহায্য প্রয়োজন হয়। দর্শনেন্দ্রিয় দ্বারা সমতল ক্ষেত্রাকারে মানুষের আকৃতি দর্শন করিয়া, স্পর্শেন্দ্রিয়ের দ্বারা তাহার চারি দিকের স্পর্শানুভব করিয়া, চাক্ষুষ জ্ঞানকে কতকটা পাকা করিয়া লইতে হয়। নতুবা অনেক সময় পটস্থ চিত্রিত মূর্ত্তিকে প্রকৃত মানুষ বলিয়া ভ্রম জন্মিতে পারে। জন্মাবধি যাহার চক্ষে ছানি পড়া—সুতরাং যে জন্মান্ধ, হঠাৎ অস্ত্র-চিকিৎসায় তাহার ছানি অপনীত হইলে, সে দৃষ্টি লাভ করিয়া সুধু চক্ষুর সাহায্যে যে রূপ অনুভব করে, তাহা সমুদয়ই, সমতল ক্ষেত্রের, ঘনক্ষেত্রের নহে। সে ব্যক্তি যে সকল পদার্থকে অগ্রে কেবল স্পর্শেন্দ্রিয় দ্বারা জানিত, এখন সেই সকল পদার্থকে তাহার সম্মুখে দূর-নিকট করিয়া সাজাইয়া রাখিলে, সুধু চক্ষুর দ্বারা সে তৎসমুদয়কে সমদূরবর্ত্তী এবং সমতল ক্ষেত্রাঙ্কিত জ্ঞান করিয়া থাকে। ফলতঃ স্পর্শজ্ঞানের সাহায্য-নিরপেক্ষ কোন ঘনক্ষেত্রের বা কোন পদার্থের দূরাদূরত্বের জ্ঞান চক্ষু নিজে জন্মাইতে পারে না। অনন্ত আকাশের দূরাদূর প্রদেশ ব্যাপিয়া চন্দ্র-সূর্য্য-গ্রহ-নক্ষত্রাদি কত উজ্জ্বল গোলক ঝুলিতেছে, কিন্তু চক্ষু দ্বারা আমি সে সকলকে যেন দূরবর্ত্তী উজ্জ্বল থালের সমতল ক্ষেত্রবৎ দর্শন করিয়া থাকি!

চক্ষু দ্বারা আমি বর্ণ দেখিয়া থাকি, কিন্তু তাহাতেও দোষ আছে। কি স্বপ্রকাশ, কি উপপ্রকাশ, সকল পদার্থ হইতেই তাহাদের রূপ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে; সুতরাং প্রত্যেক পদার্থেরই রূপ-তরঙ্গ পদার্থান্তরে সঞ্চারিত হইয়া কতক তাহাতে শোষিত, কতক তাহা হইতে প্রতিক্ষিপ্ত হইয়া নিতান্ত জটিল এক তরঙ্গাকারে আমাদের চক্ষে প্রতিহত হয়; সুতরাং কোন্ পদার্থের কোন্ টুকু নিজস্ব, আর কোন টুকু পরস্ব, তাহার নির্ণয় হইয়া উঠে না। অপিচ সহজ দৃষ্টিতে বা দূর-দৃষ্টিতে যে বর্ণকে অবিচ্ছিন্ন একই বর্ণ বলিয়া জ্ঞান হয়, যন্ত্রযোগে বা নিকটে রাখিয়া দেখিলে তাহাকে একাধিক বর্ণের সংঘাত বলিয়া বুঝা যায়। অনুবীক্ষণ দ্বারা শোণিত দর্শন করিলে, আর তাহাকে পূর্ব্বের মত অবিচ্ছিন্ন লোহিত বর্ণ দেখায় না, জলীয় পদার্থ মধ্যে লোহিত ও শ্বেত কণাসমূহ ভাসমান থাকা দৃষ্ট হয়। স্যান্টোনাইন (Santonine) প্রভৃতি ঔষধ সেবনে বা "কামলা" প্রভৃতি অন্যান্য কারণে এমন কখন কখন হইয়া থাকে যে, এত দিন যে সকল বস্তুকে

ধবল দেখাইয়াছিল, সেই সকল পদার্থকে তখন হরিদ্রাবর্ণাভ দেখায়। দৃষ্টপদার্থের এই বর্ণ-পরিবর্ত্তনের প্রতি কারণ আমার চক্ষুরই এমন একপ্রকার পরিবর্ত্ত, যাহার জন্ম আমি বাহ্যরূপ মাত্রকে হরিদ্রাবর্ণাভ দেখিতে বাধ্য হই। আমার চক্ষুর এই পরিণতিকে আমি একপ্রকার রোগ বলি; কিন্তু তাহা রোগ হইলেও প্রকৃতির নিয়মাধীন একপ্রকার স্বাভাবিক অবস্থা এবং পীতনেত্র আমার জীবনের সহচর হইবার পক্ষে কোন বাধা দেখা যায় না। যদি সকল মনুষ্যেরই জন্মাবধি মৃত্যুপর্য্যন্ত এই প্রকার চক্ষু হইত, তাহাহইলে, এখনকার প্রত্যেক ধবলপদার্থকে সকলেই হরিদ্রাবর্ণ-বিশিষ্ট বলিয়া মনে করিত। পূর্ব্বে বলা হই-য়াছে যে, স্বপ্রকাশ পদার্থের বর্ণের ইতর-বিশেষে অপ্রকাশ-পদার্থের বর্ণান্তর ঘটে; এখন দেখা গেল যে, কি স্বপ্রকাশ, কি অপ্রকাশ, সকল পদার্থেরই বর্ণান্তর হওয়া আমাদের চক্ষুরই পরি-বর্ত্তনের উপর নির্ভর করে—অর্থাৎ আমাদের চক্ষুর ভাবান্তরে সকল পদার্থেরই বর্ণান্তর ঘটে।

পদার্থসকলের বর্ণান্তর হওয়ার প্রস্তাব উপলক্ষ্যে আর একটী কথা বলিয়া রাখিব। নানাবর্ণরঞ্জিত একখানি পট অত্যন্তবেগে ঘুরাইলে পটখানিকে আর বিবিধ বর্ণাঙ্কিত বলিয়া বোধ হয় না, একই বর্ণের বলিয়া বোধ হয় এবং অবস্থাবিশেষে অতবেগসঞ্চরমান পটকে গতিহীন বলিয়া ভ্রম হয়। ফলতঃ বাহ্যবস্তুর যদি প্রকৃত কোন রূপ থাকে, সে রূপ আমরা জানিতে পারি না। আমরা কেবলমাত্র বিকৃত রূপ দেখিতে পাই এবং তাহাকেই প্রকৃতস্বরূপ জ্ঞান করিয়া তুষ্ট হই। বস্তুতঃ নিরপেক্ষ রূপ আমাদের জ্ঞানাতীত; কেবল সাপেক্ষ রূপই আমাদের জ্ঞেয় এবং তাহা জানিয়াই আমরা সন্তুষ্ট হই।

আমরা সকল পদার্থের রূপের সত্তা স্বীকার করি, কিন্তু চক্ষুর্মহাশয়ের সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করিয়া তেজ-তন্মাত্ররূপের পরগত স্পর্শতন্মাত্র-বায়ুর প্রভা বা রূপের অস্তিত্ব স্বীকার করি না। এটী অবশ্য আমাদের একটী স্থূল ভ্রম নহে। যদি অন্যান্য জড়সত্তার রূপ থাকে, তবে বায়ুরও অবশ্য প্রভাতীত একরূপ রূপ আছে। তবে যে অপরাপর বস্তুর প্রভাগতরূপের ন্যায় আমরা সাধারণতঃ বায়ুর কোন রূপ দেখিতে পাই না, তাহার কারণ পরিষ্কার। কোন পদার্থের রূপ দেখিতে হইলে, সেই পদার্থকে চক্ষুর সহিত এক-বারে সংলগ্ন না রাখিয়া একটু দূরে রাখিতে হয়; কিন্তু বায়ুকে আমরা চক্ষু হইতে দূরে রাখিতে পারি না এবং সেই জন্য তাহার রূপ দেখিতে পাই না। যে অবস্থায় অপরাপর পদার্থের রূপ দেখি, সেই অবস্থায় স্বনেত্র-প্রতিহত তেজঃ বায়ুতে আরোপিত করিয়া বায়ুরও রূপ দেখা যায়। যে অবস্থায় বায়ুর রূপ দেখিতে পাই না, সে অবস্থায় অন্য কোন বস্তুরও রূপ দেখা যায় না। আমাদের চক্ষুর পাতা বা চক্ষুর কি রূপ, তাহা স্বচক্ষে আমরা দেখিতে পাই না: কেন না তাহারা দৃষ্টিকেন্দ্রাপেক্ষা চক্ষুর অধিকতর নিকটে থাকে। পুনশ্চ, আমরা যে বায়ুর রূপ একেবারে দেখিতে পাই না, তাই বা কি করিয়া বলি? দিবসে সূর্য্যের আলোক এবং রাত্রিতে চন্দ্রের আলোক বায়ুর অন্তর্ব্বাহ্য সর্ব্বাঙ্গে কিয়দংশ আশোষিত এবং কিয়দংশ তাহাহইতে প্রক্ষিপ্ত হয়; কিন্তু অধিকাংশই বায়ুভেদ করিয়া বাহির হওয়ায়, তাহাতে এক অনির্-ব্বচনীয় স্বচ্ছরূপ উৎপাদন করে, যাহা আমরা অনুভব করিয়াও প্রকাশ করিতে বা অন্যকে বুঝাইতে পারি না এবং আমাদের এই অক্ষমতা প্রযুক্তই তেজ-তন্মাতীত বায়ুর রূপ আছে বলিয়া স্বীকার করি না। অবশ্য, রূপতন্মাত্র তেজতন্মা-

তীত বায়ুর নিজের কোন রূপ নাই, কিন্তু এক পক্ষে ধরিতে গেলে পৃথিবীর কোন্ পদার্থইবা নিজের রূপে রূপবান? দিবসে সৌরকর স্পর্শে যেমন স্থাবরজঙ্গমাত্মক বিশ্বচরাচরের প্রত্যেক পদার্থ নিজ নিজ শক্তি অনুসারে সূর্য্যালোক ধার করিয়া বস্তুতঃ এক এক নির্দ্দিষ্টরূপ ধারণ করে, যাহার সহিত আর সকলের রূপের প্রভেদ বুঝিতে পারি, তেমন অন্ধকার রজনীতে যখন আলোকাভাবে বিশ্বচরাচরের রূপ ফুটিতে পারে না, তখন বায়ুও হৃতরূপ বা স্বস্বরূপাবস্থিত হয়। যদি বায়ুর আলোকসমাগমে রূপময় হইবার সম্ভাবনা না থাকিত, তাহাহইলে দিবারাত্রভেদে বায়ু-প্রতিফলিত প্রভাব বায়ুর এইরূপ ভেদ সম্ভব হইত না। প্রকৃতপক্ষে অন্যান্য বস্তুর ন্যায় বায়ুও আলোকসংসর্গে সেই এক অপরূপ স্বচ্ছরূপে রূপবান্ হইয়া থাকে, যাহা আমরা বুঝিয়াও সহজে বুঝিতে বা বুঝাইতে পারি না। বায়ুর স্বচ্ছরূপ না থাকিলে আমরা কি স্বপ্রকাশ, কি পরপ্রকাশ, কোন বস্তুরই রূপ দেখিতে পাইতাম না—সকলেরই রূপের তরঙ্গ বায়ুর বাহ্যাঙ্গে প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া যাওয়ায়, তাহা কখনই আমাদের চক্ষুর সম্বন্ধের অন্তর্গত হইতে পারিত না। কাচ, জল এবং আরও কতকগুলি জলীয় ও বায়বীয় পদার্থ স্বচ্ছ; অনেক সময় আমরা বায়ুর রূপের ন্যায় ইহাদেরও রূপ দেখিতে পাই না। আবার যেমন অবস্থানভেদে এই সকল স্বচ্ছপদার্থের রূপ দেখিতে পাই, তেমনই অবস্থানভেদে বায়ুরও রূপ দেখিতে পাই। জলমধ্যে যখন খণ্ডিতবায়ু বুদ্বুদ আকারে উঠিতে থাকে, তখন চতুর্দ্দিকস্থ জলের রূপের দ্বারা সীমাবচ্ছিন্ন হওয়ায় সেই বায়ুগোলকের রূপ জলপ্রভানুবন্ধীভাবে কেমন সুন্দররূপে দেখিতে পাই

চক্ষুদ্বারা সচরাচর গতি-জ্ঞানও আমাদের হয়। কিন্তু ইহাতেও আমরা অনেক সময়ে প্রতারিত হইয়া থাকি। গতিশীল তরণী বা অন্য কোন যানে বসিয়া থাকিয়া অনেক সময় আমরা যান এবং আমাদিগকে গতিহীন এবং চতুর্দ্দিকস্থ গতিহীন পদার্থসকলকে গতিশীল জ্ঞান করিয়া থাকি। মেঘাচ্ছাদিত আকাশের গতিশীল মেঘকে গতিহীন মনে করিয়া, গতিহীন চন্দ্রকে গতিশীল জ্ঞান করি। নিত্য তীব্র গতিশীলা পৃথিবীকে অচলা মনে করিয়া, অচলপ্রায় সূর্য্যকে পৃথিবী পরিবেষ্টন করিয়া ঘুরিতে দেখি। কোন চক্র যখন ধীরে ধীরে ঘুরিতে থাকে, তখন তাহার ঘূর্ণন দেখিতে পাই, কিন্তু যখন চক্রটী অত্যন্ত বেগে ঘুরিতে থাকে, তখন তাহার সেই ঘূর্ণন দেখিতে পাই না। একখানি যষ্টির দুই প্রান্তে অগ্নি জ্বালাইয়া দিয়া যদি কেহ সেই যষ্টিকে বেগে ঘুরাইতে থাকে, সেই ঘূর্ণিত আলোকদ্বয়কে একটি গতিহীন আলোক-চক্রের আকার ধারণ করিতে দেখি। বস্তুতঃ শুধু চক্ষুদ্বারা আমরা গতি নির্ণয় করিতে যাইয়া প্রায়ই গতিশীলকে গতিহীন এবং গতিহীনকে গতিশীল মনে করি। কতকগুলি পদার্থ—যাহাদিগকে আমরা স্থির মনে করি, প্রকৃত পক্ষে তাহারা আপেক্ষিক ভাবে স্থির ভিন্ন নিরপেক্ষ স্থির নহে; পরন্তু পরিদৃশ্যমান জগতে কোন পদার্থই নিরপেক্ষভাবে স্থির নহে। সাধারণ দৃষ্টিতে যাহাকে আমরা স্থির মনে করি, একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে তাহাকেই আবার অস্থির বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হই। কোনও ইন্দ্রিয়ের প্রমাণে কোনরূপ গতি অনুভব করিতে না পারিয়া, যে পৃথিবীর নাম রাখা হইয়াছে অচলা, সেও অবিশ্রামে মহাবেগে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, অন্যে পরে কা কথা! পৃথিবী স্থির নহে, সুতরাং পৃথিবীর পৃষ্ঠে যত কিছু

আছে, কেহই স্থির নহে। তবে যে আমরা কাহাকেও স্থির—কাহাকেও অস্থির বলি, তাহা কেবল অস্থিরতার ন্যূনাধিক্য বিবেচনা করিয়া বলিয়া থাকি। গতিশীলা পৃথিবীকে স্থির মনে করিয়া এবং পৃথিবীর গতিতে সমান গতিশীল পার্থিব পদার্থ সকলের সাধারণ গতি গণনায় না আনিয়া, তাহাদের বিশেষ গতি-স্থিতির তারতম্য করিয়া কাহাকেও গতিশীল—কাহাকেও গতিহীন বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকি। প্রকৃতপক্ষে কিন্তু কেহই সম্পূর্ণ গতিহীন নহে।

চক্ষুদ্বারা আমরা বাহ্যবস্তুর সংখ্যাও নির্ণয় করি, কিন্তু তাহাও নিরপেক্ষ সংখ্যার জ্ঞান নহে। চক্ষুর গঠনের ইতর-বিশেষে রূপজ সংখ্যা-জ্ঞানের ইতর বিশেষ হয়। আমাদের চক্ষু যদি বর্ত্তুল না হইয়া চক্রাকারে সজ্জিত কতকগুলি কাচ খণ্ডবৎ হইত, তাহাহইলে একই প্রকৃতির প্রতিবিম্ব প্রত্যেক খণ্ডে পতিত হইয়া প্রতিবিম্বের সংখ্যানুসারে বিম্ব-পদার্থের সংখ্যা-জ্ঞান হইত এবং আমরা কোন একটী বস্তুকে এখনকার মত একাকৃতিগত না দেখিয়া বহ্বাকৃতিগত দেখিতাম। পুনশ্চ আমাদের দুইটী চক্ষু এবং সাধারণতঃ দুইচক্ষুদ্বারা একমাত্র রূপ দর্শন করি, কিন্তু চক্ষু দুইটী যে আকারে গঠিত ও বিন্যস্ত, তাহাতে ইচ্ছা করিলেই তাহাদের অবস্থান-ভেদ জন্মাইয়া সকল বস্তুকেই যুগলমূর্ত্তিতে দেখিতে পারি। যদি চক্ষু দুইটীকে সহজভাবে দ্রষ্টব্য পদার্থ হইতে দূর বা নিকটের কোন মধ্যে দৃষ্টিনিবদ্ধ করিয়া দ্রষ্টব্যকে দেখিতে প্রয়াস পাওয়া যায়, তাহাহইলে তাহাকে যুগলমূর্ত্তিতে দেখা যায়। আমার এই যুগলমূর্ত্তির বিষয়ীভূত বস্তুটীকে যদি ক্রমে নিবদ্ধ লক্ষ্য পদার্থের দিকে সরাইয়া আনা যায়, তাহাহইলে যুগলের মধ্যের অন্তর ক্রমে হ্রাস হইতে হইতে লক্ষ্যস্থানে যুগলত্ব একেবারে অন্তর্হিত হয় এবং যুগলমূর্ত্তি একত্র মিলিত হইয়া এক হইয়া যায়। অপর, নাসিকামূলের দুই পার্শ্বে দুই অঙ্গুলী রাখিয়া অঙ্গুলীদ্বয়কে দেখিতে গেলে দুটী অঙ্গুলী মিলিত হইয়া একটী স্থূল অঙ্গুলীর মত দেখায় এবং একত্বভাবাপন্ন সেই অঙ্গুলী দুইটীকে নাসিকামূল হইতে দূরে লইলে, আবার তাহাদের একত্ব বিচ্ছিন্ন হইয়া দ্বিত্ব প্রকাশিত হয়। নাসিকাগ্রে নিবদ্ধ চসমার কাচ দুই খানিকে একখানি বৃহৎ কাচ বলিয়া জ্ঞান হয়। মানব চক্ষু এইরূপ গঠিত ও বিন্যস্ত না হইয়া যদি এমন একভাবে গঠিত ও বিন্যস্ত হইত যে, তদ্দ্বারা সর্ব্বদা সর্ব্বাবস্থায় আমরা সম্মুখস্থ প্রত্যেক মূর্ত্তিকে বহ্বাকৃতিগত দেখিতে বাধ্য হইতাম, তাহাহইলে আমাদের তদবস্থার চাক্ষুষজ্ঞান বর্ত্তমান অবস্থার চাক্ষুষ জ্ঞান হইতে কত বিভিন্ন ও বিচিত্র হইত!

চক্ষুদ্বারা আমরা সকল পদার্থের আয়তনও স্থির করিতে যাই এবং তাহাতেও বিস্তর ভ্রমে পড়ি। চক্ষুর বর্ত্তুলত্বের হ্রাস-বৃদ্ধিতে একই দৃষ্টবস্তুর আয়তনের এবং দূরাদূরত্বের ইতর বিশেষ হয়। আবার একই পদার্থ দূরাদূর-ভেদে একবার ছোট একবার বড় দেখায়। অতএব চক্ষুদ্বারা কোন বস্তুর নিরপেক্ষ আয়তন স্থির হইবার সম্ভাবনা নাই। সহজ দৃষ্টিতে পৃথিবী অপেক্ষা সূর্য্য কত ছোট দেখায়, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে সূর্য্য পৃথিবী অপেক্ষা কত বড়! একটী টাকাকে চক্ষুর সঙ্গে লাগাইয়া ধরিলে, তাহাকে একবারেই দেখা যায় না; ক্রমে চক্ষু হইতে দূরে লইতে থাকিলে, কোন এক স্থানে তাহাকে দেখা যায় এবং সেই স্থান হইতে যতই দূরে লইয়া যাওয়া যায়, টাকটীর আয়তন ততই ক্ষুদ্র হইতে থাকে; অবশেষে এত ক্ষুদ্র হইয়া পড়ে যে, তাহাকে আর দেখা যায় না।

একই বস্তু যখন নিকটে আসিলে বড় দেখায় এবং দূরে যাইলে ছোট দেখায়, তখন সুধু চক্ষুর সাহায্যে কোন পদার্থের প্রকৃত আয়তন জানিবার উপায় নাই। ফলতঃ চক্ষু মহাশয় তাঁহার সহজাত ভ্রাতাদের সহিত যুক্তি না করিয়া কাহারও আয়তনসম্বন্ধে কোন কথা বলিতে পারেন না, এবং সকলের সহিত যুক্তি করিয়াও যাহা বলেন, তাহা যে প্রবঞ্চনাময়, ইহা আমরা সহজে বুঝিতে পারি না!

চক্ষুদ্বারা দূরত্বজ্ঞানও আমাদের হয়, কিন্তু সে জ্ঞানও ভ্রমসঙ্কুল। দূরত্বের তারতম্যে দ্রব্যের আয়তনের হ্রাস বৃদ্ধি দেখায়, আবার বস্তুর আয়তনের ইতর-বিশেষে দূরত্বেরও হ্রাস-বৃদ্ধি বোধ হয়। যে দুইটী পদার্থকে আয়তনে সমান বলিয়া জানা থাকে, সেই দুইটী বস্তুর যাহাকে ছোট বলিয়া জ্ঞান হয়, তাহাকে দূরস্থ মনে করি এবং যাহাকে বড় দেখায়, তাহাকে নিকটস্থ জ্ঞান করি। আকাশে যে অসংখ্য নক্ষত্র জ্বলিতেছে, ইহাদের কে নিকটে, কে দূরে অবস্থিত, আর কেই বা বড়, কেই বা ছোট, তাহার মীমাংসা চাক্ষুষ জ্ঞানসাধ্য নহে। তবে সকলকে সমান দূরস্থ মনে করিয়া তাহাদের আপেক্ষিক ক্ষুদ্রাক্ষুদ্রত্বের এবং সকলকে সমানায়তন বলিয়া ধরিয়া লইয়া তাহাদের আপেক্ষিক দূরাদূরত্বের এক অপসিদ্ধান্ত করিয়া থাকি; মূলে কিন্তু দূরাদূরত্বের বা আয়তনের ক্ষুদ্রাক্ষুদ্রত্বের নিশ্চিতাবধারণা না হওয়ায় প্রকৃতপক্ষে কে ছোট, কে বড়, আর কে দূরে, কে নিকটে, তাহা বুঝিবার উপায় নাই।

একটা চিত্রের সমালোচন করিতে যাইয়াও আমরা চাক্ষুষ জ্ঞানের অতিরিক্ত সিদ্ধান্ত করি। এক ইঞ্চি স্থানের মধ্যে একটা নগর কল্পনা করিতে পারি, তিল প্রমাণ একটী প্রতিকৃতি জান্ত প্রাণ দেখিতে পাই। একই সমতলক্ষেত্রগত বিবিধ বর্ণসংঘাতকে দূরাদূরসন্নিবিষ্ট বলিয়া মনে করি। এ সকল আমাদের দৃষ্টিভ্রমেরই কার্য্য।

দর্শনেন্দ্রিয়দ্বারা দ্রষ্টব্য পদার্থকে আমরা যে স্থানে দর্শন করি, তাহাও নিরপেক্ষ স্থান নহে। দুই চক্ষুদ্বারা যে পদার্থকে যে স্থানে দেখা যায়, এক চক্ষুদ্বারা তাহাকে সে স্থানে দেখা যায় না; হয় এ পাশে না হয় ওপাশে সরিয়া থাকা বোধ হয়। আবার জলতলস্থ কোন পদার্থকে যেমন তাহার প্রকৃত স্থান হইতে চতুর্থাংশমিত উপরিস্থ জ্ঞান হয়, তেমনই স্বচ্ছ বায়ু জগতের বায়ুস্তরের গাঢ়তার তারতম্যানুসারে যাবতীয় বস্তুকে তাহাদের প্রকৃত আয়তন ও অবস্থান হইতে অনেকাংশে ভিন্ন রূপ দেখায়। সেই জন্য প্রৌঢ় সূর্য্যাপেক্ষা বালক ও বৃদ্ধারুণ অধিকতর দূরবর্ত্তী হইয়াও বৃহত্তর দেখায় এবং সাধারণতঃ দৃষ্টিপথের বাহিরে থাকিয়াও অস্ত ও উদয়কালে আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়।

চক্ষুর সম্মুখে একখানা দর্পণ ধরিলে তাহার অভ্যন্তরে কতকগুলি রূপ দেখিতে পাই। সেই রূপ গুলিকে আমার এবং আমার পার্শ্বস্থ বস্তু সকলের প্রতিবিম্ব বলিয়া থাকি। কিন্তু যে স্থলে দর্পণের অস্তিত্ব দৃষ্টিতে অনুভব করিতে পারি না, সে স্থলে প্রতিবিম্ব সকলকে প্রকৃত পদার্থ বলিয়া জ্ঞান হইয়া থাকে। আমাদের এই দৃষ্টি-ভ্রমের সম্ভাবনার উপর নির্ভর করিয়া যাদুকর সকল আমাদিগকে কাটামুণ্ডের কথা শুনাইয়া থাকে এবং আরও কত প্রকার অলৌকিক দৃশ্য দেখায়। প্রতিবিম্ব সম্বন্ধে সুধু চক্ষুর সাহায্যে যে জ্ঞানটী পাওয়া যায়, তাহাতে যে কোন অলীকতা আছে, চক্ষু তাহা ধরিতে পারে না। তবে, যখন হাত বাড়াইয়া আমরা দর্পণের ক্রোড়স্থ

প্রত্যক্ষবৎ দৃষ্ট বস্তু সকলকে ধরিতে ছুঁইতে পারি না এবং দর্পণের পৃষ্ঠের দিকেও অনুসন্ধান করিয়া যখন কিছু দেখিতে বা স্পর্শ করিতে পারি না, প্রত্যুত যখন দর্পণের সম্মুখস্থ বস্তু সকলকে সরাইলে তাহার ক্রোড়স্থ বস্তু সকলও অদৃশ্য হয়, আর বিম্ব সকলকে স্পর্শ করিলে, প্রতিবিম্ব সকলকেও স্পর্শ করার মত দেখায়, তখন আমরা অনুমান করি যে, সম্মুখস্থ বস্তুর রূপ দর্পণে প্রতিবিম্বিত হইয়া প্রকৃতবৎ দেখাইতেছে। দর্পণের প্রতিবিম্ব প্রকৃতবৎ দেখাইতেছে, তথাচ তাহার প্রকৃত অস্তিত্ব আমরা স্বীকার করি না! যে সকল যুক্তি-মুখে অন্যান্য বাহ্য বস্তুর রূপানুভব করি; রূপাধার বস্তুর অনুমান করি, প্রতিবিম্বের বাস্তবিকতা সম্বন্ধেও সে সকল যুক্তি না খাটে, এমন নহে। প্রতিবিম্বকে চক্ষুদ্বারা দেখিতে পাই, বিম্বকে স্পর্শ করিয়া প্রকারান্তরে প্রতিবিম্বকেও স্পর্শ করিতে পারি। বিম্বের রস, গন্ধ যেমন অনুভব করি, প্রকারান্তরে প্রতিবিম্বের রস-গন্ধও তেমনি অনুভব করিতে পারি। বিম্ব বর্ত্তমান থাকিলে দর্পণে প্রতিবিম্ব দেখি, কিন্তু বিম্ব সরাইলে প্রতিবিম্বও সরিয়া যায়; কেবল এই টুকুর উপর নির্ভর করিয়া প্রতিবিম্বকে অলীক অবাস্তবিক বিবেচনা করিবার কি আছে? আকাশের গ্রহ-নক্ষত্রাদি কাহারও রূপ ভিন্ন রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দাদি কিছুই অনুভব করিতে পারি না, সেই রূপও নানাকারণে নানা সময় দেখিতে পাই না, তবুও তাহাদের সত্তার বাস্তবিকতা অস্বীকার করি না, কিন্তু জলমধ্যে তাহাদের যে প্রতিবিম্ব পড়ে, তাহার বাস্তবিকতা অস্বীকার করি।

চাক্ষুষজ্ঞান সম্বন্ধে আরও কিছু বলিবার আছে। যাবতীয় পদার্থের প্রতিবিম্ব চক্ষুরূপ দুই খানি দর্পণে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্ররূপে পতিত হয়। বিম্বনিঃসৃত সে সকল রূপ-রেখা এক চক্ষুতে পড়ে, সে সকল রূপ-রেখা অপর চক্ষুতে পড়ে না। বিম্ব হইতে অসংখ্য রূপ-রেখা চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে। তাহারই কতকগুলি এক চক্ষুতে এবং কতকগুলি অন্য চক্ষুতে পড়িতেছে। চক্ষুর সম্মুখে দূরাদূরাবস্থিত অনেক পদার্থ রহিয়াছে এবং সেই সকলের প্রত্যেকটী হইতেই ঐরূপ দুইটী স্বতন্ত্র আলোক-ধারা চক্ষুতে পড়িতেছে। সেই সকল বহুরূপিণী আলোকধারা চক্ষুতে পড়িবার পূর্ব্বে পথে পরস্পরে ঘাত প্রতিঘাত হইতেছে এবং চক্ষুর মধ্যেও অতি ক্ষুদ্রায়তন একটী সমতলক্ষেত্রে সংগৃহীত হইতেছে। চক্ষুমধ্যে সংগৃহীত হইতেছে, তাই কি সোজাভাবে? তাহাও নহে; বিপর্য্যস্ত ভাবে সংগৃহীত হইতেছে; এরূপ অবস্থায় উভয় চক্ষুতে, অতি ক্ষুদ্রায়তন স্থানে সমতলক্ষেত্রে, বিপর্য্যস্তভাবে, যে সকল বর্ণময় ক্ষুদ্র প্রতিবিম্ব পড়ে, তাহা হইতে বৃহদায়তন, দূরাদূরস্থ অবিপর্য্যস্ত এবং ঘনক্ষেত্রাকার বিম্বের রূপ দেখিয়া থাকি। চক্ষুতে পড়ে দুইটী প্রতিবিম্ব, আমরা দেখি একটী বিম্ব! চক্ষুতে পড়ে সর্ষপায়তন প্রতিবিম্ব, আমরা দেখি তালপ্রমাণ বিম্ব!! চক্ষুতে যে প্রতিবিম্বের মাথা নীচে থাকে, তাহারই বিম্বের মাথা দেখি উপরে। চক্ষুতে সকল প্রতিবিম্ব এক সমতলে থাকে, বাহিরে তাহাদিগের বিম্ব সকলকে অসমতলে দূরাদূরস্থ বলিয়া মনে করি! প্রতিবিম্ব সকল থাকে সমতলক্ষেত্রাকারে, আমরা বিম্ব সকলকে দেখি ঘনক্ষেত্রাকারে! প্রতিবিম্ব পড়ে এক বর্ণের, বিম্বকে দেখি আর এক বর্ণের! বামচক্ষুদ্বারা বিম্বকে দেখি এক স্থানে, দক্ষিণ চক্ষুদ্বারা বিম্বকে দেখি অন্য স্থানে, উভয় চক্ষুদ্বারা বিম্বকে দেখি মধ্যস্থানে! কিমাশ্চর্য্যমতঃ পরং!

রূপের জ্ঞান কেবল দর্শনেন্দ্রিয়-সাপেক্ষ। ঘ্রাণেন্দ্রিয়াদি অপর ইন্দ্রিয়-চতুষ্টয় রূপের অস্তিত্ব-সম্বন্ধে কোন কথা বলে না। রূপ-সম্বন্ধে চক্ষু যে টুকু বলিতে পারে, তাহা তাহার বাহ্যাস্তিত্বের জ্ঞাপক নহে। চক্ষুরন্তর্গত প্রতিবিম্ব এবং বহিঃস্থ বিম্বে আকৃতি গত, অবস্থানগত, বর্ণগত, সংখ্যাগত বিভিন্নতা বুঝিতে পারি। কিন্তু সেই প্রতিবিম্বকে আমি কোন রূপে অনুভব করিতে পারি না, অথচ সেই অননুভূত অসত্য প্রতিবিম্বকে অবলম্বন করিয়া অশ্রুত অস্পৃষ্ট অনাঘ্রাত অনাস্বাদিত বহিঃস্থ বিম্বরূপের অস্তিত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতেছি!! বস্তুতঃ রূপ-জ্ঞানটী ঐন্দ্রিয়িক, কিন্তু রূপের বাহ্যাবস্থানগত জ্ঞান সমস্তই আনুমানিক—সম্পূর্ণই কাল্পনিক (ক্রমশঃ)

শ্রীউমেশচন্দ্র মৈত্র।

জ্যোতিষ-তত্ত্ব।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

হোম, জপ প্রভৃতির দ্বারা গ্রহ-শান্তির মর্ম্মোদ্ঘাটন ও মন্ত্রের বৈজ্ঞানিক রহস্য।

আর একটী প্রশ্নের মীমাংসা করিয়া এই জ্যোতিষতত্ত্বাধ্যায় সমাপ্ত করিব। মানবের গ্রহবৈগুণ্য হইলে জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ নবগ্রহ-পূজা ও হোম, জপ, সস্ত্যয়ন প্রভৃতি এবং ধাতু-দ্রব্যাদিদ্বারা গ্রহশান্তি করেন। ঐ প্রকার গ্রহশান্তির ব্যবস্থা জ্যোতিষ-শাস্ত্রমূলক বটে। প্রকৃতপক্ষে উপরোক্ত পূজা, হোম ও জপ প্রভৃতির মূলে কোন সত্য আছে কিম্বা ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের স্বার্থ-সম্ভূত কল্পনা হইতে ঐ হোম, জপ প্রভৃতির সৃষ্টি হইয়াছে? ফলিতার্থ কোন কার্য্যের মূলে প্রকৃত সত্য থাকিলেও কালক্রমে তাহার অপভ্রংশ হইয়া যে কতকটা সেই ভাবে পরিণত হইতে পারে, তৎপক্ষে সন্দেহ নাই। তদনুসারে কেবল জ্যোতিষ বলিয়া নহে, সমস্ত শাস্ত্র এবং মত, কালক্রমে স্বার্থাভিসন্ধি ও অমূলক বিশ্বাসে যে পরিণত হইয়াছে, তৎপক্ষে সন্দেহ নাই। যাহাহউক, ঐ প্রকার বিকৃতিতেও প্রকৃত সত্যের কখনই অপলাপ হইতে পারে না। যাহা সত্য, তাহা চিরকালই সত্য থাকিবে; ঐ সত্যের সহিত সহস্র সহস্র ভণ্ডামি বা অসত্য মিশ্রিত হইলেও সত্যের কখনও ধ্বংস নাই। কষ্টিপাথরে স্বর্ণ নিশ্চয়ই কসিয়া লওয়া যাইতে পারে। কবি যথার্থই বলিয়াছেন "হেম্নঃ-সংলক্ষ্যতে হ্যগ্নৌ বিশুদ্ধি সাসিকাপিব"। একণে ধাতুধারণ ও জপ, হোম প্রভৃতির মূলে প্রকৃত সত্য কি? প্রথমতঃ ধাতু-দ্রব্য ধারণ সম্বন্ধে বোধ হয় অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই। বাহ্যধাতু ও শরীরস্থ ধাতুর উপাদান ও শক্তির সামঞ্জস্য ও অসামঞ্জস্য ঘটনায় শারীরিক শুভাশুভ যে নির্ভর করে, ইহা বিজ্ঞানসম্মত এবং মানসিকশক্তির সহিত উহার যে সম্পূর্ণ সম্বন্ধ আছে, তাহা পূর্ব্বে বিশদরূপে বর্ণনা করিয়াছি, পুনরুক্তি অনাবশ্যক। হোম সম্বন্ধেও বোধ হয় অধিক বলিবার আবশ্যক হইবে না। এক এক গ্রহ শক্তির প্রকৃতি অনুসারে এক বা দুই তিনটী দ্রব্য একত্রে শত শত বার ঘৃতের সহিত প্রজ্জ্বলিত অগ্নিতে সুর-সংযোগে মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক নিক্ষিপ্ত হয়; ঐ

দ্রব্যগুলি অধিকাংশ উদ্ভিদ্ ও সুগন্ধময়, উহার মধ্যে দুই একটী ধাতব দ্রব্যও আছে; আবার বেল বা যজ্ঞডুমুর প্রভৃতি নির্দ্দিষ্ট কাষ্ঠের অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিতে হয়। হোতার স্নানানন্তর শুচি ভাবে সুগন্ধ পুষ্প-চন্দনাদি সহ ভক্তির সহিত ঐ প্রজ্জ্বলিত অগ্নিতে ঐ সকল দ্রব্য আহুতি প্রদান করিতে হয়। ঐ সকল নির্দ্দিষ্ট দ্রব্য-সংযোগে যে রাসায়ণিক ক্রিয়া উৎপন্ন হয়, তৎপক্ষে সন্দেহ নাই। ঐ সকল দ্রব্যের ঘৃত ও অগ্নিসংযোগে ধূম উত্থিত হইয়া সুগন্ধের সহিত ঐ ধূম হোতার শরীরাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হওয়ায় তাঁহার শরীরে ঐ রাসায়ণিক ক্রিয়া হইতে থাকে; হোতা যে ঐ রাসায়ণিকক্রিয়া-সম্ভূত ফলভোগী হন, ইহাও নিশ্চিত। ঐ সকল বস্তুর রাসায়ণিকসংযোগে অবস্থাভেদে অম্লজান, যবক্ষারজান, জলজান, গন্ধক প্রভৃতি উত্তেজক, নিবর্ত্তক প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন উপাদান শরীরে প্রবিষ্ট হওয়ায়, গ্রহশক্তির আকর্ষণে শরীরের যে সকল উপাদানের অভাব ঘটে, তাহার পূরণ হয়। ঐ সকল উপাদানের সহিত যে মানসিকসম্বন্ধ আছে ও উহা যে মানসিকবৃত্তি ও শক্তিবিশেষের উত্তেজক ও নিবর্ত্তক, তাহা পূর্ব্বে যথেষ্ট বিবৃত হইয়াছে; অতএব ঐ সকল উপাদান ও রাসায়ণিকক্রিয়াহেতু শারীরিক ও মানসিকশক্তি ও বৃত্তির অবস্থাভেদে অভাব পূরণ বা অসামঞ্জস্য অপনয়ন হইয়া আবশ্যকীয় সামঞ্জস্য সংরক্ষিত হয়; অতএব উহা যে গ্রহশান্তি, তৎপক্ষে সন্দেহ নাই; কিন্তু এস্থলে ভক্তি, বিশ্বাস, একাগ্রতা আবশ্যক। একাগ্রতা ধারণাশক্তিমূলক, ভক্তি ও বিশ্বাস ব্যতীত ধারণাশক্তির উদ্ভব হইতে পারে না। ধারণাশক্তি দৈবীশক্তির সম্পূর্ণ অনুকূল এবং কাম, ক্রোধ, লোভ প্রভৃতি ধারণাশক্তি ও দৈবীশক্তির প্রতিকূল, মানসিকবৃত্তি ও শক্তি-সামঞ্জস্য ও তাহাদের ক্রিয়া, গুণ ও পরস্পরের সহিত সম্বন্ধ পরবর্ত্তী প্রবন্ধে বিশদরূপে দর্শাইব, আশা করি; তবে এস্থলে এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে যে, ঐ ধারণাশক্তি হইতে নিশ্বাস-প্রশ্বাসের ভাগ ও বেগ অপেক্ষাকৃত হ্রাস হয়। ঐ নিশ্বাস-প্রশ্বাসের ভাগের ন্যূনাতিরেকানুসারে বায়ুমণ্ডলস্থ ও শরীরস্থ অম্লজান, যবক্ষারজান, জলজান, গন্ধক, লবণ প্রভৃতি অধিক গৃহীত বা নিঃসৃত হয়। তদ্দ্বারা পূর্ব্বোক্তমত অভাব-পূরণ বা আবশ্যকমত কথঞ্চিৎ সামঞ্জস্য সংরক্ষিত হইতে পারে। ঐ সকল কার্য্যে যজমান স্বয়ং হোতা হইলে অধিক ফলের সম্ভাবনা, কিন্তু যজমান স্বয়ং হোতা না হইলেও হোতার সহিত শুচি ও স্থিরভাবে ভক্তি, বিশ্বাস ও একাগ্রতা-সহ ঐ সকল কার্য্যকালে হোতার পার্শ্বে অবস্থিত হইয়া মন্ত্র শ্রবণ ও ধূম ও ঘ্রাণাদি উপভোগ আবশ্যক, তদ্ভিন্ন কিছুই উপকার হয় না; অধিকন্তু ঐ সকল কার্য্যে অধিকাংশস্থানে যজমান স্বয়ং হোতা না হইলে হোতার অপকারের সম্ভাবনা। ঐ সকল ক্রিয়াদ্বারা যজমানের কথঞ্চিৎ উপকার হইলেও হোতার শারীরিক ও মানসিকশক্তির অসামঞ্জস্য হইতে পারে। বিনা জ্বরে কুইনাইন সেবন যে অত্যন্ত অপকারক, তাহার আর সন্দেহ নাই। হোতার পক্ষে উহা প্রায় বিনা জ্বরে কুইনাইন সেবন সদৃশ। তবে বিনা হোতার অধ্যাত্মশক্তির আধিক্যস্থলে আশঙ্কা নাই। যজমানের পক্ষেও অনেকস্থলে ঐরূপ ঘটিয়া উঠে। শ্লেষ্মাজ্বরে মহালক্ষ্মীবিলাস, শ্লেষ্মাশৈলেন্দ্ররস প্রভৃতি অনেকগুলি ঔষধের ব্যবস্থা আছে। অবস্থানুসারে ঔষধ ও তাহার পরিমাণ ঠিকমত ব্যবহার না হইলে, হয় কিছুই ফল হয় না, নচেৎ হিতে বিপরীত হয়। এক্ষণকার অধিকাংশ জ্যোতির্ব্বিদগণ ফলিতজ্যোতিষের প্রকৃত তত্ত্ব প্রায়

কিছুই জানেন না। ঐ শাস্ত্রটীও তিনচারি সহস্রাধিক বর্ষ পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে। সেই কালের সহিত গ্রহগণের স্থিতি-গতি-সম্বন্ধও কিছু পরিবর্ত্তিত হইয়াছে; তদ্দ্বারা গণনার পূর্ব্ব আদেশ, স্থলবিশেষে এক্ষণে দুই একটী অপ্রযোজ্যও হইতে পারে। শান্তি-সম্বন্ধে দ্রব্যাদি ও তাহার ক্রিয়াপদ্ধতিরও কথঞ্চিৎ পরিবর্ত্তনের সম্ভাবনা; বিশেষতঃ কার্য্যও অনেক সময় ঠিক্ হয় না; তদ্ভিন্ন ঋষিগণকর্ত্তৃক আদিমকালে যে সকল ব্যবস্থা প্রণীত হইয়াছিল, তাহার অবস্থা এক্ষণে ঠিক্ নাই; আধুনিক জ্যোতিষব্যবসায়ীগণ স্বার্থের অনুরোধে তাহা অনেকটা রূপান্তর করিয়াছেন, ঐ রূপান্তরিত ব্যবস্থাই এক্ষণকার শাস্ত্র; সুতরাং পূর্ব্বোক্তমত গ্রহশান্তির মূলে প্রকৃত সত্য থাকিলেও তাহা এক্ষণে অধিকাংশ স্থানেই প্রয়োজ্য নহে, তবে যজমানের প্রকৃতি ও ক্রিয়ানুসারে ফল হইতে পারে।

পূর্ব্বোক্ত হোমাদির ন্যায় জপও বিজ্ঞানানুমোদিত। জপের দুইটী ফল একাগ্রতা ও চিন্তাজনিত এবং অন্তরে প্রকৃত শব্দের উচ্চারণজনিত। ঋষিগণ মানবের জৈবীশক্তির ও মানসিক বৃত্তি ও শক্তির অনুকূল শব্দ উচ্চারণ দ্বারা নিশ্বাস-প্রশ্বাসের ভাগ ও বেগ পরিমাপক কতকগুলি বীজ-মন্ত্র ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন, যথা ওঁ, হ্রাং, হ্রীং, ক্লীং, ক্রূং, হুং প্রভৃতি; ঐ সকল বীজের উচ্চারণের তারতম্যানুসারে নিশ্বাস-প্রশ্বাসের ভাগ ও বেগ নির্ণয় করিয়া, কোন্ বীজের জপ দ্বারা কি পরিমাণ অম্লজান, যবক্ষারজান, জলজান, গন্ধক, লবণ প্রভৃতি গৃহীত হইতে পারে, তাহা স্থির করতঃ এক এক গ্রহ-শক্তির অনুকূল বা প্রতিকূল বীজ-মন্ত্র সকল অবধারণ করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং বীজ-মন্ত্র জপ দ্বারা রাসায়নিক ক্রিয়া ও ঔপাদানিক শক্তির আবশ্যকীয় সামঞ্জস্য সংরক্ষিত ও তদ্দ্বারা এই সকল প্রতিকূল গ্রহ-শক্তি নিবারিত হইতে পারে ও এক একটী বীজের সহিত এক একটী শক্তির চিন্তা দ্বারা পূর্ব্বোক্ত ফল হয়; কিন্তু ঐ সকল শক্তি চিন্তার পূর্ব্বে সেই সকল শক্তির ধারণা আবশ্যক; প্রকৃত পক্ষে শক্তির ধারণা ও চিন্তা বা ধ্যান কি উপায় দ্বারা আয়ত্তাধীন করা যায়, তাহার উপদেশ অতি বিরল; তবে ভক্তি ও বিশ্বাসের সহিত জপে পূর্ব্বোক্ত মতে কথঞ্চিৎ ফল হইতে পারে; কিন্তু ঐ জপ দ্বারা যেরূপ রাসায়নিক ক্রিয়া উৎপন্ন হয়, অনেক স্থলে জপকারী তাহা সহ্য করিতে না পারায়, বিপরীত ফল হয়। কোন ব্যক্তির শরীরের অতি দৌর্ব্বল্য-অবস্থায় উহার বলাধানের নিমিত্ত অধিক উত্তেজক ঔষধি সেবন বা অধিক বলকারী খাদ্য পথ্য দিলে নিশ্চয়ই রোগীর অপকার হয়। চিরকাল "বেচারা কৃষ্ণের জীবের" ন্যায় অর্দ্ধ পোয়া চাউলের অন্ন ও ক্ষুদ্র মৎস্যের ঝোল যে ব্যবহার করে, তাহাকে হঠাৎ বলাধান করিবার নিমিত্ত প্রতিদিন 'পোলাও কালিয়া' ভক্ষণ করিতে দিলে, নিশ্চয়ই তাহার উদরাময় পীড়ার উৎপত্তি হইয়া শীঘ্রই তাহার মানবলীলা সম্বরণ করিতে হইবেক। সেইরূপ পুরুষানুক্রমে আধ্যাত্মিক শক্তি পরিচালনাভাবে ঐ শক্তিহীন অনভ্যাসী ব্যক্তি হঠাৎ মনোবৃত্তি দমন করিয়া (মনের বেগ বশতঃ) নিবৃত্তি-শিক্ষার নিমিত্ত উত্তেজক খাদ্যাদিপরিত্যাগ করিয়া কঠোর জপে মন নিবেশ করিলে, স্বীয় শক্তি অভাবে নিশ্চয়ই মস্তিক বিঘূর্ণিত ও শারীরিক মানসিক পীড়াগ্রস্ত হইয়া পড়িতে হইবে, সন্দেহ নাই। (আমরা যোগ-তত্ত্ব বর্ণন কালে কর্ম্মযোগ-সিদ্ধি ব্যতীত ধ্যান-যোগ-সাধনা যে ভয়ঙ্কর কঠিন, তাহা প্রতিপন্ন করিয়াছি)। এস্থলে অধিক বাখাহুল্যের

আবশ্যকতা নাই; তবে মন্ত্র-শক্তি যে বিজ্ঞানানুমোদিত, তাহা পূর্ব্বোক্ত বর্ণনা দ্বারা প্রতিপন্ন হইল। যাহা হউক, আমাদের প্রস্তাবিত গ্রহ-শক্তি সম্বন্ধে উত্থিত প্রশ্নের যথাসম্ভব মীমাংসা হওয়ায়, আমরা জ্যোতিষ-তত্ত্ব এই স্থানে সমাপ্ত করিলাম.

শ্রীশশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

তন্ত্রশাস্ত্র।

আজকাল নব্যশিক্ষিত অনেকেই তন্ত্রশাস্ত্রকে গুরু-ব্যবসায়ীদিগের কৃত অর্থ-উপার্জ্জনের উপায় জন্য কল্পিত শাস্ত্র বলিয়া তাহার প্রতি শ্রদ্ধা করেন না। ফলতঃ ঐ শাস্ত্রকে কালক্রমে তদ্রূপ ব্যবসায়োপযোগী করার জন্য যে মূলতন্ত্রে বহুবিধ প্রক্ষিপ্ত, রূপক ও অর্থবাদাদি-যোগে চেষ্টা করা হইয়াছে, তাহা উক্ত শাস্ত্রীয় আধুনিক মুদ্রিত গ্রন্থাদি দেখিলে, অতি সহজেই বোধগম্য হইতে পারে। বেদের বহুপর তন্ত্রশাস্ত্র প্রকাশিত হইয়াছে সৃষ্ট পদার্থ দর্শনে স্রষ্টা—অর্থাৎ ঈশ্বর-প্রতিপাদন ও তাহার উপাসনাই বেদের বিষয়। যখন কালক্রমে হিন্দু-জাতির বুদ্ধির প্রখরতার উৎকর্ষ সাধন হইতে লাগিল, তখন পরমার্থ বিষয়ে মন অগ্রসর হইয়া বুদ্ধির সাহায্যে কালক্রমে দর্শন ও উপনিষৎ এবং তন্ত্রশাস্ত্র সমুদায় প্রকাশিত হইয়াছে। তন্ত্র কোন স্বতন্ত্র ধর্ম্মশাস্ত্র নহে, উহা বেদেরই রূপান্তর—বিশেষতঃ সাংখ্যদর্শন ও উপনিষদের সার। উহাতে মুক্তির সহজ উপায় নির্দ্ধারিত ও বিচারিত হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে বাক্‌সর্ব্বস্বতা ও ক্রিয়াশূন্যতা-দোষে ভারতসমাজে তন্ত্রশাস্ত্রের যেরূপ ঘোর দুর্দ্দশা উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে তন্ত্রের নাম শুনিলেও অনেকে উপহাস করিবেন, বিচিত্র কি? ফলতঃ যেরূপ যথেচ্ছভাবে প্রবৃত্তি-প্রলোভিনী কল্পিত ব্যবস্থা তন্ত্রের অন্তর্নিবিষ্ট করার চেষ্টা হইয়াছে, তাহাতে অনভিজ্ঞগণের উপহাসকরাও নিতান্ত অসঙ্গত বলা যায় না। মুসলমান-রাজত্ব সময়ে হিন্দুদিগের কোন গ্রন্থই অক্ষতাবস্থায় ছিল না; ঐ সময়েই তন্ত্রশাস্ত্রেরও দুর্দ্দশা উপস্থিত হইয়াছে। একদিকে মুসলমানদিগের অত্যাচার, অন্যদিকে হিন্দুসমাজে সদ্‌গুরুর বিরলতাবশতঃ শিক্ষা-বিভ্রাট-সম্ভূত স্বেচ্ছাচারিতায় প্রক্ষিপ্ত বিষয়াদিতে পরিপূর্ণ হইয়া প্রকৃত তন্ত্রশাস্ত্র অনেক স্থলে এরূপ ভাবে বিকৃত হইয়া পড়িয়াছে যে, তাহা হইতে অবিকৃত-তত্ত্ব অনুসন্ধান করা অল্পাধিকারীর পক্ষে অসম্ভব। বেদ ও সদাচার-বিরুদ্ধ কত তন্ত্রগ্রন্থ নূতন রচিতও হইয়াছে। কিন্তু তজ্জন্য সাধারণ লোক ভ্রমে পড়িলেও তন্ত্রতত্ত্বজ্ঞের তাহা চিনিতে বাকী থাকে না। আধুনিক অনেক বিজ্ঞ ব্যক্তি বলেন যে, প্রবৃত্তিমার্গে মন একবার ধাবিত হইলে, তাহা হইতে সহসা নিবৃত্তিমার্গে মনকে ফিরান সুকঠিন। হঠাৎ কোনমতে নিবৃত্তি সাধন করিলেও সে অপরিপক্ব সিদ্ধি স্থির থাকে না; তজ্জন্য সুকৌশলে সকামতার মধ্য দিয়াই সৎপথে মন ধাবিত করার উপায় জন্য নানারূপ আপাত-বেদবিরুদ্ধ ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ হইয়াছে। তাঁহাদের এরূপ ব্যাখ্যাও প্রায় মূল্য-হীন বোধ হয়। সত্ত্ব, রজঃ, তমো, ত্রিগুণভেদে উপাসনার অধিকার ও প্রকারভেদ বেদেও ব্যবস্থিত; সুতরাং মহাযোগ-লীলাবতার মহাদেব-প্রণীত মূল তন্ত্রশাস্ত্রও অবশ্য সে তত্ত্ব ছাড়া নহে।

শুধু শাস্ত্র-পণ্ডিত তাহা না বুঝুন, সাধন-পণ্ডিতের তাহা অবিদিত থাকে না; না বুঝিয়া তজ্জন্য যে শাস্ত্র-নিন্দা, তাহা অর্ব্বাচীনতা মাত্র। তবে কিনা আধুনিক কতিপয় তন্ত্রের অনেক স্থলেই মহাদেব ও পার্ব্বতীর কথোপকথন প্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়া অনেক বিকট, বিকৃত বা অকিঞ্চিৎকর বিধি-বিধান ধর্ম্মশাস্ত্রের অন্তর্গত করার চেষ্টা করা হইয়াছে বোধ হয়; আবার অবিকৃত প্রকৃত শিব-বাক্য-তন্ত্রেও হয়ত আপাত-দৃষ্টিতে এমন অনেক অস্বাভাবিক, অদ্ভুত ও বীভৎস বিষয় বর্ণিত হইয়াছে যে, উহার মর্ম্ম-রহস্য-মূঢ়, 'রুচি'-রোগগ্রস্ত স্থূলনীতি-সর্ব্বস্ব অনেক স্থূলাধিকারীর মতে, মহাদেব ও পার্ব্বতীর নামেও তাহার কিছু মাত্র পবিত্রতা সম্পাদন করিতে পারে নাই! ফল কথা, সকল-সাধন-ক্রিয়ান্বিত সদ্‌-গুরুর কৃপানুকূল্যের অভাবে অনেকেই আজ-কাল তন্ত্র-মথিত নবনীত না চিনিয়া কেবল ঘোল খাইয়া গোল করিতেছেন!

শ্রুতিস্মৃতিবিরুদ্ধানি আগমাদীনি যানি চ।
করালভৈরবঞ্চাপি যামলঞ্চাপি যৎকৃতম্।
এবংবিধানি চান্যানি মোহনার্থানি তানি বৈ॥
কূর্ম্মপুরাণ।

লোক সকলকে মোহাভিভূত করার জন্য শ্রুতি-স্মৃতি-বিরুদ্ধ ধর্ম্মশাস্ত্র মহাদেবের বলিবার কি কারণ ছিল? তান্ত্রিক রহস্যের মর্ম্মগ্রন্থি এই স্থানেই ভেদ করিতে হইবে। কিন্তু বক্ষ্যমান প্রবন্ধে ইহার বিস্তার-বিবৃতি আমাদের উদ্দেশ্য নহে; মাত্র তন্ত্রশাস্ত্রের মূলভিত্তি আলোচনাদ্বারা ইহার প্রয়োজন প্রতিপাদন করাই আমাদের লক্ষ্য। এ দুর্দ্দিনে দেবদেবই তাঁহার অপার কৃপার যন্ত্র তন্ত্রকে বিকৃতি-বিপ্লব হইতে রক্ষা করুন।

প্রকৃত তন্ত্রশাস্ত্র-মধ্যে বেদ-বিরুদ্ধ ব্যবস্থা অতি স্পষ্টরূপে নিষিদ্ধ হইয়াছে।

"দেবীনাঞ্চ যথা দুর্গা বর্ণানাং ব্রাহ্মণো যথা।
তথা সমস্তশাস্ত্রাণাং তন্ত্রশাস্ত্রমনুত্তমম্।
সর্ব্বকামপ্রদং পুণ্যং তন্ত্রং বৈ বেদসম্মতং।"

তন্ত্রশাস্ত্র সমুদায় বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে যে, তন্ত্রশাস্ত্রের মূলভিত্তি সাংখ্য এবং উপনিষদের উপর স্থাপিত। হিন্দুসমাজে কাল-ধর্ম্মে পবিত্র তন্ত্রশাস্ত্রের সাত্ত্বিক সাধন তিরোহিত হইয়া কেবল রাজসিক ও তামসিক সাধনের প্রক্রিয়া-প্রণালীই প্রায়শঃ প্রচলিত রহিয়াছে; তাহাই অধিকার-তত্ত্ববোধাভাবে তন্ত্রশাস্ত্রের অনাদরের কারণ। বস্তুতঃ তন্ত্রকে যোগধর্ম্মের কল্পভাণ্ডার বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ইহাতে মানসিক ও বাহ্য পূজা এবং প্রাণায়াম প্রভৃতির ব্যবস্থা অতি সুন্দররূপে সন্নিবেশিত হইয়াছে। বেদ যেমন জ্ঞান ও কর্ম্মকাণ্ড, দুই ভাগে বিভক্ত, যোগশাস্ত্রও তদ্রূপ দুই ভাগে বিভক্ত। তন্ত্রোক্ত ক্রিয়া-কলাপই ইহার কর্ম্মকাণ্ড। তন্ত্রের উপাসনার প্রণালী অতি পবিত্র; ইহাতে প্রাণায়াম এবং সাধন-পদ অতি উৎকৃষ্টরূপে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

যোগ ও তন্ত্রোক্ত উপাসনা প্রণালীর উদ্ভব এক উপকরণ হইতেই হইয়াছে; ঐ সকল বিষয় পুরাণে অতি সহজে বুঝান হইয়াছে। ঋগ্বেদসংহিতার প্রাচীন মন্ত্রগুলিতে অনেক দেবদেবীর উল্লেখ থাকা অনেকে অর্থ করেন বটে, কিন্তু তাহাতে কালী, দুর্গা, শিব প্রভৃতি নামের দেবদেবীর কোন স্পষ্ট উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না; কিন্তু ইহা নিশ্চয় যে, শব্দান্তরে প্রকৃতপক্ষে অর্থান্তর ঘটে নাই। তন্ত্র-প্রতিপাদ্য সাধনার অন্যতম মূলভিত্তি মহাত্মা কপিল কৃত সাংখ্য। একথা সত্য যে, মহাত্মা কপিল বর্ত্তমান সময়ের ন্যায় মূর্ত্তি-উপাসনার প্রণালী উদ্ভাবন করেন নাই; কিন্তু সাংখ্য যে প্রকৃতি-পুরুষের তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন, তন্ত্রেও

তন্ত্রাশ্রয়ে দেবদেবীর উপাসনার প্রণালী বিধিবদ্ধ হইয়াছে। কপিল মুনির পুরুষই পরিশেষে হিন্দু উপাসনাতে নানারূপে বিকাশিত হইয়া রুচি ও অধিকার অনুসারে নানা মূর্ত্তিতে উপাস্য হইতেছেন। প্রকৃতিই ভগবতী দেবীর প্রথম আবির্ভাব,—তিনিই কালীদেবী।

তস্যাং বিনির্গতায়ান্তু কৃষ্ণাভূৎ সাপি পার্ব্বতী।
কালিকেতি সমাখ্যাতা হিমাচলকৃতাশ্রয়া॥

চণ্ডী—দেব্যাদূত সম্বাদ, ৮৮ শ্লোক।

"প্রকৃতির সত্ত্বাধিক্যে পুরুষের সান্নিধ্যে মহত্তত্ত্ব বা বুদ্ধিতত্ত্ব উৎপন্ন হয়, বুদ্ধিতত্ত্ব হইতে অহঙ্কার এবং এই অহঙ্কারের ভিন্ন ভিন্ন বিকার হইতে ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়ের বিষয়, উভয়ের উৎপত্তি হইয়াছে। পুরুষই চৈতন্যশক্তি, সুখদুঃখাদিশূন্য; ইনি অকর্ত্তা, কোন কার্য্যই করেন না, সমুদায় বিশ্বব্যাপারই প্রকৃতির কার্য্য। ঐ প্রকৃতি ও পুরুষ পরস্পর সাপেক্ষ। লৌহ যেমন চুম্বক সমীপস্থ হইলে সেই দিকে গমন করে, তদ্রূপ প্রকৃতিও পুরুষ-সন্নিধানপ্রযুক্ত বিশ্বরচনায় প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন।" প্রকৃতিরই সাক্ষাৎ কর্ত্তৃত্ব, ইহাই সাংখ্যদর্শনের মত—তজ্জন্য পুরুষই দেবীর ক্রিয়াধাররূপে পদতলে এবং সেই অভিনয়েই কালীদেবীর মূর্ত্তি মহাদেবের উপর স্থাপিত!

মহাত্মা কপিলকৃত সাংখ্যের সহিত তন্ত্র এবং উপনিষদের যে সম্বন্ধ আছে, তাহা উপরোক্ত প্রকৃতি-পুরুষের বিষয় চিন্তা করিলে অতি সহজেই প্রতীয়মান হইবে। এই সাংখ্যশাস্ত্র কাহার দ্বারা রচিত হইয়াছে, তদ্বিষয় অতি সংক্ষেপে কিছু উল্লেখ করা সঙ্গত। কপিলই যে সাংখ্যশাস্ত্র-প্রবর্ত্তক, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কপিল কে ছিলেন, তৎসম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন মত দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ কেহ কপিলকে ব্রহ্মার পুত্র, কেহ কোন স্থানে বিষ্ণুর অবতার, কেহ বা তাঁহাকে কর্দ্দমের পুত্র, কেহ বা হিংসা এবং ধর্ম্মের পুত্র, কেহ বা ছদ্মবেশধারী অগ্নি বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। অতি প্রাচীন সময়াবধি কপিলের মত বিশেষ সমাদৃত হইয়া আসিতেছে। শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতায়ও কপিলের সবিশেষ প্রশংসা দেখিতে পাওয়া যায়, যথা—

"গন্ধর্ব্বাণাং চিত্ররথঃ সিদ্ধানাং কপিলোমুনিঃ।"

কপিল যে ঈশ্বর মানিতেন না, ইহা পুরাণাদি রচনার দীর্ঘকাল পর কেহ কেহ প্রকাশ করিয়াছেন। এরূপ অনুমানের কারণ এই যে, কপিল ঈশ্বর-উপাসনার সম্বন্ধে স্থূলপ্রণালীবদ্ধভাবে কিছুই বলেন নাই। তিনি সূক্ষ্মভাবে জ্ঞানই মুক্তির উপায় বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, তদ্বিবরণ নিম্নোদ্ধৃত ভীষ্মবাক্যে সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে। কপিলকৃত সাংখ্যকে সাধারণতঃ "নিরীশ্বরসাংখ্য" এবং পাতঞ্জলমুনিকৃত যোগশাস্ত্রকে "সেশ্বরসাংখ্য" বলিয়া থাকে। যুধিষ্ঠিরের প্রশ্নানুসারে মহাত্মা ভীষ্ম কপিলকৃত সাংখ্যশাস্ত্রের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন।

"ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! সাংখ্যমতাবলম্বীরা সাংখ্যের ও যোগীগণ যোগের বিশেষ প্রশংসা করিয়া থাকেন। যোগীরা ঈশ্বর ব্যতিরেকে মুক্তির উপায় নাই বলিয়া আপনাদের মতের শ্রেষ্ঠতা সম্পাদন করেন; কিন্তু সাংখ্যমতাবলম্বীরা কহিয়া থাকেন যে, ঈশ্বরে (বাহ্যপূজার পন্থায়) ভক্তি করিবার প্রয়োজন (সবলাধিকারীর) নাই। 'যিনি সমুদায় তত্ত্ব জ্ঞাত হইয়া বিষয় হইতে মুক্ত হইতে পারেন, তিনি দেহনাশের পর নিশ্চয়ই মুক্তি লাভে সমর্থ হন। * * * * এই উভয় মতই যথার্থ ও সাধুসম্মত।"

শান্তিপর্ব্ব, ৩০৩ অধ্যায়।

মহাত্মা কপিলই প্রকৃতিপুরুষের তত্ত্ব প্রকাশ

এবং যুক্তিদ্বারা তাঁহার মত স্থাপন করেন। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য যে, প্রকৃতিরই কর্তৃত্ব, এ কথা বেদবিরোধী কি না। কপিলদেব শ্রুতির অবিরোধিনী বিবিধ উপপত্তির উপদেশ দিয়াছেন। প্রকৃতির তত্ত্ব বেদেও বিবৃত দেখিতে পাওয়া যায়। "অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং" ইত্যাদি অন্যান্য শ্রুতিতেও প্রকৃতিরই সৃষ্টিকর্তৃত্ব আরোপিত হইয়াছে; সুতরাং কপিল যে প্রকৃতি-পুরুষের তত্ত্ব-বিচার করিয়াছেন, তাহার মূল বেদ। এ কথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, কপিল বর্তমান সময়ের উপাসনার প্রণালীর ন্যায় ক্রিয়াযোগানুবন্ধীভাবে কিছুই বলেন নাই। কালক্রমে প্রকৃতি-পুরুষতত্ত্ব অবলম্বন করিয়া সিদ্ধর্ষিগণকর্তৃক সাধকগণের অধিকার-সম্মত সাকারমূর্তি-উপাসনার ব্যবস্থা হইয়াছে।

কপিলকৃত সাংখ্যও যোগশাস্ত্রের অন্তর্গত। তাঁহাকে সমুদায় পুরাণকর্তারা 'যোগধর্মবিৎ' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

"অন্যনামতবৎ পশ্চাৎ কপিলো যোগধর্মবিৎ।"

ইত্যাদি। পদ্মপুরাণ, পাতালখণ্ড, ৯৭ অঃ।

সত্যযুগেই কপিলকৃত সাংখ্যবিজ্ঞান প্রকাশিত হয়। তাহা কতক উপনিষদের পূর্বে রচিত হইয়াছে। উপনিষদেও কপিলের নাম-উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

"ঋষিং প্রসূতং কপিলং যস্তমগ্রে জ্ঞানৈর্বিভর্তি।"

ইত্যাদি, শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ। ৫ অঃ, ২ শ্লোক।

বিষ্ণুপুরাণ পাঠেও জানা যায় যে, সত্যযুগে সাংখ্যবিজ্ঞান প্রথম প্রকাশিত হয়।

(বিষ্ণুপুরাণ, ৩য় অংশ, ২য় অধ্যায়)।

কপিল-প্রকাশিত প্রকৃতি-পুরুষের তত্ত্ব পরিষ্কাররূপে সর্বাধিকারী-নির্বিশেষে বুঝাইবার জন্যই পুরাণ এবং তন্ত্রশাস্ত্রের প্রয়োজন হইয়াছে। প্রকৃতি-পুরুষের সাকাররূপ পুরাণে ও তন্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে। সমগ্র বেদ হইতে যেরূপ সন্ধ্যোপাসনা ও অন্যান্য বৈদিককর্মের পদ্ধতি বিধিবদ্ধ হইয়াছে, তদ্রূপ সাংখ্যশাস্ত্র অবলম্বন করিয়া তন্ত্রোক্ত উপাসনার প্রণালী ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। তন্ত্রশাস্ত্র যোগের সর্বসম্পদসম্পন্ন অতি বিশুদ্ধ ধর্মশাস্ত্র। কপিল ও পতঞ্জলিমুনি যোগানুষ্ঠানের ভাবতত্ত্ব যাহা বুঝাইয়াছেন, তাহারই কর্মজ্ঞানানুষ্ঠানপূর্ণ তন্ত্রশাস্ত্র। উপনিষদে উপাসনার যে সকল মত ও রীতি দেখিতে পাওয়া যায়, সামান্য ইতর-বিশেষ থাকিলেও তন্ত্রেও প্রায় তদ্রূপ ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ হইয়াছে। বীজমন্ত্র এবং যন্ত্র উপনিষৎ ও তন্ত্র, উভয় শাস্ত্রেই আছে; সুতরাং তন্ত্র যে কোন আধুনিক কল্পিত শাস্ত্র, এরূপ সিদ্ধান্ত করার কোন কারণ নাই।

বেদ ও তন্ত্রোক্ত উপাসনা-প্রণালীর উপর দৃষ্টিপাত করিলে সহজেই প্রতীয়মান হইবে যে, সময়ের পরিবর্তনে মনুষ্যের চিন্তাশীলতা এবং বুদ্ধিবৃত্তির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মনুষ্যে রুচির ও অধিকারেরও পরিবর্তন সংঘটিত হইয়াছে এবং মুনি-ঋষিগণও সময়ে সময়ে ব্যবস্থা পরিবর্তন করিয়াছেন। বেদোক্ত কর্ম অতি কষ্টসাধ্য। কোন সময়ে মনুষ্যের শারীরিক ও মানসিক দুর্বলতা আরম্ভ হইলে, পারত্রিক সুখ অপেক্ষা ইহসংসারের সুখ অধিক প্রার্থনীয় হইয়া উঠিল, তখন ক্রমেই বেদের কর্মকাণ্ডোক্ত কার্য্যসকল শিথিল হইতে লাগিল; তৎকালে সহজ উপায়ে ঈশ্বর-আরাধনার জন্য তন্ত্রশাস্ত্রের ব্যবস্থার প্রতি লোকের অধিকতর অনুরাগ হইল। যিনি বেদ ও তন্ত্রোক্ত প্রাণায়াম অবগত আছেন, তিনিই এই উভয় মতের আপাত-পার্থক্য অনায়াসে উপলব্ধি করিতে পারিবেন। বেদের প্রাণায়াম সংক্ষিপ্ত এবং সুসাধ্য।

"তস্য বাচকঃ প্রণবঃ ॥ ২৭ ॥"

"তজ্জপস্তদর্থ ভাবনম্" ॥ ২৮॥

পাতঞ্জলদর্শন, যোগপাদঃ। ৮ম অধ্যায়।

অ-উ-ম বর্ণের যোগে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব প্রতিপাদন করে, ক্লীং শব্দে "শ্রীকৃষ্ণায় ভগবতে গোপীজনবল্লভায় নমঃ" প্রতিপাদন করে; ফলে সাধারণতঃ ওঁম্ শব্দে সগুণ ব্রহ্মের সর্ব্বরূপই প্রতিপাদন করে। প্রণব-চিন্তায় ত্রিগুণের ত্রিমূর্ত্তি —অর্থাৎ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব একেবারে চিন্তা করা সহজ ব্যাপার নয়; তাহা অধিকাংশ স্থলেই অসম্ভব হইয়া পড়ে; এইজন্য তন্ত্রে অধিকারীভেদে দেব ও দেবীর এক একটী মূর্ত্তি চিন্তার ব্যবস্থা প্রকাশিত হইয়াছে। বৈদিক মন্ত্র ওঁম্ শব্দ সহজে উচ্চারণ করা সকলের পক্ষে সম্ভব নয়, কিন্তু তন্ত্রোক্ত মন্ত্র (দীর্ঘপ্রণব ও অন্যান্য বীজ প্রভৃতি) অতি সহজেই উচ্চারিত হয়। সর্ব্বসাধারণের জন্যই তন্ত্রশাস্ত্র ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। তাহা অশিক্ষিত লোকেও সহজে (স্বাধিকার-প্রয়োজনানুরূপ) সেবা করিতে পারে। অধিকারী-ভেদে উপাসনার প্রণালীও পৃথক্ পৃথক্‌রূপে হিন্দুশাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। স্ত্রী-শূদ্র-দ্বিজ-বন্ধু প্রভৃতিকে বেদের অধিকার প্রদান করা হয় নাই,—তাহাদিগের জন্যও তন্ত্রোক্ত সহজ উপাসনা প্রস্তুত রহিয়াছে। যাঁহারা বেদাধিকারী ছিলেন, তাঁহারাও কালক্রমে বেদ-পথ-অতিক্রান্ত হইয়া তন্ত্রোক্ত উপাসনা-পদ্ধতি গ্রহণ করিয়াছেন; তজ্জন্য ব্রাহ্মণদিগের মধ্যেও তন্ত্রশাস্ত্রের সমধিক আদর হইয়াছে।

প্রকৃতির পরিণাম,—অর্থাৎ বিকার দ্বারা সমুদায় বিশ্ব-ব্যাপার উৎপন্ন হইয়াছে। ফলতঃ আদি কারণের নামই কপিল ঋষি 'প্রকৃতি' রাখিয়াছেন। প্রকৃতির কর্ত্তৃত্ব যে বেদ-মূলক, তাহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। প্রকৃতির উপাসনাও সত্যযুগাবধি প্রচলিত আছে। সত্যযুগে মার্কণ্ডেয় মুনির প্রণীত চণ্ডী, তাহাতেও প্রকৃতির কর্ত্তৃত্ব, অতি বিস্তৃতরূপে বর্ণিত হইয়াছে।

"নিত্যৈব সা জগন্মূর্ত্তিস্তয়া সর্ব্বমিদং ততং" ॥৬৪॥

সেই মহাবিদ্যা নিত্যা, জন্ম-মৃত্যু-রহিত-স্বভাবা, (জগতের আদিকারণ) এই ব্রহ্মাণ্ডই তাঁহার মূর্ত্তি, তাঁহাহইতেই এই সংসার বিস্তারিত হইয়াছে। ৬৪ ॥

(মধুকৈটভ বধ, চণ্ডী।)

"নমঃ প্রকৃত্যৈ ভদ্রায়ৈ নিয়তাঃ প্রণতাঃস্মতাং ॥"

তুমি প্রকৃতি মূল কারণ, ভদ্রকারিণীও তুমি। ইত্যাদি।

ত্রেতাযুগে রাম-সীতা, তাহা উপনিষদেও বর্ণিত আছে; সেই উপনিষদের ছায়া অবলম্বন করিয়াই বোধ হয় মহাত্মা বাল্মীকি মহাকাব্য রামায়ণ রচনা করিয়াছেন। রাম-সীতাও উপনিষদে প্রকৃতি-পুরুষরূপে বর্ণিত হইয়াছেন।

"শ্রীরামসান্নিধ্যবশাজ্জগদানন্দদায়িনী ॥
উৎপত্তি-স্থিতি-সংহারকারিণী সর্ব্বদেহিনাং ॥
সা সীতা ভবতি জ্ঞেয়া মূলপ্রকৃতিসংজ্ঞিতা।
প্রণবত্বাৎপ্রকৃতিরিতি বদন্তি ব্রহ্মবাদিনঃ" ॥ ৪ ॥

(রামতাপনী, উত্তরভাগ।)

শ্রীরামের সান্নিধ্য বশতঃ জগতের আনন্দ-প্রদায়িনী এবং সর্ব্বপ্রাণীর উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রলয়ের কারণীভূতা সীতাকে মূলপ্রকৃতিরূপে জানিবে, যখন সীতা প্রণবের সহিত অভেদ প্রাপ্ত হয়েন, তখন ব্রহ্মবাদীরা তাঁহাকে প্রকৃতি বলেন।

দ্বাপরযুগে শ্রীকৃষ্ণ এবং যোগমায়া, ভাগবত-প্রণেতা তাহা রামলীলায় অতি পরিষ্কাররূপে বর্ণন করিয়াছেন।

"ভগবানপিতারাত্রীঃ শারদোৎফুল্লমল্লিকাঃ।
বীক্ষ্যরন্তুং মনশ্চক্রে যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ" ॥ ১ ॥

সেই শারদোৎফুল্লমল্লিকা-শোভিত রাত্রি

দেখিয়া ভগবান্ যোগমায়াকে আশ্রয় করতঃ ক্রীড়া করিতে মনন করিয়াছিলেন।

শ্রীমদ্ভগবৎগীতায় প্রকৃতির কর্তৃত্ব বর্ণিত হইয়াছে, যথা—

"ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃসূয়তে সচরাচরম্।
হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্বিপরিবর্ত্ততে" ॥ ১০ ॥

হে কৌন্তেয়! আমার অধিষ্ঠান বশতঃই প্রকৃতি এই চরাচর জগৎ প্রসব করিয়া থাকেন এবং আমার অধিষ্ঠান জন্যই এই জগৎ নানারূপে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

উপরোক্ত গীতাবাক্যে প্রকৃতিই জগৎ প্রসব করিয়াছেন জানা যায়। সেই প্রকৃতিদেবীই তন্ত্রের প্রধান অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, তাহা উপনিষদ্ এবং পুরাণাদির অনুমোদিত। তন্ত্রে দেব এবং দেবী উভয়ের উপাসনাই বিধিবদ্ধ হইয়াছে। ভারতবর্ষে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের উপাসক দেখিতে পাওয়া যায়, তন্মধ্যে এক সম্প্রদায়ের লোক কেবল প্রকৃতিদেবীর উপাসক, তাহারাও তন্ত্রোক্ত উপাসনার ব্যবস্থানুসারে পরিচালিত। যেরূপ ভগবান্ গীতাতে যোগশাস্ত্রকে কর্ম্মের কৌশল বলিয়াছেন, যথা—

"বুদ্ধিযুক্তো জহাতীহ উভে সুকৃত দুষ্কৃতে।
তস্মাৎ যোগায় যুজ্যস্ব যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্॥"

তদ্রূপ তন্ত্রশাস্ত্রেও অতি সুকৌশলে দেব-দেবীর উপাসনা-প্রণালী যোগশাস্ত্রের বিধানানুসারে বিধিবদ্ধ হইয়াছে।

কপিলমুনির প্রকৃতি-পুরুষই পরিশেষে হিন্দু-উপাসনায় নানারূপে বিকাশিত হইয়া, মনুষ্যের অধিকার-ভেদ-অনুসারে নানা মূর্ত্তিতে উপাস্য হইতেছেন। হিন্দুধর্ম্ম-বিদ্বেষী অধিকাংশ লোকেই শিবপূজার প্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়া হিন্দুধর্ম্মের নানারূপ নিন্দা করিয়া থাকেন, কিন্তু শিবপূজার গূঢ় রহস্য সহজে বোধগম্য নয় বলিয়াই ঐরূপ নিন্দা ও অবজ্ঞা করিয়া থাকেন; প্রকৃতার্থে সৃষ্টি-রহস্য-প্রকাশই শিবপূজার মূল। প্রকৃতি-পুরুষ-রূপ-স্থাপনই শিবমূর্ত্তি, তাহাই মহাত্মা কপিলের প্রকৃতি-পুরুষ-তত্ত্ব।

মহাত্মা অমর সিংহ তাঁহার কৃত অভিধানে তন্ত্রকে কোনও শাস্ত্র মধ্যে উল্লেখ করেন নাই।

"তন্ত্রে প্রধানে সিদ্ধান্তে সূত্রবাপে পরিচ্ছদে।"
(অমরকোষ)

এ কথা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, তন্ত্র কোন স্বতন্ত্র ধর্ম্মশাস্ত্র নহে, ইহা বেদ-বেদান্তেরই রূপান্তর স্বরূপ; সাংখ্যের সারোদ্ধার ও তৎক্রিয়াগত সাধন-বিস্তার-শাস্ত্র। ইহাতে ঠিক কপিলকৃত সাংখ্যশাস্ত্রোক্ত প্রকৃতি-পুরুষের উপাসনার সারভাগ অথবা সহজ উপায় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। তন্ত্রকে সিদ্ধান্তও বলা যাইতে পারে। সর্ব্বাধিকারী-সেবিত মহাপ্রামাণ্য মহাভারতেও তন্ত্রশাস্ত্রের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

"মহর্ষিরা ভগবান্ ব্রহ্মার আদেশানুসারে যুগান্তকালে অন্তর্হিত বেদ ও ইতিহাসসকল তপঃপ্রভাবে লাভ করিয়াছিলেন। ভগবান্ স্বয়ম্ভু বেদ, বৃহস্পতি বেদান্ত, শুক্রাচার্য্য জগৎ-হিতকর নীতি ও তন্ত্র পরিজ্ঞাত হইয়াছিলেন।"
[শান্তিপর্ব্ব, ২১০ অধ্যায়]
(প্রতাপচন্দ্র রায়।)

মহাভারতের দীর্ঘকাল পর অমরকোষ অভিধান যে রচিত হইয়াছে, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। অমরকোষ-মধ্যে তন্ত্র 'শাস্ত্ররূপ' লিখিত না হওয়া বিবেচনা হইলেও তাহা অমরসিংহের ভ্রম বলিয়াই সিদ্ধান্ত করা উচিত। তন্ত্র শব্দের অর্থ 'শ্রুতি-শাখা-বিশেষ' বলিয়া মেদিনী-অভিধানে লিখিত হইয়াছে। পূর্ব্বতন আর্য্যঋষিগণ অতি প্রখর-বুদ্ধি-সম্পন্ন ছিলেন। তাঁহারা যেরূপ সুকৌশলে উপাসনার ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ করিয়াছেন, তৎপ্রতি

কিঞ্চিন্মাত্রও মনোনিবেশ করিলে, তাহার প্রকৃত ভাব কিয়ৎ পরিমাণে উপলব্ধি করা যাইতে পারে এবং তাহাতে মনে অতি পবিত্র আনন্দ-ভাবের আবির্ভাব হয়; সে পবিত্র আনন্দ অন্যকে বুঝাইবার উপায় নাই। যিনি সেই সাত্ত্বিকানন্দ অনুভব করিয়াছেন, তিনি ভিন্ন আর কাহারও তাহা বুঝিবার সাধ্য নাই। বর্ত্তমান সময়ে অধিকাংশ লোকই ঐ সকল বিষয়ের প্রতি মনোনিবেশ না করায়, তন্ত্রশাস্ত্রের প্রকৃত অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই, তজ্জন্যই তাঁহারা তন্ত্রশাস্ত্রকে বেদ-বিরুদ্ধ কার্য্যের অভিপ্রায়ে ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের ইচ্ছানুসারে প্রস্তুত বলিয়া উপেক্ষা করিতে কুণ্ঠিত হন না।

নিগম° বেদ, আগম তন্ত্র। "কলাবাগম-সম্মতা" কলিকালে আগম-সম্মতা উপাসনাই ফলপ্রদা; কারণ ইহাতে কলির দুর্ব্বলাধিকারী মানবের উপযুক্ত সুকর সাধন-বিধানই সন্নিবিষ্ট; সুতরাং তন্ত্রই কলির বেদ। "আগমোক্ত বিধানেন কলৌ দেবান্ যজেৎ সুধীঃ"। তন্ত্রের প্রক্ষিপ্ত, রূপক ও অর্থবাদাদি অতিক্রম করিয়া, গুরূপদেশানুসারে প্রকৃত সাধনপরায়ণ হইতে পারিলেই এই কলিকালে সিদ্ধি বা কৃতার্থতা সুলভ হয়, সন্দেহ নাই।

শ্রীউমেশনারায়ণ চৌধুরী।

আমিত্বের প্রসার।

বৈশ্য।

মনুষ্যের মনুষ্যত্ব কি লইয়া? আহার-বিহারাদিক্রিয়া ইতর প্রাণীরাও সম্পাদন করিয়া থাকে। ইতর প্রাণীরা তাহাদিগের "আমিত্বের প্রসার" করিতে সক্ষম হয় না। তাহারা বিধির নির্ব্বন্ধানুসারে পূর্ব্বকর্ম্মহেতু ভোগদেহ ধারণ করে মাত্র, স্বাধীন কার্য্য করিবার ক্ষমতা তাহাদের নাই; সুতরাং তাহারা তাহাদের জীবনের উন্নতি বা অবনতি সাধন করিতে সক্ষম হয় না। মনুষ্যদেহ কেবল ভোগদেহ নহে, উহা কর্ম্মদেহও বটে। মনুষ্য ইহ-জীবনে যেমন পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মের ফলভোগ করে, তদ্রূপ স্বাধীনেচ্ছাজনিত কার্য্যদ্বারা জীবনের উন্নতি বা অবনতিসাধন করিতে পারে। মানব স্বীয় কার্য্যদ্বারা যে আপনাকে পশু বা দেবরূপে পরিণত করিতে পারে, তাহা প্রত্যেক ব্যক্তিই অনায়াসে স্বীয় স্বীয় জীবনেই প্রত্যক্ষ করিতে পারেন। স্বাধীন কার্য্য করিবার শক্তি থাকাতেই মনুষ্য মনুষ্য। স্বাধীনকার্য্য যদি আত্ম-বিকাশের প্রতিকূলে প্রবর্ত্তিত হয়, তাহা হইলে ক্রমে এমন এক সময় উপস্থিত হয় যে সে সময় মানব আর মানব থাকিতে পারে না, ইতর প্রাণীতে পরিণত হয় এবং সে সময় আর স্বাধীনকার্য্য করিবার শক্তিই থাকে না। আত্ম-বিকাশ, আত্ম-প্রসার বা "আমিত্বের প্রসার" বহুবিধ উপায় অবলম্বন করিয়া সাধন করা যায়, কিন্তু এই বহুবিধ উপায়সমূহের সকলের মূলেই একটি বস্তু চাই। তুমি যে কার্য্যই কর, তাহার ফল কেবল "আমিতে" সঙ্কীর্ণ না করিয়া উহা যদি "আমি" ভিন্ন "আমি"সমূহে প্রসারিত করিতে আরম্ভ কর, তাহাহইলে "আমি"তে "আমি"তে যে ভেদজ্ঞান, তাহা নষ্ট হইয়া যাইবে; সর্ব্বত্রই মেঘ-মুক্ত-দিবাকরসদৃশ উপাধি-

বর্জ্জিত নির্ম্মল "আমি" পরিদৃশ্যমান হইবে! "আমিত্বের" সম্পূর্ণ প্রসার হইলেই, জীব মুক্তাবস্থা প্রাপ্ত হইল; সুতরাং সম্পূর্ণ আমিত্বের প্রসারই প্রত্যেকের লক্ষ্য হওয়া কর্ত্তব্য; কিন্তু বৃক্ষের নিম্নপ্রদেশ অবলম্বন না করিলে যেরূপ উহার শিরঃপ্রদেশে যাওয়া যায় না, তদ্রূপ যে কার্য্যের পর যে কার্য্য করা কর্ত্তব্য, তাহা না করিলে "আমিত্বের প্রসার" হইতে পারে না। বালক যেরূপ যৌবন ও প্রৌঢ় অবস্থা অতিক্রম না করিয়া বার্দ্ধক্যদশায় উপনীত হইতে পারে না, তদ্রূপ শূদ্র-গুণধারী কোন ব্যক্তিই একেবারে ব্রাহ্মণত্ব অধিকার করিতে পারে না। বৈশ্যত্ব ও ক্ষত্রিয়ত্বরূপ পান্থশালা অলক্ষ্যে অতিক্রম করিয়া শূদ্র কখনও গন্তব্য ব্রাহ্মণত্ব-প্রদেশে গমন করিতে পারে না। অবনতির ক্রমাতিক্রমের নিদর্শন বহুল হইলেও, উন্নতির ক্রমাতিক্রমের নিদর্শন অতি বিরল। কার্য্যতঃ পণ্ডিত সহসা মূর্খ হইতে পারেন, ব্রাহ্মণ সহসা শূদ্র হইতে পারেন, কিন্তু মূর্খ সহসা পণ্ডিত হইতে পারে না, শূদ্রও সহসা ব্রাহ্মণ হইতে পারে না। ব্রাহ্মণত্বই গন্তব্যস্থান, কিন্তু শূদ্রের ব্রাহ্মণত্ব-প্রদেশে যাইতে হইলে বৈশ্যত্ব-প্রদেশ দিয়া যাওয়া চাই।

আমি সামাজিক শূদ্রের কথা বলিতেছি না; শাস্ত্রোক্ত শূদ্রের অবস্থা কি?

শাস্ত্র বলেন :—

"সর্ব্বভক্ষ্যরতিনিত্যং সর্ব্বকর্ম্মকরোঽশুচিঃ।
ত্যক্ত বেদস্ত্বনাচারঃ স বৈ শূদ্র ইতি স্মৃতঃ॥"

যাহার খাদ্যাখাদ্যের বিচার নাই, জীবিকানির্ব্বাহার্থে ব্যবসায়ের বিচার নাই, যাহার দেহ ও মন অশুচি, যে বেদ পরিত্যাগ করিয়াছে এবং আচারভ্রষ্ট হইয়াছে, সেই শূদ্র।

এইক্ষণ আলোচনা করিয়া দেখুন যে, মনুষ্য যখন পূর্ব্বোক্ত দশাপন্ন হয়, তখন তাহার অবস্থা কতদূর নিকৃষ্ট। যথেচ্ছ আহার-বিহার, যথেচ্ছ কার্য্যদ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ যে ব্যক্তি করে, তাহার অবস্থা যে কতদূর শোচনীয়, তাহা লেখনীদ্বারা বর্ণনা করা যায় না। এইরূপ অবস্থাপন্ন লোকদিগকে উন্নতি-পথে অগ্রসর করাইতে হইলে তাহাদিগকে উত্তম সংসর্গে রাখার প্রয়োজন। ব্রাহ্মণ-গৃহের নিকটে যদি কোন চর্ম্মকার বাস করে, তাহাহইলে সে ইতর চর্ম্মকারদিগের অপেক্ষা সহস্রাংশে উন্নত হইয়া পড়ে, ইহা সকলেই প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। এইরূপ অবস্থাপন্ন লোকদিগকে শিক্ষাবিধানদ্বারা ভাল করা যাইতে পারে, কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে ইহাও দৃষ্ট হইয়াছে যে, নিতান্ত অসভ্য বর্ব্বরদিগকে পুস্তকাদি পড়াইয়া শিক্ষিত করিবার চেষ্টায় পাশ্চাত্য জাতিরা অধিকাংশস্থলে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। পাঠকের ইহাও স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, পুস্তকাদির অধ্যাপনাই যে লোককে সুশিক্ষিত করার একমাত্র উপায়, তাহা নহে। পূর্ব্বে ব্রহ্মচারীরা গুরুগৃহে পুস্তকাদি অধ্যয়নদ্বারা যত না শিখিতেন, গুরুগৃহে বাস করিয়া, গুরুর সংসর্গে থাকিয়া, তাহার কার্য্যকলাপ দেখিয়া, তাহা অপেক্ষা অধিক শিক্ষালাভ করিতেন। গুরুসেবাই তাঁহাদের প্রধান কার্য্য ছিল। মহাত্মাদিগের সংসর্গে মাত্র থাকিলেই অনেকস্থলে জীবন পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। এই জন্যই শূদ্রের পক্ষে উচ্চ তিন বর্ণের সেবা শাস্ত্রে আদিষ্ট হইয়াছে। "সেবা স্বামিস্থ-ময়য়া"। শূদ্র, ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্যাদির সংসর্গে থাকিয়া তাহাদের উন্নত জীবনের আদর্শ স্বীয় জীবনে অধিকার করিতে শিক্ষা করে। উন্নতির ক্রম ধরিলে, বৈশ্যত্বই শূদ্রত্বের অব্যবহিত উচ্চপ্রদেশে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে।

এই জগতে সাধারণ মানব কোন্ শক্তিদ্বারা পরিচালিত হইয়া থাকে? এমন কোন্

কেন্দ্র আছে, যাহার চতুর্দ্দিগে মানব ঘূর্ণায়মান রহিয়াছে? ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তিই সেই কেন্দ্র। পশ্বাদির কার্য্যেরও প্রেরণা-শক্তি ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তি, কিন্তু তাহাদের ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তির একটি সীমা আছে, ঐ সীমা তাহারা কখনও অতিক্রম করিতে পারেনা বা করিতে তাহাদের ইচ্ছাও হয় না। মানবের ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তি করিবার ইচ্ছা সীমাবদ্ধ নহে। মানবের বাসনার সীমা নাই। যাহাদের হৃদয়ে বাসনা বলবতী, তাহাদের বাসনা-পরিতৃপ্তির উৎকৃষ্ট উপায় দেখাইয়াই তাহাদিগকে উন্নতিপথে লইয়া যাইতে হয়। যে অসভ্য সম্প্রদায় অনিশ্চিত মৃগয়ার উপর জীবিকা ন্যস্ত করে, তাহাদিগকে পশুপালনের উপায় শিক্ষা দিলে, তাহারা কষ্টসাধ্য মৃগয়া পরিত্যাগ করিয়া সভ্যতার এক স্তর উচ্চে উন্নীত হইবে, সন্দেহ নাই। যে অসভ্য জাতি স্বভাবজাত বনফল-মূলাদি সংগ্রহ করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করে, তাহাদিগকে কৃষিকার্য্য শিক্ষা দিলে, উহা তাহারা যে সাদরে গ্রহণ করিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই; কারণ মানব অনিশ্চিত উপায় অপেক্ষা নিশ্চিত উপায়েরই চিরকাল পক্ষপাতী হইয়া থাকে। কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য এক বা বহুসংখ্যক স্ত্রীলোক স্বীয় আয়ত্তাধীন রাখা যত সুবিধাজনক, প্রয়োজনানুসারে নূতন নূতন স্ত্রীলোক সংগ্রহ করা তত সুবিধাজনক নহে—পরন্তু অত্যন্ত বিপজ্জনক। পশ্বাদির ন্যায় অসভ্যজাতিরাও আহার্য্য দ্রব্য এবং স্ত্রী লইয়া সর্ব্বদাই আপনাদিগের মধ্যে ঘোর বিবাদ করিয়া থাকে। পশুপালন-ব্যবস্থাদ্বারা মৃগয়ার যে বিবাদ, কৃষিকার্য্যদ্বারা বনফল-মূলাদি লইয়া যে বিবাদ এবং বিবাহ-নিয়মদ্বারা স্ত্রীলোক লইয়া যে বিবাদ, তাহার আশঙ্কা তিরোহিত হয়। মানব ক্রমশঃ স্বীয়াধিকৃত বস্তুর ধ্বংসাশঙ্কায় পরাধিকৃত বস্তুর প্রতি লোভ পরিত্যাগ করে। মানব-হৃদয়ের বাসনা অসীম থাকায়, অসভ্য মানবও ক্রমশঃ আত্মসুখকর বহুবিধ নূতন নূতন খাদ্য, নূতন নূতন পরিধেয়, নূতন নূতন গৃহ উদ্ভাবন করিতে প্রযত্নবান হয় এবং তৎসঙ্গে তাহাদের মধ্যে শিল্প, বাণিজ্যাদির বিস্তার হইতে থাকে। ধনই আত্মসুখকর বস্তু প্রাপ্তির একমাত্র উপায়, এই জন্য, অসভ্য শূদ্রকে বৈশ্যত্বে পরিণত করিলেই ধনের লোভ দেখাইতে হয়। ধনদ্বারা স্ত্রী, ভৃত্য, গো, অশ্ব, যান, গৃহ, উদ্যান, অলঙ্কার প্রভৃতি সকলই সুলভ। মৃগয়োপজীবী স্বচ্ছন্দবিহারী অলস শূদ্র ধনের পক্ষপাতী হইল। তমোশক্তি-সুলভ আলস্য পরিত্যাগ করিয়া সে কৃষি ও শিল্পবাণিজ্যাদিদ্বারা ধন উপার্জ্জনে প্রবৃত্ত হইলে, তাহার রজোশক্তি পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল। শূদ্র বৈশ্যত্বের পথে অগ্রসর হইতে চলিল। কিন্তু কৃষি, শিল্প, বাণিজ্যাদি দ্বারা কেবল ধনোপার্জ্জন করিলেই বৈশ্য হওয়া যায় না। যথার্থ বৈশ্যত্বলাভ করিতে হইলে যেমন ধনোপার্জ্জন চাই, তেমনই ধনব্যয় চাই। সভ্য-জীবনের প্রত্যেক কার্য্যেই অধিকারের সঙ্গে সঙ্গে দায়িত্ব আছে। স্বদারে রমণাধিকারের সঙ্গে পুত্র-কন্যার প্রতিপালন-দায়িত্ব রহিয়াছে। ভৃত্যের সেবালাভে যে অধিকার, তাহার সহিত ভৃত্যের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব রহিয়াছে; তাহার পীড়াদি হইলে, চিকিৎসাদিদ্বারা স্বাস্থ্যবিধানের দায়িত্ব রহিয়াছে। পুত্রাদিদ্বারা বিনা তর্কে আদেশ-প্রতিপালনাধিকারের সহিত পুত্রাদির সর্ব্ববিষয়ক মঙ্গলসংসাধন-দায়িত্ব রহিয়াছে। রাজার করগ্রহণাধিকারের সহিত পুত্রনির্ব্বিশেষে প্রজাপালনের দায়িত্ব রহিয়াছে। দায়িত্বপরিশূন্য অধিকার অসভ্য-সমাজের পরিচায়ক। চিন্তা করিয়া দেখিলে বুঝা যায়, দায়িত্ব-

বোধ না থাকিলে অধিকার পরিচালন করা যায় না। প্রজারা যদি দেখে যে রাজা কেবলই করগ্রহণ করেন, কিন্তু সেই করদ্বারা তাহাদের হিতকল্পে কোন কার্য্য করেন না, কেবলই আত্ম-সুখে নিরত থাকেন, তাহাহইলে তাহারা রাজ-বিদ্রোহী হইয়া রাজার রাজত্বাধিকার ধ্বংস করে। পুত্রেরা যদি দেখে যে পিতা তাহাদের মঙ্গলকামনা করেন না, তাহাহইলে তাহারা পিতার অধিকার পরিচালনে বাধা দেয়। ভগবানের রাজ্যে স্বার্থ ও পরার্থ এতই পরস্পর সংস্থষ্ট যে, পরার্থের দিকে দৃষ্টি রাখিলেই স্বার্থের দিকে দৃষ্টি রাখা হয়! যথার্থ স্বার্থ পরার্থ-পোষিত। পরার্থব্যতীত যে স্বার্থ, তাহা স্বার্থ নহে,—সে অনর্থমাত্র। কোনও ব্যক্তি কেবল নিজের উপর নির্ভর করিয়া জগতে জীবিত থাকিতে পারে না, অন্যের আশ্রয় তাহার গ্রহণ করিতেই হইবে। এই জগতে একাকী কে জীবিত থাকিতে পারে? স্বার্থরক্ষা করিতে হইলে পরার্থের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবেই হইবে, কারণ পরার্থও স্বার্থ। ভগবান যাজ্ঞবল্ক্য স্বীয় পত্নী মৈত্রেয়ীকে উপদেশ দিবার সময় বলিয়াছিলেন যে, 'পিতা, পুত্র, ভ্রাতা, স্ত্রী, পতি প্রভৃতিকে যে মানুষ ভালবাসে, তাহার কারণ সর্ব্বত্রই আত্মা বিরাজিত।' এই সত্য উপলব্ধি করিতে পারিলে যে কেবল পারত্রিক মঙ্গল, তাহা নহে, ঐহিক মঙ্গলও হয়। ঐহিক মঙ্গল ও পারত্রিক মঙ্গলে যে বিরোধ দৃষ্ট হয়, সে অজ্ঞানবশতঃ। সত্য কথন, ইন্দ্রিয়-সংযম প্রভৃতির দ্বারা যেরূপ ঐহিক মঙ্গল হয়, তদ্রূপ পারত্রিক মঙ্গলও হয়—বিরোধমাত্র নাই।

ধর্ম্মোপায়ে ধনোপার্জ্জন দ্বারা জগতের মঙ্গল সাধনই বৈশ্যধর্ম্ম। মানব স্বীয় স্বীয় অধিকারানুযায়ী উপায় দ্বারাই আমিত্বের প্রসার সাধন করিবে। তুমি যদি অর্থের লোভ পরিত্যাগ করিতে না পারিয়া থাক, তুমি যদি বিষয়-বাসনা নির্ম্মূল না করিতে পারিয়া থাক, তুমি যদি ব্রহ্মচর্য্যের কঠোর ব্রতাদি অবলম্বন না করিতে পার, তাহা হইলে কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যাদি দ্বারা ধনোপার্জ্জন করিয়া ঐহিক সুখ সম্ভোগ কর, কিন্তু কর্পূর-বিন্দু দ্বারা যেমন পানীয় জল সুবাসিত কর, তদ্রূপ কিঞ্চিৎ পরোপকার-বৃত্তি দ্বারা তোমার জাগতিক সুখ স্বর্গ-সুখে পরিণত কর। ধন উপার্জ্জন কর, স্ত্রী-পুত্র-কুটুম্বাদিকে প্রতি-পালন কর, নিজে সুখে স্বচ্ছন্দে থাক, কিন্তু তোমার হতভাগ্য দরিদ্র ভ্রাতাদিগকেও বিস্মৃত হইও না; তাহাদিগকেও কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ দান করিও, তাহা হইলে তুমি বৈশ্য হইতে পারিবে। সমাজে ধনোপার্জ্জন এবং ঐ ধন দ্বারা জগতের হিত করাই বৈশ্যের কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মণ জ্ঞান-বিজ্ঞানাদি শিক্ষা দিবেন, ক্ষত্রিয় সুশাসনে রাজ্যে শান্তি-সংস্থাপন করিবেন, বৈশ্য ধন সংগ্রহ করিবেন। ক্ষত্রিয়ে ও বৈশ্যে উভয়েতেই রজোশক্তি আছে, কিন্তু ক্ষত্রিয় রজো-শক্তি দ্বারা প্রজারক্ষণ, রাজ্যে শান্তি ও সর্ব্ব-বিষয়ক শৃঙ্খলা স্থাপন করেন; বৈশ্য তাহার নিম্ন-শ্রেণীর রজোশক্তি দ্বারা কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যাদি দ্বারা ধনোপার্জ্জন করেন। যেমন চতুর্ব্বিধ আশ্রমের মধ্যে গৃহস্থাশ্রমই অন্যান্য আশ্রমের অন্নদাতা, তদ্রূপ চতুর্ব্বিধ বর্ণের মধ্যে বৈশ্যই অন্যান্য বর্ণের অন্নদাতা বা পোষক।

বৈশ্য ও ক্ষত্রিয়ই ব্রাহ্মণের হস্ত স্বরূপ। ব্রাহ্মণের উদ্ভাবনী শক্তি, ক্ষত্রিয়ের কার্য্যকরী শক্তি এবং বৈশ্যের ধন-শক্তিই জগতের হিতে নিয়োজিত হইত। ব্রাহ্মণেরা যে নিশ্চিন্তভাবে শাস্ত্রাধ্যায়ন এবং জগতের হিতানুষ্ঠানে ব্যাপৃত থাকিতে পারিতেন, সে যে কেবল ক্ষত্রিয়ের সুশাসনের জন্য, তাহা নহে,

বশ্যের ধনের জন্যও বটে। ধনোপার্জ্জন করিয়া, ধনের সদ্ব্যয়ের দ্বারাও আমিত্বের প্রসার হয়। আত্মপর-ভেদ কমাইতে পারিলেই আমিত্বের প্রসার হয় এবং যে উপায় দ্বারাই কমনা কেন, তাহাতেই ফল হয়। তুমি যদি নিজে জ্ঞানী হও, জগতে জ্ঞান বিস্তার কর; যদি নিজে জ্ঞানী না হও, যদি ধনী হও, ধনের দ্বারাই জগতের উপকার কর। বহুস্থলে ধনের দ্বারা যে উপকার করা যায়, জ্ঞানের দ্বারা তাহা করা যায় না। দুর্ভিক্ষের সময় যখন চতুর্দ্দিকে হাহাকার ধ্বনি উত্থিত হয়, দেশে ধন না থাকিলে জ্ঞানী জ্ঞান দ্বারা কি করিতে পারেন? ধনের দ্বারাই অনাথশালা, চিকিৎসালয়, বিদ্যালয়, জলাশয়, দেবমন্দিরাদি সংস্থাপিত হয়। মানব-সমাজে ধন না থাকিলে, মানব-সমাজ পশু-সমাজের সমান হইত। সমাজে ধনই আমিত্বের প্রসার লাভ করিবার প্রথম সোপান।

কিন্তু ধনের সদ্ব্যবহারের জন্য জ্ঞানেরও আবশ্যক। জ্ঞান না থাকিলে ধনের সদ্ব্যবহার করা যায় না। এই জন্য ধনোপার্জ্জনের সহিত বৈশ্যের বেদাদি শাস্ত্র অধ্যয়নও আবশ্যক।

"বিশত্যাশু পশুভ্যশ্চ কৃষ্যাদানরতিঃ শুচিঃ।
বেদাধ্যয়ন সম্পন্নঃ স বৈ বৈশ্য ইতি স্মৃতঃ॥"

হে মানব! যদি তুমি আমিত্বের প্রসার করিতে চাও, ব্রাহ্মণ হও; যদি ব্রাহ্মণ হইতে চাও, ক্ষত্রিয় হও; যদি ক্ষত্রিয় হইতে চাও, বৈশ্য হও, যদি বৈশ্য হইতে চাও, তাহাহইলে ন্যায্যোপায়ে ধন উপার্জ্জন করিয়া উহা জগতের মঙ্গলে নিয়োজিত কর।

(কস্যচিদ্ পরিব্রাজকস্য)

হিন্দু-আচার।

(প্রথমবিধি)

যাহা (চিরকাল অবিচলিতভাবে) থাকে, তাহা সত্য; যাহা (লোককে সম্যক্‌রূপে) রাখে, তাহা ধর্ম্ম।

সদাচারকে হিন্দু-ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রণেতৃগণ ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, কারণ সদাচারের অনুবর্ত্তী হইলে, সম্যক্‌রূপে জীবনধারণ করা যায় এবং সদাচার-বর্জ্জনে অকালমৃত্যু ঘটিয়া থাকে। * বিজ্ঞান বহুদর্শনের ফলমাত্র। হিন্দু-আচার বহুদর্শনের ফলোদ্ভূত বিধি, সুতরাং বহুদর্শন বা বিজ্ঞানসম্মত। একথা হিন্দু-পত্রিকার ৩য় বর্ষের শেষ সংখ্যায় ২২৯ পৃষ্ঠায় বলিয়াছি। হার্বার্ট স্পেন্সার বিলাতের একজন শ্রেষ্ঠ দার্শনিক, তিনি ধর্ম্ম ও বিজ্ঞানের পরস্পর অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ লক্ষ্য করিয়াছেন। (First Principles 5th Edition, page 107)

জন্ম হইতে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া পর্য্যন্ত হিন্দুর ক্রিয়া-কলাপ এইরূপ বিধি-নিবদ্ধ আছে। কিন্তু গূঢ়মর্ম্ম না জানায়, অনেকে তৎপ্রতি আস্থা-শূন্য। শিক্ষিত লোকে উহাদিগের অন্তর্নিহিত সত্য জানিলে সদাচারে অনুরাগবান্ হইতে পারেন।

মানব মাতৃগর্ভ-অজ্ঞাতবাস হইতে এই জাগ্রত জগতে—কর্ম্মভূমিতে উদিত হওয়া মাত্রই

* অনভ্যাসেন শাস্ত্রাণামাচারস্য চ বর্জ্জনাৎ।
আলস্যাদন্নদোষাচ্চ মৃত্যুর্বিপ্রাণ্ জিঘাংসতি (মনু)

শাস্ত্রের অনভ্যাস, সদাচারত্যাগ, আলস্য ও খাদ্য-দোষেই মৃত্যু বিপ্রগণকে হনন করে। আমাদের নিতান্ত দুর্ভাগ্যবশতই শাস্ত্রের এই সব অপার করুণা-প্রসূত তত্ত্বোক্তিগুলিতে আমাদের শোচনীয় ঔদাসীন্য। "অনভ্যাসেন শাস্ত্রাণাম্" এইখানেই ত প্রমাণিত।

আর্য্য-শাস্ত্রের নিকট ঋণী হয়। ভূমিষ্ঠ হইবার পরই প্রথম বিধি এই,—

"প্রাঙ্ নাভিবর্দ্ধনাৎ পুংসো জাতকর্ম্মবিধীয়তে।
মন্ত্রবৎ প্রাশনঞ্চাস্য হিরণ্যমধুসর্পিষাম্॥"

(মনু ২ অধ্যায় ২৯ শ্লোক।)

বালক জন্মিবামাত্র, নাড়ীচ্ছেদের পূর্ব্বে তাহার (গৃহ্যসূত্রোক্ত) 'জাতকর্ম্ম' নামক সংস্কার করিবে এবং তৎকালে মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক তাহাকে সুবর্ণ, মধু ও ঘৃত ভোজন করাইবে। সদ্যজাত বালককে সুবর্ণ, মধু ও ঘৃত ভোজন করাইবার বিধি আজকাল প্রায় লোপ পাইয়াছে।

সংস্কার ও মন্ত্রাদি অজ্ঞ লোকের দ্বারায় সম্পাদনে অর্থবিহীন বাক্যোচ্চারণ মাত্রে পরিণত হইতে পারে, কিন্তু প্রকৃতি-জাত দ্রব্যের গুণ অপরিবর্ত্তনীয়। ভেষজাদি যথাযথ দেশ-কাল-পাত্রে প্রযুক্ত হইলে, তাহার ফল রাসায়নিক ক্রিয়ার ন্যায় অবশ্যম্ভাবী।

সুবর্ণকে ঔষধস্বরূপ এলোপ্যাথিক ডাক্তারগণ ব্যবহার করেন না। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকগণ উহার (Aurnm metallicum) গুণ বিদিত আছেন। আয়ুর্ব্বেদে স্বর্ণের বিস্তর গুণ বর্ণিত আছে। স্নায়ু ও অস্থি মজ্জাদির রোগে নানাবিধ জটিল ও পুরাতন রোগে, ক্ষয় ও উন্মাদরোগে, শিশুদিগের উৎকাশিতে; তালু, কর্ণ, নাসিকা প্রভৃতির রোগে, প্রবল ক্রন্দনেচ্ছা বা মৃত্যুকামনা প্রভৃতি চিত্তবিকারে ঔষধরূপে স্বর্ণের বহুপ্রয়োগ জানা যায়। স্বর্ণ-গুণ-বর্ণনায় আয়ুর্ব্বেদ বলেন,—

"সুবর্ণং তিক্তমধুরং কষায়ং গুরুলেখনম্।
হৃদ্যং রসায়নং বল্যং চক্ষুষ্যং কান্তিদং শুচি॥
আয়ুর্মেধাবয়ঃস্থৈর্য্যবাগ্‌বিশুদ্ধি-দ্যুতিপ্রদং।
ক্ষয়োন্মাদগদার্ত্তানাং শমনং পরমুচ্যতে॥"

(রাজবল্লভঃ)

আয়ুর্ব্বেদীয় বহুগ্রন্থে স্বর্ণের এইরূপ বহুগুণ বর্ণিত আছে।

মধু। বলবীর্য্যবৃদ্ধিকর, জীবিত্বকর, প্রীতিজনক, বাতঘ্ন, কফঘ্ন, ত্রিদোষনাশক ইত্যাদি ইত্যাদি। আয়ুর্ব্বেদ বলেন—"মধু তু মধুরং কষায়ানুরসং রুক্ষং সীতমগ্নিদীপনং বর্ণ্যং বল্যং লঘুলেখনং বাজীকরণং সংগ্রাহী চক্ষুঃপ্রসাদনং ত্রিদোষঘ্নং" ইত্যাদি। মধুর ভূরি ভূরি গুণানুবাদ আয়ুর্ব্বেদ, স্মৃতি, পুরাণ ইত্যাদি বিবিধ শাস্ত্রে সবিস্তার বর্ণিত আছে; সে সমস্ত উদ্ধৃত করা বাহুল্য মাত্র; ফলে মধু মানবজীবনের সর্ব্ব উপাদানেরই উপকারক, সন্দেহ নাই। আয়ুর্ব্বেদে ত প্রায় প্রতি ঔষধসহই মধুর ব্যবহার।

ঘৃত।—বলবর্দ্ধক, চক্ষুষ্য, আয়ুষ্কর, শুক্রকর, স্বরশোধক; বুদ্ধি, স্মৃতি, ধৃতি ও মেধাবর্দ্ধক, প্রতিভা-পোষক, মাঙ্গল্য, মহাতেজস্কর, মহাপাপনাশক ইত্যাদি। আর্য্য-শাস্ত্র সহস্রমুখে ঘৃতের গুণগান করিয়াছেন। আয়ুর্ব্বেদ ঘৃতকে স্পষ্ট "আয়ুঃ, অমৃতম্, তৈজসম্" ইত্যাদি নাম প্রদান করিয়াছেন। ঘৃত-মাহাত্ম্য-ঘোষক শত-সহস্র বচন বেদ-বেদান্ত, স্মৃতি, তন্ত্র, পুরাণ প্রভৃতি সর্ব্ব শাস্ত্রেই বিকীর্ণ রহিয়াছে। ফলে স্বর্ণ, ঘৃত ও মধু, এই তিন দ্রব্যই জীবনীশক্তির প্রকৃষ্ট পোষক।

শাস্ত্রে সাত্ত্বিকাহারের লক্ষণ-বর্ণনায় বলিয়াছেন,—
'আয়ুঃ সত্ত্ববলারোগ্য-সুখ-প্রীতিবিবর্দ্ধনাঃ।
রস্যাঃ স্নিগ্ধাঃ স্থিরা হৃদ্যা আহারাঃ সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ॥'

(গীতা ১৭ অধ্যায়, ৮ শ্লোক।)

ঘৃত, মধু, সুবর্ণ, তিনিই সাত্ত্বিক বস্তু।

"আয়ুর্বৈঘৃতং" আয়ুর্হবিঃ ইত্যাদি বাক্যে ঘৃত শ্রেষ্ঠ আয়ুষ্কর পদার্থ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। পাশ্চাত্য শরীর-বিজ্ঞান ও রসায়ন (Physiology & Chemistry) হইতে আমরা এক্ষণে, জানিতেছি যে, মধু, ইক্ষু-বিটপালম-

মূল ও খর্জ্জুর প্রভৃতির ন্যায় শর্করা-প্রধান দ্রব্য (Surcose) শর্করার পাশ্চাত্য রাসায়নিক বিশ্লেষণে জানা যায় যে, উহাতে অঙ্গার-পরমাণু ১২, জলজান-পরমাণু ২২ এবং অম্লজান-পরমাণু ১১ ($C^{12}H^{22}0^{11}$)। ঘৃতও ঐরূপ উদগ-ম্লাঙ্গারজ দ্রব্য। নবনীতে অঙ্গার-পরমাণু ৪, জলজানের ৮, অম্লজানের ২, (Butyric Acid) এবং (glycerol) অন্যান্য উদগম্লাঙ্গারজ পদার্থ আছে। মাতৃস্তন্যেও শর্করা (Lactose or milk-suger) আছে। শর্করা ও মেদজনক পদার্থ (Carbo-hydrates) শরীরে যেন ইন্ধনবৎ দগ্ধ হয় (oxidised in the body); উহারা নিশ্বাসের অম্লজানের সহিত মিলিত হইয়া তাপ উৎপাদন করে। মানবদেহ বস্তুতঃ একটী বৃহৎ চুল্লী অথবা বাষ্পযন্ত্রের ন্যায়; আমাদের খাদ্য কাষ্ঠ বা কয়লার কার্য্য করিয়া থাকে। তাপজননের উপযোগী হইবার পূর্ব্বে অনেক দ্রব্যই যকৃতের ক্রিয়াদ্বারা শর্করারূপে পরিণত হয়। সমুচিত পরিশ্রমাদি দ্বারা যথেষ্ট অম্লজান গ্রহণ করিতে পারিলে ঐ শর্করা ভস্মীভূত হইয়া তাপোৎপাদন করে, নতুবা স্বভার-কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হয়। শিশুর চঞ্চল অঙ্গসঞ্চালন ও জ্ঞানলাভের চেষ্টা পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক। মানসিক ও শারীরিক ক্রিয়া-জনিত ক্ষয় নিবারণ ভিন্ন শিশুর পেশী ও অস্থি প্রভৃতির সংবর্দ্ধন ও নির্ম্মাণ জন্য অধিকতর 'পোষক শর্করাসার-খাদ্যের (Surcose) প্রয়োজন; শিশুও স্বভাবতঃ মিষ্ট ভালবাসে! প্রকৃতির বিধানে ভ্রান্তি নাই। মানুষ সে বিধান পাঠ করিতে পারিলেই বৈজ্ঞানিক হয়।

পূর্ণতাপ্রাপ্ত লোকের দেহে নূতন অস্থি প্রভৃতির নির্ম্মাণ হয় না, সুতরাং সমুচিত পরিশ্রম না করিয়া আলস্যপরায়ণ হইলে, মধুমেহ, ইক্ষুমেহ, বসামেহ ইত্যাদি (Diabetes) রোগ-গ্রস্ত হইবার সম্ভাবনা। আর কিছু না পাইলে, যকৃৎ ডাউল প্রভৃতি উদ্ভিজ্জ ও মৎস্যমাংসাদি প্রাণিজ নাইট্রোজেন-প্রধান দ্রব্য হইতে শর্করা-প্রস্তুত করণোপযোগী উপাদান গ্রহণ করিয়া থাকে। [Herbert Spencer on Education-Physical training.]

শিশুর জন্মের অব্যবহিত পরেই বিকীরণ (Radiation) জন্য তাপের হ্রাস হয়; অতি সত্বর পুনরায় সেই পরিমাণ তাপ নবজাত শিশু-দেহে উৎপাদন আবশ্যক। শাস্ত্রবিহিত ঘৃত, মধু ও স্বর্ণ ভোজনে উহা সহজে উৎপন্ন হইয়া থাকে। * ভূমিষ্ঠ হইবার পর নাড়ীচ্ছেদকালে যে স্নায়বিক উত্তেজনা হয়; তৎপক্ষেও এই বিধি বিশেষ উপকারক।

পাশ্চাত্য বিজ্ঞান এখনও ধাত্বাদির আয়ুর্ব্বেদমতে জারণ-শোধনাদির বিষয় বিশদরূপে ব্যাখ্যা করিতে অসমর্থ। স্বর্ণ-ঘৃত-মধু-সংমিশ্রণে যে যে রাসায়নিক প্রক্রিয়া হয় এবং উহা দেহাভ্যন্তরে কি কি অবস্থান্তর উৎপাদন করে, তাহার বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ তাহার পক্ষে এখনও সুদূরপরাহত।

যাহাহউক, যতদূর জানা গেল, তাহাতে

* শারীরিক ও মানসিক ক্রিয়ার পরস্পর বিশেষ সম্বন্ধ আছে। অধুনা ইহাও প্রমাণিত হইয়াছে যে, প্রতি মানসিক ক্রিয়ায় হৃৎপিণ্ডের কার্য্যের অল্পাধিক ব্যত্যয় হয় এবং সমস্ত দেহও সেই পরিমাণে সঙ্কুচিত বা প্রসারিত হয়। নিশ্বাস-প্রশ্বাসের যন্ত্রাদি ভিন্ন ভিন্ন ভাবের আবির্ভাবে যে ভিন্নভিন্নরূপ কার্য্য করে, তাহা অনেকেই জানেন। সুখকর বা দুঃখকর স্নায়বিক উত্তেজনা হইতে নিশ্বাসের পরিমাণ যে বৃদ্ধি হয়, তাহা বেশ দেখিতে ও শুনিতে পাওয়া যায়। এমন কি, অন্ধকার হইতে আলোকে আসিলে যে স্নায়বিক উত্তেজনা হয় ও তাহাতে যে শ্বাসক্রিয়া বর্দ্ধিত হয়, তাহাও প্রমাণিত হইয়াছে (First Principles p. 213).

বিলক্ষণ প্রতীতি হয় যে, হিন্দু-আচার-শাস্ত্রের প্রথম বিধিবিজ্ঞান-ভিত্তিতে অবস্থিত। উহা একটী বিশেষ খাদ্য (Special food) বা ভেষজ-খাদ্য (Medicated food) উহার ফল মানব-জীবনে হয়ত সর্ব্বতোমুখী হইতে পারে [Herbert Spencer. First Principles—Multiplication of Effects—page 442] অঙ্কুরে সার পাইলে বৃক্ষ সতেজই হইয়া থাকে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশরচ্চন্দ্র সেনগুপ্ত।

নাসদীয়সূক্ত। (১)

ঋগ্বেদ, ১০ম মণ্ডল, ১২৯ সূক্ত।

নাসদাসীন্নো সদাসীত্তদানীং নাসীদ্রজো নো ব্যোমা পরো যৎ। কিমাবরীবঃ কুহকস্য শর্ম্মন্নম্ভঃ কিমাসীদ্গহনং গভীরম্‌॥ ১॥

পদপাঠঃ। ন। অসৎ। আসীৎ। নো। সৎ। আসীৎ। তদানীং। ন। আসীৎ। রজঃ। নো। ব্যোম। পরঃ। যৎ। কিম্‌। আ। অবরীবঃ। কুহ। কস্য। শর্ম্মন্‌। অম্ভঃ। কিম্‌। আসীৎ। গহনম্‌। গভীরম্‌॥ ১॥

ব্যাখ্যা। তদানীং ন অসৎ আসীৎ—সৎ শব্দের অর্থ যাহা আছে, "অসৎ" যাহা নাই; সুতরাং তৎকালে অর্থাৎ প্রলয়কালে যাহা নাই, তাহা ছিল না, এইরূপ অনাবশ্যক উক্তি ঋষিদিগের উক্তি হইতে পারে না। রমেশ বাবু তাঁহার ঋগ্বেদের বঙ্গানুবাদে এই স্থানের এই রূপ অর্থ করিয়াছেন; কিন্তু এই অর্থ যে প্রকৃত অর্থ হইতে পারে না, তাহা তিনি ভগবদ্গীতা

(১) এই সূক্ত ব্যাখ্যা করিবার পূর্ব্বে পাঠককে অবগত করান উচিত যে, এই সূক্তই বেদান্তদর্শনের মায়াবাদের ভিত্তিস্বরূপ। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের ধারণা এই যে, বেদে মায়াবাদের কোন ভিত্তি নাই, উহা পশ্চাদাগত দার্শনিকদিগের স্বকপোল-কল্পিত। তাঁহাদের এই ধারণা যে ভ্রমাত্মক, তাহা "নাসদীয় সূক্ত" পাঠ করিলেই উপলব্ধি হইবে। বেদান্তদর্শনমতে মায়া ব্রহ্মের শক্তিমাত্র। মায়া শক্তিরূপে অব্যক্তভাবে ব্রহ্মে অবস্থিতা; এই মায়া আশ্রয় করিয়া ব্রহ্ম বিশ্ব সৃষ্টি করিয়া থাকেন। মায়া আশ্রয় করিলে ব্রহ্মকে 'ঈশ্বর' বলা হয়। এই জগতে ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কোন পদার্থ নাই। ব্রহ্মই জগতের নিমিত্ত এবং উপাদান কারণ; কিন্তু মায়াশক্তি উদ্ভাবন না করিলে সৃষ্টি হয় না, এই জন্য মায়াকেও জগতের উপাদান-কারণ বলা যাইতে পারে। মায়া "সৎ" ও নহে, কারণ ব্রহ্মই একমাত্র "সৎ" বা নিত্য পদার্থ; "অসৎ"ও নহে, কারণ মায়াই ব্যবহারিক জগতের কারণ। 'মায়া' "সৎ"ও নহে, "অসৎ"ও নহে, অথচ "সৎ" এবং "অসৎ" এই উভয়ই। ব্যবহারিক জগতের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে, মায়া "সৎ", ব্যবহারিক জগৎ পরিত্যাগ করিলে, মায়া "অসৎ"। মায়া হেতু এই বিশ্বকে "সদসদাত্মক" বলা যায়। মায়া আশ্রয় করিয়াই "একমেবাদ্বিতীয়ম্‌" কারণ ব্রহ্মই পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষ, পর্ব্বত, গ্রহ-নক্ষত্রাদি ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যাবস্থায় পরিণত হন।

উপরোক্ত বেদান্তমত অতি সংক্ষেপে নাসদীয়সূক্তে ব্যক্ত হইয়াছে। সূক্তে বলা হইয়াছে, "সৎ"ও ছিল না, "অসৎ"ও ছিল না, অর্থাৎ "সদসদাত্মক" বা মায়াত্মক জগৎ ছিল না; উহা অধিকতর পরিস্ফুট করিবার জন্য বলা হইতেছে, পৃথিব্যাদি লোক ছিল না, আকাশ ছিল না, আকাশের উপরিস্থিত লোকসমূহ ছিল না। তখন জগতের কোন আবরণও ছিল না, ইত্যাদি। তখন রাত্রি-দিবার প্রভেদ ছিল না, তখন মৃত্যুও ছিল না, অমৃতত্বও ছিল না। তখন অন্ধকারদ্বারা আবৃত ছিল। তখন একমাত্র পরব্রহ্ম ছিলেন, প্রলয়াবস্থায় একমাত্র পরব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুই থাকে না, "নাসদীয়সূক্ত" হইতে তাহাই ব্যক্ত হইয়াছে।

স্মরণ করিলেও বুঝিতে পারিতেন। সতের কখনও অভাব হয় না, অসত্তের কখনও ভাব হয় না, গীতা ইহাই বলেন। যে বস্তু নাই, তাহা সৃষ্টির পূর্ব্বে ছিল না, ইহা বলা ঋষির উদ্দেশ্য নহে, কারণ উহাদ্বারা যেন এইরূপ অনুমান হয় যে, যাহা নাই, তাহা বুঝি পরে হইয়াছে। তৎপরে বলা হইতেছে, যাহা "সৎ" অর্থাৎ যাহা আছে, তাহাও ছিল না। রমেশ বাবু এইরূপ অর্থ ই করেন। কিন্তু ইহাতেও এই দোষ স্পর্শে যে, যে সতের কখনও অভাব হইতে পারে না, এই স্থলে সেই সতের অভাব সূচিত হইতেছে! ইহা কখনও ঋষির উদ্দেশ্য হইতে পারে না। এই স্থলের প্রকৃত অর্থ এই যে, সদসদাত্মিকা মায়া তখন ছিল না। সৃষ্টির পূর্ব্বে মায়া ছিল না। মায়াদ্বারাই জগৎ সৃষ্ট হয়; সুতরাং মায়াও ছিল না, সৃষ্টিও ছিল না। তখন রজঃ—অর্থাৎ পৃথিব্যাদিলোক ছিল না। 'লোকা রজাংস্যুচ্যন্তে' ইতি যাস্কঃ।

ন ব্যোম—তখন অন্তরীক্ষও ছিল না। পর ব্যোম—অন্তরীক্ষের উপরিস্থিত লোকসমূহও ছিল না। কিমাবরীবঃ—তখন আবরণ করে, এমন কি ছিল? অর্থাৎ আবরণীয় কোন বস্তু না থাকায় আবরকও ছিল না। বৃণোতের্যঙ-লুগন্তাচ্ছান্দসে লঙিতিতি রূপমেতৎ। কুহ—কুত্র দেশে, কিং শব্দাৎ সপ্তম্যর্থে হ প্রত্যয়ঃ। সেই আবরকের কোন আধারভূত দেশ কি ছিল? অর্থাৎ তাহাও ছিল না। কস্য শর্ম্মন্—কস্য বা ভোক্তুঃ জীবস্য শর্ম্মণি সুখে। জীবানা-মুপভোগার্থা হি সৃষ্টিঃ—জীবের উপভোগের জন্যই সৃষ্টি। তৎকালে সৃষ্টি যেরূপ ছিল না, তদ্রূপ ভোক্তা জীবও ছিল না। শর্ম্ম অর্থে সুখ—কাহার সুখের জন্য? অর্থাৎ কাহারও নহে। অম্ভ কিমাসীৎ গহনম্ গভীরম—তখন দুর্গম ও গভীর জল ছিল না। (২)

বঙ্গানুবাদ। তৎকালে অর্থাৎ অবান্তর প্রলয়কালে সদসদাত্মিকা মায়া ছিল না। পৃথিব্যাদিলোক, অন্তরীক্ষ এবং অন্তরীক্ষের উপরিস্থিত লোকসমূহ (যাহা মায়া হইতে উদ্ভূত হয়) ছিল না। তখন এই সমুদায় লোকের কোন আবরক ছিল না এবং উহার কোন আধার ছিল না। তখন ভোক্তা জীব, যাহার সুখের জন্য এই সৃষ্টি-প্রপঞ্চ, সে জীবও ছিল না। তখন দুর্গম ও গম্ভীর জল ছিল না।

ন মৃত্যুরাসীদমৃতং ন তর্হি ন রাত্র্যা অহ্ন আসীৎ প্রকেতঃ। আনীদবাতং স্বধয়া তদেকং তস্মাদ্ধান্যন্ন পরঃ কিঞ্চনাস ॥ ২ ॥

পদপাঠঃ। ন। মৃত্যুঃ। আসীৎ। অমৃতম্। ন। তর্হি। ন। রাত্র্যাঃ। অহ্নঃ। আসীৎ। প্রকেতঃ। আনীৎ। অবাতম্। স্বধয়া। তৎ। একম্। তস্মাৎ। হ। অন্যৎ। ন। পরঃ। কিম্। চন। আস ॥ ২ ॥

ব্যাখ্যা। ন মৃত্যুঃ আসীৎ—তখন মৃত্যু বা মরণ ছিল না। অমৃতং ন তর্হি—তখন অমরণও ছিল না। যে সময় মৃত্যু নাই, সে সময় অম-

---

(২) এই ঋকের যে ব্যাখ্যা ও অনুবাদ প্রকাশিত হইবে, পাঠক তাহার সহিত রমেশ বাবুর অনুবাদ মিলাইয়া দেখিবেন। এই ঋক্ রমেশ বাবু এইরূপ অনুবাদ করিয়াছেন, "তৎকালে যাহা নাই, তাহাও ছিল না, যাহা আছে, তাহাও ছিল না। পৃথিবীও ছিল না, অতি দূর-বিস্তার আকাশও ছিল না। আবরণ করে, এমন কি ছিল? কোথায় কাহার স্থান ছিল? দুর্গম ও গভীর জল কি তখন ছিল" এই অনুবাদে যে কি কি দোষ আছে, তাহা আমাদিগের ব্যাখ্যা ও অনুবাদ পাঠ করিলেই, পাঠক বুঝিতে পারিবেন। রমেশ বাবুর অনুবাদ অনেক স্থলে বেদের যথার্থ অর্থ প্রকাশ করে না, অনেক স্থলে বরং বিপরীত অর্থ করে। এই ঋকে "কস্য শর্ম্মন্" ইহার আদৌ অনুবাদ হয় নাই।

রূপেরও কোন জ্ঞান নাই। যেমন দুঃখজ্ঞান না থাকিলে, সুখজ্ঞান হইতে পারে না, তদ্রূপ মরণ না থাকিলে, অমরণ থাকিতে পারে না। ন রাত্র্যাঃ অহ্নঃ প্রকেতঃ আসীৎ। প্রকেতঃ—প্রজ্ঞানং। তখন রাত্রি-দিবার প্রভেদ-জ্ঞান ছিল না। সূর্য্য-চন্দ্রের অভাবে দিন-রাত্রি-মাস-ঋতু প্রভৃতি কাল ছিল না, তাহাই বলা হইতেছে। 'তৎ আনীত—প্রাণিতবৎ।' তৎ শব্দে—ব্রহ্ম। তখন কেবলমাত্র ব্রহ্ম প্রাণন-ক্রিয়া করিতেছিলেন। সংশয় হইতে পারে যে, তিনি বুঝি জীবের ন্যায় বায়ুর সাহায্যে প্রাণন-ক্রিয়া করিতেছিলেন, তাহাতেই বলা হইতেছে—অবাতম্—বায়ুর সাহায্য ব্যতীত। তবে তিনি কিরূপে প্রাণন-ক্রিয়া করিতেছিলেন বা জীবিত ছিলেন?—"স্বধয়া"। স্বধাদ্বারা। স্বধা শব্দের বহু অর্থ, সাধারণতঃ জল ও অন্ন বুঝায়। এস্থলে স্বধা শব্দে মায়া। সায়ন বলেন, "স্বস্মিন্ ধীয়তে ধ্রিয়তে আশ্রিত্য বর্ত্তত ইতি স্বধামায়া।" তিনি মায়াশক্তি আশ্রয় করিয়া জীবিত ছিলেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, মায়া ব্রহ্মের অঘটন-ঘটন-পটীয়সী শক্তিবিশেষ। মায়া ব্রহ্মে অপ্রকট-ভাবে আছে। মায়া প্রকট হইলেই জগৎ সৃষ্ট হয়! এস্থলে মায়া প্রকট হওয়ার পূর্ব্ব অবস্থার কথা বলা হইতেছে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, মায়া ছিল না, এইক্ষণ বলা হইতেছে তিনি মায়াসহকারে প্রাণন-ক্রিয়া করিতেছিলেন। পাছে মায়ার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব সূচিত হয়, এই জন্য বলা হইতেছে—'একম্' অর্থাৎ অবিভক্ত-ভাবে। অর্থাৎ তখন মায়ার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ছিল না এবং মায়ার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব হইলে যে জগতের উদ্ভব, পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, সে জগৎ ছিল না। 'তস্মাৎ অন্যৎ ন কিঞ্চন আস।' পূর্ব্বোক্ত মায়া সহিত ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুই ছিল না। পরঃ—অর্থাৎ পরস্মাৎ সৃষ্টেঃ ঊর্দ্ধং বর্ত্তমানং ইদং জগৎ ন বভূব। আর সৃষ্টি আরম্ভ হওয়ায় যে জগৎ হইয়াছে, তাহাও ছিল না।

বঙ্গানুবাদ। তৎকালে মরণ বা অমরণ ছিল না, তখন রাত্রি-দিবার প্রভেদ ছিল না। তৎকালে ব্রহ্ম বায়ুর সাহায্যব্যতীত মায়া আশ্রয় করিয়া প্রাণন-ক্রিয়া করিতেছিলেন; কিন্তু তখন মায়ার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ছিল না; তিনি মায়ার সহিত অবিভক্তভাবে অবস্থিত ছিলেন। তৎকালে ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুই ছিল না। তখন এই জগৎ ছিল না। (৩)

তম আসীত্তমসা গূড়্হমগ্রে প্রকেতং
সলিলং সর্ব্বমা ইদম্। তুচ্ছেনাভ্বপিহিতং
যদাসীত্তপসস্তন্মহিনা জায়তৈকম্ ॥৩॥

পদপাঠ। তমঃ। আসীৎ। তমসা। গূড়্হম্। অগ্রে। অপ্রকেতম্। সলিলম্। সর্ব্বম। আঃ। ইদম্। তুচ্ছ্যেন। আভু। অপিহিতম্।

(৩) রমেশবাবু এই ঋকের এই প্রকার অনুবাদ করেন,—"তখন মৃত্যুও ছিল না, অমরত্বও ছিল না, রাত্রি ও দিনের প্রভেদ ছিল না। কেবল সেই এক-মাত্র বস্তু বায়ুর সহকারিতা ব্যতিরেকে আত্মা মাত্র অবলম্বনে নিশ্বাস-প্রশ্বাসযুক্ত হইয়া জীবিত ছিলেন। তিনি ব্যতীত আর কিছুই ছিল না।"—এই অনুবাদে "স্বধয়া" শব্দের অনুবাদ "আত্মা মাত্র অবলম্বনে" ধরিয়া লইতে হয়। রমেশবাবু তাঁহার বঙ্গানুবাদের ভূমিকায় লিখিয়াছেন যে, তিনি সায়ণের টীকা অবলম্বন করিয়া অনুবাদ করিয়াছেন এবং ইহাও লিখিয়াছেন যে, যদি কোনও স্থানে কোন শব্দের অর্থ সায়ণের অর্থানুরূপ অনুবাদিত না হইয়া থাকে, তাহাহইলেও সেই স্থানে সায়ণের অর্থ টীকায় দিয়াছেন। সায়ণের মতে এস্থলে স্বধা অর্থে মায়া, সুতরাং রমেশবাবু কিরূপে এই অনুবাদ করিয়াছেন, আমরা বুঝিতে পারিলাম না। তাঁহার প্রকাশিত ঋগ্বেদসংহিতার মূলেও এই "স্বধা" পাঠ আছে। পরঃ শব্দের অনুবাদ আদৌ হয় নাই। একম্ অর্থে "এক-মাত্র বস্তু" করিয়াছেন, এটিও ভ্রম।

পাশ্চাত্য সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণ বেদে ব্যবহৃত মায়া-

যৎ। আসীৎ। তপসঃ। তৎ। মহিনা। অজা-য়ত। একম্॥ ৩॥

ব্যাখ্যা। 'অগ্রে—তম আসীৎ তমসা গূঢ়ম্' সৃষ্টির পূর্ব্বে অন্ধকার অন্ধকারদ্বারা আবৃত ছিল। এই হইল শব্দার্থ। কিন্তু যখন রাত্রি নাই, দিবা নাই, তখন আবার অন্ধকার কি? সৃষ্টির পূর্ব্বে গাঢ় অন্ধকার ছিল, ইহাই বলা কি ঋষির উদ্দেশ্য? পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ইহাকে গাঢ় অন্ধকারের উত্তম বর্ণনা বলিয়া ঋষিকে প্রশংসা করিয়াছেন। রমেশ বাবু ইহাকে "সৃষ্টির পূর্ব্বের অবস্থার বর্ণনা অতিশয় গম্ভীর ও ভয়াবহ" বলিয়াছেন। তীক্ষ্ণবুদ্ধি স্বামী বিবেকানন্দও কলিকাতার কোন বক্তৃতায় এই অংশ টুকুর অনেক প্রশংসা করিয়াছেন। তিনি বলেন ডান্টি-মিল্টন প্রভৃতি কবিগণও অন্ধকারের এমন সুন্দর বর্ণনা করিতে পারেন নাই। কিন্তু অন্ধকার বর্ণনা করা ঋষির উদ্দেশ্য নহে। আলোক-সাপেক্ষ অন্ধকারই আমরা বুঝি, কিন্তু বাদের ভিত্তি আছে, ইহা স্বীকার করেন না। জর্ম্মাণ ও ফরাশিদেশীয় মুদ্রিত বেদে "স্বধা" স্থলে কি পাঠ আছে, জানি না, কিম্বা তাহারা উহার কি অর্থ করিয়াছেন, তাহাও অবগত নই। সায়ণ যে অর্থ করিয়াছেন, তাহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। রমেশবাবু কি পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের অনুকরণ করিয়া সায়ণের "মায়া" পরিত্যাগ করিয়াছেন? রমেশবাবুর বেদানুবাদের ভ্রম আমরা পূর্ব্বে অনেক স্থলে দেখাইয়াছি, এবারও কিছু দেখাইলাম। ইহাতে কেহ যেন মনে করেন না যে, আমরা রমেশবাবুর গুণের পক্ষপাতী নহি, কিন্তু রমেশ বাবু একটু দেখিয়া শুনিয়া বেদের অনুবাদ করিলেই আমরা সুখী হইতাম। রমেশবাবুর বেদানুবাদ হইতে বেদের অর্থ যে কেহ বুঝিতে পারে, তাহা আমাদের বোধ হয় না। অনেকেই আমাদিগকে ঐরূপ বলেন। অনেককে বলিতে শুনিয়াছি "বেদত ঐ, যাহা রমেশবাবু অনুবাদ করিয়াছেন, উহা পড়ার প্রয়োজন নাই" বস্তুতঃ রমেশবাবুর অনুবাদ হইতে বেদের প্রতি সংস্কৃতানভিজ্ঞ লোকের ভক্তি না হইয়া যথেষ্ট অভক্তিই জন্মিয়াছে।

এই স্থলে নিত্য-নিরপেক্ষ অন্ধকার বলা হইতেছে এবং উহার প্রকৃত অর্থ এই প্রকাশ পায় যে, তখন কার্য্য-কারণের কোন ভেদ ছিল না, আবরক ও আবার্য্যের কোন ভেদ ছিল না; এই কার্য্যাত্মক জগৎ তখন মায়ায় অব্যক্তভাবে নিহিত ছিল। নৈশ অন্ধকারে যেমন বস্তু হইতে বস্তন্তর পৃথক্ করা যায় না, সেই রূপ সৃষ্টির প্রাক্‌কালে কারণাচ্ছাদিত কার্য্য কারণ হইতে পৃথক্ করা যাইতে পারিত না। যদি কেহ তর্ক করেন যে, একটি "আবরক" কর্ত্তা আর একটি "আবার্য্য" কর্ম্মস্বরূপ হইলে উহাদিগকে পৃথক্ করা যাইবে না কেন? তজ্জন্য বলা হইতেছে, প্রকেতঃ—অপ্রজ্ঞায়মানং—কারণ দ্বারা কার্য্য আবৃত ছিল অপ্রজ্ঞায়মানভাবে। ব্যবহারিক অবস্থায় নামরূপদ্বারা কারণ যেরূপ পরিস্ফুট হইয়াছে, তখন তদ্রূপ হয় নাই। এই স্থলে মনু স্মরণ করুন—"আসীদিদং তমোভূতম-প্রজ্ঞাতমলক্ষণং। অপ্রতর্কমনির্দ্দেশ্যং প্রসুপ্ত-মিব সর্ব্বত ইতি।" তৎপরে বলা হইতেছে, ইদম্ সর্ব্বগসলিলং—সলগতো ঔণাদিকঃ একম্। ইদং সর্ব্বং জগৎ সলিলং কারণেন সঙ্গতং অবিভাবাপন্নং। আঃ—আসীৎ। অর্থাৎ এই জগৎ তখন কারণদ্বারা আচ্ছাদিত হইয়া অবিভক্ত-ভাবে ছিল। সায়ণ অন্যরূপ অর্থও করেন। নীরের মধ্যে ক্ষীর দিলে যেমন নীরের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব উপলব্ধি হয় না, ক্ষীরই দেখা যায়, এই জগৎ তদ্রূপ লুপ্তোপম সলিলের ন্যায় ছিল। নীর যদি এইরূপ দুর্ব্বল হয় যে ক্ষীরের সহিত সংসৃষ্ট থাকিলেই উহার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব উপলব্ধি হয় না, তাহাহইলে নীররূপ জগৎ ক্ষীররূপ মায়া-কারণ হইতে কিরূপ স্বতন্ত্র হইল? তদুত্তরে বলা হইতেছে যে—তুচ্ছ্যেনাভ্বপিহিতং যদাসীত্তপস-স্তন্মহিনা অজায়তৈকম্। একং একীভূতং, অর্থাৎ জগৎ মায়ায় লীন থাকা সত্ত্বেও। তুচ্ছ্যেনাভ্বপি-

হিতং আসমন্তাৎ ভবতীত্যাভু তুচ্ছ্যেন (ছান্দসো য কারোপজনঃ). তুচ্ছেন তুচ্ছ কল্পেন সদসদ্বিলক্ষণেন ভাবরূপাজ্ঞানেন নিহিতং ছাদিতম্ আসীৎ যৎ তৎ তপসঃ মহিনা অজায়ত জগৎ তুচ্ছকল্প সদসদাত্মিকা মায়াদ্বারা চতুর্দ্দিক হইতে আচ্ছাদিত হইলেও এবং তদ্ধেতু একীভূত অবস্থা থাকা সত্ত্বেও তাহার তপের মাহাত্ম্য হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল। তপসঃ—দ্রষ্টব্য বিষয় পর্য্যালোচনাই তপ।

বঙ্গানুবাদ। সৃষ্টির পূর্ব্বে জগৎ তাহার কারণরূপ মায়াদ্বারা আচ্ছাদিত ছিল, অন্ধকারে যেরূপ কোন বস্তু হইতে বস্ত্বন্তর নির্দ্দেশ করা যায় না, জগৎকেও তখন স্বতন্ত্ররূপে নির্দ্দেশ করিতে পারা যাইত না, উহা মায়ার সহিত সংগত থাকায় অপ্রজ্ঞায়মান ছিল। তুচ্ছকল্প মায়াদ্বারা আচ্ছন্ন থাকিয়া একীভূত অবস্থায় থাকা সত্ত্বেও ব্রহ্মের সৃষ্টি-পর্য্যালোচনারূপ তপস্যা হইতে জগৎ স্বতন্ত্রভাবে উৎপন্ন হয়॥ ৪ ॥

कामस्तदग्रे समवर्त्तताधिमनसो रेतः प्रथमं यदासीत्। सतो बन्धुमसति निरविन्दन् हृदि प्रतीष्या कवयो मनीषा ॥ ४ ॥

পদপাঠঃ। কামঃ। তৎ। অগ্রে। সম। অবর্ত্তত। অধি। মনসঃ। রেতঃ। প্রথমম্। যৎ। আসীৎ। সতঃ। বন্ধুম্। অসতি। নিঃ। অবিন্দন। হৃদি। প্রতীষ্য। কবয়ঃ। মনীষা॥ ৪॥

ব্যাখ্যা। অগ্রে—সৃষ্টির পূর্ব্বে। কাম মনসি অধি সমবর্ত্তত—ঈশ্বরের অন্তঃকরণে কাম-অর্থাৎ সৃষ্টির ইচ্ছা জন্মিয়াছিল। উপনিষদের "সো কাময়ত বহুঃ স্যাং প্রজায়েয়েতি স তপোতপ্যত স তপস্তপ্ত্বা ইদং সর্ব্বমসৃজত যদিদং কিং চেতি" স্মরণ করুন্। তাঁহার এই সৃষ্টির ইচ্ছা হইল কেন? তদুত্তরে বলা হইতেছে—রেতঃ প্রথমম্ যৎ আসীৎ তৎ। প্রথমম্ অর্থাৎ অতীতকল্পে—রেতঃ শব্দে—প্রাণিদিগের কৃতকর্ম্ম, যাহা ভাবী-সৃষ্টির বীজস্বরূপ হইয়াছিল। যেহেতু সৃষ্টিসময়ে প্রাণীদিগের পূর্ব্বকল্পকৃত কর্ম্ম ছিল, সেইহেতু তাঁহার সৃষ্টির ইচ্ছা হইয়াছে। যৎ শব্দে যেহেতু, তৎ শব্দে সেইহেতু। তাঁহার মনে কাম উদয় হইলে, তিনি স্রষ্টব্য পর্য্যালোচনারূপ তপ করিয়া সৃষ্টি করিলেন। কবয়ঃ হৃদি মনীষা প্রতীষ্য সতঃ বন্ধুম্ অসতি নিরবিন্দন্ সতঃ বন্ধুম্—এস্থলে সৎ অর্থে ব্যবহারাত্মক জগৎ। বন্ধুম্—বন্ধকং হেতুভূতং অর্থাৎ পূর্ব্বকল্পকৃত কর্ম্ম। কবয়ঃ—ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমানবেত্তা যোগিগণ। হৃদি—হৃদয়ে। মনীষা—বুদ্ধিরদ্বারা। প্রতীষ্য—বিচার করিয়া। অসতি — নিরবিন্দন মায়াতে জানিয়াছিলেন। ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমানবেত্তা যোগিগণ মায়াতেই ব্যবহারিক জগতের হেতুভূত পূর্ব্বকল্পকৃত কর্ম্মের উৎপত্তিস্থান বুদ্ধিদ্বারা হৃদয়ে পর্য্যালোচনা করিয়া স্থির করিয়াছিলেন।

বঙ্গানুবাদ। জীবের পূর্ব্বকল্পকৃত কর্ম্ম রেত বা বীজস্বরূপ থাকায়, পরমেশ্বরের মনে সৃষ্টির

(৪) রমেশবাবু এই ঋকের অনুবাদ এইরূপ করেন;—সর্ব্বপ্রথম অন্ধকারদ্বারা অন্ধকার আবৃত ছিল। সমস্তই চিহ্নবর্জ্জিত ও চতুর্দ্দিকে জলময় ছিল। অবিদ্যমান বস্তুর দ্বারা সেই সর্ব্বব্যাপী আচ্ছন্ন ছিল। তপস্যার প্রভাবে সেই এক বস্তু জন্মিলেন। অন্ধকার দ্বারা অন্ধকার আবৃত ছিল, ইহা মূলের কথায় কথায় অনুবাদ হইল বটে, কিন্তু কেহ কিছু বুঝিল না। "চতুর্দ্দিকে জলময় ছিল" এবড় আশ্চর্য্য! কারণ তখন জল আদৌ ছিল না। "অবিদ্যমান বস্তু" কি, কেহ তাহা বুঝিল না। সেই সর্ব্বব্যাপী "অবিদ্যমান বস্তু" দ্বারা আচ্ছন্ন ছিল, ইহা মূলে নাই। তপস্যার প্রভাবে সেই এক বস্তু জন্মিলেন। "এক বস্তু" কি? ব্রহ্ম কি নিজে তপস্যা করিয়া নিজেই জন্মিলেন? এই অনুবাদের অধিক সমালোচনা অনাবশ্যক।

ইচ্ছা হইয়াছিল। ঋষিগণ মায়াতেই ব্যবহারিক জগতের হেতুভূত পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের উৎপত্তিস্থান বুদ্ধিদ্বারা আপন হৃদয়ে বিচার করিয়া স্থির করিয়াছিলেন। (৫)

তিরশ্চীনো বিততো রশ্মিরেষামধঃ স্বিদাসীদুপরি স্বিদাসীৎ। রেতোধা আসন্মহিমান আসন্ত্স্বধা অবস্তাৎ প্রযতিঃ পরস্তাৎ॥ ৫॥

পদপাঠঃ। তিরশ্চীনঃ। বিততঃ। রশ্মিঃ। এষাম্। অধঃ। স্বিৎ। আসীৎ। উপরি। স্বিৎ। আসীৎ। রেতো। ধাঃ। আসন্। মহিমানঃ। আসন্। স্বধা। অবস্তাৎ। প্রযতিঃ। পরস্তাৎ॥৫॥

ব্যাখ্যা। অবিদ্যা-কামকর্ম্মই সৃষ্টির হেতু। এষামৃরশ্মি—অবিদ্যা-কামকর্ম্মসমূহেররশ্মি। তিরশ্চীনঃ অধঃ উপরি বিতত আসীৎ। সূর্য্যরশ্মি যেরূপ সূর্য্যের উদয়ান্তর নিমেষমধ্যে সমস্ত জগতে ব্যাপ্ত হয়, তদ্রূপ অবিদ্যা-কামকর্ম্মের রশ্মি উর্দ্ধ, অধঃ এবং উভয়পার্শ্বে বিস্তৃত হইল, অর্থাৎ চতুর্দ্দিকে সৃষ্টি আরম্ভ করিল। স্বিৎ—বিতর্কে। তখন "রেতোধা" অর্থাৎ বীজভূত কর্ম্ম সম্পাদনকারী কর্ত্তা, ভোক্তা জীব এবং "মহিমানঃ" অর্থাৎ আকাশ, বায়ু, অগ্নি, অপ, পৃথিবী প্রভৃতি পঞ্চেন্দ্রিয়গ্রাহ্য পঞ্চভূত "আসন্" উৎপন্ন হইয়াছিল। মায়াসহকারে জগৎ সৃষ্টি করিয়া পরমেশ্বর সৃষ্টি-ভোক্তৃ ভোগ্যরূপে বিভাগ করিলেন। এই জন্য স্বধা অবস্তাৎ প্রযতিঃ পরস্তাৎ "স্বধা" অন্ন বা ভোগ্যপ্রপঞ্চ, স্বধা ভোগ্যপ্রপঞ্চের উপলক্ষণমাত্র। "প্রযতিঃ" ভোক্তা। অবস্তাৎ—নিকৃষ্ট আসীৎ। পরস্তাৎ—উৎকৃষ্ট আসীৎ। ভোক্তা প্রধান হইয়াছিল এবং ভোগ্য নিকৃষ্ট হইয়াছিল।

বঙ্গানুবাদ। সূর্য্যরশ্মির ন্যায় অবিদ্যা-কামকর্ম্মের রশ্মি নিমেষমধ্যে উর্দ্ধে, নিম্নে এবং উভয়পার্শ্বে বিস্তৃত হইয়া সৃষ্টি আরম্ভ করিল, তখন ভোক্তা জীব এবং ভোগ্য ভূতপ্রপঞ্চ সৃষ্ট হইল। ভোক্তা জীব প্রধান এবং ভোগ্যপ্রপঞ্চ নিকৃষ্ট গণ্য হইল। (৬)

কো অদ্ধা বেদ ক ইহ প্রবোচৎ কুত আজাতা কুত ইয়ং বিসৃষ্টিঃ। অর্ব্বাগ্দেবা অস্য বিসর্জ্জনেনাথ কো বেদ যত আবভূব॥ ৬॥

পদপাঠঃ। কঃ। অদ্ধা। বেদ। কঃ। ইহ। প্রবোচৎ। কুতঃ। আজাতা। কুতঃ। ইয়ম্। বিসৃষ্টিঃ। অর্ব্বাক্। দেবাঃ। অস্য। বিসর্জ্জনেন। অথ। কঃ। বেদ। যতঃ। আবভূব॥ ৬॥

(৫) পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মই জীবের জন্মের কারণ। প্রলয়কালে যাহারা মুক্ত না হয়, তাহাদের কর্ম্ম রহিয়া যায়, উহাই ভগবানের রেতঃ স্বরূপ এবং উহাই নূতন সৃষ্টির কারণ। অনাদিকাল হইতে এইরূপ হইয়া আসিতেছে। কেহ বলিতে পারে না জীবের কর্ম্ম কোন্ সময় আরম্ভ হইল, যেমন কেহই বলিতে পারে না বীজ অগ্রে না অঙ্কুর অগ্রে। কিন্তু এই সৃষ্টি-প্রপঞ্চ যে মায়া (ব্রহ্মের অঘটন-ঘটন-পটীয়সীশক্তি) হেতু হইয়াছে, ঋষিগণ তাহা নির্দ্ধারণ করিয়াছেন।

(৬) রমেশবাবু এই ঋকের অনুবাদ এইরূপ করেন;—"রেতোধা পুরুষেরা উদ্ভব হইলেন, মহিমা সকল উদ্ভব হইলেন, উহাদিগের রশ্মি দুই পার্শ্বে ও নিম্নের দিকে এবং উর্দ্ধদিকে বিস্তারিত হইল। নিম্নদিকে স্বধা রহিল প্রয়াতি উর্দ্ধদিকে রহিল" অনুবাদে উহাদিগের রশ্মি "রেতোধা পুরুষ এবং মহিমা সকলের রশ্মি" বুঝাইতেছে। কিন্তু মূলে "এষাং" শব্দে সায়ণ অর্থ করেন 'এষামবিদ্যাকামকর্ম্মণাং।' যে ভাবে অনুবাদ করা হইয়াছে, তাহাতে মূলের ভাব ব্যক্ত হওয়া দূরে থাকুক, বিপরীত অর্থ হইয়া গিয়াছে! রমেশবাবু তাঁহার টীকায় "মহিমা" অর্থে পঞ্চভূত, "স্বধা" অর্থে অন্ন এবং "অন্ন" নিকৃষ্ট এবং প্রযতি অর্থে ভোক্তা, সেই ভোক্তা উপরে—অর্থাৎ প্রধান এইরূপ বলা সত্ত্বেও তাঁহার অনুবাদ পাঠ করিলে মূলের মর্ম্মবোধ হয় না।

ব্যাখ্যা। কঃ অদ্ধা বেদ—কোন্ পুরুষ "অদ্ধা" পারমার্থ্যেন যথার্থভাবে জানে? কঃ ইহ প্রবোচৎ—কেইবা উহার বর্ণনা করিবে? কুতঃ আজাতা—কি উপাদানকারণ হইতে সৃষ্টি হইল? কুতঃ ইয়ং বিসৃষ্টিঃ—কোন্ নিমিত্তকারণ হইতে বিবিধ সৃষ্টি হইল? অস্য বিসর্জ্জনেন দেবাঃ অর্ব্বাক্—দেবাঃ জগতো বিসর্জ্জনেন অর্ব্বাচীনাঃ কৃতাঃ ভূতসৃষ্টিঃ পশ্চাজ্জাতাঃ। দেবতারা ভূতসৃষ্টির পরে জন্মিয়াছেন, সুতরাং তাঁহারাও জানেন না, অথ কো বেদ যত আবভূব—যে কারণ হইতে জগৎ হইয়াছে, তাহা কোন্ মনুষ্য জানে?

বঙ্গানুবাদ। কোন্ উপাদান এবং কোন্ নিমিত্তকারণ হইতে জগৎ সৃষ্ট হইল, তাহা যথার্থভাবে কে জানে—কেই বা বর্ণনা করিবে? দেবতারা ভূত সৃষ্টির পরে জন্মিয়াছেন, তাঁহারাও উহা জানেন না। যে কারণ হইতে জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা কোন্ মনুষ্য জানে?

ইয়ং বিসৃষ্টির্যত আবভূব যদি বা দধে যদি বা ন। যো অস্যাধ্যক্ষঃ পরমে ব্যোমন্ সো অঙ্গ বেদ যদি বা ন বেদ ॥ ৭ ॥

পদপাঠঃ। ইয়ম্। বিসৃষ্টিঃ। যতঃ। আবভূব। যদি। বা। দধে। যদি। বা। ন। যঃ। অস্য। অধ্যক্ষঃ। পরমে। ব্যোমন্। সঃ। অঙ্গ। বেদ। যদি। বা। ন। বেদ ॥ ৭ ॥

ব্যাখ্যা। ইয়ং বিসৃষ্টির্যত আবভূব। এই বিবিধ সৃষ্টি যে উপাদানভূত পরমাত্মা হইতে হইয়াছে। যদি বা দধে যদি বা ন দধে—সেই উপাদানভূত পরমাত্মা আবার নিমিত্তকারণ হইয়া এই বিবিধ সৃষ্টি যে সৃষ্টি করেন কি না করেন। যো অস্যাধ্যক্ষঃ পরমে ব্যোমন্। যিনি আকাশবৎ নির্গুণ স্বপ্রকাশে বা স্বরূপে—জগতের অধ্যক্ষস্বরূপ রহিয়াছেন। সো অঙ্গ—সোঽপি—তিনিই। বেদ যদি বা ন বেদ। তিনিই জানেন বা নাইবা জানেন। এই শ্লোকে দুই স্থানে সংশয়াত্মক বাক্য রহিয়াছে। এই বিবিধ সৃষ্টি যে উপাদানভূত পরমাত্মা হইতে হইল, তিনিই উহার নিমিত্তকারণ হইয়া উহাকে সৃষ্টি করেন বা না করেন, তাহা আকাশবৎ নির্গুণ স্বপ্রকাশে প্রতিষ্ঠিত জগতের অধ্যক্ষস্বরূপ পরমাত্মাই জানেন বা তিনি নাইবা জানেন। উহার মধ্যে—যদি বা দধে যদি বা ন,—এই সন্দেহবচন যে রহিয়াছে, উহা বস্তুতঃ সন্দেহ নহে। সায়ণ বলেন "অসংদিগ্ধে সংদিগ্ধবচনমেতৎ" অসন্দেহসত্ত্বেও সন্দেহবচন রহিয়াছে। আমরা সাধারণ ভাষায় যেরূপ বলি, অমুকই এই কার্য্য করিবে; করে ত সেই করিবে, না করে ত সেই না করিবে" ইহার অর্থ এই যে, অন্যের এই কার্য্য করার সাধ্য নাই। ঐপ্রকার "স অঙ্গ বেদ যদি বা ন বেদ" তিনিই জানেন, বা না জানেন, ইহার ভাব এই "জানেন ত তিনি, না জানেন ত তিনি, অন্য কেহ জানে না"—সায়ণও তাহাই বলেন—সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর এব তাং সৃষ্টিং জানীয়াৎ, নান্য ইত্যর্থঃ। সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর সৃষ্টির বিষয় জানেন, অন্যে জানে না। (৭)

বঙ্গার্থ। এই বিবিধ সৃষ্টি যে উপাদানভূত পরমাত্মা হইতে হইয়াছে এবং যে উপাদানভূত পরমাত্মা নিমিত্তকারণ হইয়া ইহা সৃজন করিয়াছেন, আকাশবৎ নির্গুণ স্বপ্রকাশ বা স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়া যিনি সৃষ্টির অধ্যক্ষস্বরূপ রহিয়াছেন, তিনিই উহা অবগত আছেন, অন্য কেহ নহে। (৭)

(৭) সৃষ্টি করিয়াছেন বা করেন নাই, তিনিই জানেন বা তিনি নাও জানিতে পারেন, ইহার বিশদরূপ ব্যাখ্যা না থাকায় রমেশবাবুর অনুবাদ হইতে [illegible]

সৃষ্টিকার্য্য এবং সর্ব্বজ্ঞের সর্ব্বজ্ঞতার উপর সন্দেহ আসিতে পারে। রমেশবাবুর অনুবাদ;—"এই নানা সৃষ্টি যে কোথা হইতে হইল, কাহা হইতে হইল, কেহ করিয়াছেন বা করেন নাই, তাহা তিনিই জানেন, যিনি ইহার প্রভুস্বরূপ পরমধামে আছেন। অথবা তিনিও নাও জানিতে পারেন।"

প্রশ্নোত্তর-রত্নমালিকা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

কো মূকো যঃ কালে প্রিয়াণি বক্তুং ন জানাতি (৪০)। কিং মরণং মূর্খত্বং (৪১)। কিমনর্ঘ্যং দত্তমবসরে যচ্চ (৪২)॥ ১৬॥

শিষ্য। মূক কে?

গুরু। যে সময়ে প্রিয় বলিতে পারে না।

শিষ্য। মরণ কি?

গুরু। মূর্খতা।

শিষ্য। অমূল্য কি?

গুরু। যাহা সময়ে দেওয়া যায়।

আমরণাৎ কিং শৈল্যং প্রচ্ছন্নং যৎ কৃতং পাপম্ (৪৩)। কুত্রবিধেয়ো যত্নো বিদ্যাভ্যাসে সদৌষধে দানে (৪৪)॥ ১৭॥

শিষ্য। আমরণান্ত হৃদয়ে শৈল্য কি?

গুরু। গুপ্তপাপ।

শিষ্য। কোন্ কার্য্যে যত্ন করা কর্ত্তব্য?

গুরু। সর্ব্বদা বিদ্যাভ্যাসে, ঔষধে ও দানে।

অবধীরণা ক কার্য্যা খল পর যোষিৎ পর-

---

(৪০) সুলভা পুরুষা রাজন্ সততং প্রিয়বাদিনঃ।
অপ্রিয়স্য তু পথ্যস্য বক্তা শ্রোতা চ দুর্লভঃ॥
উদ্যোগপর্ব্বণি ৩৬ অ, ১৫।
অপ্রিয়স্য চ পথ্যস্য বক্তা শ্রোতা চ দুর্লভঃ॥
বাল্মীকিয়ে রামায়ণে ১৬ সর্গে ২৩ (লঙ্কাকাণ্ডে)

(৪১) বিদ্যানাম নরস্য রূপমধিকং বিদ্যাৎ গুপ্তং ধনং।
বিদ্যাসাধুকরী জনপ্রিয়করী বিদ্যা গুরূণাং গুরুঃ।
বিদ্যা বন্ধুজনার্ত্তিনাশকরী বিদ্যা পরং দেবতা।
বিদ্যা রাজসু পূজিতা চ ধনিনাং বিদ্যাবিহীনঃ পশুঃ॥
গরুড়পুরাণে, পূর্ব্বখণ্ডে ১১৫ অধ্যায়ে ৮১।
বরং গর্ভস্রাবো বরমপি চ নৈবাভিগমনং
বরং জাতপ্রেতো বরমপি চ কন্যাভিজননম্।
বরং বন্ধ্যা ভার্য্যা বরমপি চ গর্ভেষু বসতিঃ
ন চাবিদ্বান্ রূপদ্রবিণ গুণযুক্তোঽপি তনয়ঃ॥
ভবভূতিঃ গুণরত্নে।

(৪২) দানঞ্চ যাচতে চান্নমন্নেনাপি হি তুষ্যতি।
ইতি দদাৎ দরিদ্রায় কারুণ্যাদিতি সর্ব্বথা॥
অনুশাসনিকে ১৩৮ অ, ১০।
দরিদ্রান্ ভরকৌন্তেয় মা প্রযচ্ছেশ্বরে ধনং।
ব্যাধিতস্যৌষধং পথ্যং নিরুজস্য কিমৌষধৈঃ॥
(মহাভারতে।)

অদেশকালে যদ্দানমপাত্রেভ্যশ্চ দীয়তে।
অসৎকৃতমবজ্ঞাতং তৎ তামসমুদাহৃতম্॥
শ্রীভগবদ্গীতায়াং ১৭ অ, ২২।

(৪৩) তস্মাৎ পাপং ন গুহেত গুহ্যমানং বিবর্দ্ধতে।
কৃত্বা তু সাধুষাখ্যেয়ং তে তৎ প্রশমযন্ত্যত॥
অনুশাসনিকে পর্ব্বণি ১৬২অ, ৫৯।
তজ্জন্য পাপ গোপন করিবে না, গোপন করিলে বৃদ্ধি হয়। পাপ করিয়া সাধু ব্যক্তির নিকট প্রকাশ করিলে সেই পাপ নষ্ট হয়।
জ্ঞানপূর্ব্বং কৃতং পাপং ছাদয়ন্ত্যবহুশ্রুতাঃ।
নৈনং মনুষ্যাঃ পশ্যন্তি পশ্যন্তি হি দিবৌকসঃ॥
শান্তিপর্ব্বণি ১৯৩ অ, ২৭।
অথ প্রচ্ছন্নপাপানাং শাস্তা বৈবস্বতো যমঃ।
উদ্যোগপর্ব্বণি ৩৪ অ, ৭২।

(৪৪) দানে তপসি সত্যে চ যস্য নোচ্চারিতং যশঃ।
বিদ্যায়ামর্থলাভে চ মাতুরুচ্চার এব সঃ॥
উদ্যোগপর্ব্বণি ১৩২ অ, ২৩।
ইজ্যাধ্যয়নদানানি তপঃ সত্যং ক্ষমাঘৃণা।
অলোভ ইতি মার্গোঽয়ং ধর্ম্মস্যাষ্টবিধঃ স্মৃতঃ।
ঐ ৩৫ অ, ৫৭।

ধর্মেষু (৪৫)। কাহর্নিশমনুচিন্ত্যা সংসারাসারতা নতু প্রমদা (৪৬) ॥ ১৮ ॥

শিষ্য। কোন্ কার্য্যে অবজ্ঞা করা কর্ত্তব্য?

গুরু। খল, পরস্ত্রী ও পরধনে।

শিষ্য। কি সর্ব্বদা চিন্তা করা কর্ত্তব্য?

গুরু। সংসারের, অসারতা পরস্ত্রী নহে।

কা প্রেয়সী বিধেয়া করুণাদীনেষু (৪৭) সজ্জনে মৈত্রী (৪৮)। কঃ পূজ্যঃ সদ্বৃত্তঃ কমধমমাচক্ষতে চলিতবৃত্তম্ (৪৯) ॥ ১৯ ॥

শিষ্য। কোন্ কার্য্য প্রিয় ও কর্ত্তব্য?

গুরু। দীনে দয়া ও সজ্জনের সহিত মিত্রতা।

শিষ্য। পূজ্য কে?

গুরু। সজ্জন।

শিষ্য। কাহাকে অধম বলে?

গুরু। অসচ্চরিত্রকে।

কণ্ঠগতৈরপ্যসুভিঃ কস্যাত্মা ন বশমুপযাতি। মূর্খস্য বিষাদবতো গর্ব্ববতোঽপি চ কৃতঘ্নস্য (৫০) ॥ ২০ ॥

শিষ্য। প্রাণ কণ্ঠগত হইলে কাহার আত্মা না বশ হয়?

গুরু। মূর্খ, বিষাদী, গর্ব্বযুক্ত ও কৃতঘ্নের।

কেন জিতং জগদেতৎ সত্য তিতিক্ষাবতা পুংসা (৫১)। কুত্র বিধেয়ো বাসঃ সজ্জননিকটেঽথবা কাশ্যাম্ (৫২) ॥ ২১ ॥

(৪৫) অভ্রচ্ছায়া খলপ্রীতিঃ পরনারীষু সঙ্গতিঃ।
পঞ্চৈতে অস্থিরা ভাবা যৌবনানি ধনানি চ ॥
গরুড়পুরাণে ১১১ অধ্যায়ে ২৫।
বিপত্তিঃ সন্ততং তস্য পরবস্তুষু যন্মনঃ।
বিশেষতঃ পরস্ত্রীষু সুবর্ণেষু চ ভূমিষু ॥
ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে, শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে ৩৫ অ, ৯২।

(৪৬) শ্রীমদ্ভাগবতে ৫ম স্কন্ধে ১৪ অধ্যায়ে ভবাটবী বর্ণনে সংসারাসারতা সুন্দররূপে বর্ণিত আছে। শিবপুরাণে ধর্ম্মসংহিতার ৪২ অধ্যায়ে ও সংসারাসারতাও বর্ণিত আছে।

(৪৭) যোবাত্মনীহ ন গুরৌ ন চ ভৃত্যবর্গে
দীনে দয়াং ন কুরুতে ন চ মিত্রকার্য্যে।
কিং তস্য জীবিতফলেন মনুষ্যলোকে
কাকোপি জীবতি চিরঞ্চ বলিঞ্চ ভুঙ্‌ক্তে ॥
গরুড়পুরাণে ১১৫ অধ্যায়ে ৩৫।
সতাং সকৃৎ সঙ্গতমীপ্সিতং পরং
ততঃ পরং মিত্রমিতি প্রচক্ষতে।
নচাফলঃ সৎপুরুষেণ সঙ্গতং
ততঃ সতাং সন্নিবসেৎ সমাগমে ॥
বনপর্ব্বণি ২৯৭ অ, ২৭।
সাধূনাং বাপ্যসাধূনাং সন্তএব সদা গতিঃ।
মৎস্যপুরাণে ২১০ অধ্যায়ে ২।

(৪৮) ত্যজতো দুর্জ্জনা সেবো দুর্জ্জনৈঃ সহ সমাগমঃ।
যোগবাশিষ্ঠে বৈরাগ্যপ্রকরণে।
[illegible] পুনর্দুঃখং ন বাধতে। ঐ ঐ

(৪৯) দুর্জ্জনস্য হি সঙ্গেন সুজনোঽপি বিনশ্যতি।
[illegible] কলুষীকৃতম্ ॥
গরুড়পুরাণে ১১৫ অ ৪০।

দুর্জ্জনঃ পরিহর্ত্তব্যো বিদ্যয়ালঙ্কৃতো যদি।
মণিনা ভূষিতঃ সর্পঃ কিমসৌ ন ভয়ঙ্করঃ ॥
গরুড়পুরাণে ১১২ অ, ১৫।
সন্তঃ প্রাণানপি ত্যক্ত্বা পরার্থং কুর্ব্বতে যথা।
তথা সন্তোঽপি সন্তুষ্টা পরপীড়াসু তৎপরাঃ ॥
মৎস্যপুরাণে ২২০ অ, ৪।
গুণায়ন্তে দোষাঃ সুজনবদনে দুর্জ্জনমুখে
গুণাদোষায়ন্তে কিমিতি জগতাং বিস্ময়পদম্।
যথা জীমূতোঽয়ং লবণজলধের্ব্বারিমধুরং
ফণী পীত্বা ক্ষীরং বমতি গরলং দুঃসহতরম্ ॥
ভবভূতিঃ গুণরত্নে।
মন্যে দুর্জ্জনচিত্তবৃত্তিহরণে ধাতাপি ভগ্নোদ্যমঃ ॥
পঙ্করত্নে।

(৫০) গুণবন্তং নিযুঞ্জীত গুণহীনং বিবর্জ্জয়েৎ।
পণ্ডিতস্য গুণাঃ সর্ব্বে মূর্খে দোষাশ্চ কেবলাঃ ॥
গরুড়পুরাণে ১১৩ অ, ১।
——সিংহব্রতং চরত গচ্ছত মা বিষাদং।
ঐ ১১৫-৩৪।
অবলিপ্তেষু মূর্খেষু রৌদ্রসাহসিকেষু চ।
তথৈবাপেত ধর্ম্মেষু ন মৈত্রীমাচরেদ্বুধঃ ॥
উদ্যোগপর্ব্বণি ৩৮ অধ্যায়ে ৫০।

শিষ্য। এই জগৎকে কে জয় করিয়াছে?

গুরু। সত্যবান্ ও সহিষ্ণুলোক।

শিষ্য। কোথায় বাস করা কর্ত্তব্য?

গুরু। সজ্জননিকটে অথবা কাশীতে।

কস্মৈ নমস্ক্রিয়া স্যাদ্দেবানামপি দয়াপ্রধানস্ত (৫৩)। কস্মাদুদ্বেজিতব্যং সংসারারণ্যতঃ সুধিয়া (৫৪)॥ ২২॥

শিষ্য। দেবতাসকল অপেক্ষা কাহাকে নমস্কার করা কর্ত্তব্য?

গুরু। দয়ালুকে।

শিষ্য। সুবুদ্ধি কাহাকে ভয় করিবে?

গুরু। সংসাররূপ অরণ্যকে।

কস্য বশে প্রাণিগণঃ সত্যপ্রিয়ভাষিণো বিনীতস্য (৫৫)। ক স্থাতব্যং ন্যায্যে পথি দৃষ্টার্থলাভায় (৫৬)॥ ২৩॥

শিষ্য। প্রাণিগণ কাহার বশীভূত হয়?

গুরু। সত্য ও প্রিয়ভাষী এবং বিনীত ব্যক্তির।

শিষ্য। কোন্ বিষয়ে থাকা কর্ত্তব্য?

গুরু। দৃষ্টার্থলাভের জন্য ন্যায্যপথে।

বিদ্যুৎবিলসিতচপলং কিং দুর্জ্জনসঙ্গতির্যুবতয়শ্চ (৫৭)। কুলশীলনিষ্প্রকম্পাঃ কে কলিকালেঽপি সৎপুরুষাঃ (৫৮)॥ ২৪॥

জ্ঞানীলোক গর্ব্বিত, মূর্খ, উগ্র, অবিমৃষ্যকারী ও অধার্ম্মিক ব্যক্তির সহিত মিত্রতাচরণ করিবেন না।

দুর্ব্বুদ্ধিমকৃতপ্রজ্ঞং ছন্নং কূপং তৃণৈরিব।
বিবর্জ্জয়ীত মেধাবী তস্মিন্ মৈত্রী প্রণশ্যতি॥
ঐ ঐ ৪৯।

অশ্রদ্ধেয়ঃ কৃতঘ্নো হি কৃতঘ্নে নাস্তি নিষ্কৃতিঃ॥
শান্তিপর্ব্বণি ১৭৩ অ, ১৯।

(৫১) সত্যমেব ব্রতং যস্য দয়া দীনেষু সর্ব্বথা।
কামক্রোধৌ বশে যস্য তেন লোকত্রয়ং জিতং॥
মহানির্ব্বাণতন্ত্রে ৮ উল্লাসে ৬৫।

আক্রুশ্যমানো নাক্রোশেন্মন্যুরেব তিতিক্ষিতঃ।
আক্রোষ্টারং নির্দ্দহতি সুকৃতং চাস্য বিন্দতি॥
উদ্যোগপর্ব্বণি ৩৫ অ, ৫।

(৫২) সজ্জনমাহাত্ম্য শ্রীভাগবতে একাদশস্কন্ধে ১২ অধ্যায়ে বিশেষ বর্ণিত আছে।

কাশীপ্রাপ্ত্যা ভবেৎ জ্ঞানং জ্ঞানান্নির্ব্বাণ মৃচ্ছতি।
স্কন্দপুরাণে কাশীখণ্ডে পূর্ব্বভাগে ৩৬ অধ্যায়ে ৮০।

এতদ্ভিন্ন ঐ পুস্তকের ৩৯ অধ্যায়ে ও ৪৪ অধ্যায়ে কাশীমাহাত্ম্য সবিশেষ বর্ণিত আছে।

(৫৩) এতত্ত্রয়ং শিক্ষেৎ দমং দানং দয়ামিতি।
বৃহদারণ্যকোপনিষদি ৫ অ, ২ব্রাহ্মণে ৩ মন্ত্রঃ।

দয়াভূতেষ্বলোলুপ্ত্বং মার্দ্দবং হ্রীরচাপলম্। ২।

* * * *

অভয়ং সত্ত্বসংশুদ্ধি জ্ঞানযোগব্যবস্থিতিঃ।

ভবন্তি সম্পদং দৈবীমভিজাতস্য ভারত।
শ্রীভগবদ্গীতায়াং ১৬ অধ্যায়ে।

(৫৪) তস্মাৎ সংসারদাবাগ্নিতাপার্ত্তো দ্বিজসত্তমাঃ।
অভ্যসেৎ পরমং জ্ঞানং জ্ঞানান্মুক্তো ভবিষ্যতি॥
বৃহন্নারদীয়পুরাণে ৩০ অধ্যায়ে।

এইরূপ ঐ অধ্যায়ে সংসার ক্লেশ সমুদায় বর্ণিত আছে।

এবং কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্তি সংসারবিজিগীষবঃ॥
বনপর্ব্বণি ২ অধ্যায়ে ৭৭।

ন বিষং কালকূটাখ্যং সংসারো বিষমুচ্যতে।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন সংহরেত সুদারুণম্॥
লিঙ্গপুরাণে পূর্ব্বভাগে ৮৬ অধ্যায়ে ৯।

এইরূপ ঐ অধ্যায়ে সমুদায় বর্ণিত আছে।

(৫৫) সত্যং মৃদু প্রিয়ং ধীরো বাক্যং হিতকরং বদেৎ।
আত্মোৎকর্ষং তথা নিন্দাং পরেষাং পরিবর্জ্জয়েৎ।
মহানির্ব্বাণতন্ত্রে ৮ উল্লাসে ৬২।

(৫৬) নিন্দন্তু নীতিনিপুণা যদি বা স্তুবন্তু
লক্ষ্মীঃ সমাবিশতু গচ্ছতু বা যথেষ্টম্।
অদ্যৈব বা মরণমস্তু যুগান্তরে বা
ন্যায্যাৎপথঃ প্রবিচলন্তি পদং ন ধীরাঃ॥
ভর্ত্তৃহরিঃ নীতিশতকে ৯।

(৫৭) যথা পুষ্করপত্রেষু পতিতাস্ তোয়বিন্দবঃ।
ন শ্লেষমভিগচ্ছন্তি তথা নার্য্যোষু সৌহৃদম্॥ ১১।
বিদ্যুতে স্ত্রীষু সম্পন্নং বিদ্যুতে [illegible]।
"বিদ্যুতে স্ত্রীষু চাপল্যং বিদ্যুতে [illegible]॥
বাল্মীকিয়ে রামায়ণে [illegible]

শিষ্য। বিদ্যুতের ক্রীড়ার ন্যায় চপল কি ?

গুরু। দুর্জ্জন সঙ্গতি ও যুবতীগণ।

শিষ্য। কাহারা কুলশীলযুক্ত হইয়াও অচঞ্চল ?

গুরু। কলিকালেও যাহারা সৎপুরুষ।

কিংশোচ্যং কার্পণ্যং সতি বিভবে (৫৯) কিং প্রশস্তমৌদার্য্যম্ (৬০)। তনুতরবিভবস্য প্রভবিষ্ণোর্ব্বা কিং সৎ সহিষ্ণুত্বম্ (৬১) ॥ ২৫ ॥

শিষ্য। কি সঙ্কোচ করিবে ?

গুরু। ঐশ্বর্য্য থাকিলে কার্পণ্য।

শিষ্য। প্রশংসনীয় কি ?

গুরু। ঔদার্য্য।

শিষ্য। অল্পবিভবসম্পন্ন ও মহাধনশালীদিগের কর্ত্তব্য কি ?

গুরু। সহিষ্ণুতা।

চিন্তামণিরিব দুর্লভমিহ কিং কথয়ামি চতুর্ভদ্রম্। কিং তদ্বদেতি ভূয়ো বিধুততমসো বিশেষেণ ॥ ২৬ ॥

শিষ্য। চিন্তামণির ন্যায় দুর্লভ কাহাকে বলিব ?

গুরু। চতুর্ভদ্র।

শিষ্য। তাহা কি, পুনরায় বিশেষ করিয়া বলুন।

দানং প্রিয়বাক্ সহিতং (৬২) জ্ঞানমগর্ব্বং (৬৩) শৌর্য্যম্ (৬৪)। বিত্তং ত্যাগসমেতং (৬৫) দুর্লভমেতচ্চতুর্ভদ্রম্ ॥ ২৭ ॥

গুরু। প্রিয়বাক্যের সহিত দান, গর্ব্বরহিত জ্ঞান, ক্ষমাসহিত শৌর্য্য, দানসহিত ধন, এই চারিটি দুর্লভ দ্রব্যকে 'চতুর্ভদ্র' বলে।

স্ত্রীয়োমূলং হি দোষণাং লঘুচিত্তাঃ সদা মুনে।
শিবপুরাণে ধর্ম্মসংহিতায়াং ৪৩ অধ্যায়ে ২।

ঐ অধ্যায়ে স্ত্রীনিন্দা বিশেষরূপে বর্ণিত আছে। ৪ অধ্যায়ে স্ত্রীচিত্তদুষ্টতাসম্বন্ধে বর্ণিত আছে।

(৫৮) বিদ্যাতপো বিত্তবপুর্ব্বয়ঃ কুলৈঃ
সতাং গুণৈঃ ষড় ভিরসত্তমেতরৈঃ।
"——————......——————।
শ্রীভাগবতে ৪ স্কন্ধে ৩ অধ্যায়ে ১৫।

(৫৯) বিত্তাঢ্যঃ কৃপণঃ—————"
"——————হাস্যাস্পদং ভূতলে।" নবরত্নং।

আশাধৃতিং হন্তি সমৃদ্ধিমন্তকঃ
ক্রোধঃ শ্রিয়ঃ হন্তি যশঃ কদর্য্যতাং।
অপালনং হন্তি পশূংশ্চ রাজ-
ন্নেকঃ ক্রুদ্ধো ব্রাহ্মণো হন্তিরাষ্ট্রম্।
উদ্যোগপর্ব্বণি ৩৯ অধ্যায়ে ৮।

আশা ধৈর্য্য নাশ করে, যম সমৃদ্ধিকে, ক্রোধ লক্ষ্মীকে কৃপণতা যশকে, অপালন পশুকে ও এক ক্রুদ্ধ ব্রাহ্মণ রাজ্য নষ্ট করে।

"[illegible] কৃপণত্বসত্ত্বেন পুংসাং——"
[illegible] ১১৮ অ, ৩।

(৬০) "[illegible]"

(৬১) ক্ষমা ধর্ম্মঃ ক্ষমা যজ্ঞঃ ক্ষমা বেদাঃ ক্ষমাশ্রুতম্।
যত্র তদেবং জানাতি স সর্ব্বং ক্ষন্তুমর্হতি।
বনপর্ব্বণি ২৯ অধ্যায়ে ৩৬।

ঐ অধ্যায়ে ক্ষমাবানের প্রশংসা ৩৬ হইতে ৪৪ শ্লোক পর্য্যন্ত।

একঃ ক্ষমীবতাং দোষো দ্বিতীয়োনোপপদ্যতে।
যদেবং ক্ষময়াযুক্তমশক্তং মন্যতে জনঃ।
গারুড়ে ১১৪ অ, ৬২।

(৬২) অর্থানামুচিতে পাত্রে শ্রদ্ধয়া প্রতিপাদনম্।
দানমিত্যাভিনির্দ্দিষ্টং ভুক্তিমুক্তিফলপ্রদম্।
কূর্ম্মপুরাণে উপবিভাগে ২৬ অধ্যায়ে।

এইরূপ ঐ অধ্যায়টী সম্পূর্ণ দান বিষয়ে সম্পূর্ণ উক্ত হইয়াছে।

(৬৩) শ্রেয়াংস্তু ষড় বিধস্ত্যাগঃ শ্রিয়ঃ প্রাপ্য ন হৃষ্যতি।
উদযোগপর্ব্বণি ৪২ অধ্যায়ে ২৮।

(৬৫)

ষড় বিধ শ্রেষ্ঠত্যাগের বিবরণ এই যে ঐশ্বর্য্যলাভ করিয়া সন্তুষ্ট না হওয়া, অর্থাৎ বিদ্যা ধনাদি লাভ করিয়া সর্ব্বত্যাগ করিবে।

ঐ স্থানে [illegible] সমুদায় বিশেষরূপে বর্ণিত আছে; উহার শেষে ভগবান কৃষ্ণদ্বৈপায়ন [illegible]

ইতি কণ্ঠগতা বিমলপ্রশ্নোত্তর-রত্নমালিকা যেষাম্। তে মুক্তাভরণা অপি বিভান্তি বিদ্বৎ সমাজেষু॥ ২৮॥

ইতি শ্রীমৎ পরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীশঙ্করাচার্য্যবিরচিতা প্রশ্নোত্তর-রত্নমালিকা সমাপ্তা॥

এই বিমল প্রশ্নোত্তর-রত্নমালা যিনি কণ্ঠে ধারণ করেন, তিনি অন্য কোন আভরণযুক্ত না হইলেও বিদ্বৎ সমাজে শোভা পান।

শ্রীবিধুভূষণ দেব।

দোষৈরেতৈর্ব্বিযুক্তস্তু গুণৈরেতৈঃ সমন্বিতঃ।
এতৎ সমৃদ্ধমত্যর্থং তপো ভবতি কেবলম্॥ ৩৮॥

এই সমুদায় দোষ হইতে বিযুক্ত হইয়া এই সমুদায় গুণযুক্ত হইবে। তাঁহা হইলেই (কৈবল্যসাধন) অত্যর্থ-সমৃদ্ধ তপশ্চরণ করা হইবে।

বিদ্যা বিবাদায় ধনং মদায়
শক্তিঃ পরেষাং পরিপীড়নায়।
খলস্য সাধোর্ব্বিপরীতমেতৎ
জ্ঞানায় দানায় চ রক্ষণায়॥ ৭॥

ভবভূতিঃ গুণরত্নে।

আত্মানাত্মবিবেক।

(পূর্ব্বতোনুবৃত্তঃ)

অবস্থাত্রয়ং নাম জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তয়ঃ। (১)

জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি, এই তিন অবস্থা।

জাগরণং নাম ইন্দ্রিয়ৈরর্থোপলব্ধির্জাগরিতং।

ইন্দ্রিয়দ্বারা রূপাদিবিষয়ের যে অনুভব, তাহাকে জাগরণ বলে।

স্বপ্নো নাম জাগরিতসংস্কারজন্য প্রত্যয়ঃ সবিষয় স্বপ্নঃ।

জাগরণাবস্থার যে সংস্কার, তজ্জন্য সবিষয় যে জ্ঞানাবস্থা, তাহার নাম স্বপ্ন।

সুষুপ্তির্নাম সর্ব্ববিষয় জ্ঞানাভাবঃ।

সর্ব্ববিষয়-জ্ঞান-অভাবের যে অবস্থা, তাহার নাম সুষুপ্তি।

এক্ষণে উক্ত অবস্থাত্রয় পুরুষের নাম কহিতেছেন।

---

(১) মন আদি চতুর্দ্দশকরণৈঃ পুষ্কলৈরাদিত্যাদ্যনুগৃহীতৈঃ শব্দাদীন্ বিষয়ান্ স্থূলান্ যদোপলভতে তদাত্মনো জাগরণম্।

তদ্বাসনারহিতশ্চতুর্ভিঃ করণৈঃ শব্দাদ্যভাবেঽপি বাসনা ময়ান্ শব্দাদীন্ যদোপলভতে তদাত্মনঃ স্বপ্নম্। চতুর্দ্দশকরণোপরমাদ্বিষয়বিশেষ বিজ্ঞানাভাবাৎ যদা তদা আত্মনঃ সুষুপ্তম্। অবস্থাত্রয়াভাবাদ্ ভাবসাক্ষি স্বয়ং ভাবরহিতং নৈরন্তর্য্যং চৈতন্যং যদা তদা তৎ তুরীয়ং চৈতন্যমিত্যুচ্যতে।

সর্ব্বোপনিষৎ সারে ২।৩।

ভাষ্যানুবাদ। আত্মা যখন চন্দ্র, অচ্যুত, শঙ্কর, চতুর্ম্মুখ, দিক্, বায়ু, অর্ক, বরুণ, অশ্বিনীকুমার, বহ্নি, ইন্দ্র, বিষ্ণু, মিত্র ও ব্রহ্মা, এই সকল ইন্দ্রিয়াধিপতি দেবতা কর্ত্তৃক অনুগৃহীত, মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহঙ্কার, শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষু, রসনা নাসিকা, বাক্, পানি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ, এই সকল বহিরাধিভূত জ্ঞান ও কর্ম্মেন্দ্রিয় সকলদ্বারা সঙ্কল্প, অধ্যবসায়, চেতনা, অভিমান, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, বক্তৃ, ব্যাদান, গমন, বিসর্গ ও আনন্দ, এই সকল বহির্ভূত স্থূলবিষয় উপলাভ করে, তখন আত্মার জাগ্রদবস্থা হয়॥ ২॥

যখন আত্মা বাসনারহিত হইয়া শব্দাদির অভাবেও মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহঙ্কার, এই চতুষ্টয়দ্বারা বাসনাময় শব্দাদি উপলাভ করে, তখনই আত্মার স্বপ্নাবস্থা। দেবতা নিমিত্ত ও অদৃষ্ট নিমিত্ত স্বপ্ন হইয়া থাকে, এই চিন্তা স্বপ্নে বাসনাই নিমিত্ত হয় তজ্জন্য 'বাসনাময়' শব্দ উক্ত হইয়াছে। দেবতা ও অদৃষ্ট নিমিত্ত বাসনাবলে 'বাসনা' শব্দে দেবেচ্ছাও ধর্ম্মাধর্ম্ম ব্যাখ্যেয়। স্বপ্নাবস্থায় পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয় ইহাদের কর্ম্ম

জাগ্রৎ স্থূলশরীরাভিমানী বিশ্বঃ। (২)

জাগ্রতাবস্থায় স্থূলশরীরাভিমানী পুরুষকে বিশ্ব কহে।

স্বপ্ন সূক্ষ্মশরীরাভিমানী তৈজসঃ। (৩)

স্বপ্নাবস্থাবিশিষ্ট সূক্ষ্মশরীরাভিমানী পুরুষকে তৈজস বলে।

থাকে না, কেবল মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহঙ্কার, এই চারি ইন্দ্রিয়ের কার্য্য থাকে। স্বপ্নে দশ ইন্দ্রিয়ের কার্য্য উপরত হয় ও অন্তঃকরণ চতুষ্টয়ের ব্যাপার থাকে না, সুতরাং ইন্দ্রিয়ের অভাবে শব্দাদি বিষয় সকলের বিশেষ জ্ঞান থাকে না। আত্মার যখন এই অবস্থা হয়, তখন তাহাকে সুষুপ্তি অবস্থা বলে। যখন আত্মা উপরোক্ত অবস্থাত্রয়রহিত, ভাব পদার্থের সাক্ষী অথবা সাক্ষাৎ দ্রষ্টা এবং নির্লেপত্ববশতঃ ভাবরহিত ও ব্যবধায়ক বাহ্যান্তররহিত হইয়া চৈতন্যরূপে অবস্থান করেন, তখন আত্মার তুরীয়াবস্থা ॥ ৩ ॥

অন্যান্য প্রমাণ হিন্দু-পত্রিকাতে দেওয়া গিয়াছে। ঐতরেয় আরণ্যকে ২ আরণ্যকে ৪ অধ্যায়ে ১ খণ্ডে ১ মন্ত্র ভাষ্যে——"জাগরণং স্বপ্নঃ সুষুপ্তঞ্চেতি—— আরম্ভ করিয়া বিস্তৃত ব্যাখ্যা আছে।

(২) "হিরণ্যগর্ভঃ স্থূলেঽস্মিন্ দেহে বৈশ্বানরো ভবেৎ।"

পঞ্চদশী তত্ত্ববিবেকে ২৮।

ভাষ্যঃ। এবং স্থূল শরীরোৎপত্তিমভিধায় তেষু স্থূল শরীরেষ্বভিমানবতো হিরণ্যগর্ভস্য সমষ্টিরূপস্য বৈশ্বানরসংজ্ঞকত্বং একৈক স্থূলশরীরাভিমানবতাং ব্যষ্টিরূপাণাং তৈজসানাং বিশ্বসংজ্ঞকত্বং ভবতি।

এই প্রকারে স্থূলশরীরোৎপত্তি কথিত হইল; সেই স্থূলশরীরাভিমানী সমষ্টিরূপ হিরণ্যগর্ভের 'বৈশ্বানর' সংজ্ঞ হয় ও পৃথক্ পৃথক্ স্থূলশরীরাভিমানী ব্যষ্টিরূপী তৈজসের 'বিশ্ব' সংজ্ঞা হয়।

(৩) "প্রাজ্ঞস্তত্রাভিমানেন তৈজসত্বং প্রপদ্যতে।"

পঞ্চদশী তত্ত্ববিবেকে ২৪।

ভাষ্যানুবাদ। প্রাজ্ঞ অর্থাৎ মলিনসত্ত্ব প্রধান অবিদ্যোপাধিক জীব তৈজঃ শব্দ বাচ্য অন্তঃকরণোপলক্ষিত লিঙ্গশরীরাভিমানদ্বারা অর্থাৎ তাহাতে অভিমান দ্বারা তৈজস নাম প্রাপ্ত হয়।

সুষুপ্তিঃ কারণশরীরাভিমানী প্রাজ্ঞঃ। (৪)

সুষুপ্তি-অবস্থাবিশিষ্ট কারণশরীরাভিমানী পুরুষকে প্রাজ্ঞ কহে।

কোষপঞ্চকং নামান্নময়-মনোময়-বিজ্ঞানময়ানন্দময়াখ্যাঃ। (৫)

অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময়, আনন্দময়, এই পঞ্চ কোষ।

অন্নময়োন্ন বিকারঃ।

অন্নের বিকার অন্নময়।

প্রাণময়ঃ প্রাণ বিকারঃ।

প্রাণের বিকার প্রাণময়।

মনোময়ো মনোবিকারঃ।

মনের বিকার মনোময়।

বিজ্ঞানময়ো বিজ্ঞানবিকারঃ।

বিজ্ঞানবিকার বিজ্ঞানময়।

---

(৪) প্রাজ্ঞের লক্ষণ পূর্ব্বে দেওয়া গিয়াছে।

(৫) "অন্নকার্য্যাণাং ষণ্ণাং কোষাণাং সমূহোঽন্নময়ঃ কোষ ইত্যুচ্যতে। প্রাণাদি চতুর্দ্দশ বায়ুভেদা অন্নময়ে কোষে যদা বর্ত্তন্তে তদা প্রাণময়ঃ কোষ ইত্যুচ্যতে। এতৎ কোষদ্বয়সংযুক্তো মন আদিভিশ্চতুর্ভিঃ করণৈরাত্মশব্দাদি বিষয়ান্ সঙ্কল্লাদি ধর্ম্মান্ যদা করোতি তদা মনোময়ঃ কোষ ইত্যুচ্যতে। এতৎ কোষত্রয়সংযুক্তস্বদগতবিশেষাবিশেষজ্ঞো যদা ভাসতে তদা বিজ্ঞানময়ঃ কোষ ইত্যুচ্যতে। এতৎ কোষচতুষ্টয়স্বকারণবিজ্ঞানে বটকণিকায়ামিব বৃক্ষো যদা বর্ত্ততে তদা আনন্দময়ঃ কোষ ইত্যুচ্যতে।"

সর্ব্বোপনিষৎসারে ৪।

নারায়ণীদীপিকানুবাদ। অস্থি, মজ্জা, মেদ, ত্বক্, মাংস ও শোণিত, এই ষট্‌কোষই অন্নের কার্য্য উহা সকল দেহীর দেহে বিদ্যমান থাকে। এই ষট্‌কোষই অন্নময় কোষ বলিয়া কথিত হয়। প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান, সমান, নাগ, কূর্ম্ম, কৃকর, দেবদত্ত, ধনঞ্জয়, এই দশ ও বৈরম্ভণ, হাসমুখ্য, প্রদ্যোত ও প্রাকৃত, এই চারি, সমুদায়ে চতুর্দ্দশ বায়ু যখন দেহে বিদ্যমান থাকে, তখন তাহাকে প্রাণময় কোষ বলে। যখন আত্মা অন্নময় ও প্রাণময়

আনন্দময় আনন্দবিকারঃ।

আনন্দবিকার আনন্দময়।

অন্নময়কোষো নাম স্থূলশরীরং।

স্থূলশরীরের নাম অন্নময়কোষ।

কথং?

কি জন্য?

মাতৃপিতৃভ্যামন্নং ভুক্তে সতি শুক্রশোণিতাকারেণ পরিণতং তয়োঃ সংযোগাদেব দেহাকারেণ পরিণতেন কোষবদাচ্ছাদকত্বাৎ কোষ ইত্যুচ্যতে। (৭)

মাতা-পিতাকর্ত্তৃক অন্নভুক্ত হইলে শুক্রশোণিতরূপে পরিণত হয়, পরে মাতা-পিতার সংযোগহেতু সেই শুক্রশোণিত দেহরূপে পরিণত হইয়া তরবারি-কোষের ন্যায় আত্মার আচ্ছাদক হয়। এই জন্য, স্থূলশরীর অন্নময়কোষ।

ইতি ব্যুৎপত্ত্যা অন্নবিকারত্বে সতি আত্মানমাচ্ছাদয়তি।

পূর্ব্বোক্ত ব্যুৎপত্তিদ্বারা অন্নবিকারত্ব হইলে, আত্মাকে আচ্ছাদন করে।

কথমাত্মানমপরিচ্ছিন্নং পরিচ্ছিন্নমিব জন্মাদিষড়্‌বিকাররহিতমাত্মানং। (৮) জন্মাদিষড়্‌ভাববন্তমিব তাপত্রয়রহিতমাত্মানং তাপত্রয়বন্তমিবাচ্ছাদয়তি।

কিপ্রকারে অপরিচ্ছিন্ন আত্মাকে পরিচ্ছিন্নের ন্যায়, জন্মাদিষড়বিকাররহিত আত্মাকে জন্মাদিষড়্‌বিকারভাববন্তের ন্যায়, তাপত্রয়রহিত আত্মাকে তাপত্রয়বন্তের ন্যায় আচ্ছাদন করে।

যথা কোষঃ খড়্গমাচ্ছাদয়তি, যথা তুষস্তণ্ডুলমাচ্ছাদয়তি যথা গর্ভঃ সন্তানমাবরয়তি, তথাত্মানমাবরয়তি। (৯)

যেমন কোষ খড়্গকে, তুষ তণ্ডুলকে ও গর্ভ সন্তানকে আচ্ছাদন করে, তেমনি স্থূলশরীর আত্মাকে আচ্ছাদন করে।

এই দুই কোষ সংযুক্ত হইয়া মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহঙ্কার এই কারণচতুষ্টয়দ্বারা শব্দাদি পঞ্চবিষয়কে গ্রহণ করে, তখন তাহাকে মনোময় কোষ বলে। আত্মা পূর্ব্বোক্ত কোষত্রয়ে সংযুক্ত হইয়া সঙ্কল্পাদিগত ব্রাহ্মণত্বাদিবিশেষজ্ঞ ও মনুষ্যত্বাদি অবিশেষজ্ঞ হইলে, তাহাকে বিজ্ঞানময় বলা যায়। যখন আত্মা স্বকারণ বিজ্ঞানবিষয়ে বটবীজে যেরূপ বটবৃক্ষ বর্ত্তমান থাকে, তদ্রূপ পূর্ব্বোক্ত কোষচতুষ্টয়যুক্ত হইয়া স্বীয় কারণীভূত হইয়া বর্ত্তমান থাকেন, তখন তাহাকে আনন্দময় কোষ কহিয়া থাকে।

(৭) "পিতৃভুক্তান্নজাদ্ বীর্য্যাজ্জাতোঽন্নেনৈব বর্দ্ধতে।
দেহঃ সোঽন্নময়োনাত্মা প্রাক্ চোর্দ্ধং তদভাবতঃ॥
পঞ্চদশী পঞ্চকোষবিবেকে ৩।

পিতৃমাতৃভুক্ত অন্নজাত বীর্য্য হইতে যে দেহ জন্মে ও যে দেহ জন্মের পর দুগ্ধাদি অন্নের দ্বারা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় সেই দেহ অন্নময়, উহা আত্মা নহে; কারণ জন্মের পূর্ব্বে ও মরণের পরে ঐ দেহের বিদ্যমানতা থাকে না।

(৮) ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিন্নায়ং ভূত্বা ভবিতা ন ভূয়ঃ। অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥ ২০॥

অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ।
নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ॥ ২৪॥
অব্যক্তোঽয়মচিন্ত্যোঽয়মবিকার্য্যোঽয়মুচ্যতে॥ ২৫॥
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং ২ অধ্যায়ে।

শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে কহিয়াছিলেন হে অর্জ্জুন! আত্মার কখন জন্ম নাই, মৃত্যু নাই, ইনি পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করিয়া অস্তিত্ব ভজনা করেন না, ইনি অজ, নিত্য (ক্ষয়োদয়রহিত), শাশ্বত (বিকারশূন্য), পুরাণ (পুরাপি নব এব অর্থাৎ পূর্ব্বেও নূতন ছিলেন অথবা পরিণামে রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়া নূতন হন না), শরীর বিনষ্ট হইলে তিনি নষ্ট হন না॥ ২০

তিনি অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, অক্লেদ্য, অশোষ্য, তিনি নিত্য, সর্ব্বগত, স্থিরস্বভাব, অচল ও অনাদি॥ ২৪॥

তিনি অব্যক্ত, অচিন্ত্য ও বিকাররহিত বলিয়া কথিত হন॥ ২৫॥

(৯) "অন্নং প্রাণো মনো বুদ্ধিরানন্দশ্চেতি পঞ্চতে।
কোষাস্তৈরাবৃতঃ স্বাত্মা বিস্মৃত্যা সংসৃতিং ব্রজেৎ॥"
পঞ্চদশী তত্ত্ববিবেকে ৩৩।

প্রাণময়কোষো নাম কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি পঞ্চ বায়বঃ পঞ্চ, এতৎ সর্ব্বং মিলিত্বা প্রাণময়কোষ ইত্যুচ্যতে। (১০)

পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ বায়ু, এই সকল মিলিয়া প্রাণময়কোষ নামে অভিহিত হয়।

প্রাণ বিকারে সতি বক্তৃত্বাদিরহিতমাত্মানং বক্তারমিব, দাতৃত্বাদিরহিতমাত্মানং দাতারমিব, গমনাদিরহিতমাত্মানং গন্তারমিব, ক্ষুৎপিপাসাদিরহিতমাত্মানং ক্ষুৎপিপাসাবন্তমিবাবরয়তি।

প্রাণের বিকার হইলে, বক্তৃত্বাদিরহিত আত্মাকে বক্তার ন্যায়, দাতৃত্বাদিরহিত আত্মাকে দাতার ন্যায়, গমনাদিরহিত আত্মাকে গমনকর্ত্তার ন্যায়, ক্ষুৎপিপাসাদিরহিত আত্মাকে ক্ষুৎপিপাসাবিশিষ্টের ন্যায় আবরণ করে।

মনোময়কোষো নাম জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি পঞ্চমনশ্চ, এতৎ সর্ব্বং মিলিত্বা মনোময়কোষ ইত্যুচ্যতে। (১১)

পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও মন, এই সকল মিলিয়া মনোময়কোষ নামে অভিহিত হন।

কথং?

কি জন্য?

মনোবিকারে সতি সংশয়রহিতমাত্মানং সংশয়বন্তমিব, শোকমোহাদিরহিতমাত্মানং শোকমোহাদিবন্তমিব, দর্শনাদিরহিতমাত্মানং দ্রষ্টারমিবাবরয়তি।

মনের বিকার হইলে, সংশয়রহিত আত্মাকে সংশয়যুক্তের ন্যায়, শোকমোহাদিরহিত আত্মাকে শোকমোহাদিবিশিষ্টের ন্যায়, দর্শনাদিরহিত আত্মাকে দর্শনকর্ত্তার ন্যায় আচ্ছাদন করে।

বিজ্ঞানময়কোষো নাম জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি পঞ্চ বুদ্ধিশ্চ, এতৎ সর্ব্বং মিলিত্বা বিজ্ঞানময়কোষ ইত্যুচ্যতে। (১২)

পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও বুদ্ধি, এই সকল মিলিয়া বিজ্ঞানময়কোষ নামে কথিত হয়।

অর্থাৎ অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, জ্ঞানময় ও আনন্দময়, এই পঞ্চকোষদ্বারা আত্মা আবৃত থাকেন। আত্মা স্বস্বরূপ, বিস্মরণদ্বারা জননাদিপ্রাপ্তিরূপ সংসার-যন্ত্রণা ভোগ করেন। ভাষ্যার্থ। যেরূপ কোষকার (গুটি-পোকা) কোষ নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে বাস করিয়া নানাপ্রকার ক্লেশভোগ করে, সেইরূপ আত্মা পঞ্চকোষে আবৃত হইয়া স্বস্বরূপ-তত্ত্ব বিস্মৃত হইয়া সংসারে অশেষ ক্লেশভোগ করিয়া থাকেন। কীট যতদিন সেই কোষ ভেদ করিয়া বহির্গত হইতে না পারে, ততদিন তাহার ইতস্ততঃ গমনাগমন ক্ষমতা থাকে না, সেইরূপ আত্মা যতদিন পঞ্চকোষের মধ্যে থাকেন, ততদিন তিনি পরম তত্ত্ব জানিতে পারেন না।

(১০) "পূর্ণদেহে বলং যচ্ছন্নক্ষাণাং যঃ প্রবর্ত্তকঃ।
বায়ুঃ প্রাণময়ো নাসাবাত্মা চৈতন্যবর্জ্জনাৎ" ॥৫॥
পঞ্চদশী পঞ্চকোষবিবেকে।

যে প্রাণাদি পঞ্চবায়ু শরীরে পাদাদি মস্তকপর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়া ব্যানরূপে বলপ্রদান করিয়া চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের প্রেরকরূপে বর্ত্তমান থাকেন, তাহাকে প্রাণময় কোষ বলে। উহাও আত্মা নহে, কারণ উহা জড়পদার্থ।

(১১) "অহন্তাং মমতাং দেহে গৃহাদৌ চ করোতি যঃ।
কামাদ্যবস্থয়া ভ্রান্তো নাসাবাত্মা মনোময়ঃ।
ঐ ঐ

দেহে অহংভাব ও গৃহাদিতে যিনি মমতা করেন, উঁহাকে মনোময়, কোষ বলে। ঐ কোষ কামক্রোধাদি বৃত্তিদ্বারা ভ্রান্ত হইয়া বিকার প্রাপ্ত হয়, সুতরাং উহা আত্মা নহে। কারণ আত্মার কখনও ভ্রান্তি হয় না ও বিকার হয় না।

(১২) "লীনাসুপ্তৌ বপুর্বোধে ব্যাপ্নুয়াদানখাগ্রগা।
চিচ্ছায়োপেতধীর্নাত্মা বিজ্ঞানময়শব্দভাক্ ॥" ৭॥

চৈতন্যের ছায়াবিশিষ্ট বুদ্ধি সুষুপ্তিকালে অজ্ঞানদ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া থাকে ও জাগরণকালে নখাগ্রপর্য্যন্ত সর্ব্বশরীর ব্যাপিয়া থাকে, ঐ বুদ্ধিকে বিজ্ঞানময়কোষ বলে। উঁহাকে আত্মা বলা যায় না, কারণ ঘটাদিবৎ ঐ বুদ্ধির উৎপত্তি ও লয় হয়।

কথং কর্ত্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বাদ্যভিমানেন ইহলোক-পরলোকগামী ব্যবহারিকো জীব ইত্যুচ্যতে ?(১৩)

কিজন্য কর্ত্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বরূপ অভিমানদ্বারা ইহলোক ও পরলোকগমনশীল ব্যবহারিক জীব, এই শব্দবাচ্য হয় ?

বিজ্ঞানবিকারে সতি অকর্ত্তারমাত্মানং কর্ত্তারমিব অবিজ্ঞাতারমাত্মানং বিজ্ঞাতারমিব নিশ্চয়রহিতমাত্মানং নিশ্চয়বন্তমিব মান্দ্যজাড্য-রহিতমাত্মানং জাড্যাদিবন্তমিবাবারয়তি।

বিজ্ঞানের বিকার হইলে, অকর্ত্তারূপ আত্মাকে কর্ত্তার ন্যায়, অবিজ্ঞানকর্ত্তা আত্মাকে বিজ্ঞানকর্ত্তার ন্যায়, নিশ্চয়রহিত আত্মাকে নিশ্চয়বিশিষ্টের ন্যায়, মন্দত্ব-জড়ত্বাদিরহিত আত্মাকে জড়ত্বাদিবিশিষ্টের ন্যায় আবরণ করে, এই জন্য।

আনন্দময়কোষো নাম প্রিয়মোদপ্রমোদ-বৃত্তিমজ্ঞানপ্রধানমন্তঃকরণমানন্দময়কোষ ইত্যুচ্যতে। (১৪)

প্রীতি, আমোদ, প্রমোদরূপবৃত্তিযুক্ত অজ্ঞানপ্রধান অন্তঃকরণের নাম আনন্দময় কোষ।

কথং ?

কি জন্য ?

প্রিয়মোদপ্রমোদরহিতমাত্মানং প্রিয়মোদ-প্রমোদবন্তমিবাভোক্তারমাত্মানং ভোক্তারমিব অপরিচ্ছিন্ন সুখরহিতমাত্মানং পরিচ্ছিন্ন সুখমিবাচ্ছাদয়তি। (১৫)

প্রীতি-হর্ষ-বিহাররহিত আত্মাকে প্রীতি-হর্ষ-বিহারবিশিষ্টের ন্যায়, অভোক্তা আত্মাকে ভোক্তার ন্যায়, পরিচ্ছিন্ন সুখরহিত আত্মাকে পরিচ্ছিন্নসুখের ন্যায় আচ্ছাদন করে, এই জন্য।

শরীরত্রয় বিলক্ষণত্বমুচ্যতে।

আত্মার শরীরত্রয় হইতে ভিন্নত্ব উক্ত হয়।

কথং ?

কি জন্য ?

সত্যরূপোঽসত্যরূপো ন ভবতি।

সত্যরূপ আত্মা অসত্য শরীরবিশিষ্ট হন না।

অসত্যস্বরূপঃ সত্যস্বরূপো ন ভবতি।

অসত্যস্বরূপ শরীর সত্যস্বরূপ আত্মা হইতে পারে না।

জ্ঞানস্বরূপো জড়স্বরূপো ন ভবতি।

জ্ঞানস্বরূপ আত্মা জড়স্বরূপ শরীর হন না।

(১৩) "পুণ্য-পাপ-কর্ম্মানুসারী ভূত্বা প্রাপ্তশরীর সম্বন্ধ বিয়োগমপ্রাপ্ত শরীর সংযোগমিব কুর্ব্বাণো যদা দৃশ্যতে তদোপহিতত্বাজ্জীব ইত্যুচ্যতে॥"৬। সর্ব্বোপনিষৎসারে।

আত্মা পুণ্য ও পাপকর্ম্মের অনুসারী হইয়া প্রাপ্ত-শরীর সম্বন্ধের বিয়োগকে অপ্রাপ্ত শরীরের সংযোগন্যায় করেন, ইহা যখন দেখা যায়, তখন নানা শরীরের উপাধি অভিমানবশতঃ তাঁহাকে জীব কহা যায়।

(১৪) "কাচিদন্তর্মুখাবৃত্তিরানন্দপ্রতিবিম্বভাক্।
পুণ্যভোগে ভোগশান্তৌ নিদ্রারূপেণ লীয়তে" ॥৯॥
পঞ্চদশী পঞ্চকোষবিবেকে।

পুণ্যকর্ম্ম ফলানুভবকালে যে বুদ্ধি আত্মার অন্তর্গত হইয়া আত্মস্বরূপ আনন্দের প্রতিবিম্ববিশিষ্ট হয় ও ভোগাবসানকালে নিদ্রারূপে লয়প্রাপ্ত হয়, সেই বুদ্ধিকে আনন্দময় কোষ বলে। ঐ আনন্দময়কোষ আত্মা নহে, ইহা দেখাইতেছেন।

"কদাচিৎকত্বতো নাত্মা স্যাদানন্দময়োপ্যয়ম্।
বিম্বভূতো য আনন্দ আত্মাসৌ সর্ব্বদাস্থিতেঃ॥"
ঐ ঐ ১০।

আনন্দময়কোষ অন্নাদির ন্যায় ক্ষণভঙ্গুর, উহা আত্মা নহে। বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বদ্বারা অবস্থান কারণ প্রিয়াদি শব্দবাচ্য আনন্দময়ের কারণভূত যে আনন্দ, উহাই আত্মা। আত্মা দেহাদির ন্যায় অনিত্য নহে,—উহা নিত্য।

(১৫) "ত্বং পদার্থাদৌপাধিকাৎ তৎপদার্থাদৌপাধিকাদ্ বিলক্ষণঃ আকাশবৎ সূক্ষ্মঃ কেবলঃ সত্তামাত্রস্বভাবঃ পরমাত্মেত্যুচ্যতে। ১০। সর্ব্বোপনিষৎসারে।

জড়স্বরূপো জ্ঞানস্বরূপো ন ভবতি।

জড়স্বরূপ শরীর জ্ঞানস্বরূপ আত্মা হয় না।

সুখস্বরূপো দুঃখস্বরূপো ন ভবতি।

সুখস্বরূপ আত্মা দুঃখস্বরূপ শরীর হন না।

দুঃখস্বরূপঃ সুখস্বরূপো ন ভবতি।

দুঃখস্বরূপ শরীর সুখস্বরূপ আত্মা হন না।

এবং শরীরত্রয়বিলক্ষণত্বমুক্ত্বা অবস্থাত্রয় সাক্ষী উচ্যতে।

এইরূপে শরীরত্রয় বিলক্ষণত্ব কহিয়া জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি, এই অবস্থাত্রয়ের সাক্ষী 'আত্মা, ইহা কথিত হইতেছে।

কথং ?

কিজন্য ?

জাগ্রদবস্থা জাতা জাগ্রদবস্থা ভবতি জাগ্রদবস্থা ভবিষ্যতি স্বপ্নাবস্থা জাতা স্বপ্নাবস্থা ভবতি স্বপ্নাবস্থা ভবিষ্যতি সুষুপ্ত্যবস্থা জাতা সুষুপ্ত্যবস্থা ভবতি সুষুপ্ত্যবস্থা ভবিষ্যত্যেবমবস্থাত্রয়মধিকারিতয়া জানাতি।

জাগ্রদবস্থা হইয়াছে, জাগ্রদবস্থা হইতেছে, জাগ্রদবস্থা হইবে। স্বপ্নাবস্থা হইয়াছে, স্বপ্নাবস্থা হইতেছে, স্বপ্নাবস্থা হইবে। সুষুপ্ত্যবস্থা হইয়াছে, হইতেছে, হইবে, এইরূপে অবস্থাত্রয়কে অধিকারিস্বরূপে জানিতেছেন।

অথাত্মনঃ পঞ্চকোষ বিলক্ষণত্বমুচ্যতে।

অনন্তর আত্মার পঞ্চকোষ হইতে ভিন্নতা কথিত হইতেছে।

পঞ্চকোষ বিলক্ষণত্বমাত্মনঃ কথং।

পঞ্চকোষ হইতে আত্মা ভিন্ন কেন ?

দৃষ্টান্তরূপেণ প্রতিপাদয়তি।

দৃষ্টান্তরূপে প্রতিপন্ন করিতেছেন।

মমেয়ং গৌঃ।

আমার এই গরু।

মমায়ং বৎসঃ।

আমার এই বৎস।

মমায়ং কুমারঃ।

আমার এই কুমার।

মমেয়ং কুমারী।

আমার এই কুমারী।

মমেয়ং স্ত্রী।

আমার এই স্ত্রী।

এবমাদিপদার্থবান্ পুরুষো ন ভবতি।

এইরূপ পদার্থবিশিষ্ট পুরুষ অর্থাৎ আত্মা হন না।

তথা মমান্নময়কোষঃ মম প্রাণময়কোষঃ মম মনোময়কোষঃ মম বিজ্ঞানময়কোষঃ মমানন্দময়কোষঃ এবং পঞ্চকোষবানাত্মানভবতি।

সেইরূপ এই অন্নময়কোষ আমার, এই প্রাণময়কোষ আমার, এই মনোময়কোষ আমার, এই বিজ্ঞানময়কোষ আমার, এই আনন্দময়কোষ আমার, এইরূপ পঞ্চকোষবান্ আত্মা হন না।

তেভ্যো বিলক্ষণঃ সাক্ষী।

তাহাদিগের হইতে ভিন্ন সাক্ষীস্বরূপ।

"অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং, তথা রসং নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ। অনাদ্যনন্তং মহতঃ পরং ধ্রুবং, নিচায্যতং মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে॥" ইতি শ্রুতেঃ। (১৬)

ব্রহ্ম অশব্দ, অস্পর্শ, অরূপ, অব্যয়, রসহীন, নিত্য, গন্ধশূন্য, অনাদি, অনন্ত, মহত্তত্ত্ব হইতে পৃথক্ ও কূটস্থ; সেই ব্রহ্মকে এইরূপ জানিলে আত্মা মৃত্যুমুখ হইতে মুক্তিলাভ করেন।

ঔপাধিক ত্বং পদার্থ ও ঔপাধিক তৎ পদার্থ হইতে ভিন্ন, আকাশের ন্যায় সূক্ষ্ম কেবল তৎপদার্থের সত্তামাত্র উহাকে আত্মা কথিত হয়।

(১৬) এই শ্রুতি কঠোপনিষদের তৃতীয়াবল্লী ১৫। এই শ্রুতির পূর্ব্বার্দ্ধ মুক্তিকোপনিষদের ২ অধ্যায়ের ৭০। নৃসিংহতাপনী উত্তরে ৯।

তস্মাদাত্মনঃ সচ্চিদানন্দস্বরূপত্বমুক্তং।

তজ্জন্য আত্মার সচ্চিদানন্দস্বরূপত্ব উক্ত হইল।

সদ্রূপত্বং নাম কেনাপ্যবাধ্যমানত্বেন কালত্রয়েপ্যেকরূপেণ বিদ্যমানত্বমুচ্যতে।

কাহারও কর্তৃক বাধিত না হইয়া বর্ত্তমান, ভূত ও ভবিষ্যৎ, এই তিন কালে একরূপে থাকাকে সদ্রূপ কহে।

চিদ্রূপত্বং নাম সাধনান্তরনিরপেক্ষতয়া স্বয়ং প্রকাশমানং স্বস্মিন্নারোপিত সর্ব্বপদার্থাবভাসকবস্তুত্বং চিদ্রূপত্বমিত্যুচ্যতে। (১৭)

অন্য সাধনের অপেক্ষা না করিয়া স্বয়ং প্রকাশমান আপনাতে আরোপিত সর্ব্বপদার্থের প্রকাশক যে বস্তুধর্ম্ম, তাহাকে চিদ্রূপত্ব কহে।

আনন্দস্বরূপত্বং নাম পরমপ্রেমাস্পদত্বং নিত্যনিরতিশয়ত্বমানন্দস্বরূপত্বমিত্যুচ্যতে। (১৮)

নিত্য, নিরতিশয় পরমপ্রেমাস্পদকে আনন্দস্বরূপত্ব কহে।

বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্মরাতে দাতুঃ পরায়ণমিতি শ্রুতেঃ। (১৯)

ব্রহ্ম বিজ্ঞানস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ ও দানদাতার পরম আশ্রয়স্বরূপ, ইহা শ্রুতি কহেন।

এবং নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাবব্রহ্মাহমস্মীতি সংশয়সম্ভাবনা বিপরীতভাবনারাহিত্যেন যস্তু জানাতি সজীবন্মুক্তো ভবতি। (২০)

এইপ্রকারে নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাব ব্রহ্মস্বরূপ আমি, এই সংশয়সম্ভাবনা বিপরীতভাবনারহিত হইয়া যিনি আত্মাকে জানেন, তিনি জীবন্মুক্ত হন।

ইতি শ্রীভগবান্ শঙ্করাচার্য্যবিরচিতাত্মানাত্মবিবেকঃ সমাপ্তঃ।

শ্রীকৃষ্ণার্পণমস্তু।

শ্রীবিধুভূষণ দেব।

(১৭) "———যথাদাহ্যং দগ্ধ্বা অগ্নিরবিকল্পোহয়মাত্মা অবাঙ্মনোগোচরত্বাচ্চিদ্রূপঃ"। নৃসিংহতাপনী উত্তরভাগে ২ খণ্ডে ৮।

যেরূপ দাহ্যবস্তুকে দগ্ধ করিয়া অগ্নি অবিকল্প থাকেন, তদ্রূপ এই আত্মা বাক্য ও মনের অগোচরবশতঃ চিদ্রূপ।

(১৮) "আনন্দো নাম সুখচৈতন্যস্বরূপোঽপরিমিতানন্দসমুদ্রঃ অবশিষ্ট সুখস্বরূপশ্চ আনন্দ ইত্যুচ্যতে।

যিনি সুখ ও চৈতন্যস্বরূপ ও অপরিমিত আনন্দসাগর এবং অবশিষ্ট সুখস্বরূপ, তাঁহাকে আনন্দ বলা যায়।

পঞ্চদশী পঞ্চকোষবিবেকে আত্মার বিষয় সবিস্তরে বর্ণিত আছে।

(১৯) বৃহদারণ্যকোপনিষৎ ৩ অ, ৯ ব্রাহ্মণে ২৮।

(২০) জীবন্মুক্তের লক্ষণ পূর্ব্বে যোগবাশিষ্ঠ গ্রন্থ হইতে দেওয়া গিয়াছে।

অধ্যাত্মরাজ্য।*

নিশা-ঘোরে আবরিত সমস্ত ভুবন,
চিন্তাবৃতমনা মর্ত্ত্য-মানব-নন্দন,
জাগ্রতে দেখে স্বপন,—
ক্ষিতি, জল, গিরি, বন
আলোকিত হ'ল যেন কিসের প্রভায়!
সৃষ্টির বিভূতি-বিভা ভাতিল তাহায়।

'মন' নামে নৃপবর
সে রাজ্যের অধীশ্বর,
অন্তর নামেতে রাজ্য খ্যাত চরাচর;
চাঞ্চল্য-বিদ্যুতালোকে পূরিত নগর

* হিন্দুপত্রিকার লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক শ্রীযুক্ত শশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের স্বর্গীয়া বালিকা কন্যায় রচিত।

তথায় প্রকৃতি সতী স্বাধীনা সুন্দরী,
মায়াময়ী সোদরারে আলিঙ্গন করি,
আরাধ্যা দেবীর মত,
রহেন গৃহে সতত,
ভ্রমান্ধ রাজেশ মন নাহি চিনে তাঁরে,
দেবী-রূপে পূজে তাই নানা উপচারে!

৪

বুদ্ধিরূপ-রাজ্য এক আছে কাছে তার,
'বিবেক' তাহার রাজা ভুবনে প্রচার;
নিবৃত্তি তাঁহার কন্যা,
গুণেতে জগৎ-ধন্যা,
বিবেক সে কন্যা করে মন-করে দান,
সরলা সুশীলা সতী পতিগত-প্রাণ।

৫

বালিকা বলিয়া কন্যা বিবেক-রাজন্,
স্বগৃহে পালয়ে শিক্ষা দিতে অনুক্ষণ।
তাই মন-নৃপবর,
পরিগ্রহে দারান্তর,
কামরূপ রাজ্যমাঝে হরষেতে যেয়ে,
স্বেচ্ছাচারীরাজ্যেশ্বরী বাসনার মেয়ে।

৬

'প্রবৃত্তি' তাহার নাম সুচঞ্চল-প্রাণ,
'ইচ্ছা' তার সহোদরা স্বভাবে সমান!
'সুমতি-কুমতি' তারি
'দুয়া-সুয়া' সহচরী,
তাহাদের সহ গেল পতির ভবনে;
নব ভার্য্যা পেয়ে মন বড় সুখী মনে

৭

বিলাসেতে নৃপবর ভাসালেন প্রাণ,
রাজ্যেতে উঠিল ভাসি প্রমোদ-তুফান।
প্রবৃত্তি মনের সাধে,
বাহুতে মনেরে বাঁধে,
নিজের বাসনা কাণে ঢালে অবিরত,
আজ্ঞাবাহী পতি পালে আদরে সতত।

৮

বিজ্ঞান * আলোক রায় করি আবিষ্কৃত,
সে প্রভায় পত্নীসহ প্রমোদে মিলিত!
স্বরূপ-জ্ঞানের জ্যোতিঃ
হীন প্রভা ক্রমে অতি,
জড়জ্ঞানে পূর্ণ মন, ইন্দ্রিয়-সেবায়
পরম পিরীতি লাভ করে নররায়।

৯

ক্রমশঃ জন্মিল তার ছয়টী নন্দন.
আকৃতি আপাত-মিষ্ট প্রকৃতি ভীষণ!
মাতার সমান মতি,
অশান্ত দুর্দ্দান্ত অতি,
সর্ব্বংসহার ভার করিল অসহ্য
কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ-মদ-মাৎসর্য্য।

১০

বিলাস-সুখের স্রোতে ভাসিত যে গৃহ,
তাহাতে উঠিল ক্রমে অসুখ-প্রবাহ,
সামান্য কারণ হ'লে,
পুত্রগণ উঠে জ্বলে,
জীব-মন্ত্রী মন্ত্রীদলে দলে হায় পায় পায়;
স্বরগ নরক হ'ল, নন্দন মরুর প্রায়!

১১

ব্যতিব্যস্ত মন-নৃপ তাদের জ্বালায়,
মাতার প্রশ্রয়ে তারা আরো স্পর্দ্ধা পায়,
আদুরে তনয় ব'লে,
রাজা কিছু নাহি বলে,
কুমতি তাদের 'ধাত্রী' সমানে-সমান!
দুয়া-দাসী সুমতি—সে দুখে ম্রিয়মাণ!

* এস্থলে জড়-বিজ্ঞানই লক্ষ্য।

১২

কি জানি কিসের বলে কুমতি প্রধানা,
প্রবৃত্তি তাহার কাছে যেন আছে কেনা!
সুমতিকে পায়-পায়
কুমতি দলিয়া যায়,
প্রবৃত্তি উপেক্ষা করে কুমতির কাজ,
নীরব নিশ্চেষ্ট স্ত্রৈণ মন-মহারাজ!

১৩

দুর্দ্দান্ত তনয়গণ বয়সের সহ,
বাড়াইল কুকার্য্যের কদর্য্য প্রবাহ!
রজস্তম সর্ব্বনেশে
ইয়ার যুটিল এসে;
ঈর্ষা-ঘৃণা-প্রতারণা পূরে অন্তঃপুরী,
প্রীতি-ভক্তি-ধৃতি রহে মরমেতে মরি!

১৪

অবিচারে অত্যাচারে ক্ষুব্ধ প্রজাগণ,
জানায় রাজেশ-পদে দুথ-বিবরণ।
প্রবৃত্তি-বশেতে মন,
কিছুতে না দেন মন,
বিষয়-কামনা-বশে ভাসাইয়া প্রাণ,
প্রবৃত্তি সহিত ক্রমে রসাতলে যান!

১৫

বিশৃঙ্খল হল রাজ্য, গেল ধন-মান,
মোহে মতিচ্ছন্ন রাজা জরাজীর্ণ-প্রাণ!
দুর্দ্দান্ত তনয়গণ,
আরো হরষিতমন,
অবাধে অবৈধ বিধি সাধে নিরন্তর,
পুত্রের কুকার্য্যে সুখী মাতার অন্তর!

১৬

কুমতি সুখিনী অতি হেরিয়া সকল,
প্রবৃত্তি-তনয়ে তোষে দিয়া স্নেহজল।
রোগগ্রস্ত পতি হায়!
প্রবৃত্তি না মানে তায়,
আনন্দ-উৎসাহ আরো—বিজয়উল্লাস!
অন্তরে রৌরব, মুখে গৌরবের হাস!

১৭

কোন চিন্তা নাহি মনে, কুমতির সহ,
ভোগের সুযোগ সুধু খুঁজে অহরহ।
ঘোর অশান্তির ঘর,
তার কাছে সুখকর!
বিষাদে প্রসাদ-ভাব তাই নিরন্তর;
বিষাদে সুমতি কিন্তু একাই কাতর।

১৮

এ সব সম্বাদ পেয়ে বিবেক-রাজন্,
পাঠালে জামাতৃগৃহে তনয়া তখন।
বিবেচনা-সহচরী
লয়ে এল করে ধরি,
সে শ্মশান-পুরীমাঝে নিবৃত্তি-রাণীরে;
পতি-দশা দেখি সতী ভাসে আঁখি-নীরে।

১৯

নিবৃত্তি আসিয়া গৃহে মোহিনী প্রভায়
মোহিত করিল সবে, বিষাদ পালায়!
নিবৃত্তির আচরণে
কুমতি প্রমাদ গণে,
নিবৃত্তি-সেবায় নাহি পায় অধিকার!
সুমতি সেবিকাবেশে এল পাশে তার।

২০

জ্যেষ্ঠা শ্রেষ্ঠ স্থান পেলে মন-সিংহাসনে,
থামাইল নীতি-ভাষে ভীমপুত্রগণে।
কনিষ্ঠাভগিনী-ভাবে,
প্রবৃত্তিরে তুষি তবে,
রাখিল আপন হাতে হরে, পাপ, বল,
মনের চাঞ্চল্য-তাপ করিল শীতল।

২১

কুমতিরে তাড়াইল, সুমতি উপর
পুত্রের পালন-ভার দিল অতঃপর।

প্রবৃত্তি, নিবৃত্তিসহ,
সুখে রহে অহরহ,
কভু রাজ্যেশ্বরী রূপে কহে নীতিবাণি,
কভু দাসী ভাবে পূজে পতি-পা-দুখানি।

২২

এ রূপেতে কত দিন হইল অতীত,
মনের চাপল্য-তাপ ক্রমে তিরোহিত ;
প্রবৃত্তি নিবৃত্তি-সাথে
চলিল সরল পথে,—
পুত্রগণ হ'ল ক্রমে সুমতি-শাসিত,
পুরবাসীগণ হ'ল হরষিত-চিত।

২৩

নিবৃত্তির অহৈতুক-প্রেমের বন্ধন !
শুভক্ষণে দম্পতির শুভ-সম্মিলন !
সুনীতির 'ধ্রুব' প্রায়,
তাহ'তে আত্মজ পায়,
যাহ'তে মুক্তির পথ হবে পরিষ্কার,
'ত্যাগ' নামে পুত্র সেই ভুবনে প্রচার।

২৪

ধরা-ধন্যা 'ভক্তি'-কন্যা অযোনি-সম্ভবা,
শুভক্ষণে ত্যাগ সনে হ'ল তার বিভা।
'মাণিক-কাঞ্চন' প্রায়,
দুটী আত্মা শোভা পায় !
'জ্ঞান' নামে তাঁহাদের তনয় হইল,
স্বরূপ-জ্ঞানের জ্যোতি গৃহ আলোকিল !

২৫

দেখাইল পিতামহে সেই মুক্তি-পথ,
(সাগর-বংশের তরে যথা ভগীরথ)
মুক্তি-পথে মনবর,
হইলেন অগ্রসর,
প্রবৃত্তি নিবৃত্তি দুই ভার্য্যাসহকরি,
লভিলেন ভবার্ণবে হরি-পদ-তরী।

২৬

জ্ঞান রাজা হল, রাজ্য হ'ল জ্ঞানময়,
ভবের পাতক সব বিদূরিত হয়।
মুক্ত হল মনবর,
মিশিলা অনন্ত পর,
প্রবৃত্তি স্বভাবে র'ল, নিবৃত্তি-সাধিত—
অপূর্ব্ব অধ্যাত্মরাজ্য হইল স্থাপিত।

৺প্রভাবতী দেবী।

দক্ষ-যজ্ঞ।

শ্রুতি, স্মৃতি ও পুরাণ আর্য্য-ঋষিগণের আদরের ধন ও অন্তরের বস্তু। লোক-শিক্ষার জন্য দৃষ্টান্তসহ নীতিশাস্ত্রের উপদেশসমূহ যেমন সমধিক ফলোপদায়ী ও উপকারী, সাধারণ লোকের ধর্ম্মশিক্ষার নিমিত্ত শ্রুতি ও স্মৃতির সংক্ষিপ্ত উপদেশাবলী তেমনই পৌরাণিক উপাখ্যানে সুচারুরূপে পরিণত হওয়ায় বড়ই শ্রদ্ধেয় ও হিতকর হইয়া উঠিয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে নব্যশিক্ষিত, ইংরাজীমন্ত্রে দীক্ষিত "ইয়ং বেঙ্গল" দল যেরূপে ও যেভাবে ধর্ম্মশাস্ত্র বুঝিতে এবং বুঝাইতে চান এবং যতক্ষণ ধর্ম্ম-শাস্ত্রের বর্ণিত বিষয়ের অপরূপ আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করিতে বা শুনিতে সুবিধা না পান, ততক্ষণ তৃপ্ত, শান্ত বা নিবৃত্ত হন না। আমরা পৌরাণিক উপাখ্যান-রহস্যগুলি সেরূপে ও সে-ভাবে বুঝিবার চেষ্টা করি না। সুতরাং ত্রিকাল-দর্শী আর্য্য-ঋষির মতামত যখন বুঝিতে না পারি, তখন অসম্ভব 'গাঁজাখুরী' গল্প বলিয়া সে সকল উপহাসছলে উড়াইয়া দিতে চেষ্টা করি না। বিশ্বাস ও শ্রদ্ধাসহকারে অভিজ্ঞ তত্ত্ববিদ্ গুরুদেবের শরণাপন্ন হইয়া সেই আশু-অবোধ্য বিষয়ের তত্ত্ব-জিজ্ঞাসা ও সংশয়-নিরা-

সনে যত্নবান্ হইয়া থাকি। ব্রহ্মের সাক্ষাৎ মূর্ত্তি স্বরূপ—আচার্য্য গুরুদেবের শরণাপন্ন হইলে এবং জ্ঞানাঞ্জন-শলাকাদ্বারা তিনি নেত্র বিস্ফারিত করিয়া দিলে, বাহ্যপদার্থের দর্শন দূরে থাকুক, অন্তঃস্থ দ্রব্যনিচয়ও সহজে সুদৃশ্য হইয়া পড়ে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমরা পাঠকগণকে 'গীতা'র দশম ও একাদশ অধ্যায় পাঠ করিতে অনুরোধ করি। বিশ্বম্ভর শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় অর্জ্জুন দিব্যচক্ষু লাভ করিয়া যে অপরূপ বিশ্বরূপ দর্শন করিয়াছিলেন, তাহাতেই আচার্য্যের অপার শক্তি ও অতুল মহিমার পরিচয় পাইবেন। আমরা গুরু-কৃপায় যেরূপে ও যে ভাবে শাস্ত্রতত্ত্ব বুঝিয়া থাকি ও তাহার রহস্য জ্ঞাত হইয়া অলৌকিকশক্তিসম্পন্ন ভগবানের মহিমা ও গরিমার প্রমাণ প্রাপ্ত হই, তাহার নিদর্শন স্বরূপ একটী পৌরাণিক উপাখ্যান আজ পাঠকবর্গের সমীপে উপস্থাপিত করিলাম। বলা বাহুল্য, অনুকূল যুক্তির সহিত শাস্ত্রমর্ম্মাবধারণ ও গ্রহণ করা সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়স্কর।

যে পৌরাণিক উপাখ্যান আমাদের বর্ত্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়, তাহার নাম সর্ব্বজন-শ্রুত ও সর্ব্বজন-জ্ঞাত "দক্ষযজ্ঞ"। সাদা কথায় প্রথমতঃ দক্ষযজ্ঞের গল্পটী বলিয়া রাখা ভাল। ব্রহ্মার পুত্র দক্ষপ্রজাপতির সতী নাম্নী কন্যার সহিত দেবাদিদেব মহাদেবের বিবাহ হয়। বিবাহের পর শিব-সতী কৈলাসে বাস করেন। দক্ষ নিজে রাজা, বড় লোক, কিন্তু তাঁহার জামাই শিব ভিক্ষুক ও শ্মশানবাসী। দক্ষ এজন্য তাঁহার প্রতি নিয়ত বিরক্ত, আবার শিবও এ অবস্থায় শ্বশুরের মর্য্যাদা রক্ষা করেন না। এক দিন ভৃগুর যজ্ঞস্থলে সকলেই অভ্যুত্থানাদির দ্বারা দক্ষের অভ্যর্থনা ও সম্মাননা করিলেন, কিন্তু শিব কোনরূপে তাঁহার প্রতি লক্ষ্যও করিলেন না। একে শ্বশুর বড়লোক, আবার অভিমানী; এ অপমান তাঁহার পক্ষে অসহ্য হইল; তিনি নিজালয়ে আসিয়াই এক বৃহৎ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন। এই যজ্ঞে ত্রিভুবনের সকলেরই নিমন্ত্রণ হইল, কেবল বাদ রহিলেন, জামাই শিব আর কন্যা সতী। শিবকে বাদ দিয়া এ মহাযজ্ঞ সম্পাদন করাই দক্ষের প্রকৃত উদ্দেশ্য। নিমন্ত্রণ করিবার ভার ছিল দেবর্ষি নারদের উপর। নারদ কলহ ব্যাপারে মহানন্দ লাভ করিয়া থাকেন। ঝগড়া বাধাইয়া তামাসা দেখা তাঁহার একটী প্রিয়কার্য্য। তিনি দক্ষের মনোভাব বেশ বুঝিয়াছিলেন। শিবের প্রতি তাঁহার অবজ্ঞা ও অশ্রদ্ধা প্রদর্শনে শিব ক্রুদ্ধ হইতে পারেন, এই ভাবিয়া, তিনি ছলে কৌশলে কৈলাসধামে গিয়া শিবের নিকট—বিশেষতঃ সতীর নিকট দক্ষের যজ্ঞ-বিবরণ, শিব সতীর নিমন্ত্রণ বন্ধ উত্তমরূপে জানাইলেন। পিতা হইয়া কন্যার প্রতি এত মায়ামমতাহীন কেন, এসকল কথাও পাড়িলেন এবং এ সমারোহ-ব্যাপার সতী না গেলে শোভা পাবে না এবং এ অদ্ভুত যজ্ঞ-ব্যাপার অতীব দর্শনীয়, তাহাও নানারূপে বুঝাইলেন। আবার পিতৃগৃহে কন্যা অনিমন্ত্রণে গেলেও কোন দোষ হয় না, এ ভাবও আকার-ইঙ্গিতে বলিয়া গেলেন। নারদের গমনের পর সতী 'দক্ষযজ্ঞ' দর্শনে উৎসুক হইয়া শিবের নিকট অনুমতি প্রার্থনা করায় তিনি তাহাতে সম্মত হইলেন না, বরং এ যজ্ঞে না যাওয়াই সর্ব্বতোভাবে তাঁহাদের কর্ত্তব্য, তাহাও বুঝাইয়া দিলেন। 'আমার অপমান করা—সর্ব্বজনসমক্ষে আমাকে নিমন্ত্রণ না করা যখন তোমার পিতার উদ্দেশ্য, তখন এ যজ্ঞে তোমার যাওয়া কোনমতেই উচিত নয়।'

(ক্রমশঃ—)

শ্রীশ্রীহরিঃ।
[১৮৪৭ সালের ২০ আইনমতে রেজিষ্টারীকৃত।]

হিন্দু-পত্রিকা।

৪র্থ বর্ষ, ৫ম খণ্ড, ৯ম ও ১০ম সংখ্যা, | ১৩০৪ সাল, ১৮১৯ শকাব্দা, | পৌষ ও মাঘ।

দক্ষ-যজ্ঞ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

তুমি এ যজ্ঞে গেলে আমার অপমান আরও বাড়িবে। আবার তোমাকে দেখিয়া পিতার ক্রোধ বাড়িয়া উঠিবে, তখন তিনি আমাকে নানারূপে নিন্দা ও অপমান করিয়া তোমাকেও হয়ত তিরস্কার লাঞ্ছনা করিবেন। তুমি সহজেই অভিমানিনী, সে সকল অনুযোগ অভিযোগ সহজে সহ্য করিতে পারিবে না, শেষে কোনরূপ অনিষ্ট সংঘটনের সম্ভাবনা—তাই বলি, এ যজ্ঞে যাইবার বাসনা পরিত্যাগ কর।" শিব যতই বুঝাইলেন, সতী কিছুতেই কোন কথা শুনিলেন না। ছলে, কৌশলে, অনুনয়, বিনয়ে, যখন শিবকে সম্মত করিতে পারিলেন না, তখন স্ত্রীজাতিসুলভ নানা মায়া ও বিবিধ বিভীষিকা প্রদর্শন করিয়া কোনরূপে পতির আংশিক সম্মতিলাভ করিলেন এবং তাহাকেই অনুমতিজ্ঞানে প্রিয় পরিচর নন্দীর সহিত 'শিববিহীন দক্ষযজ্ঞ' দর্শনে প্রস্থান করিলেন। গমন সময়ে নন্দীকে মহাদেব নানারূপে সতর্ক করিয়া দিলেন। যজ্ঞক্ষেত্রে মহাসমারোহ—এ যজ্ঞের ধূমধাম বর্ণনা করা সাধ্যাতীত। এখনও কোন বৃহৎ ব্যাপার উপস্থিত হইলে লোকে উপমা দিয়া থাকে "এ কি দক্ষযজ্ঞ" ? এই দৃষ্টান্তস্থানীয় দক্ষযজ্ঞের জাঁকজমক বর্ণনাতীত। যজ্ঞক্ষেত্রে সর্ব্বভূতের নিমন্ত্রণ ও অধিষ্ঠান,—নাই কেবল ভূতনাথ! দক্ষ মহাযজ্ঞে মহোৎসাহে যজ্ঞে ব্রতী হইয়া যজ্ঞস্থলে দণ্ডায়মান। শিবকে নিমন্ত্রণে বাদ দিয়া কি এক আশ্চর্য্য পৌরুষের কার্য্য করিয়াছেন, তাই ভাবিতেছেন; এমন সময় শিবপত্নী তাঁহার কন্যা সতী তাঁহার চরণে উপস্থিত হইয়া তাহাকে প্রণাম করিলেন। সতীর দর্শনে দক্ষের ক্রোধানল শতগুণ জ্বলিয়া উঠিল, তিনি যা মুখে আসিল, তাই বলিয়া শিবের নিন্দা ও অপমান করিলেন এবং অনিমন্ত্রিত হইয়া যজ্ঞদর্শনে আসার জন্য কন্যা সতীকেও অত্যন্ত ভর্ৎসনা ও লাঞ্ছনা করিলেন। পিতৃমুখে পতিনিন্দা সতীর অসহ্য হইল। তিনি নন্দীকে সকল কথা বলিয়া, দক্ষের প্রতি অভিশাপ প্রদান করিয়া, পিতৃজাত দেহ সেই যজ্ঞক্ষেত্রে ত্যাগ করিলেন। নন্দী অবিলম্বে কৈলাসে যাইয়া শিবের নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত জানাইলেন। মহাদেব আশুতোষমূর্ত্তি পরিহারপূর্ব্বক মহা-

রুদ্ররূপে বীরভদ্র প্রভৃতি বীর ভূতগণের সহিত যজ্ঞক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। শোকে, রোষে মহারুদ্র মহাভয়ঙ্কর! তাঁহার প্রমত্ত প্রমথগণ নানাবিধ উৎপাত করিয়া দক্ষের যজ্ঞ নাশ করিল। আবালবৃদ্ধবনিতার, নিমন্ত্রিতব্যক্তিমাত্রেরই অপমান ও লাঞ্ছনা করিল. এমন কি—অনেককে অনেক অত্যাচার ও প্রচুর প্রহার পর্য্যন্ত ভোগ করিতে হইয়াছিল। বীরভদ্র অতি ক্রোধভরে দক্ষের মুণ্ডচ্ছেদ করিয়া যজ্ঞানলে আহুতিপ্রদান করিল। মোটকথা যজ্ঞ পণ্ড ও নষ্ট হইল। যখন যজ্ঞক্ষেত্রের এই ভীষণ ব্যাপার শেষ হইল, শিববিহীন যজ্ঞের চরম পরিণাম যখন সকলের সবিশেষ অনুভূত হইল, তখন দক্ষের পত্নী প্রসূতি ভয়ভক্তিসহকারে শিবের নিকট কাতরতা জানাইয়া তাঁহার শরণাপন্না হইয়া নিজপতি দক্ষের জীবনদান প্রার্থনা করিলেন। অনেক বিচার বিতর্ক গোলযোগের পর মহাদেব সম্মত হইলেন। শ্বশুরের উপর রাগ থাকিলেও শাশুড়ীর কাতরবাক্যে কতক নরম হইলেন এবং দক্ষের প্রাণ প্রদান জন্য নন্দীর প্রতি আদেশ করিলেন। কিন্তু মহা বিভ্রাট্—দক্ষের মাথা নাই। মুণ্ডশূন্যকায় পতিত রহিয়াছে। পরে নন্দীর পরামর্শমত একটী ছাগমুণ্ড আনিয়া দক্ষের স্কন্ধে যোড়া দিয়া কোনরূপে তাঁহাকে বাঁচাইয়া দেওয়া হইল। দক্ষযজ্ঞের পরিণামে দক্ষের ছাগমস্তক লাভ হইল! পরে মহাদেব সতীদেহ স্কন্ধে করিয়া উন্মত্তভাবে ত্রিভুবন ভ্রমণ করেন। বিষ্ণু-চক্রে ঐ দেহ ছিন্ন হইলে একান্ন পীঠের উৎপত্তি হয়। সে সকল নানা কথা। আমাদের এ প্রবন্ধের সহিত তাহার কোন সম্পর্ক নাই বলিয়া তৎসম্বন্ধে কোন কথা বলা নিষ্প্রয়োজন।

উপরে সংক্ষেপে দক্ষযজ্ঞের বিবরণে গল্পমাত্র লেখা হইল। এখন এই ব্যাপারগত রহস্য কি, তাহাই আমাদের আলোচ্য বিষয়।

যজ্ঞ আমাদের নিত্য কর্ত্তব্য প্রয়োজনীয় কার্য্য।

ঋগ্বেদ বলেন—

যজ্ঞেন যজ্ঞমযজন্ত দেবাস্তানি ধর্ম্মাণি প্রথমা ন্যাসন্। তেহ নাকং মহিমানঃ সচন্ত যত্র পূর্ব্বে সাধ্যা সন্তি দেবাঃ॥ পুরুষসূক্ত।

দেবগণ যজ্ঞের দ্বারা যজ্ঞের (যজ্ঞেশ্বরের) পূজা করিয়াছিলেন। তাহাই সর্ব্বপ্রথম ধর্ম্মানুষ্ঠান হইয়াছিল। সেই মহিমাশালী পুরুষগণ স্বর্গপ্রাপ্ত হন, যেস্থানে বিরাট্‌পুরুষের উপাসক দেবগণ আছেন। এখন বুঝা উচিত যে, যজ্ঞানুষ্ঠান আমাদের প্রথম ও পরম ধর্ম্ম। ভগবান্ মনু 'পঞ্চসূনাদোষ' নিবারণ জন্য ব্রহ্মযজ্ঞ (শাস্ত্রাধ্যয়ন), পিতৃযজ্ঞ (তর্পণ), দেবযজ্ঞ (হোম) ভূতযজ্ঞ (বলি) ও নৃযজ্ঞ (অতিথিসেবন) এই পঞ্চ মহাযজ্ঞের ব্যবস্থা করিয়াছেন এবং গৃহস্থাশ্রমীর পক্ষে ইহা নিত্য প্রতিপাল্য বলিয়া বিধি করিয়া দিয়াছেন; এমন কি, তিনি এই পঞ্চ মহাযজ্ঞের অকরণে অত্যন্ত দোষ প্রদর্শন পর্য্যন্ত করিয়াছেন। মনু আরও বলেন—

অনিষ্ট্বা চৈব যজ্ঞৈশ্চ মোক্ষমিচ্ছন্ ব্রজত্যধঃ॥

৩৭, ৬ষ্ঠ অধ্যায়।

যজ্ঞানুষ্ঠান না করিয়া মোক্ষ ইচ্ছাকারী পুরুষ অধোগতি প্রাপ্ত হন, অর্থাৎ নরকে গমন করেন।

নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য ভেদবশতঃ যজ্ঞের প্রকারভেদ ও অনুষ্ঠানপদ্ধতি নানারূপ হইলেও যজ্ঞের নিত্যকরণীয়তা সর্ব্বত্রই মনুর মতে রক্ষণীয়।

আজকাল সর্ব্ববাদিসম্মত প্রামাণিক গ্রন্থ 'গীতা' যজ্ঞসম্বন্ধে কি বলেন, একবার দেখা যাউক।

যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ।
তদর্থং কর্ম্ম কৌন্তেয়মুক্তসঙ্গঃ সমাচর॥ ৯॥ ৩
সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ।
অনেন প্রসবিষ্যধ্বমেষবোঽস্ত্বিষ্টকামধুক্॥১০॥৩

+ + + +

যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তোমুচ্যন্তে সর্ব্বকিল্বিষৈঃ।
ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ॥১৩॥
অন্নাদ্ভবন্তি ভূতানি পর্জ্জন্যাদন্নসম্ভবঃ।
যজ্ঞাদ্ভবতি পর্জ্জন্যো যজ্ঞঃ কর্ম্মসমুদ্ভবঃ॥ ১৪ ॥ ৩
কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি ব্রহ্মাক্ষরসমুদ্ভবম্।
তস্মাৎ সর্ব্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্॥১৫।

অর্থাৎ যজ্ঞের নিমিত্ত কর্ম্ম করণীয়, অন্য বিষয়ক কর্ম্ম করিলে লোক কর্ম্মে বদ্ধ হয়; অতএব হে কৌন্তেয়! যজ্ঞের জন্য নিষ্কাম হইয়া কর্ম্মানুষ্ঠান কর। ৯।

সৃষ্টির প্রথমে প্রজাপতি যজ্ঞসহ প্রজাসকল সৃষ্টি করিয়া বলিয়াছেন, এই যজ্ঞদ্বারা তোমরা উত্তরোত্তর আত্মোন্নতি লাভ কর, ইহা তোমাদের সর্ব্বাভীষ্টভোগপ্রদ হউক। ১০।

যজ্ঞাবশিষ্টভোজী সাধুগণ সকল পাপ হইতে মুক্ত হন, কিন্তু যাহারা আপনার জন্য পাক করে, সেই পাপীগণ পাপই ভোজন করিয়া থাকে। ১৩।

ভূতসকল অন্ন হইতে উৎপন্ন হয়, বৃষ্টি হইতে অন্নের উৎপত্তি, বৃষ্টি যজ্ঞ হইতে এবং যজ্ঞ কর্ম্ম হইতে সমুৎপন্ন হয়। ১৪।

কর্ম্ম ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন জানিও, ব্রহ্ম অক্ষর হইতে সঞ্জাত, অতএব সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্ম সর্ব্বদা যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত আছেন। ১৫।

ঋগ্বেদের, মনুসংহিতার এবং সর্ব্বোপনিষদের সারস্বরূপ 'গীতা'র কয়েকটী শ্লোক উপরে উদ্ধৃত করিয়া আমরা যজ্ঞের নিত্যতা, প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতা বুঝাইবার চেষ্টা করিলাম। পুরাণ ও দর্শনে এ বিষয়ের অনেক যুক্তি প্রমাণ আছে, বাহুল্যভয়ে সে সকল সঙ্কলনে নিরস্ত হইলাম। যজ্ঞের ফলে ও বলে লোকে সর্ব্বপ্রকার অভীষ্টসিদ্ধি লাভ করে। যজ্ঞের পরিণাম যাজকের পক্ষে নিত্য মঙ্গলকর। এখন ইহা আশ্চর্য্যের ও কৌতুকের বিষয় যে, এমন নিত্যপ্রয়োজনীয় মহোপকারী ও ফলপ্রদ যজ্ঞ-ব্যাপারে লিপ্ত হইয়া দক্ষপ্রজাপতির দুর্দ্দশা ও যজ্ঞনাশ কেন ঘটিল? ইহার একমাত্র উত্তর 'শিববিহীন যজ্ঞ' বলিয়া দক্ষ যজ্ঞের সুফল পাইলেন না, বরং বিপরীত ফল লাভ তাঁহার ভাগ্যে ঘটিয়া উঠিল। এবিষয়ে আমাদের কোন কথা বলিবার পূর্ব্বে শিবগতপ্রাণ শান্তমতি ভক্ত পুষ্পদন্ত স্বকৃত 'মহিম্নস্তোত্রে' যাহা বলিয়াছেন, বিশদ হইবে ভাবিয়া আমরা তাহাই পাঠকগণকে উপহার দিলাম।—

ক্রতৌ সুপ্তে জাগ্রত্ত্বমসি ফলযোগে ক্রতুমতাং
ক্ব কর্ম্ম প্রধ্বস্তং ফলতি পুরুষারাধনমৃতে।
অতস্ত্বাং সংপ্রেক্ষ্য ক্রতুষু ফলদানপ্রতিভুবং
শ্রুতৌ শ্রদ্ধাং বদ্ধ্বা দৃঢ়পরিকরঃ কর্ম্মসু জনঃ॥২০॥
ক্রিয়াদক্ষোদক্ষঃ ক্রতুপতিরধীশস্তনুভৃতা-
মৃষীণামার্ত্বিজ্যং শরণদ! সদস্যাঃ সুরগণাঃ।
ক্রতুভ্রংশস্ত্বত্তঃ ক্রতুফলবিধানব্যসনিনো
ধ্রুবং কর্ত্তুঃ শ্রদ্ধাবিধুরমভিচারায় হি মখাঃ॥২১॥

যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে, অর্থাৎ যজ্ঞের কার্য্য শেষ ও অগ্নিনির্ব্বাণ হইলে যজ্ঞকর্ম্ম যখন নষ্টবৎ প্রতীয়মান হয়, তখন যজ্ঞকারীর পক্ষে ফলযোগবিষয়ে কেবল তুমিই অপ্রমাদশীল। যজ্ঞপুরুষ তুমি, তোমার আরাধনা ব্যতীত কোন্ স্থানে বিনষ্টকর্ম্ম ফলপ্রদ হইয়া থাকে? অতএব লোকসকল তোমাকে যজ্ঞফল প্রদানে প্রতিভূ (জামিন) স্বরূপ দেখিয়া, শ্রুতিবাক্যে শ্রদ্ধা করিয়া যজ্ঞকর্ম্মে দৃঢ়পরিকর হইয়া থাকেন।২০।

হে শরণদ! শরীরীদিগের অধিপতি (প্রজাপতি) ক্রিয়াপটু দক্ষ স্বয়ং যে যজ্ঞের অধিষ্ঠান-

কর্ত্তা, ভৃগু-বশিষ্ঠ প্রভৃতি তেজস্বী ঋষিগণ যে যজ্ঞে পৌরহিত্য করিয়াছিলেন, ইন্দ্র-ব্রহ্মাদি-দেবগণ যে যজ্ঞের সদস্য (বিধিদর্শী) হইয়াছিলেন, ঈদৃশ যজ্ঞও তোমাহইতে বিনষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু প্রভো! তুমি যজ্ঞফলদানে সমুৎসুক, (তবে এ ঘটনা কেন?) কারণ এই যে, শ্রদ্ধাবিহীন যজ্ঞ নিশ্চয়ই যজ্ঞকর্ত্তার বিনাশের কারণ হইয়া থাকে। ২১।

যজ্ঞমাত্রেই প্রয়োজনীয় ও মঙ্গলপ্রদ। যজ্ঞফলদাতা যজ্ঞেশ্বর যজমানের যজ্ঞফলবিধানে নিয়ত উৎসুক। কিন্তু সর্ব্ববিধ অনুষ্ঠান করিয়াও আমরা মনোমত অভীষ্টফললাভে অনেক স্থলে বঞ্চিত হই কেন? এই বিষম সমস্যার সদুত্তর দক্ষযজ্ঞের মত মহাব্যাপারে পাওয়া যাইতেছে। উপরিলিখিত স্তবে ভক্ত পুষ্পদন্ত স্পষ্টই বলিতেছেন, শ্রদ্ধাবিধুর মখ যজ্ঞকর্ত্তার অভিচারের কারণ হইয়া থাকে।

জ্ঞানকর্ম্ম লইয়া আমরা অনেক আলোচনা করিয়া থাকি; সময় সময় তাহাদিগকেই সর্ব্বার্থসিদ্ধির একমাত্র উপায় ভাবিয়া সর্ব্বান্তঃকরণে তাহাদের সেবাতেই মনোনিবেশ করিতে প্রবৃত্ত হই। কোন কোন পণ্ডিত কর্ম্মকে অজ্ঞানের সঙ্গে তুলনা করিয়া উভয়ের সমতা প্রতিপাদনে চেষ্টা করিয়াছেন, আমরা সে কথা বুঝিতে পারি না, কিন্তু জ্ঞানের প্রাবল্য প্রকাশিত হইলে যে কর্ম্মজাল আপনি হীন ও মলিন হইয়া থাকে, তাহা দেখিতে পাই। বাস্তবিক জ্ঞানানল প্রজ্বলিত হইলে কর্ম্মকাষ্ঠ স্বতঃ দগ্ধ ও ভস্মীভূত হইয়া থাকে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাও বলিয়াছেন, জ্ঞানের সদৃশ পবিত্র পরমার্থ ইহ জগতে আর নাই।

'জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা।'

অর্থাৎ জ্ঞানানল সর্ব্বকর্ম্মকে ভস্মসাৎ করে। জ্ঞানের প্রখর প্রতাপ ও প্রভূত প্রভাব সন্দর্শন করিয়া সাধক পণ্ডিতগণ একেবারে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছেন; তখন আর তাঁহাদের বক্তব্যাবক্তব্যবিষয়ে কোন স্থিরতা লক্ষিত হয় না; এমন কি—একজন জ্ঞানপ্রয়াসী সাধক জ্ঞানোপাসনার ঘোষণা করিয়া জলদগম্ভীরস্বরে বলিতেছেন—

জ্ঞানং নিধানং পরমং প্রধানং
জ্ঞানং সমানং ন বহুক্রিয়াভিঃ।
জ্ঞানং মহানন্দরসং রহস্যং
জ্ঞানং পরং ব্রহ্ম জয়ত্যনন্তম্॥

স্থূলকথা জ্ঞান পরম শ্রেষ্ঠ, জ্ঞান পরব্রহ্ম, মহানন্দরসময়, রহস্যময় জ্ঞান অনন্ত জয়শীল, বহুকর্ম্মের সহিত জ্ঞানের তুলনা হয় না। জ্ঞানানল প্রবল, তাহাতে হৃদয় আলোকিত হয়, মলিনতা, পাপ ও অজ্ঞানান্ধকার বিদূরিত হয় সত্য, কিন্তু অগ্নিসন্তাপজনিত জ্বালার অনুভূতিত দূর হয় না। ত্রিতাপসন্তাপিত হৃদয়ে জ্ঞানপ্রতাপ জানিতে পারা যায়। জ্ঞান-প্রভাকরের অপেক্ষা ভক্তি-সুধাকরের নিকট আমরা সেইজন্য স্বতঃ ধাবিত হইয়া থাকি এবং ভক্তি-শশধরের বিমলচন্দ্রিকায় মনঃপ্রাণ সমস্তই স্নিগ্ধ, শান্ত ও সুখময় হইয়া পড়ে। ভক্তির জ্যোৎস্নায় যাঁহার হৃদয় আলোকিত, সর্ব্বাঙ্গ পুলকিত, সেই কৃতার্থ ভক্তের বিশুদ্ধ ভাবের নিকট অজ্ঞান ও কর্ম্ম দূরে থাকুক, জ্ঞানও তখন মলিন ও তুচ্ছ বোধ হইয়া থাকে!

ভক্তি-প্রাণ একজন ভক্ত ভক্তির প্রবাহে পড়িয়া প্রেমতরঙ্গের রঙ্গ দেখিয়া যাহা বলিয়াছেন, তাহা এই খানে উদ্ধৃত হইল:—

জ্ঞানকর্ম্ম করে লোক, নাহি জানে ভক্তিযোগ,
নানামতে হয়ে আগোয়ান।
তার কথা নাহি শুনি, পরমার্থ তত্ত্ব জানি,
প্রেমভক্তি ভক্তগণ-প্রাণ॥

আবার—

অজ্ঞান অভাগা যত, নাহি লয় সাধু মত,
অহঙ্কারে না জানে আপনা।
অভিমানী ভক্তিহীন, জগমাঝে সেই দীন,
বৃথা করে অশেষ ভাবনা॥

শ্রীনরোত্তম দাসের প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা।

ভক্ত বলিতেছেন—ভক্তিহীন অভিমানী ব্যক্তি জগন্মধ্যে অতিশয় দীন; অশেষ ভাবনায় তাহার কোন ফল ফলে না। এই অখণ্ডনীয় যুক্তির দৃষ্টান্ত দক্ষপ্রজাপতি। পুষ্পদন্ত দক্ষের দক্ষতা, মহিমাপ্রভৃতি স্বীকার করিয়াও একমাত্র শ্রদ্ধাভক্তির অভাব তাঁহার যজ্ঞবিনাশের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

পরমহংস রামকৃষ্ণদেব ঈশ্বরে বিশ্বাসভক্তির উল্লেখ করিয়া বুঝাইতেছেন, বালকেরা যেমন খুঁটি ধরিয়া নানাভাবে ঘোরে, কিন্তু পড়ে না, আবার সেই খুঁটি ছাড়িবামাত্র অমনি পড়িয়া যায়। সেইরূপ মানব যতক্ষণ ভগবানকে আশ্রয় করিয়া সংসারক্ষেত্রে বিবিধব্যাপারে বিচরণ করে ততক্ষণ তাহার পতন নাই, কিন্তু ঐ সুদৃঢ় অবলম্বন পরিহারের ফল অবশ্যই পতন। সাক্ষী দক্ষপ্রজাপতি।

এখন একবার দেখা উচিত, যে মহাদেবের অবমাননার ফলে দক্ষরাজার যজ্ঞনাশ ও মহতীদুর্দ্দশা সংঘটিত হইল, তিনি কে?—শাস্ত্রে নানাস্থানে তাঁহার ন্যনারূপ নানাবিভূতি নানাভাবে বর্ণিত আছে, আমরা সংক্ষেপে বুঝাইবার নিমিত্ত শিবগীতা হইতে তাঁহার নিরাকার সাকার স্বরূপের বর্ণনাটী উদ্ধৃত করিলাম:—

অচিন্ত্যরূপমব্যক্তমনন্তমমৃতং শিবং।
আদিমধ্যান্তরহিতং প্রশান্তং ব্রহ্মকারণম্॥
একং বিভুং চিদানন্দমরূপমজমদ্ভুতম্।
শুদ্ধস্ফটিক সঙ্কাশমুমাদেহার্দ্ধ ধারিণম্॥
ব্যাঘ্রচর্ম্মাম্বরধরং নীলকণ্ঠং ত্রিলোচনম্।
জটাধরং চন্দ্রমৌলিং নাগযজ্ঞোপবীতিনম্।
ব্যাঘ্রচর্ম্মোত্তরীয়ঞ্চ বরেণ্যমভয়প্রদম্।
পরাভ্যামূর্দ্ধহস্তাভ্যাং বিভ্রাণং পরশুং মৃগং।
চন্দ্রসূর্য্যাগ্নিনয়নং স্মেরবক্ত্রসরোরুহম্।
ভূতিভূষিতসর্ব্বাঙ্গং সর্ব্বাভরণভূষিতম্।
এবমাত্মারণিং কৃত্বা প্রণবঞ্চোত্তরারণিম্।
জ্ঞাননির্ম্মথনাভ্যাসাৎ সাক্ষাৎপশ্যতি মাং জনঃ॥

অর্থাৎ:—অচিন্ত্য, অব্যক্ত, অনন্ত, অমর, শিবস্বরূপ আদি-অন্ত-মধ্যরহিত, প্রশান্ত, কারণস্বরূপ ব্রহ্ম, একমাত্র, সর্ব্বব্যাপী, জ্ঞানানন্দস্বরূপ, অরূপ, অজ, অদ্ভুত, শুদ্ধস্ফটিকপ্রভ, উমার দেহার্দ্ধভাগী, ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরিহিত, নীলকণ্ঠ, ত্রিলোচন, জটাধর, চন্দ্রমৌলি, নাগযজ্ঞোপবীত-ধারী, ব্যাঘ্রচর্ম্ম-উত্তরীয়ধারী, পূজনীয়, অভয়-প্রদ, ঊর্দ্ধ দুইকরে পরশু ও মৃগধারী, চন্দ্র-সূর্য্যানল-নয়ন, সহাস্যমুখপদ্মবিশিষ্ট, ভূতি-ভূষিত, সর্ব্বাভরণযুক্ত, এইরূপে আমাকে (আত্মাকে) অরণি ও প্রণবকে উত্তরারণি করিয়া জ্ঞানমন্থনপূর্ব্বক লোকে যোগবলে আমাকে সাক্ষাৎ দেখিতে পায়।

শিবের ব্রহ্মত্ব বা শিবত্বসূচক যে সকল পদ শিবগীতা হইতে উদ্ধৃত হইল, পাঠক দেখিবেন; তৎসমুদায় নানাভাববোধক ও নানার্থপ্রকাশক; আমরা কেবল অনুবাদমাত্র প্রদান করিলাম।

এক্ষণে পরমহংস ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের শিবস্তোত্র হইতে দুইটী শ্লোক উদ্ধার করিতেছি। বলা বাহুল্য, শঙ্করাচার্য্য যেভাবে ও যেরূপে আর্য্যমত প্রচার ও শিবারাধনা প্রচলন করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে শৈবমত প্রবলরূপে ভারতবর্ষময় ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে এবং লোকে তাঁহাকে শঙ্করের অবতার বলিয়া বিশ্বাস করিয়া থাকে। তাঁহার শৈবমত

পৌরাণিক নয়, তিনি বেদপ্রতিপাদ্য শিব লইয়া স্বমত স্থাপন করিয়াছেন। শ্লোক দুইটী এই:—

নমস্তে নমস্তে বিভো বিশ্বমূর্ত্তে
নমস্তে নমস্তে চিদানন্দমূর্ত্তে।
নমস্তে নমস্তে তপোযোগগম্য
নমস্তে নমস্তে শ্রুতিজ্ঞানগম্য॥
ত্বত্তো জগদ্ভবতি দেব ভব স্মরারে
ত্বয্যেব তিষ্ঠতি জগন্মৃড় বিশ্বনাথ।
ত্বয্যেব গচ্ছতি লয়ং জগদেতদীশ
লিঙ্গাত্মকে হর চরাচর বিশ্বরূপিন্॥

অনুবাদ। হে বিশ্বমূর্ত্তে! বিভো! তোমার পদে পুনঃ পুনঃ প্রণাম। হে চিদানন্দস্বরূপ! তোমায় বার বার নমস্কার। হে তপোযোগ-দ্বারা সাধনীয়, তোমাকে বার বার প্রণাম। হে বেদপ্রতিপাদ্যব্রহ্ম! তোমার চরণে পুনঃ পুনঃ প্রণাম॥

হে কামনাশক দেবভব! তোমা হইতে জগৎ উৎপন্ন হয়। হে বিশ্বনাথ মৃড়! তোমাতেই জগৎ স্থিত রহিয়াছে এবং হে ঈশ্বর হর! লিঙ্গাত্মক তোমাতেই জগৎ লীন হয়, কারণ তুমি চরাচর বিশ্বরূপী।

শিবের গুণগরিমা ও তত্ত্বমহিমাসম্বন্ধে আর অধিক উল্লেখের প্রয়োজন নাই। নিখিল-ভয়হারী বিশ্বাদ্য ও বিশ্ববীজ মহাদেবসম্বন্ধে ভক্তপ্রবর পুষ্পদন্ত যাহা বলিয়াছেন, তাঁহার তিনটী শ্লোকমাত্র নিম্নে উদ্ধৃত হইল:—

ত্রয়ী সাংখ্যং যোগঃ পশুপতিমতং বৈষ্ণবমিতি
প্রভিন্নে প্রস্থানে পরমিদমদঃ পথ্যমিতি চ।
রুচীনাং বৈচিত্র্যাদৃজুকুটিল নানাপথজুষাং
নৃণামেকো গম্যস্ত্বমসি পয়সামর্ণব ইব॥
ত্রয়ীং তিস্রো বৃত্তীস্ত্রিভুবনমথো ত্রীণপি সুরা
নকারাদ্যৈর্বর্ণৈস্ত্রিভিরভিদধত্তীর্ণ বিকৃতিঃ।
তুরীয়ন্তে ধামধ্বনিভিরবরুন্ধানমণুভিঃ
সমস্তং ব্যস্তং ত্বাং শরণদ গৃণাত্যোমিতিপদম্॥
অসিতগিরিসমং স্যাৎ কজ্জলং সিন্ধুপাত্রং
সুরতরুবর শাখালেখনী পত্রমুর্ব্বী।
লিখতি যদি গৃহীত্বা সারদাসর্ব্বকালং।
তদপি তবগুণানামীশ পারং ন যাতি॥

মহিম্নঃ স্তব হিন্দুপত্রিকার পাঠকবর্গের পরিচিত ও পরিজ্ঞাত। সমস্ত স্তবটীর অর্থ ব্যাখ্যা ও অনুবাদ পূর্ব্বে সবিশেষ আলোচিত হইয়াছে, সুতরাং উদ্ধৃত শ্লোকটীর অনুবাদ প্রদত্ত হইল না। পাঠকগণ সহজেই বুঝিতে পারিবেন, পরমব্রহ্মস্বরূপ মহাদেবের প্রতি অবমাননা ও অভক্তি যে কার্য্যব্যাপারে অনুষ্ঠিত বা সংসূচিত, তাহার পরিণাম বিষয়-বিলয় এবং কর্ত্তার অধঃপতন। লোকশিক্ষার নিমিত্ত ও লোকাচারের পবিত্রতা সংরক্ষণ নিমিত্ত সর্ব্বকার্য্যে ঈশ্বরনিষ্ঠা ও ঐকান্তিক ভক্তিজ্ঞাপন নিমিত্ত ব্রহ্মার পুত্র, সতী ভগবতীর পিতা, মহাদেবের ও অন্যান্য দেবের শ্বশুর দক্ষ-প্রজাপতি মহাশয়ের অধঃপতন আমাদিগকে সুস্পষ্টরূপে ঐ সকল ব্যাপারের নিমিত্ত সতর্ক ও সাবধান করিয়া দিতেছে। এস্থলে আর একটী রহস্য পাঠকগণের অবগতির জন্য সংগ্রহ করিলাম।

দক্ষপ্রজাপতি শিবের প্রতি রুষ্ট, বিরক্ত ও অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার নিন্দা, গ্লানি ও অপমান-সূচক কতিপয় বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন। সোজাসুজি বুঝিতে গেলে সে কথাগুলি নিন্দা-বোধক মনে হয়, কিন্তু অর্থান্তর ও ভাবান্তর গ্রহণ করিলে তৎসমুদায় মহাদেবের শ্রেষ্ঠতর প্রাধান্য ও অপরূপ ব্রহ্মভাবের জ্ঞাপক হইয়া থাকে। পুরাণাদিতে এইরূপ বর্ণনাই আছে। টীকাকারগণ তাহার অর্থ ও ব্যাখ্যা করণাবসরে তাহার দুই বিপরীত ব্যাখ্যা প্রদান করিয়া সংস্কৃতভাষার অদ্ভুত কৌশল ও ভাব পারি-

পাট্য এবং আপনাদের পাণ্ডিত্য ও নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, অসীম মহিমাশালী, সর্ব্বশক্তিমান্ মহাদেবের নিন্দা করে কার সাধ্য? ক্ষণিক রোষের আবেগে, অজ্ঞানের প্রাবল্যে, কামের তাড়নায়, অভিমানের বলে দক্ষ কিংবক্তব্যবিহীন হইলেও বাগ্দেবী সরস্বতী কেমন করিয়া মহাদেবের নিন্দাসূচক বাণীরূপে কণ্ঠনিঃসৃতা হইবেন? যে সারদা সর্ব্বদা মহাদেবের গুণমহিমা বর্ণনা করিয়া শেষ করিতে পারেন না, তিনি কোন্ সাহসে কিসের জন্য তাঁহার নিন্দায় প্রবৃত্ত হইবেন? অতএব নিন্দাই এস্থলে তাঁহার স্তুতি। আলঙ্কারিক পণ্ডিতগণ এইরূপ স্থলে 'ব্যাজস্তুতি' নাম প্রদান করিয়াছেন। আমরা দুইটী স্থল হইতে 'দক্ষের শিবনিন্দা' উদ্ধৃত করিলাম। প্রথমটী শ্রীমদ্ভাগবতের বর্ণিত দক্ষযজ্ঞের এবং দ্বিতীয়টী অন্নদামঙ্গলের বর্ণিত দক্ষযজ্ঞের বর্ণনা হইতে গৃহীত হইল।

(১)

শ্রূয়তাং ব্রহ্মর্ষয়ো মে সহদেবাঃ সহাগ্নয়ঃ।
সাধূনাং ব্রুবতো বৃত্তং নাজ্ঞানান্ন চ মৎসরাৎ॥
অয়ন্তু লোকপালানাং যশোঘ্নো নিরপত্রপঃ।
সদ্ভিরাচরিতঃ পন্থা যেন স্তব্ধেন দূষিতঃ॥
এষ মে শিষ্যতাং প্রাপ্তো যন্মে দুহিতুরগ্রহীৎ।
পাণিং বিপ্রাগ্নিমুখতঃ সাবিত্র্যা ইব সাধুবৎ॥
গৃহীত্বা মৃগশাবাক্ষ্যাঃ পাণিং, মর্কটলোচনঃ।
প্রত্যুত্থানাভিবাদার্হে বাচাপ্যকৃতনোচিতং॥
লুপ্তক্রিয়ায়াশুচয়ে মানিনে ভিন্নসেতবে।
অনিচ্ছন্নপ্যদাং বালাং শূদ্রায়েবোশতীং গিরম্॥
প্রেতাবাসেষু ঘোরেষু প্রেতৈর্ভূতগণৈর্বৃতঃ।
অটত্যুন্মত্তবন্নগ্নো ব্যুপ্তকেশো হসন্ রুদন্॥
চিতাভস্মকৃতস্নানঃ প্রেতস্রঙ্ন্রস্থিভূষণঃ।
শিবাপদেশো হ্যশিবো মত্তোমত্তজনপ্রিয়ঃ॥
পতিঃ প্রমথনাথানাং তমোমাত্রাত্মকাত্মনাং॥
তস্মা উন্মাদনাথায় নষ্টশোচায় দুর্হৃদে॥
দত্তাবত ময়া সাধ্বী চোদিতে পরমেষ্ঠিনা॥

ভাগবত ৪ স্কন্ধ। ২ অধ্যায়।

(২)

সভাজন শুন, জামতার গুণ,
বয়সে বাপের বড়।
কোন্ গুণ নাই, যেথা সেথা ঠাঁই,
সিদ্ধিতে নিপুণ দড়॥
মান অপমান, সুস্থান, কুস্থান,
অজ্ঞান জ্ঞান সমান।
নাহি মানে ধর্ম্ম, নাহি মানে কর্ম্ম,
চন্দনে ভস্ম জ্ঞেয়ান॥
যবনে ব্রাহ্মণে, কুকুরে আপনে,
শ্মশানে স্বরগে সম।
গরল খাইল, তবু না মরিল,
ভাঙ্গড়ের নাহি যম॥
সুখে দুখ জানে, দুখে সুখ মানে,
পরলোকে নাহি ভয়।
কি জাতি কেজানে, কারে নাহি মানে,
সদা কদাচার ময়॥
কহিতে ব্রাহ্মণ, কি আছে লক্ষণ,
বেদাচার বহিষ্কৃত।
ক্ষত্রিয় কথন, না হয় ঘটন,
জটা ভস্ম আদি ধৃত॥
যদি বৈশ্য হয়, চাষী কেন নয়,
নাহি কোন ব্যবসায়।
শূদ্র বলে কেবা, দ্বিজে দেয় সেবা,
নাগের পৈতা গলায়॥
গৃহী বলা দায়, ভিক্ষা মাগি খায়,
না করে অতিথি সেবা।
সতী ঝি আমার, গৃহিণী তাহার,
সন্ন্যাসী বলিবে কেবা॥
বনস্থ বলিতে, নাহি লয় চিতে,
কৈলাস নামেতে ঘর।

ডাকিনী বিহারী, নহে ব্রহ্মচারী,
একি মহা পাপ হয়॥

অন্নদামঙ্গল দক্ষযজ্ঞ।

উদ্ধৃতাংশ কিছু বেশি হইল। আমরা সংস্কৃত ভাগের অনুবাদ বা ব্যাখ্যা এবং বাঙ্গলা অংশের কোনরূপ ব্যাখ্যা দিবার চেষ্টাও করিলাম না। সংস্কৃত কাব্যরসজ্ঞ পণ্ডিত পাঠকবর্গ এবং বাঙ্গলা কাব্যপাঠকগণ উভয় স্থলের অর্থযোজনা এবং যুগপৎ শিবের নিন্দা-স্তুতির ভাব গ্রহণ করিয়া পরিতৃপ্ত হইবেন, এই আমাদের কামনা।

এক্ষণে আর একটী বিষয়ের তথ্যানুসন্ধান করা কর্ত্তব্য। দক্ষের ছাগমুণ্ড হইল কেন? কোথায় মহাতেজস্বী দক্ষপ্রজাপতি, আর কোথায় অধম ছাগপশু? এ উভয়ের অসম-সম্মিলন কেন ঘটিল? দেব, দানব, যক্ষ, রক্ষ, গন্ধর্ব্ব, নাগ, মানব—এই সকল বিদ্যমান থাকিতে ছাগের মুণ্ড দক্ষস্কন্ধে প্রদত্ত হইল কেন? সিংহ, ব্যাঘ্র, হস্তী, গণ্ডার, উষ্ট্র, অশ্ব প্রভৃতি প্রধান প্রধান পশু সকল থাকিতেও ক্ষুদ্র ক্ষীণ ছাগের মুণ্ডই বা কেন দক্ষের পক্ষে পুনর্জ্জীবনের জন্য যোগ্য বোধ হইল? এস্থলে দেব, মানব ও পশু, এই তিন শ্রেণীর সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা কর্ত্তব্য।

সত্ব, রজঃ এবং তমঃ, এই তিন গুণের আধিক্য ও ন্যূনতানিবন্ধন আমাদের উন্নতি-অবনতি অথবা ঊর্দ্ধগতি-অধোগতি সংঘটিত হইয়া থাকে। ভগবান্ মনু এই তিন গুণের সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা এইস্থলে উদ্ধৃত হইল।

সত্বং রজস্তমশ্চৈব ত্রীণ্ বিদ্যাদাত্মনো গুণান্। যৈর্ব্যাপ্যেমান্ স্থিতো ভাবান্ মহান্ সর্ব্বানশেষতঃ॥ ২৪॥

যো যদৈষাং গুণো দেহে সাকল্যেনাতিরিচ্যতে।
স তদা তদ্গুণপ্রায়ং তং করোতি শরীরিণম্॥২৫

সত্বং জ্ঞানং তমোঽজ্ঞানং রাগদ্বেষৌ রজঃ স্মৃতম্।
এতদ্ব্যাপ্তিমদেতেষাং সর্ব্বভূতাশ্রিতং বপুঃ॥২৬॥

* * * *

দেবত্বং সাত্বিকা যান্তি মনুষ্যত্বঞ্চ রাজসাঃ।
তির্য্যক্ত্বং তামসা নিত্যমিত্যেষা ত্রিবিধা গতিঃ॥৪॥

১২ অধ্যায়।

অনুবাদ। সত্ব, রজঃ, তম, এই তিন আত্মার গুণ, যে তিন গুণে ব্যাপ্ত মহত্তত্ব স্থাবরজঙ্গম-রূপ সকল পদার্থ ব্যাপিয়া থাকেন। ২৪।

যদ্যপি সকল দেহী এই তিন গুণযুক্ত হয়, তথাপি এই তিনের মধ্যে যে গুণের আধিক্য যে দেহে থাকে, ঐ গুণ ঐ দেহীকে লক্ষণাক্রান্ত করে॥ ২৫॥

সত্বগুণের জ্ঞান, তমোগুণের অজ্ঞান এবং রজোগুণের রাগদ্বেষ লক্ষণস্বরূপ জানিবে। সর্ব্বভূতাশ্রিত বপু এই এই গুণ সকলে পরিব্যাপ্ত॥২৬

যে ব্যক্তি সত্বগুণবৃত্তিতে অবস্থিত হয়, সে দেবত্ব প্রাপ্ত হয়, যে রজোগুণবৃত্তিতে অবস্থিত, সে মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত হয়, যে তমোগুণবৃত্তিতে থাকে, সে পশু-পক্ষীপ্রভৃতি নিকৃষ্ট-যোনিত্ব লাভ করে॥ ৪০॥

মনুসংহিতার দ্বাদশ অধ্যায় এবং গীতার ১৪শ, ১৭শ ও ১৮শ অধ্যায় পাঠে এই তিন গুণের বিশিষ্ট বিবরণ প্রাপ্ত হইবেন। আমরা সংক্ষেপ করিবার অভিপ্রায়ে কেবল ২।৪টী শ্লোক তুলিয়া দিলাম; যাঁহারা সবিশেষ তত্ত্ব জানিতে চান, তাঁহাদিগকে ঐ ঐ স্থান পাঠ করিতে অনুরোধ করি। গীতাতে আছে—

ঊর্দ্ধং গচ্ছন্তি সত্বস্থাঃ মধ্যে তিষ্ঠন্তি রাজসাঃ।
জঘন্যগুণবৃত্তিস্থাঃ অধোগচ্ছন্তি তামসাঃ॥ ১৮॥

অনুবাদ—

সত্বপ্রধান ব্যক্তিগণ ঊর্দ্ধে গমন করে, রজোগুণ প্রধান লোকমধ্যে থাকে, নিকৃষ্ট গুণাবলম্বী তামসপ্রকৃতি ব্যক্তি অধোগতি প্রাপ্ত হয়॥ ১৮॥

দেবভাব ও পশুভাবের মধ্যে মানুষভাব। আমাদের কোন বন্ধু ইহা একটী সুন্দর সমীকরণ Equation দ্বারা বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। কথাটা বেশ পরিষ্কার হইবে বলিয়া, আমরা নিম্নে তাহা দেখাইলাম।

দে = দেবত্ব, মা = মানবত্ব, প = পশুত্ব।

দে + প = মা দে = মা − প প = মা − দে দে + প − মা = 0	সত্ত্বগুণে দেবত্ব, রজোগুণে নরত্ব, তমোগুণে পশুত্ব। ত্রিগুণাতীত তুরীয়ভাব বা ব্রহ্মত্ব।

মানবপ্রকৃতি দেবপ্রকৃতি ও পশুপ্রকৃতির সম্মিলনে গঠিত। দোষগুণের আকর, আহার, নিদ্রা, ভয়, রোগ, শোক, মোহ, কামাদি রিপুর প্রাবল্যহেতু মানব প্রকৃতি পশুবৎ। রিপুবিশেষের প্রাবল্যে মানব যখন বিবেক বাক্য অবহেলা করিয়া কদাচার পরায়ণ হইয়া জঘন্য হেয়কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, আমরা তখন নরাকার পশু বলিয়া তাহাকে বুঝিয়া থাকি। দয়া, ক্ষমা, শ্রদ্ধা, ভক্তি, উপচিকীর্ষা স্নেহ প্রভৃতি সদ্‌গুণে মানব যখন বিভূষিত এবং ঐ সকল সদ্‌গুণ প্রণোদিত হইয়া যখন দেবোপম সাধু হৃদয়ে ও শান্তচিত্তে পুণ্যকার্য্যের ব্যবস্থায় অবহিত হয়, তখন আমরা তাহাকে নরলোকে দেবতা বলিয়া প্রশংসা ও পূজা করিয়া থাকি।

এতাবতা আমরা গুণত্রয়ের আলোচনায় মানব প্রকৃতি লইয়া যাহা বলিলাম, তাহাতে স্পষ্টই বুঝা যায় আমাদের কার্য্যগুণে আমরা সময়বিশেষে দেবত্ব বা পশুত্ব লাভ করি এবং মনুষ্যত্ব হারাইয়া ফেলি। এখন দক্ষের কাজ দক্ষের অভিমান ও দক্ষের কামনা মনে করিয়া দেখুন। সর্ব্বযজ্ঞেশ্বর মহাদেবকে ভুলিয়া তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া আবার তাঁহার অংশ বাদ দিয়া যে যজ্ঞ করিতে যায়, তাহার দেবভাব কোথায়? তাহার পশুত্ব অনিবার্য্যরূপে প্রত্যক্ষ প্রতিভাত হইয়া থাকে। এই জন্যই দক্ষের পশুমুখ হইল। এক্ষণে ছাগমুণ্ড কেন হইল তাহা একবার অনুসন্ধান করা উচিত। মহাদেব যখন দক্ষপত্নী প্রসূতির স্তবে প্রসন্ন হইয়া দক্ষের পুনর্জ্জীবন আদেশ প্রদান করেন, তৎপূর্ব্বে নন্দী যাহা বলিয়াছেন তাহাই এস্থলে উদ্ধৃত করিলাম। পাঠক দেখিবেন দক্ষের ছাগমুণ্ড দেওয়ার ব্যবস্থা নন্দী কেমন যুক্তিসহকারে জানাইতেছেন। পুরাণপ্রসিদ্ধ নন্দীর শাপই দক্ষের ছাগমুণ্ডের কারণ, সুতরাং নন্দীর উক্তি এস্থলে উল্লেখ করা আবশ্যক। দক্ষযজ্ঞ বিবরণ নানা পুরাণে নানাভাবে বর্ণিত। আমরা শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণ হইতে নন্দীর অভিশাপ উদ্ধৃত করিলাম। নন্দীর শাপেও অনেক কথা আছে, যে অংশটুক আমাদের প্রয়োজনীয় তাহাই গ্রহণ করিলাম।

বুদ্ধ্যা পরাভিধ্যায়িন্যা বিস্মৃতাত্মগতিঃ পশুঃ।
স্ত্রীকামঃ সোঽস্ত্ব নিতরাং দক্ষোবস্তমুখোঽচিরাৎ॥

৪র্থ স্কন্ধ ২য় অধ্যায়।

অনুবাদ—

দক্ষের বুদ্ধি দেহকে আত্মা বলিয়া ধ্যান ও বিশ্বাস করে। সে আত্মতত্ত্ব বিস্মৃত হইয়া পশুবৎ আচরণ করিতেছে। সে পশুর সমান নিতান্ত স্ত্রীকাম হউক এবং অচিরে ইহার ছাগমুখ হউক। যে অবিদ্যাকে তত্ত্ববিদ্যা বলিয়া বোধ করে, সে বস্তুতঃই ছাগতুল্য, অতএব তাহার ছাগবদন হওয়াই উচিত।

কোন কোন পুরাণের মতে সতীর শাপে দক্ষের ছাগমুণ্ড হইয়াছে বলিয়া উল্লেখ আছে। যাহা হউক কামপরায়ণ দক্ষের কামরূপী ছাগের মুণ্ডই প্রশস্ত। পূজার অঙ্গ বলিয়া বলিদানের ব্যবস্থা শাস্ত্রসিদ্ধ। লৌকিক আচারে অথবা প্রবৃত্তির তাড়নায় আমরা ছাগ ও মহিষ প্রভৃতি কাটিয়া থাকি। বাহ্যপূজার অনুষ্ঠানে জীবন্ত ছাগ, মেষ ও মহিষাদি বলিদান করিয়া থাকি।

কিন্তু বাহ্যপূজার পূর্ব্বে শাস্ত্রানুমোদিত পূজা পরায়ণ সাধকের অভ্যন্ত মানসপূজার ব্যবস্থা। এই পূজাতে মানদোপচারে পাদ্য, অর্ঘ্যপ্রভৃতি দেওয়ার বিধি। যথা হৃৎপদ্মে আসন, সহস্রার চ্যুতামৃতে পাদ্য ইত্যাদি। মহানির্ব্বাণতন্ত্রের পঞ্চমোল্লাসে ইহার সবিশেষ বিবরণ লিখিত আছে। পূজার পর "কামক্রোধৌ ছাগবাহৌ বলিং দত্বা জপং চরেৎ॥

কাম ও ক্রোধকে ছাগ মহিষরূপে বলিদান দিয়া জপাচরণ করিবে। পুরাণ ও তন্ত্রের মতে যে সকল স্থলে বলিদানের ব্যবস্থা আছে, সেই সেই স্থানেই ছাগের সহিত কামের সাদৃশ্য প্রদর্শিত হইয়াছে। পশুতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ ছাগের প্রকৃতি ও গুণাগুণ পরীক্ষা করিয়া যাহা নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, তাহা সমস্তই কামমূলক এবং এই জন্যই অনন্ততত্ত্বদর্শী ঋষিগণ মানসপূজার বলিদানে কামকে ছাগরূপে কল্পনা করিয়াছেন। কামাদি ছয়টী রিপুকেই জন্তুর সহিত তুলনা করা হইয়াছে, সে সকল বলিদানের কথা। আমাদের বর্ত্তমান প্রসঙ্গে অপ্রাসঙ্গিক বলিয়া সে সকলের উল্লেখ ও সমালোচনা অনাবশ্যক।

এখন কামাসক্ত তত্ত্বজ্ঞানশূন্য ও নিষ্ঠা ভক্তিবিহীন দক্ষের প্রধান অঙ্গ (মস্তক) লইয়াই যত গোল। মাথাটার দোষেই বেচারার এত বিড়ম্বনা। হস্ত, পদ, বক্ষঃ, কক্ষ, উদর, পৃষ্ঠ সকলই বাহাল থাকিল বীরভদ্র আসিয়া তাঁহার মাথাটাই ছিঁড়িয়া ফেলিলেন এবং নন্দী ও পুনর্জীবনের সময় যোগ্যবিবেচনায় অজমস্তক দক্ষস্কন্ধে সংযোজিত করিয়া দিবা দৃষ্টিতে তাঁহার দোষরাশি বিকাশিত করিয়া তাঁহার পশুত্ব ও কামাত্মতা বিষয়ে জগতের সকলের নিকট জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণ প্রদান করিলেন। দেহকে যে আত্মা বুঝে, তত্ত্বজ্ঞান ও অধ্যাত্মবিদ্যা যে জানে না, পরম পুরুষের অস্তিত্বে যার বিশ্বাস নাই, সে পশু নয় ত কি? তার মস্তক পশুর মস্তক। তার দেহমাত্র নরদেহ। এই মহাতত্ত্ব জ্ঞাপন জন্যই দক্ষের অধঃপতন।

কামের অদ্ভুতশক্তি—কামের সর্ব্বানর্থকরী ক্ষমতা দেব, নর ও তির্য্যক্ সকল সমক্ষেই নিত্য পরিচিত ও নিত্য পরীক্ষিত। আমরা কেবল ২।১টী স্থান উদ্ধৃত করিয়া কামসম্বন্ধে সকলকে সতর্ক করিয়া দিলাম।

ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে॥ ৬২॥

ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাৎ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি॥৬৩॥

গীতা—২য় অধ্যায় আবার ৩য় অধ্যায়ের ৪৩ ব' শেষ শ্লোক।

এবং বুদ্ধেঃ পরং বুদ্ধ্বা সংস্তভ্যাত্মানমাত্মনা।
জহি শত্রুং মহাবাহো কামরূপং দুরাসদ॥

এই ত শ্রীভগবানের জ্ঞানময় উপদেশ শুনিলেন। আবার মনু বলেন,

ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয়এবাভিবর্দ্ধতে॥

জ্বলন্ত আগুণে ঘৃত দেওয়া আর ভোগ্যবস্তু দ্বারা কামদমনে চেষ্টা সমান। তাই তিনি বলেন 'নিবৃত্তিস্তু মহাফলা'।

এখন একজন ভক্তের কথা শুনুন,—

কাম ক্রোধ লোভ মোহ, মদ মাৎসর্য্য দম্ভ সহ;
স্থানে স্থানে নিযুক্ত করিব।
আনন্দ করি হৃদয়, রিপু করি পরাজয়;
অনায়াসে গোবিন্দ ভজিব॥
অন্যথা স্বতন্ত্র কাম, অনর্থাদি যার ধাম;
ভক্তিপথে সদা দেয় ভঙ্গ।
কিবা বা করিতে পারে, কাম ক্রোধ সাধকেরে;
যদি হয় সাধুজনার সঙ্গ॥

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা।

আমরাও এখন সর্ব্বকার্য্যবিধায়ক, কাল-কামিনীসাধক কামান্তক শ্রীবামদেবকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিয়া দক্ষযজ্ঞ হইতে অবসর লইলাম।

শ্রীদুর্গাদাস রায়।

সামবেদসংহিতা।

সমুদায় ধর্ম্মশাস্ত্রের মধ্যে বেদ অতি প্রাচীন (১) ও অত্যন্ত সারবান্। বেদের অপর নাম ব্রহ্ম। ব্রহ্মার বদন হইতে বেদের উৎপত্তি (২) সুতরাং ইহা অলৌকিক ইহা যে কিরূপ মূল্যবান তাহা আমরা অনুধাবন করিতে পারি না। যাঁহার যত বুদ্ধির তেজ তিনি তত রূপ অর্থ করেন। কেহ আধিদৈবিক, কেহ আধিভৌতিক ও কেহ আধ্যাত্মিক অর্থ করিয়া থাকেন। বেদের ভাব অতি গভীর। (৩) এই বেদকে অবলম্বন করিলে ব্রহ্মকে জানিতে পারা যায় তজ্জন্য মহর্ষি ব্যাস কহিয়াছেন যে ব্রহ্ম জানিতে হইলে শাস্ত্রই তাহার প্রমাণ (৪)। সুতরাং বেদ আমাদিগের আরাধ্য বস্তু। ইহা সামান্য শ্লোক-বদ্ধ পুস্তক অথবা "চাষার গান" বলিয়া অবজ্ঞা করিলে আমাদিগকে পাপভাক্ হইতে হয়। যদি আমরা বেদকে এরূপ সামান্য জ্ঞান করি তাহা হইলে আমরা মূর্খ, কারণ মহতের মহত্ত্ব না জানিয়া নিন্দা করা মূর্খের ধর্ম্ম। (৫) যেরূপ ব্রহ্মার গুণগান করিয়া

(১) বেদশব্দেভ্য এবাদৌ পৃথক্সংস্থাশ্চ নির্ম্মমে॥
মনুঃ ১অ, ২১।

(২) অনাদি নিধনা নিত্যা বাগুৎসৃষ্টা স্বয়ম্ভুবা।
আদৌ বেদময়ী বিদ্যা যতঃ সর্ব্বাঃ প্রবৃত্তয়ঃ।

বেদান্তদর্শনে ১ অধ্যায়ে ৩ পাদে ২৮ সূত্র শঙ্কর-ভাষ্যে স্মৃতিবচনং।

ব্রহ্মা প্রথমে উৎপত্তিবিনাশবর্জ্জিত বেদময়ী বাণী উচ্চারণ করিয়াছিলেন—যে বাণী হইতে এ সমুদায় সৃষ্টি হইয়াছে। এই সূত্রের সমুদায় ভাষ্য পাঠ করিলে জানা যায় যে বেদ কোন সময়ে সৃষ্টি হইয়াছিল তাহার স্থির নাই। প্রলয়কালেও সূক্ষ্মরূপে পরমাত্মায় বেদ অবস্থান করেন "প্রলয়কালেঽপি সূক্ষ্মরূপেণ পরমাত্মনি বেদরাশিঃ স্থিতঃ"। কল্লুকভট্টঃ।

"নৈব বেদাঃ প্রলীয়ন্তে মহাপ্রলয়েঽপি" মেধাতিথিশ্চ মনুসংহিতায়াং ১ অ, ২১ শ্লোকে মহাপ্রলয়েও বেদ নষ্ট হয় না। ব্রহ্মা যখন প্রলয়ান্তে সৃষ্টি করেন তখনই বেদ হইতে শব্দ লইয়া যাহার যেরূপ ছিল তাহাকে সেরূপ প্রদান করেন।

"অস্য মহতো ভূতস্য নিশ্বসিতমেতদ্ যদৃগ্বেদঃ"।
বৃহদারণ্যকোপনিষদি ২, ৪, ১০।
৪, ৫, ১১।
মৈত্রী উপনিষৎ ৬. ৩২।

যাহা ঋগ্বেদ তাহা সেই মহদ্ভূত ব্রহ্ম হইতে নিশ্বসিতের ন্যায় বিনা ক্লেশে উৎপন্ন হইয়াছে।

(৩) "অতি গম্ভীরস্য বেদস্যার্থমববোধয়িতুং" ইত্যাদি। ঋগ্বেদভাষ্য ভূমিকায়াং সায়নাচার্য্যঃ।

(৪) শাস্ত্রযোনিত্বাৎ।
বেদান্তদর্শনে ১অ, ১ পাদে, ৩ সূত্রং।

শাস্ত্রমেব যোনিঃ কারণম্ উপায়োঽস্য (স্বরূপাবগতৌ)
যাঁহার স্বরূপ জ্ঞাত হইবার জন্য শাস্ত্রই একমাত্র কারণ।

(৫) শুক্রা ন পশ্যন্তি হি ধাম ভূয়সাম্।
শ্রীভাগবতে ৪ স্কন্ধে ৩ অ, ১৫।

ঐশ্বর্য্যমদোন্মত্তব্যক্তি মহতের তেজ দেখিতে পায় না।

অলোকসামান্যমচিন্ত্যহেতুকং
দ্বিষন্তি মন্দাশ্চরিতং মহাত্মনাম্।
কুমারসম্ভবে ৫ সর্গে ৭৫।

মূঢ় লোক মহতের চরিত্রকে বুঝিতে না পারিয়া ইতর সাধারণ বোধে নিন্দা করিয়া থাকে। কিন্তু তাহা ইতর সাধারণের বোধগম্য নহে।

শেষ করিতে পারা যায় না, তদ্রূপ বেদের মাহাত্মাও বর্ণনা করিয়া শেষ করা যায় না। এই বেদ অভ্যস্থ রাখিয়া নারদ ঋষি জাতিস্মর হইয়াছিলেন। আর্য্য-ঋষিগণ ইহার গৌরব বুঝিতেন তজ্জন্য তাঁহারা বাল্যকাল হইতে পরম যতনে ইহাকে হৃদয়ের ধন বিবেচনা করিয়া অভ্যস্থ করিয়া রাখিতেন। তাঁহারা জানিতেন যে ইহাই তাঁহাদের স্বর্গ (৬) ও ইহাই তাঁহাদের মোক্ষ, সুতরাং বাল্যকাল হইতে গুরুকুলে বাস করিয়া ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া বেদ পাঠ করিতেন। আমার গুরু পশ্চিম প্রদেশস্থ জয়পুর নিবাসী শ্রীযুক্ত পণ্ডিত ভীষ্মরাম মহাশয় ও বাল্যকালেই বেদ পাঠ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের দেশের লোকে যে নিয়মে বেদ পাঠ করেন তাহা শুনিলে বিস্ময়ান্বিত হইতে হয়। তাঁহাদের দেশে যে বেদের আদর এইক্ষণও আছে তাহা শুনিয়া চিত্ত আনন্দ-সাগরে নিমগ্ন হয়।

আমার বেদের অন্যতম গুরু ব্যাঙ্কট বদরাচার্য্য মহাশয় আমাকে আদেশ করিয়াছিলেন যে "প্রতিদিন প্রাতঃকালে গোটা কয়েক মন্ত্র অভ্যাস করিবে।" তিনি বেদের এত আদর করেন যে, এ বৃদ্ধ বয়সে ও প্রতিদিন পাঠ করিতে ক্ষান্ত হন না। তাঁহার পৈত্রিক ভূমি দ্রাবিড় দেশে এক্ষণেও বেদের যথেষ্ট আদর আছে।

বেদের মধ্যে সামবেদের ভাষা অতি শ্রুতি-মধুর, তজ্জন্য শ্রীকৃষ্ণ কহিয়াছিলেন যে "বেদের মধ্যে আমি সামবেদ"(৭)। আমি প্রথমতঃ উহা আমার পূজ্যপাদ পিতৃদেব মহাশয়ের হস্তলিখিত পুঁথি লইয়া তাঁহার নিকট পাঠ করি। আমি কয়েক জন বন্ধুর অনুরোধে হিন্দু-পত্রিকার পাঠকদিগের জন্য সামবেদ প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলাম।

শ্রীবিধুভূষণ দেবস্য।

(৬) "তথা তেন জ্ঞানেন পাপক্ষয়ে সতি মৃতঃ স্বর্গ প্রাপ্নোতি। ঋগ্বেদভাষ্য ভূমিকায়াং ভগবান্ সায়নাচার্য্যঃ

(৭) "বেদানাং সামবেদোঽস্মি————।"
শ্রীভগবদ্গীতায়াং ১০ অ, ২২।

সামবেদসংহিতা।

ছন্দ আর্চ্চিকঃ।

হরিঃ ওম্। (১)

অগ্ন আয়াহীত্যেষা ভরদ্বাজেন (২) দৃষ্টা (৩) গায়ত্রী (৪) আগ্নেয়ী (৫)।

অর্থাৎ ভরদ্বাজ ঋষি এই ঋক্ প্রয়োগফল দর্শন করিয়া শিষ্যকে উপদেশ দিলেন।

(১) বেদ পাঠের আদি ও অন্তে "ওম্" শব্দ উচ্চারণ করা কর্ত্তব্য এতদ্বিষয়ে প্রমাণঃ—

ব্রহ্মণঃ প্রণবং কুর্য্যাদাদাবন্তে চ সর্ব্বদা।
স্রবত্যনোঙ্কৃতং পূর্ব্বং পরস্তাচ্চ বিশীর্য্যতি।
মনুঃ ২ অ, ৭৪।

(২) ভরদ্বাজশব্দ যোগরূঢ়; বাজস্য অন্নস্য ভরণাৎ ভরদ্বাজঃ।

(৪) গীয়তে স্তূয়তে দেবতা অনয়েতি গায়ত্রী—যাহা দ্বারা দেবতাদিগকে স্তব করা যায় তাহাকে গায়ত্রী কহে। নিরুক্ত ৭, ৩, ৬ যথা গায়ত্রী গায়তেঃ স্তুতিকর্ম্মণঃ ইতি। উহা অষ্টাক্ষরাত্মক তিন পাদ নিবদ্ধ-ছন্দোবিশেষ।

(৫) অনয়া ঋচা অগ্নির্দেবোপাস্য ইত্যর্থ—এই ঋক্ দ্বারা অগ্নিদেবকে উপাসনা করা যায়।

সৈষা প্রথমা।

অগ্ন আয়াহি বীতয়ে গৃণানোহব্যদাতয়ে।

নিহোতা সৎসির্বর্হিষি॥ ১॥

হে অগ্নে!=অঙ্গনাদি-গুণবিশিষ্ট!

আয়াহি=অস্মদ্ যজ্ঞং প্রত্যাগচ্ছ=আমাদের যজ্ঞে আইস।

বীতয়ে=হবিষাং চরু পুরোডাশাদীনাং ভক্ষণায়=ঘৃত ও চরু আদি ভক্ষণ জন্য।

গৃণানঃ—অস্মাভিঃ স্তূয়মান আমাদের দ্বারা স্তূয়মান হইয়া।

হব্যদাতয়ে—দেবেভ্যোহবিঃ প্রদানায়—দেবতা সকলকে ঘৃত প্রদান জন্য।

হোতা—দেবানামাহ্বাতা সন্—দেবতা সকলের আহ্বানকর্ত্তা হইয়া।

বর্হিষি—আস্তীর্ণে দর্ভে—পাতিত কুশাসনে।

নিষৎসি—নিষীদ—উপবেসন কর।

হে অগ্নি! তুমি আমাদের দ্বারা স্তুত হইয়া যজ্ঞ সম্বন্ধীয় চরু পুরোডাশাদি ভক্ষণ জন্য ও অন্যান্য দেবতাগণকে দিবার জন্য আমাদের যজ্ঞে আগমন কর। আসিয়া দেবতা সকলের আহ্বানকর্ত্তা হইয়া এই পাতিত কুশাসনে উপবেসন কর॥ ১॥

ত্বমগ্নে ইত্যস্যা ঋষ্যাদ্যাঃ পূর্ব্ববৎ।

"ত্বমগ্নে" এই ঋকের ঋষি আদি পূর্ব্ববৎ।

সৈষা দ্বিতীয়া।

ত্বমগ্নে যজ্ঞানাং হোতা বিশ্বেষাং হিতঃ।

দেবেভির্মানুষে জনে॥ ২॥

হে অগ্নে! হে অগ্নি!

ত্বং—তুমি।

বিশ্বেষাং যজ্ঞানাং—অগ্নিষ্টোমদীনাং—অগ্নিষ্টোমাদি যজ্ঞ সকলের।

হোতা—হোমনিষ্পাদনশীলঃ—হোমনিষ্পন্নকারী।

মানুষে—মনোরপত্যভূতে যজমান লক্ষণে—যজমান লক্ষণ মানব সকলে।

দেবেভিঃ—দৈবৈঃ—দ্যবনশীলৈ ঋত্বিভিঃ—দীপ্তিশালী ঋত্বিকগণদ্বারা।

হিতঃ—নিহিতঃ গার্হপত্যাদিরূপে সংস্থাপিতো ভবসি—গার্হপত্যাদিরূপে স্থাপিত হও।

হে অগ্নি! অগ্নিষ্টোমাদি সমুদায় যজ্ঞের হোতা কারণ তুমি মানবগণের জন্য দীপ্তিশীল ঋত্বিক্‌গণ (১) দ্বারা স্থাপিত হইয়াছ॥ ২॥

অগ্নিন্দূতমিত্যেষা কন্বপুত্রেণ মেধাতিথিনাদৃষ্টা ছন্দোদেবতে পূর্ব্ববৎ।

সৈষা তৃতীয়া।

অগ্নিন্দূতং বৃণীমহে হোতারং বিশ্ববেদসম্।

অস্য যজ্ঞস্য সুক্রতুম্॥ ৩॥

দূতম্—দেবানাং দৌত্যে বিনিযুক্তং—দেবতাদিগের দৌত্যকার্য্যে নিযুক্ত।

অগ্নিং—অগ্নিদেবকে।

বৃণীমহে—স্তুতিভির্হবির্ভিঃ সম্ভজামহে—স্তুতিদ্বারা ও ঘৃতদ্বারা আরাধনা করি।

হোতারং—সাধুদেবানামাহ্বাতারং—সাধু ও দেবতাদিগের আহ্বানকারী।

(১) ঋত্বিক = পুরোহিত।

যজ্ঞে প্রধান পুরোহিত চারিজন। হোতা, অধ্বর্য্যু, ব্রহ্মা এবং উদ্গাতা। এই চারিজন পুরোহিতের অধীনে তিনটি তিনটি আরও বারটি ঋত্বিক্ আছেন।

হোতার অধীনে তিনটী যথা:—মৈত্রাবরুণ, অচ্ছাবাক ও গ্রাবস্তুৎ।

অধ্বর্য্যুর " " " —প্রতিপ্রস্থাতা, নেষ্টা ও উন্নেতা।

ব্রহ্মার " " " —ব্রাহ্মণাচ্ছংসী, অগ্নীধ্র ও পোতা।

উদ্গাতার " " " প্রস্তোতা, প্রতিহর্ত্তা ও সুব্রহ্মণ্য

বিশ্ববেদসং—বিশ্বানি বেত্তীতি বিশ্ববেদাঃ তং—বিশ্ববেত্তাকে।

অস্য—প্রবর্ত্তমানস্য যজ্ঞস্য—এই প্রবর্ত্তমান যজ্ঞের।

সুক্রতুম্—নিষ্পাদকত্বেন শোভনকর্ম্মাণং—নিষ্পাদনজন্য শোভনকর্ম্মাকে।

এই প্রবর্ত্তমান যজ্ঞের নিষ্পাদনকারী দেবতাদিগের দৌত্যকার্য্যে নিযুক্ত দেবতাদিগের হোতা বিশ্ববেত্তা অগ্নিদেবকে স্তুতি ও ঘৃতদ্বারা আরাধনা করিতেছি।

অগ্নির্বৃত্রাণীত্যেষা ভরদ্বাজেন দৃষ্টা
ছন্দোদেবতে পূর্ব্ববৎ।

সৈষা চতুর্থী।

অগ্নির্বৃত্রাণি জঙ্ঘনদ্ দ্রবিণস্যুর্বিপন্যয়া।
সমিদ্ধঃ শুক্র আহুতঃ॥ ৪॥

দ্রবিণস্যুঃ—দ্রবিণং ধনং স্তোতৃণামিচ্ছন্—স্তোতাদিগের ধন ইচ্ছা করিয়া অথবা হবির্লক্ষণং ধনং তদাত্মন ইচ্ছন্নগ্নিঃ—অগ্নি হবিরূপ ধনাভিলাষী হইয়া।

বিপন্যয়া—অস্মাভিঃ ক্রিয়মাণয়া স্তুত্যা—আমাদিগের ক্রিয়মাণ স্তুতিদ্বারা (স্তূয়মান হইয়া)।

বৃত্রাণি—(বলেন) জগতামাবরকাণি রক্ষপ্রভৃতীনি তমাংসি বা (বলদ্বারা) জগতের আবরক রক্ষপ্রভৃতি অথবা তম।

জঙ্ঘনৎ—ভৃশং হন্ত—একবারে নষ্ট কর।

সমিদ্ধঃ—সমিদাদিভির্হবির্ভিঃ সম্যগ্দীপিতঃ—সমিৎ কাষ্ঠদ্বারা অথবা হবির্দ্বারা সম্যক্‌রূপে দীপিত।

শুক্রঃ দীপ্যমানঃ—দীপ্তিশালী।

আহুতঃ—হবির্দ্বারা আহুত।

যিনি সমিৎ কাষ্ঠদ্বারা সম্যগ্দীপ্ত ও হবির্দ্বারা আহুত অতএব অত্যন্ত দীপ্তিশালী সেই অগ্নিদেব হবিরূপ ধনাভিলাষী হইয়া আমাদের দ্বারা স্তুত হইয়া বৃত্র (১) সকলকে একবারেই নাশ করুন॥ ৪॥

প্রেষ্ঠং ব ইত্যেষা উশনসা দৃষ্টা
ছন্দোদেবতে পূর্ব্ববৎ।

সৈষা পঞ্চমী।

প্রেষ্ঠং বো অতিথিং স্তুষে মিত্রমিব প্রিয়ম্।
অগ্নে রথং ন বেদ্যম্॥ ৫॥

হে অগ্নে!

বঃ (২)—আপনাকে।

স্তুষে—স্তৌমি—স্তব করি। [আমি উসনা]

প্রেষ্ঠং—স্তোতৃণামস্মাকং ধনদানেন প্রিয়তমম্—স্তোতাদিগের ধনদ্বারা প্রিয়তম।

অতিথিং—সর্ব্বৈরতিথিবৎ পূজ্যং—সকলের দ্বারা অতিথির ন্যায় পূজ্য।

প্রিয়ং—স্তোতুঃ প্রীণনকরঃ—স্তোতার প্রীণনকর।

রথং ন—রথমিব—রথের ন্যায়। [যথা রথেন ধনং লভন্তে তদ্বৎ স্তোতারো অনেন ধনং লভন্তে তাদৃশ ধনলাভকারণং—যেরূপ রথের দ্বারা ধনলাভ করা যায় সেইরূপ স্তোতাগণ অগ্নিদ্বারা ধনলাভ করে তাদৃশ ধনলাভ কারণ]

বেদ্যং—বেদোধনং ধনহিতং লাভহেতুং—ধনলাভহেতু।

হে অগ্নি! আপনি আমাদিগের অতিথির

(১) বৃত্র শব্দে বৃত্রাসুর অথবা যাহারা বলপূর্ব্বক জগতের অর্থাৎ জীবগণের আবরণ করে অর্থাৎ কামক্রোধাদি জ্ঞানাবরণকারী রাজসিক ও তামসিক গুণবৃত্তি আছে তাহাদিগকে বৃত্ত কহে এরূপ অর্থ ও করিতে পারা যায়।

(২) বঃ শব্দ গৌরবে বহুবচন যথা—
"একবচনং ন প্রযুঞ্জীত গুর্ব্বাত্মনীশ্বরে"।
গুরু, আত্মা ও ঈশ্বরে একবচন প্রয়োগ করিবে না।

ন্যায় পূজ্য, বন্ধুর ন্যায় প্রিয় ও রথের ন্যায় (২) ধনলাভের হেতু, আপনাকে স্তব করিতেছি।

ত্বং ন ইত্যেষা সুনীতি পুরুমীঢাভ্যাং তয়োরন্যতরেণ বা দৃষ্টা

ছন্দোদেবতে পূর্ব্ববৎ।

সৈষা ষষ্ঠী।

ত্বং নো অগ্নে মহোভিঃ পাহি বিশ্বস্যা অরাতেঃ। উত দ্বিষো মর্ত্যস্য ॥ ৬ ॥

হে অগ্নে!

ত্বং—তুমি

নঃ—অস্মান্—আমাদিবকে।

মহোভিঃ—পূজাভিঃ মহদ্ভির্ধনৈর্ব্বা—পূজা দ্বারা অথবা অনেক ধনদ্বারা।

পাহি—রক্ষ—রক্ষা কর।

বিশ্বস্যাঃ—বহুবিধাৎ—বহুবিধ।

অরাতেঃ—অদাতু সকাশাৎ অদানাৎ পাহি—অদাতার নিকট হইতে অথবা অদানের নিকট হইতে রক্ষা কর।

উত—অপিচ—আরও।

দ্বিষঃ—দ্বেষ্টুঃ—দ্বেষ্টার।

মর্ত্যস্য—মর্ত্ত্য সকাশাৎ পাহি (অস্মভ্যং বলং দত্বা)—(আমাদিগকে বল দিয়া) মনুষ্য সকলের নিকট হইতে রক্ষা কর।

হে অগ্নি! তুমি আমাদিগকে প্রচুর ধন-দান করিয়া বহুবিধ অদাতার নিকট হইতে রক্ষা কর ও মর্ত্তলোকের বিদ্বেষভাব হইতেও রক্ষা কর (৩)।

এহ্যূষিত্যেষা ভরদ্বাজেন দৃষ্টা

ছন্দোদেবতে পূর্ব্ববৎ।

সৈষা সপ্তমী।

এহ্যূষু ব্রবাণি তেগ্ন ইত্থেতরা গিরঃ। এভির্ব্বর্দ্ধাস ইন্দুভিঃ ॥ ৭ ॥

হে অগ্নে!

এহি—আগচ্ছ—এস।

তে—তুভ্যং ত্বদর্থং—তোমাকে অথবা তোমার জন্য।

গিরঃ—স্তুতীঃ—স্তুতি।

ইত্থা—ইত্থমনেন প্রকারেণ—এই প্রকারে।

সু—সুষ্ঠু—উত্তম।

ব্রবাণি—ইত্যাশংসতে—এই আশা করিতেছি [তাঃ স্তুতিঃ শৃণ্বিত্যর্থ—সেই সকল স্তুতি শ্রবণ কর]

উ—ইত্যেতাঃ—এই সকল।

ইতরাঃ—অসুরৈঃ কৃতাঃ স্তুতীঃ শৃণ্বিতি শেষঃ—অসুর সকলদ্বারা কৃত (স্তুতি ও শ্রবণ কর) অথবা অন্যান্য স্তুতি শ্রবণ কর।

এভিঃ—এতৈঃ—এইগুলি।

ইন্দুভিঃ—সোমৈঃ—সোমদ্বারা।

বর্দ্ধসি—বর্দ্ধস্ব—বর্দ্ধিত হও।

হে অগ্নি! তোমার জন্য আমরা স্তুতিগুলি এইপ্রকারে উত্তমরূপে বলিব এরূপ আশা করি তজ্জন্য আইস ও সেই স্তুতি সকল শ্রবণ কর ও

(২) যেরূপ রথ আমাদিগকে ধন আনিয়া দেয় ও পরিবর্ত্তে আমাদিগের নিকট কোন দ্রব্য যাচ্ঞা করে না তদ্রূপ অগ্নিও আমাদিগের নিকট কোন প্রত্যুপকার যাচ্ঞা করে না বরং হতশেষে নির্ব্বাণ হইয়া থাকে।

ধন এখানে মুক্তিধনও বুঝাইতে পারে। অগ্নি-বিবেকাত্মক সাত্বিক জ্ঞানাগ্নি। জ্ঞানাগ্নি ও রথের ন্যায় আমাদিগকে মুক্তিধন দান করিয়া নিবৃত্ত হয়।

(৩) মর্ত্তবাসীগণের স্বভাবসিদ্ধগুণ এই যে অন্যের উন্নতি দেখিলে মনে বিদ্বেষভাব জন্মে। তজ্জন্য যেমন আমাদিগকে প্রচুর ধনদান করিবে তেমনি আমাদিগকে বিদ্বেষভাব হইতে পৃথক করিয়া দিবে। নচেৎ আমরা তোমারই বিপুল ধনশালী হইয়া বিদ্বেষবশতঃ পরস্পর শত্রু হইয়া উঠিব।

অন্যান্য স্তবও শ্রবণ কর ও অস্মদ্দত্ত সোমগুলি দ্বারা বর্দ্ধিত হও।

আতে বৎস ইত্যেষা কণ্বগোত্রেণ বৎসেন দৃষ্টা ছন্দোদেবতে পূর্ব্ববৎ।

সৈষা অষ্টমী।

আ তে বৎসো মনোয়মৎ পরমাচ্চিৎ সধস্থাৎ।
অগ্নে ত্বাঙ্ কাময়ে গিরা ॥ ৮ ॥

বৎসঃ—এতন্নাম্না ঋষিঃ—এই নামে ঋষি কারণ এই ঋকের প্রয়োগ ফল কণ্বগোত্রসম্ভূত বৎসনামে ঋষি দর্শন করিয়া শিষ্যকে উপদেশ দিয়াছিলেন ইহা এই ঋক্ প্রারম্ভেই কথিত হইয়াছে।

তে—তব—তোমার।

মনঃ—মনকে।

পরমাচ্চিৎ—উৎকৃষ্টাদপি—উৎকৃষ্ট হইতে (এখানে উৎকৃষ্ট)।

সধস্থাৎ—সহস্থানাৎ (১)—দ্যুলোকাৎ—স্বর্গ হইতে।

আযমৎ—আযময়তি—আকর্ষণ করিতেছে।

গিরা—স্তুত্যা—স্তুতিদ্বারা।

শিষ্টং—প্রত্যক্ষকৃতং—প্রত্যক্ষকৃত [ঋক্ ত্রিবিধ যথা প্রত্যক্ষকৃত, পরোক্ষকৃত ও আধ্যাত্মিক]

হে অগ্নে!

ত্বাং—তোমাকে।

কাময়ে—ত্বদীয় মনোময্যেব নিযচ্ছামীতি প্রার্থয়ে—তোমার মন আমাতে যেন নিবদ্ধ হয় এই প্রার্থনা করি।

বৎস ঋষি উৎকৃষ্ট স্বর্গ হইতে তোমার মন আকর্ষণ করিতেছে। তজ্জন্য হে অগ্নি! আমি কামনা করি যে তোমার মন যেন আমাতে প্রত্যক্ষরূপে নিবদ্ধ হয়।

ত্বামগ্ন ইত্যেষা ভরদ্বাজেন দৃষ্টা ছন্দোদেবতে পূর্ব্ববৎ।

সৈষা নবমী।

ত্বামগ্নে পুষ্করাদধ্যথর্ব্বানিরমন্থত।
মূর্দ্ধ্নো বিশ্বস্য বাঘতঃ ॥ ৯ ॥

হে অগ্নে!

অথর্ব্বা—এতৎ সংজ্ঞ ঋষিঃ—এই নামে ঋষি।

ত্বাং—তোমাকে।

পুষ্করাদধি—পুষ্করে (১)—পুষ্করপর্ণে—পুষ্করপর্ণপ্রদেশে।

নিরমন্থত—অরণ্যোঃ সকাশাদজনয়ৎ—কাষ্ঠ হইতে উৎপন্ন করিয়া ছিলেন।

মূর্দ্ধ্নঃ—মূর্দ্ধাবদ্ধারকাৎ—মস্তকের ন্যায় সকলের ধারণ কর্ত্তা।

বিশ্বস্য—সর্ব্বস্য জগতঃ—সমুদায় জগতের

বাঘতঃ—বাহকাৎ—বাহক হইতে (অর্থাৎ) বাহক।

যেরূপ মস্তক সমুদায় শরীরের আধার স্বরূপ তদ্রূপ পুষ্করপর্ণ প্রদেশও সমুদায় জগতের আধার ও বাহনস্বরূপ। হে অগ্নি! অথর্ব্বা ঋষিও তোমাকে সেই পুষ্করপর্ণ প্রদেশে কাষ্ঠ সংঘর্ষণে আবির্ভূত করিয়াছিলেন ॥ ৯ ॥

অগ্ন ইত্যেষা বামদেবেন দৃষ্টা ছন্দোদেবতে পূর্ব্ববৎ।

সৈষা দশমী।

অগ্নে বিবস্বদাভরাস্মভ্যমূতয়ে মহে।
দেবোহ্যসিনোদৃশে ॥ ১০ ॥

হে অগ্নে!—হে অগ্নি!

(১) সহতিষ্ঠন্তি যত্র দেবাঃ সঃ সধস্থঃ স্বর্গঃ—যে স্থানে দেবতা সকল একত্রে থাকেন তাহাকে স্বর্গ বলে।

(১) পুষ্করপর্ণে হি প্রজাপতি ভূমিপ্রথয়ৎ তৎ পুষ্করপর্ণে প্রথয়ৎ ইতি শ্রুতেঃ।

অস্মভ্যং—অস্মাকং—আমাদিগকে।

মহে উতয়ে—মহতে রক্ষণায়—উত্তমরূপে রক্ষা করিবার জন্য।

বিশ্বরূৎ—স্বর্গাদি লোকেষু বিশেষেণ নিবাসস্য হেতু ভূতমিদং কর্ম্ম—স্বর্গাদি লোকেষু বিশেষরূপে বাসের হেতুভূত এই কর্ম্ম।

আভর—সম্পাদয়—সম্পন্ন কর।

হি—যস্মাৎ—যেহেতু।

নঃ—অস্মাকং—আমাদিগের।

দৃশে—দর্শনার্থং—দর্শন জন্য।

দেবঃ—দ্যোতমানঃ—উজ্জ্বল।

অসি—হও।

[ইন্দ্রাদয়ো নাস্মাভির্দৃশ্যন্তে ত্বং তু গার্হপত্যাদি দেশে অতি দ্যোতমানঃ প্রত্যক্ষেণ দৃশ্যসে তস্মাৎ ত্বাং বিশেষেণ প্রার্থয়ামহে ইত্যাভিপ্রায়ঃ—ইন্দ্রাদি দেবতাগণকে আমরা দেখিতে পাই না কিন্তু তুমি গার্হপত্যাদি দেশে অত্যন্ত দীপ্তিশালী হইয়া আমাদিগকে প্রত্যক্ষভাবে দর্শন দাও তজ্জন্য তোমাকে বিশেষ করিয়া প্রার্থনা করিতেছি এই অভিপ্রায়।]

হে অগ্নি! তুমি আমাদিগকে উত্তমরূপে রক্ষা করিবার জন্য স্বর্গাদি বাসের হেতু ভূত যে এই কর্ম্ম তাহা সম্পন্ন করিয়া দাও যেহেতু তুমি আমাদিগকে দর্শন দিবার জন্য দীপ্তিশালী রহিয়াছে ॥ ১০ ॥ ক্রমশঃ—

ইতি শ্রীসামবেদসংহিতায়াং প্রথমাধ্যায়স্য প্রথমখণ্ডঃ।

শ্রীবিধুভূষণ দেব।

মণিরত্নমালা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

মূল- -১৪।

মহাশূরান্ শূরতমোঽস্তি কো বা,
মনোজবাণৈর্ব্ব্যথিতো ন যস্তু।
প্রাজ্ঞোঽতিধীরশ্চ সমশ্চ কো বা,
প্রাপ্তো ন মোহং ললনাকটাক্ষৈঃ॥

শিষ্য জিজ্ঞাসা করিলেন (৪০) কোন ব্যক্তি সর্ব্বাপেক্ষা পরাক্রমশালী শূর (বীর)? গুরু উত্তর করিলেন যিনি কন্দর্পশরে ব্যথিত হন না তাঁহাকেই শূরবরাগ্রগণ্য বলিয়া জানিবে। কামোৎপত্তি সম্বন্ধে ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে এইরূপ লিখিত হইয়াছে :—

আবির্বভূব তৎপশ্চাৎ কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ।
মানসাচ্চ পুমানেকস্তপ্তকাঞ্চনসন্নিভঃ॥
মনোমথ্নাতি সর্ব্বেষাং পঞ্চবাণেন কামিনাম্।
তন্নাম মন্মথস্তেন প্রবদন্তি মনীষিণঃ॥
বাণাংশ্চিক্ষেপ সর্ব্বাংশ্চ কামো বাণপরীক্ষয়া।
সদ্যঃ সর্ব্বে সকামাশ্চ বভূবুরীশ্বরেচ্ছয়া॥

তাহার পর পরমাত্মরূপী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের মানস হইতে তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভ পরম সুন্দর এক পুরুষ আবির্ভূত হইলেন (শ্রীকৃষ্ণের মন হইতে উৎপন্ন বলিয়া ইহাঁর নাম মনসিজ বা মনোজ) ইনি পঞ্চশরদ্বারা কামিগণের মনকে মথিত করেন বলিয়া পণ্ডিতেরা ইহাঁর "মন্মথ" এই আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। ভগবানের ইচ্ছানুসারে কাম স্বীয় শরসমূহের প্রভাব পরীক্ষা

করিবার নিমিত্ত তাহাদিগকে নিক্ষেপ করিলেন তৎপ্রভাবে সকলেই তৎক্ষণাৎ সকাম হইয়াছিল

কামের পঞ্চবাণ।

"সম্মোহনোন্মাদনৌ চ শোষণস্তাপনস্তথা।
স্তম্ভনশ্চেতি কামস্য পঞ্চবাণাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ"॥
অথবা—"অরবিন্দমশোকঞ্চ চূতঞ্চ নবমল্লিকা।
রক্তোৎপলঞ্চ পঞ্চৈতে পঞ্চবাণস্য সায়কাঃ"॥

সম্মোহন, উন্মাদন, শোষণ, তাপন ও স্তম্ভন কামের এই পঞ্চশর এবং অরবিন্দ, অশোক, চূত, নবমল্লিকা এবং রক্তোৎপল এই পঞ্চপুষ্প ও কামদেবের পঞ্চবাণ বলিয়া আখ্যাত হয়।

কামবাণের প্রভাব।

বৃত্রহন্তা দেবেন্দ্র বাসবের প্রতি কন্দর্পের উক্তিঃ—
বজ্রং তব সুরাধীশ যৎকার্য্যং ন করিষ্যতি।
তৎ করিষ্যামি পুষ্পাস্ত্রৈঃ সর্ব্বাসুর বিমোহনম্॥
(শিবপুরাণ)

হে সুরেশ্বর! আপনার বজ্র যে কার্য্য সাধন করিতে না পারিবে আমি আমার এই পুষ্পাস্ত্রদ্বারা অসুরগণের মোহজনক সেই কার্য্য সম্পাদন করিতে পারিব।

রতির প্রতি কামদেবের উক্তি :—
"শ্রমোমদ্বাণানাং ক ইহ ভুবনোন্মাদবিধিষু"।
(প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক)

ত্রিভুবনের উন্মত্ততা জনন ব্যাপারে আমার বাণ সকলের শ্রম কি? ইহাদ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে মনোজবাণের প্রতাপ অতুল এবং শক্তি অপ্রতিহত। উহা অতি সহজেই ত্রিভুবনের প্রাণিবৃন্দকে বিমোহিত, বিচলিত এবং উন্মত্ত করিতে পারে। পুরাণেতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায় যে স্মরশরপ্রভাবে কত দেবতার, কত মহাবল পরাক্রান্ত বিশ্ববিজয়ী বীরের এবং দীর্ঘকালব্যাপি কঠোর সাধন নিরত কত তপস্বীর ধৈর্য্যচ্যুতি সংঘটিত হইয়াছে।

"ইন্দ্রিয় গ্রাহ্যপদার্থসমূহ লাভ করিবার জন্য মনে যে তীব্র ইচ্ছার উদয় হয় সেই ইচ্ছার নাম কাম। কামপূরণের জন্য কোন প্রকার বাধা উপস্থিত হইলে মনে যে শান্তিনাশিনী উত্তেজনা হয় তাহাকেই ক্রোধ কহে। এই দুইটি বৃত্তির বেগ নিতান্ত দুর্নিবার্য্য ও জ্ঞানলাভের প্রতিকূল। ইন্দ্রিয়শক্তিতে সঞ্চারিত হইবার পূর্ব্বেই যিনি এই দুর্নিবার্য্য ও বিবেকবিধ্বংসী বেগ সম্বরণ করিতে পারেন অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াভিমুখী গতিকে আত্মার দিকে ফিরাইয়া দিতে পারেন" আধ্যাত্মিক বলে বলীয়ান্ সেই মহাপুরুষই ধন্য এবং তিনিই প্রকৃত শূরপদবাচ্য। যিনি মন প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণকে বশীভূত করিয়া জিতেন্দ্রিয় হইয়াছেন তিনিই উক্ত প্রকার শূরত্বলাভ করেন।

শূরের লক্ষণ।

"উৎসাহী যুধি শূরোঽস্ত্রপ্রয়োগে চ বিচক্ষণঃ।"
(ভক্তিরসামৃতসিন্ধু)

সমিতৌ স্বাত্মকার্য্যে বা স্বামিকার্য্যে তথৈব চ।
ত্যক্ত্বা প্রাণভয়ং যুধ্যেৎ স শূরস্ত্ববিশঙ্কিতঃ॥
(শুক্রনীতি)

যুদ্ধে উৎসাহী এবং অস্ত্রপ্রয়োগে নিপুণ ব্যক্তিই শূর। যে ব্যক্তি সভাতে, যুদ্ধে, আত্মকার্য্যে এবং প্রভুর কার্য্যে প্রাণের ভয় পরিত্যাগ করিয়া নিঃশঙ্কভাবে সংগ্রাম করেন তিনিই শূর। মহর্ষি দক্ষ বলিয়াছেন :—
বলেন পররাষ্ট্রাণি গৃহ্ণন্ শূরস্ত নোচ্যতে।
জিতো যেনেন্দ্রিয়গ্রামঃ স শূরঃ কথ্যতে বুধৈঃ॥
(দক্ষসংহিতা)

বলপূর্ব্বক পররাজ্য গ্রহণ করিলেই বীর বলিয়া খ্যাতি হয় না। যে ব্যক্তি ইন্দ্রিয়সমূহ জয় করিয়াছেন পণ্ডিতগণ তাঁহাকেই যথার্থ বীর বলিয়া থাকেন।

ভগবান্ বলিয়াছেন ঃ—

শক্নোতীহৈব যঃ সোঢ়ুং প্রাক্‌শরীরবিমোক্ষণাৎ।
কামক্রোধোদ্ভবং বেগং স যুক্তঃ স সুখী নরঃ॥
(গীতা)

যিনি দেহত্যাগ করিবার পূর্ব্বেই কামক্রোধ হইতে উৎপন্ন ইন্দ্রিয়বিক্ষোভকারী বেগকে তাহার উৎপত্তি মাত্রেই প্রতিরোধ করিতে সমর্থ হয়েন, তিনিই সমাহিত এবং তিনিই সুখী। অতএব যে ব্যক্তি প্রকৃত শূরত্বলাভ করিতে ইচ্ছা করেন, শাশ্বতী শান্তিভোগের বাসনা যিনি হৃদয়ে পোষণ করেন এবং চিত্তের চাঞ্চল্যশূন্য, ক্ষোভশূন্য ও বিকারশূন্য অবস্থা প্রাপ্ত হইতে অভিলাষ করেন তিনি যমনিয়মাদি বিধিবৎ পালনপূর্ব্বক আধ্যাত্মিক শক্তিসঞ্চয় এবং সেই সঞ্চিতশক্তিকে দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে প্রযত্নপরায়ণ হইবেন। আধ্যাত্মিক শক্তিশালী বীরপুরুষকে কামবাণ বা কামাদির বেগ কদাপি ব্যথিত ও বিচলিত করিতে পারে না।

(৪১) প্রকৃষ্টজ্ঞানী, অতিধীর এবং সমদর্শী কাহাকে কহা যায়? যে ব্যক্তি কামিনীকটাক্ষে মোহপ্রাপ্ত না হন তিনিই পণ্ডিত, ধীর ও সমদর্শী।

(ক) প্রাজ্ঞ—বশেহি যস্যেন্দ্রিয়াণি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা। (গীতা)

যাঁহার ইন্দ্রিয়গণ বশীভূত হইয়াছে তাঁহারই প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা অর্থাৎ তিনিই স্থিতপ্রজ্ঞ।

(খ) ধীর—বিকারহেতাবপি বিক্রিয়ন্তে যেষাং ন চেতাংসিত এব ধীরাঃ। (কবিবাক্য)

চিত্তবিকারের হেতুভূতপদার্থ সকল বিদ্যমান থাকিলেও যাঁহাদিগের চিত্তবিকার প্রাপ্ত না হয় তাঁহারাই ধীর।

(গ) সম—রাগদ্বেষ (১) বিমুক্তো যঃ সমঃ স কথিতোবুধৈঃ। (ভক্তিরসামৃতসিন্ধু)

"যিনি রাগ দ্বেষশূন্য, পণ্ডিতগণ তাহাকেই" সম কহিয়া থাকেন।

জগতে মানবগণের মনকে বিকৃত করিবার জন্য যতপ্রকার সামগ্রী আছে তন্মধ্যে রমণী-কটাক্ষ সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। সে কটাক্ষপ্রভাবে কত মহা মহা বীরের অত্যুগ্র তেজোবীর্য্য নিষ্প্রভ হইয়াছে, কত সংযমীর সংযম টুটিয়াছে, কত যোগী ব্রহ্মচারীর ব্রহ্মচর্য্য ও যোগ নষ্ট হইয়াছে, কত মহা ধৈর্য্যশালী বিবেকবান্ মহাত্মাগণের ধৈর্য্যনাশ ও বিবেকভ্রংশ ঘটিয়াছে তাহার ইওত্তা নাই। (১) সমুদ্রমন্থনকালে মোহিনীসন্দর্শনে মহেশেরও মোহ প্রাপ্তি ঘটিয়াছিল।

ললনা কটাক্ষের প্রভাব।

মদনদেব হরধ্যান ভঙ্গ করিবার পূর্ব্বে ইন্দ্রকে বলিয়াছিলেন ঃ—

অসম্মতঃ কস্তবেন্দ্র মুক্তিমার্গমপেক্ষতে।
তং সুন্দরীকটাক্ষৈস্তু বধ্নাম্যাজ্ঞাপয়স্বমে॥
(শিবপুরাণ)

এবং রতিকে বলিয়াছিলেন ঃ—

প্রভবতিমনসি বিবেকোবিদুষামপি শাস্ত্রসম্ভবস্তাবৎ। নিপতন্তি দৃষ্টিবিশিখাযাবন্নেন্দীবরাক্ষীণাম্॥ (প্রবোধ চন্দ্রোদয়)

যোগবাশিষ্ঠে—অনুরক্তাঙ্গনালোললোচনালোকিতাকৃতেঃ। স্বস্থীকর্ত্তুং মনঃশক্তো ন বিবেকো মহানপি

হে দেবরাজ! আপনার ইচ্ছার বিরুদ্ধে

(১) সুখানুশয়ী রাগঃ,—দুঃখানুশয়ী দ্বেষঃ—সুখভোগের ইচ্ছার নাম রাগ এবং দুঃখের প্রতি অনিচ্ছার নাম দ্বেষ।

(১) বিশ্বামিত্র পরাশর প্রভৃতয়ো বাতাম্বুপর্ণাশনা স্তেহপি স্ত্রীমুখপঙ্কজং সুললিতং দৃষ্ট্বৈব মোহংগতাঃ। শাল্যন্নং সঘৃতং পয়োদধিযুতং যে ভুঞ্জতে মানবা, স্তেষামিন্দ্রিয়নিগ্রহো যদি ভবেদ্বিন্ধ্যস্তরেৎসাগরম্। কবিবাক্য

কোন্ ব্যক্তি মোক্ষমার্গ আশ্রয় করিয়াছে? যদ্যপি কেহ করিয়াই থাকে তবে আমাকে আদেশ করুন এখনই আমি তাহাকে সুন্দরীরমণীর কটাক্ষপাশদ্বারা বন্ধন করি। শাস্ত্রানুশীলনজনিত বিবেক তাবৎকাল পর্য্যন্ত পণ্ডিতব্যক্তিগণের চিত্তে আধিপত্য করে যাবৎ-কালপর্য্যন্ত নীলোৎপলনয়না ললনাদের নয়নবাণ তাহাতে নিপতিত না হয়। অনুরাগবতী বরাঙ্গনা চঞ্চলনেত্রে যে ব্যক্তির প্রতি দৃষ্টিপাত করে মহাবিবেকবান্ হইলেও সেই ব্যক্তির বিকার প্রাপ্ত মনকে তাঁহার বিবেক প্রকৃতিস্থ করিতে পারে না। শান্তিশতককার এই নিমিত্ত শ্রেয়োলাভার্থী মানবকে রমণীসংসর্গ হইতে দূরে থাকিতে উপদেশ দিয়াছেন।

"শৃণু হৃদয়রহস্যং যৎ প্রশস্তং মুনীনাং ন খলু ন খলু যোষিৎ সন্নিধিঃ সংবিধেয়ঃ। হরতিহি হরিণাক্ষী ক্ষিপ্রমক্ষিক্ষুরপ্রৈঃ পিশিতশতত্নুত্রং চিত্তমপ্যুত্তমানাম্॥ (শান্তিশতক)

মুনিগণের অভিপ্রায় শ্রবণ কর তাঁহারা বলেন স্ত্রীলোকের সন্নিধানে অবস্থান করা কখনই কর্ত্তব্য নহে; কারণ মৃগনয়না অঙ্গনা সম্মোহন নয়নবাণদ্বারা অতি শীঘ্র প্রচুর মাংসরূপ আবরণে আবৃত সাধুগণের চিত্তকেও বিদ্ধ করিয়া থাকে। তাই ভুবনচাঞ্চল্যবিধায়িনী রমণীর অশেষ দোষাকর কটাক্ষপাতেও যিনি স্বস্থ ও নির্ব্বিকার থাকিতে পারেন তাঁহাকেই জ্ঞানী, ধীর ও সমদর্শী বলিয়া আচার্য্য উল্লেখ করিলেন। ইন্দ্রলোকে অর্জ্জুন সর্ব্বলোকললামভূতা সকামা উর্ব্বশীকে প্রত্যাখ্যান করিয়া আপনার প্রাজ্ঞত্ব, ধীরত্ব ও সমদর্শিত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন।

(মহাভারত বনপর্ব্ব ১৪৬ অধ্যায়)

মূল—১৫।

বিষাদ্বিষং কিং বিষয়াঃ সমস্তাঃ দুঃখী সদা কো বিষয়ানুরাগী। ধন্যোঽস্তু কো যস্তু পরোপকারী কঃ পূজনীয়ো ননুতত্ত্বনিষ্ঠঃ॥

শিষ্য প্রশ্ন করিলেন (৪২) 'সর্পবিষ অপেক্ষাও তীব্রতর বিষ কি? গুরু উত্তর করিলেন বিষয় সকল। কারণঃ—

দোষেণ তীব্রোবিষয়ঃ কৃষ্ণসর্পবিষাদপি।
বিষং নিহন্তি ভোক্তারং দ্রষ্টারং চক্ষুষাপ্যয়ম্॥
(বিবেকচূড়ামণি)

বিষং বিষয়বৈষম্যং ন বিষং বিষমুচ্যতে।
জন্মান্তরঘ্নাবিষয়া একদেশহরং বিষম্॥
(যোগবাশিষ্ঠ)

বিষয় কৃষ্ণসর্পের বিষ অপেক্ষাও অতিশয় তীব্র, কারণ সর্পবিষ যে ভক্ষণ করে তাহার মৃত্যু হয় কিন্তু বিষয়বিষ যে দর্শন করে তাহারই মৃত্যু ঘটে। জ্ঞানিগণ বিষকে বিষ বলে না। তাঁহারা বিষয়ের বিষম অনর্থকারিতা দর্শনে তাহাকেই বিষ বলিয়া থাকেন। বিষ জীবের একজন্মমাত্র হরণ করে কিন্তু বিষয়বিষ জন্ম-জন্মান্তের হরণ করিয়া থাকে। শুক্রাচার্য্য বলিয়াছেন—

বিষয়—

শব্দঃ স্পর্শশ্চ রূপঞ্চ রসো গন্ধশ্চ পঞ্চমঃ।
একৈকস্তুলমেতেষাং বিনাশপ্রতিপত্তয়ে॥

শব্দ—

শুচির্দ্দর্ভাঙ্কুরাহারো বিদূরভ্রমণে ক্ষমঃ।
লুব্ধকোদ্গীতসম্মোহেন মৃগো মৃগয়তে বধম্॥

স্পর্শ—

গিরীন্দ্রশিখরাকারো লীলয়োন্মূলিতদ্রুমঃ।
করিণীস্পর্শসংমোহাৎ বন্ধনং যাতিবারণঃ॥

রূপ—

স্নিগ্ধ-দীপ-শিখা-লোক-বিলোলিতবিলোচনঃ
মৃত্যুমৃচ্ছতিসংমোহাৎ পতঙ্গঃ সহসাপতন্॥

রস—

অগাধসলিলে মগ্নো দূরেঽপি বসতো বসন্।

মীনস্তু সামিষং লোহমাস্বাদয়তি মৃত্যবে॥
গন্ধ—
উৎকর্ত্তিতুং সমর্থোঽপি গন্তুশ্চৈব স পক্ষকঃ।
দ্বিরেফো গন্ধলোভেন কমলে যাতি বন্ধনম্॥
একৈকশো বিনিঘ্নন্তি বিষয়া বিষসন্নিভাঃ।
কিং পুনঃ পঞ্চমিলিতা ন কথং নাশয়ন্তি হি
(শুক্রনীতি)

বিষয় পাঁচটিঃ—শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস এবং গন্ধ; এই পাঁচ প্রকার পদার্থের প্রত্যেকটি বিনাশের কারণ। কুশাঙ্কুরভোজী, হিংসাদি দোষ শূন্য, অতি দূর গমনে সমর্থ হরিণ ব্যাধের মধুরগীত শব্দে মুগ্ধ হইয়া বিনাশ প্রাপ্ত হয়। শৈলশৃঙ্গতুল্য মহাকায়, অবলীলাক্রমে বৃক্ষ-বৃহকে উৎপাটিত করিতে সমর্থ মহাবলশালী হস্তী হস্তিনীর অঙ্গ স্পর্শজনিত মোহে মুগ্ধ হইয়া বন্ধন প্রাপ্ত হইয়া থাকে। স্নিগ্ধদীপ-শিখার আলোক সন্দর্শনে বিমোহিত দৃষ্টি পতঙ্গ মোহবশতঃ অধীর হইয়া সেই দীপশিখায় পতিত হয় এবং পতিত হইবামাত্র প্রাণত্যাগ করে। ধীবরের অতি দূরস্থিত অতলস্পর্শ জলে বাস করিয়াও মৎস্য বড়িশ বিদ্ধ আমিষ রসে আকৃষ্ট হইয়া আপনার মৃত্যুর নিমিত্ত তাহা আস্বাদন করে। দশনদ্বারা কমলদল কর্ত্তন করিতে এবং উড়িয়া যাইতে সক্ষম হইয়াও ভ্রমর গন্ধ লোভে পদ্মের মধ্যে আবদ্ধ হয়। বিষ তুল্য এই শব্দাদি পাঁচ প্রকার বিষয়ের এক একটীই জীবের বিনাশ সাধন করিয়া থাকে। যদি একাধারে এই পাঁচটি মিলিত হয় তাহা হইলে যে বিষম সর্ব্বনাশ ঘটাইবে তাহা আর আশ্চর্য্য কি? ভগবদ্ভক্ত শ্রীধরস্বামী ও ভাগবতের টীকায় বলিয়াছেন—

পতঙ্গ-মাতঙ্গ-কুরঙ্গ-ভৃঙ্গ-মীনাহতাঃ পঞ্চভিরেব পঞ্চ। একঃ প্রমাদী সকথং ন হন্যতে যঃ সেবতে পঞ্চভিরেব পঞ্চ॥

পতঙ্গ, মাতঙ্গ, কুরঙ্গ, ভৃঙ্গ এবং মীন এই পাঁচপ্রকার প্রাণী যথাক্রমে রূপ, স্পর্শ, শব্দ, গন্ধ এবং রস এই পাঁচপ্রকার বিষয়ে নিধন-প্রাপ্ত হয়। এক একটি বিষয় যদ্যপি বিনাশের কারণ হইতে পারে তাহা হইলে যে অনবহিত অবোধ ব্যক্তি চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্ এই পঞ্চেন্দ্রিয়দ্বারা রূপরসাদি পাঁচটি বিষয়ই উপভোগ করে সে কেন না বিনষ্টহইবে? সে ব্যক্তির বিনাশ অবশ্যম্ভাবী।

আচার্য্য অন্যত্রও মুমুক্ষু শিষ্যের প্রতি উপদেশ দিয়াছেন।—

মোক্ষস্য কাঙ্ক্ষা যদি বৈ তবাস্তি
ত্যজাতিদূরাৎ বিষয়ান্ বিষং যথা।
(বিবেকচূড়ামণি)

যদ্যপি তোমার মোক্ষপদ লাভের বাসনা থাকে তাহাহইলে দূর হইতে বিষয় সকলকে বিষের ন্যায় পরিত্যাগ কর। অতএব মুমুক্ষু মানব "সঙ্গীতাদির সুমধুর শব্দে, বিলাসিনীগণের মোহনস্পর্শে, রমণীর রূপে, সুস্বাদুরসে ও সুগন্ধি দ্রব্যে এবং কামিনীকাঞ্চনাদি পদার্থে কখনই আসক্ত হইবেন না"। বিষয় অনিত্য, অসার ও বিষম অনর্থের মূল জানিয়া সারাৎসার নিত্য সত্যস্বরূপ ভগবানের আরাধনায় সর্ব্বদা অনু-রক্ত হইবেন। দেবর্ষি নারদ বলিয়াছিলেন।—

বিহায় কৃষ্ণসেবাঞ্চ পীযূষাদধিকাং প্রিয়াম্।
কো মূঢ়ো বিষমশ্নাতি বিষমং বিষয়াভিধম্॥
(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ)

পীযূষ (অমৃত) পান করিলে জীব অমরত্ব প্রাপ্ত হয়, কিন্তু দাস্যসখ্যাদিদ্বারা ভক্তবৎসল ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিলে জীব সালোক্য, সামীপ্য, সাযুজ্য ও নির্ব্বাণ মুক্তির অধিকারী হইয়া থাকে, সুতরাং অমৃত হইতেও অধিক-তর প্রিয় যে কৃষ্ণসেবা তাহা পরিত্যাগ করিয়া

কোন অবিবেকী পুরুষ বিষয় নামক বিষম বিষপান করিবে ?

ভগবান্ রামচন্দ্র বলিয়াছিলেন।—

বিষয়াশী বিষাসঙ্গ পরিজর্জ্জরচেতসাম্।
অপ্রৌঢ়াত্মবিবেকানামায়ুরায়াসকারণম্॥

বিষয়রূপ কালসর্প সংসর্গদ্বারা নিত্যজর্জ্জরিত চিত্ত এবং আত্মবিবেচনাশূন্য ব্যক্তির আয়ু কেবল শ্রমের নিমিত্ত হইয়া থাকে, অর্থাৎ ঈদৃশ ব্যক্তি পুরুষার্থ লাভে অসমর্থ হইয়া বৃথা জীবন ধারণ করে। তাই ভাগবতে বলিয়াছেন।

লব্ধ্বা সুদুর্লভমিদং বহুসম্ভবান্তে,
মানুষ্যমর্থদমনিত্যমপীহ ধীরঃ।
তূর্ণং যতেত ন পতেদনুমৃত্যুযাবৎ,
নিঃশ্রেয়সায় বিষয়ঃ খলু সর্ব্বতঃ স্যাৎ॥

বহুজন্মের পর সুদুর্লভ, অনিত্য, অথচ পুরুষার্থ প্রাপক (১) মনুষ্য জন্মলাভ করিয়া বুদ্ধিমান ব্যক্তি অবিলম্বে মৃত্যুর প্রাক্‌কাল পর্য্যন্ত আপনার মঙ্গলের নিমিত্ত (ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষলাভের জন্য) সর্ব্বদা সবিশেষ যত্ন করিবেন। বিষয়ভোগে কদাচ প্রসক্ত হইবেন না, কারণ পশ্বাদিযোনিতেও বিষয়ভোগ যথেষ্ট হইয়া থাকে। সাধকশ্রেষ্ঠ রামপ্রসাদ সেন বলিয়াছিলেন।—"আর ভুলালে ভুল্‌বোনাগো, বিষয়ে আসক্ত হয়ে, বিষের কূপে উল্‌বো নাগো, রামপ্রসাদ বলে দুধখেয়েছি, ঘোলে মিশে ঘুল্‌বো নাগো।

(৪৩) এসংসারে কোন্ ব্যক্তি সর্ব্বদা দুঃখী? যে ব্যক্তি বিষয়ানুরাগী।

সনৎকুমার নারদকে বলিয়াছিলেন।—

সুখং বৈষয়িকং শোকসহস্রেণাবৃতং স্বতঃ।
দুঃখমেবেতি মত্বাহ নাগেহস্তিসুখমিত্যসৌ॥

শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন।—

যে হি সংস্পর্শজা ভোগা দুঃখযোনয়এব তে।
আদ্যন্তবন্তঃ কৌন্তেয় ন তেষু রমতে বুধঃ॥
(গীতা)

প্রহ্লাদ বলিয়াছিলেন।—

যাবন্তঃ কুরুতে জন্তুঃ সম্বন্ধান্ মনসঃ প্রিয়ান্।
তাবন্তোঽস্য নিখন্যন্তে হৃদয়ে শোকশঙ্কবঃ॥
(বিষ্ণুপুরাণে)

বৈষয়িক সুখ সহস্র প্রকার দুঃখের দ্বারা আবৃত থাকায় সে সুখ ও দুঃখ মধ্যে পরিগণিত হয়। ইহা বিবেচনা করিয়া বলিয়াছেন যে ক্ষুদ্র বস্তুমাত্রে (বিষয়ে) সুখের লেশমাত্রও নাই। বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগে যে সুখ উৎপন্ন হয় তাহা ইহপারলৌকিক দুঃখের কারণভূত এবং অল্পকালস্থায়ী। পরমার্থ তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ তাহাতে কখন আসক্ত হয়েন না। জীব যে পরিমাণে মনের প্রিয়বস্তুর সহিত সম্বন্ধ করে অর্থাৎ আপাত রমণীয় ও সুখপ্রদ বাহ্যবিষয় ভালবাসে সেই পরিমাণে শোকরূপ শঙ্কু (কীলক) তাহার হৃদয়কে বিদ্ধ করে অর্থাৎ সেই পরিমাণে তাহাকে দুঃখভোগ করিতে হয়।

মনের তৃপ্তিতে বা সন্তোষে সুখ এবং মনের অতৃপ্তিতে দুঃখ। বিষয়ভোগে বিষয়াশা পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে, কোনরূপে প্রশমিত হয় না, সুতরাং মনও অপূর্ণ থাকে অর্থাৎ তৃপ্তিলাভ করিতে পারে না।

"বৈরাগ্যাৎ পূর্ণতামেতি মনোনাশাবশানুগম্"
(যোগবাশিষ্ঠ)

মন, বৈরাগ্যদ্বারাই পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়, আশার অনুগামীথাকিলে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় না। সুতরাং বিষয়াসক্ত ও আশার অনুগামী মন অতৃপ্তি বা অসন্তোষ নিবন্ধন চিরকাল দুঃখভোগ করে। শাশ্বত সুখভোগের অধিকারী কে তাহা ভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন :—

বিহায় কামান্ যং সর্ব্বান্ পুমাংশ্চরতি নিস্পৃহঃ।

(১) চতুরশীতি লক্ষেষু শরীরেষু শরীরিণঃ।
ন মানুষ্যং বিনাঽন্যত্র তত্ত্বজ্ঞানন্তু লভ্যতে॥

নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি ॥
বাহ্যস্পর্শেষসক্তাত্মা বিন্দত্যাত্মনি যৎ সুখম্।
স ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা সুখমক্ষয়মশ্নুতে ॥ (গীতা)

যে ব্যক্তি প্রাপ্তশব্দাদিবিষয় পরিত্যাগ করিয়া, অপ্রাপ্তবিষয়ে স্পৃহাশূন্য হইয়া, এবং নির্ম্মম (ইহা আমার এইরূপ অভিনিবেশ বর্জ্জিত) ও নিরহঙ্কার (অনাত্মদেহে আত্মভিমান রহিত) হইয়া সংসারে বিচরণ করেন তিনিই (সংসারদুঃখোপরমলক্ষণা) শান্তিলাভ করিয়া থাকেন। বাহ্যেন্দ্রিয়বিষয়ে অনাসক্তচিত্ত পুরুষ নিজের অন্তঃকরণে উপশমাত্মক সাত্ত্বিকসুখ লাভ করেন; তৎপরে তিনি ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা (ব্রহ্মাভ্যাসযুক্তমনা বা ব্রহ্মে সমাহিতচিত্ত) হইয়া আনন্দময় ব্রহ্মানুভবস্বরূপ অক্ষয়সুখ ভোগ করিয়া থাকেন। এই অবস্থাতে জীবের আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক এই ত্রিবিধ দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি হয়। বিষয়ানুরাগ সর্ব্বপ্রকার দুঃখের বীজস্বরূপ এবং পুরুষার্থ প্রতিবন্ধক। একারণ নিত্যানিত্য বস্তু বিচারদ্বারা যাঁহার বিবেক জন্মিয়াছে সেই অধ্যাত্মতত্ত্ববিৎ বিবেকীপুরুষ বিষয়ানুরাগ পরিত্যাগ করিয়া বৈরাগ্য অবলম্বন করেন। আর মূঢ়ব্যক্তি পশ্বাদির ন্যায় বিষয়ভোগে আসক্ত হইয়া আত্মোদ্ধারে অসমর্থ হয় এবং আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয়ে নিরন্তর সন্তাপিত হইয়া চিরদুঃখে কালহরণ করে। সুতারং বিষয়ানুরাগী ব্যক্তি আপনিই আপনার শত্রু হইয়া থাকে। বিষয়ের মধ্যে থাকিয়া ধীর ব্যক্তি কি প্রকার আচরণ করেন তাহা বলিয়াছেন :—

পুঙ্খানুপুঙ্খ বিষয়েষমুতৎপরোঽপি
ধীরো ন মুঞ্চতি মুকুন্দপদারবিন্দম্।
সঙ্গীত নৃত্যকতিতানবশংগতাঽপি
মৌলিস্থ কুম্ভপরিরক্ষণ ধীর্ণটীব ॥
(ভাগবতের টীকা)

যেমন কোন সুনিপুণা নটী সঙ্গীত নৃত্য ও অশেষবিধ তানের বশবর্ত্তিনী হইয়াও তাহার মস্তকস্থিত কুম্ভ যাহাতে পতিত না হয় তদ্বিষয়ে বিশেষরূপে মন রাখে, সেইরূপ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিষয়ব্যবহারে প্রবৃত্ত হইলেও সুখমোক্ষদাতা মুকুন্দের পদারবিন্দ পরিত্যাগ করেন না। সর্ব্বদা সর্ব্বাবস্থাতে ভগবানের পরমপদ চিন্তা করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি নিত্যসুখপ্রয়াসী তিনি ভাবিয়া থাকেন যে, "নাল্পে সুখমস্তি, যো বৈ ভূমা তৎ সুখং" যাহা ক্ষুদ্র, পরিমিত, অনিত্য ও ক্ষণস্থায়ী তাহাতে সুখ নাই, যিনি ভূমা তাঁহাতেই সুখ। অতএব বিষয়াসক্তি পরিত্যাগ করিয়া ভগবানের শ্রবণকীর্ত্তনাদিতে অনুরাগী হওয়াই নিত্য সুখার্থীর অবশ্য কর্ত্তব্য। রামপ্রসাদ বলিয়াছেন :—"যে জন কাঞ্চনের মূল্য জানে সে কি ভুলে পেয়ে কাচ।" "রামপ্রসাদ বলে (তারা) তোমায় ভুলে আমি জ্বালা সই।"

(৪৪) এ জগতে ধন্য (সার্থকজন্ম) কে?
যিনি পরের উপকার করেন তিনিই ধন্য।

শ্রোত্রং শ্রুতেনৈব ন কুণ্ডলেন,
দানেন পাণির্ন ন কঙ্কণেন।
আভাতিকায়ঃ করুণাপরাণাং
পরোপকারেণ ন চন্দনেন ॥
(নীতিশতক)

বেদাদিশাস্ত্র শ্রবণেই কর্ণ শোভা পায়, কুণ্ডলদ্বারা নহে; হস্তদানের দ্বারাই সুশোভিত হয়, কঙ্কণদ্বারা নহে এবং দয়াশীল মানবগণের দেহ পরোপকাররূপ মনোজ্ঞ ভূষণেই শোভা ধারণ করে, চন্দন বিলেপনদ্বারা নহে। সুতরাং যিনি পরোপকারী অর্থাৎ পরার্থে স্বার্থত্যাগ বা আত্মদান করেন সেই করুণার্দ্রহৃদয় মহাপুরুষই জগতে মহিমান্বিত হয়েন এবং দেহাত্যয়ে পরমোৎকৃষ্ট দিব্যলোকের অধিকারী হন।

"আলোচ্য সর্ব্বশাস্ত্রাণি বিচার্য্য চ পুনঃ পুনঃ।
পুণ্যং পরোপকারায় পাপঞ্চ পরপীড়নে॥"

সর্ব্বশাস্ত্র আলোচনা এবং পুনঃ পুনঃ বিচার করণান্তর এই স্থির হইয়াছে যে, পরোপকারের জন্য যাহা কিছু করা যায় তাহাই পুণ্যকর্ম্ম এবং পরপীড়নেই পাপ। পরোপকার পরায়ণ পুরুষই পুণ্যবান্; পুণ্যবান্ ব্যক্তিই সার্থকজন্মা। ব্যাসদেব বলিয়াছেন।—

লোকঃ পুণ্যবতাং নূনং সর্ব্বপুণ্যবতাং সুহৃৎ।
জীবন্তি পুণ্যবন্তশ্চ পরলোকং গতা অপি॥
পুণ্যেনৈকেন যান্ লোকান্ যান্তি পুণ্যব্রতা নরাঃ
কোগন্তুং তানলং জন্তুঃ সর্ব্বতঃ পরিচেষ্টয়া॥
(সংসারচক্র)

সমস্ত লোকই পুণ্যবান্ মনুষ্যগণের অধিকৃত; সকলই তাঁহাদের সুহৃৎ। তাঁহারা পরলোকে গমন করিলেও স্বীয় পুণ্যপ্রভাবে ধরাতলে চিরকাল জীবিত থাকেন। পুণ্যব্রত মহাত্মাগণ একমাত্র পুণ্যপ্রভাবে যে সমস্ত স্বর্গীয় উৎকৃষ্ট লোকের অধিকারী হন, অপর মনুষ্য সবিশেষ চেষ্টা করিয়াও তাদৃশলোকে গমন করিতে পারে না। বৃত্রভীত, ইন্দ্রপ্রমুখ, দেববৃন্দ, আথর্ব্বণ দধীচিমুনির নিকট গমন করিয়া তাঁহার দেহ ভিক্ষা করিলে মুনিবর তাঁহাদিগকে কহিলেন "আমার এই দেহ প্রিয় হইলেও অবশ্য একদিন আমাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইবে। আপনারা এ দেহ ভিক্ষা করিতেছেন, আপনাদের নিমিত্ত ইহা এখনি ত্যাগ করিতেছি"।

যোঽধ্রুবেনাত্মনা নাথা ন ধর্ম্মং ন যশঃ পুমান্।
ঈহেতভূতদয়য়া স শোচ্যঃ স্থাবরৈরপি॥
এতাবানব্যয়ো ধর্ম্মঃ পুণ্যশ্লোকৈরুপাসিতঃ।
যো ভূতশোকহর্ষাভ্যামাত্মা শোচতি হৃষ্যতি॥
অহো দৈন্যমহো কষ্টং পারক্যৈঃ ক্ষণভঙ্গুরৈঃ।
যন্নোপকুর্য্যাদস্বার্থৈর্ম্মর্ত্যঃ স্বজ্ঞাতিবিগ্রহৈঃ॥
(ভাগবত)

হে নাথগণ! এই দেহ অধ্রুব, ইহাদ্বারা প্রাণিগণের প্রতি দয়া প্রকাশ করিয়া যে ব্যক্তি ধর্ম্ম ও যশঃ উপার্জ্জন করিতে চেষ্টা না করে অচেতন স্থাবরগণও তাহার নিমিত্ত শোক করিয়া থাকে। যিনি প্রাণি সকলের শোকে শোকান্বিত এবং হর্ষে আনন্দিত হন্ সেই মহাত্মার এই অব্যয়-ধর্ম্মকেই পুণ্যশ্লোক ব্যক্তিগণ উপাসনা করিয়া থাকেন। ধন, স্ত্রীপুত্র প্রভৃতি আত্মীয়জন এবং দেহ সকলই ক্ষণভঙ্গুর এবং শৃগাল-কুক্কুরাদির ভক্ষ্য। এ সকল পদার্থে স্বার্থের উপযোগিতামাত্র নাই। অহো! তথাপি মনুষ্য যে এতদ্দ্বারা পরের উপকার করে না ইহা অতি কৃপণতার কর্ম্ম ও দুঃখের বিষয়! (১)

অহো মহত্ত্বং মহতামপূর্ব্বং বিপত্তিকালেঽপি পরোপকারম্। যথাস্যমধ্যে পতিতোঽপি রাহো কলানিধিঃ পুণ্যচয়ং দদাতি॥

অহো! মহাত্মা ব্যক্তিগণের মহত্ত্ব অপূর্ব্ব, বিপৎকালেও তাঁহারা পরোপকার করিয়া থাকেন। চন্দ্র যেমন রাহুগ্রস্ত হইয়াও পুণ্যপুঞ্জ প্রদান করেন (গ্রহণ সময়ে স্নানদানাদি দ্বারা মনুষ্য অক্ষয়পুণ্য সঞ্চয় করিয়া থাকে।)

পরোপকারী মনুষ্যের স্বভাব।

ভবন্তি নম্রাস্তরবঃ ফলোদ্গমৈর্নবাম্বুভির্ভূমিবিলম্বিনো ঘনাঃ। অনুদ্ধতাঃ সৎপুরুষাঃ (২) সমৃদ্ধিভিঃ স্বভাব এবৈষ পরোপকারিণাম্॥
(নীতিশতক)

(১) মহাভারতের বনপর্ব্বে ১৩০ অধ্যায়ে শ্যেন কপোতীয় বৃত্তান্তে উশীনর নরপতিরও উক্ত প্রকার পরোপচিকীর্ষা দেখিতে পাওয়া যায়।

(২) "এতে সৎপুরুষাঃ পরার্থ—ঘটকাঃ স্বার্থস্য বাধেন যে" (নীতিশতক) যাঁহারা স্বকীয় অর্থব্যয়াদি দ্বারা পরোপকার সাধন করেন তাঁহারা সৎপুরুষ।

'ফলবান্ তরু সকল ফলভারে অবনত হয়, মেঘসমূহ নববারিরূপ সম্পত্তিসংযোগে পৃথিবীর অভিমুখে লম্বমান হইয়া আপনাদের নম্রতা প্রদর্শন করে। এইরূপ সাধু পুরুষেরা ঐশ্বর্য্য-শালী হইলে বিনয়নম্র হইয়া থাকেন; কদাচ ঔদ্ধত্য প্রকাশ করেন না। পরোপকারী সৎ-পুরুষগণের (১) স্বভাবই এইপ্রকার। পরোপকারের মাহাত্ম্য বুঝিয়াই শাস্ত্রকারেরা উপদেশ দিয়াছেন :—

ধনানি জীবিতঞ্চৈব পরার্থে প্রাজ্ঞ উৎসৃজেৎ।
সন্নিমিত্তে বরং ত্যাগো বিনাশে নিয়তে সতি॥
(হিতোপদেশ)

বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি পরোপকারের নিমিত্ত ধন এবং জীবন উৎসর্গ করিবেন। অর্থক্ষয় এবং মৃত্যু যখন নিশ্চিত তখন পরোপকাররূপ সদনুষ্ঠানে ধন এবং জীবন পরিত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ।

যাঁহারা সংসারে আপনাকে ক্ষুদ্র ও অসমর্থ ভাবিয়া পরোপকাররূপ মহাপুণ্যকর্ম্মানুষ্ঠানে বিরত থাকেন তাঁহারা দৃষ্টান্তশতককারের এই কথাটি স্মরণ করিবেন।

উপকর্ত্তুং যথা স্বল্পঃ সমর্থো ন তথা মহান্।
প্রায়ঃ কূপস্তৃষাং হন্তি সততং ন তু বারিধিঃ॥
(দৃষ্টান্তশতক)

ক্ষুদ্রব্যক্তি যাদৃশ উপকার করিতে সমর্থ হয়, মহৎ ব্যক্তি সেরূপ করিতে পারেন না। ক্ষুদ্র কূপ প্রায়ই মনুষ্যের তৃষ্ণা নাশ করে, কিন্তু মহাসাগর তাহা পারে না। অতএব যাঁহার যেমন শক্তি সেই অনুসারে পরোপকার করিবার চেষ্টা করাই তাঁহার কর্ত্তব্য।

কোন্ ব্যক্তি পূজনীয়? যিনি তত্ত্বনিষ্ঠ তিনিই সকলের পূজ্য।

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতিশব্দ্যতে॥
(ভাগবত)

তত্ত্বজ্ঞপণ্ডিতেরা অভেদজ্ঞানকেই তত্ত্ব বলিয়া থাকেন। উপাসকভেদে এই তত্ত্বের বহুবিধ নামভেদ হয়। বেদজ্ঞ পণ্ডিতগণ তত্ত্বকে ব্রহ্ম, হিরণ্যগর্ভের উপাসকেরা পরমাত্মা এবং ভগবদ্ভক্তেরা ভগবান্ শব্দে নির্দ্দেশ করেন। অতএব যিনি অদ্বয় ব্রহ্মজ্ঞাননিষ্ঠ, ব্রহ্মনিষ্ঠ, পরমাত্মনিষ্ঠ অথবা ভগবন্নিষ্ঠ তাঁহাকেই তত্ত্বনিষ্ঠ বলা যায়। কি ধর্ম্মশাস্ত্রে, কি পুরাণেতিহাসে সর্ব্বস্থানেই ইহা দেখিতে পাওয়া যায় যে যাঁহারা তত্ত্বনিষ্ঠ তাঁহারাই জগতে চিরকাল সকলেরই পূজা প্রাপ্ত হইয়া আসিতেছেন। সংসার মুমুক্ষু, ধর্ম্মতত্ত্ব জিজ্ঞাসু, ব্যক্তিগণ জ্ঞানরত্ন লাভ করিবার নিমিত্ত জ্ঞানরত্নাকর তত্ত্বদর্শী মহাপুরুষগণের শরণাগত হইয়া শ্রদ্ধা-ভক্তিসহকারে তাঁহাদের পূজা করিয়া থাকেন।

তত্ত্বনিষ্ঠের পূজা—

মনুমেকাগ্রমাসীনমভিগম্য মহর্ষয়ঃ।
প্রতিপূজ্য যথা ন্যায়মিদং বচনমব্রবীৎ॥
(মনুসংহিতা)

ভগবান্ মনু একাগ্রচিত্তে ধ্যানপরায়ণ হইয়া আসনে সুখোপবিষ্ট আছেন এমন সময়ে ধর্ম্মতত্ত্বান্বেষী মহর্ষিগণ নিকটস্থ হইয়া যথা-বিধানে অর্চ্চনাকরতঃ তাঁহাকে এই বাক্য জিজ্ঞাসা করিলেন।

যোগীশ্বরং যাজ্ঞবল্ক্যং সংপূজ্য মনয়োঽব্রুবন্।
বর্ণাশ্রমেতরাণাং নো ব্রূহি ধর্ম্মানশেষতঃ॥
(যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা)

মুনিগণ যোগীশ্বর যাজ্ঞবল্ক্যকে বিশেষরূপে পূজা করিয়া কহিলেন (ভগবন্!) চারিবর্ণ, চারি আশ্রম, অনুলোম প্রতিলোমজাতি অপরাপর জাতি সকলের ধর্ম্ম সম্পূর্ণরূপে কীর্ত্তন

(১) "এতে সৎপুরুষাঃ পরার্থ ঘটকাঃ স্বার্থস্য বাধেন যে" (নীতিশতক) যাঁহারা স্বকীয় অর্থব্যয়াদিদ্বারা পরোপকার সাধন করেন, তাঁহারা সৎপুরুষ।

করুন। 'আবহমানকাল সর্ব্বত্রই তত্ত্বনিষ্ঠ ব্যক্তিগণের এইরূপ পূজা দেখিতে পাওয়া যায়) তত্ত্বনিষ্ঠ হওয়াই মনুষ্যত্ব (১) এবং ইহাই পরমপুরুষার্থ লাভের একমাত্র উপায়। মহানির্ব্বাণতন্ত্রে ভগবান্ শিব পার্ব্বতীকে বলিয়াছেন :—

ব্রহ্মাদিতৃণপর্য্যন্তং মায়য়া কল্পিতং জগৎ।
সত্যমেকং পরং ব্রহ্ম বিদিত্বৈবং সুখী ভবেৎ॥
বিহায় নামরূপাণি নিত্যে ব্রহ্মণি নিশ্চলে।
পরিনিশ্চিততত্ত্বো যঃ স মুক্তঃ কর্ম্মবন্ধনাৎ॥

ব্রহ্মা হইতে আরম্ভ করিয়া তৃণপর্য্যন্ত জগতের যাবতীয় পদার্থ মায়াদ্বারা কল্পিত, অতএব অনিত্য ও অসৎ; কেবল ব্রহ্মই সত্য তিনি ভিন্ন সৎপদার্থ আর কিছুই নাই ইহা বিদিত হইলে জীব সুখী হইতে পারে। যিনি সংসারের মায়াকল্পিত নামরূপ পরিত্যাগ করিয়া নিত্য নিশ্চল ব্রহ্মপদার্থে তত্ত্বনিশ্চয় করিয়াছেন তিনি শুভ শুভ কর্ম্মবন্ধন হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকেন।

সদ্‌গুরুর শাসনে অবস্থান, চিত্তবিশুদ্ধির নিমিত্ত শ্রুতিস্মৃত্যাদিত যাগযজ্ঞাদি বিবিধ কর্ম্মের অনুষ্ঠান, মন প্রভৃতি প্রমাথী ইন্দ্রিয়বর্গকে বাহ্যবিষয় হইতে প্রত্যাহার করিয়া স্ববশে আনয়নের চেষ্টা ইত্যাদি কার্য্যদ্বারা মনুষ্য ক্রমে ক্রমে তত্ত্বনিষ্ঠ হইতে পারে অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানে, ব্রহ্মে, পরমাত্মায় অথবা ভগবানে স্থিরা স্থিতি লাভ করিতে সমর্থ হইয়া থাকে। ঈদৃশী নিশ্চলা স্থিতি প্রাপ্ত হইলে কি হয় তাহা ভগবান্ গীতায় সাংখ্যযোগে অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন :—

এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ নৈনাং প্রাপ্য বিমুহ্যতি।
স্থিত্বাস্যামন্তকালেঽপি ব্রহ্মনির্ব্বাণমৃচ্ছতি॥

হে পার্থ! ব্রহ্মজ্ঞাননিষ্ঠা ঈদৃশী; গুরুর উপদেশে ইহা লাভ করিয়া বিশুদ্ধান্তঃকরণ পুরুষ সংসারমোহ প্রাপ্ত হন না, মৃত্যুকালেও ইহাতে থাকিয়া ব্রহ্মে লয়প্রাপ্ত হন অর্থাৎ পুনর্জ্জন্ম হয় না।

তত্ত্বনিষ্ঠ ব্যক্তিগণ লোকসংগ্রহার্থে নিষ্কাম-কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া থাকেন, জ্ঞানোপদেশরূপ আলোকদ্বারা কর্ম্মাসক্ত অজ্ঞানীর অজ্ঞানান্ধকার বিদূরিত করেন এবং ধর্ম্মোপদেশরূপ মহৌষধি প্রয়োগদ্বারা আধ্যাত্মিক-ব্যাধির শান্তিবিধান করিয়া থাকেন। ইহাঁদের সহবাসরূপ মহা পবিত্র-তীর্থ-নিষেবনদ্বারা মহা পাপীও সদ্য নিষ্পাপ হইয়া থাকে। যে মহাত্মা অশেষ দুঃখাস্পদ সংসারের অসারতা, বিষয়ৈশ্বর্য্যের দোষ ও অনর্থকারিতা এবং ভোগসুখের অনিত্যতা পর্য্যালোচনা করিয়া সারাৎসার সচ্চিদানন্দ নিত্য-নিরাময় ব্রহ্মে আসক্ত হয়েন, সর্ব্বাপেক্ষা তাঁহারই ভূয়সী প্রশংসা, অচলাপ্রতিষ্ঠা এবং প্রভূত সম্মান দেখিতে পাওয়া যায় (১)।

(১) নিদ্রা চ মৈথুনাহারাঃ সর্ব্বেষাং প্রাণিনাং সমাঃ।
জ্ঞানবান্ মানবঃ প্রোক্তঃ জ্ঞানহীনঃ পশুঃস্মৃতঃ॥

(১) গার্হস্থ্যধর্ম্মাবলম্বীকে উপকুর্ব্বাণব্রহ্মচারী কহে। "ব্রহ্মনিষ্ঠো গৃহস্থঃ স্যাৎ"—গৃহী "ব্রহ্মনিষ্ঠ" হইবেন, শাস্ত্রে এই উপদেশ দিয়াছেন। সংসারে মনুষ্য আরও যে সকল সদ্‌গুণ থাকিলে পূজনীয় হন, তাহা নীতিশতক-বলিয়াছেন।

বাঞ্ছা সজ্জন-সঙ্গমে, গুণিগণে প্রীতির্গুরৌ নম্রতা,
বিদ্যায়াং ব্যসনং স্বযোষিতিরতির্লোকাপবাদাদ্ভয়ম্।
ভক্তিঃ শূলিনিশক্তিরাত্মদমনে সংসর্গমুক্তিঃ খলে,
এতে যেষু বসন্তি নির্ম্মলগুণাস্তেভ্যো নরেভ্যো নমঃ॥
(নীতিশতক)

সাধুজনসহবাসে অভিলাষ, গুণিগণে প্রীতি, গুরুজনের নিকট নম্রতা, বিদ্যাতে আসক্তি, স্বদারে রতি, লোকাপবাদ হইতে ভয়, শূলপাণি শঙ্করের প্রতি ভক্তি, আত্মসংযমে শক্তি, দুর্জ্জন খলের সংসর্গ পরিত্যাগ ইত্যাদি নির্ম্মলগুণরাশি যে সকল মহাত্মার শরীরে বিরাজ করে আমি তাঁহাদিগকে প্রণাম করি।

কুলার্ণবতন্ত্রে বলিয়াছেন :—

কুলং পবিত্রং জননীকৃতার্থা, বসুন্ধরা পুণ্যবতী চ তেন। অপার-সম্বিৎ-সুখসাগরেঽস্মিন্ লীনং পরে ব্রহ্মণি যস্য চেতঃ॥

অপার সুখ বোধ সমুদ্রস্বরূপ পরব্রহ্মে যাঁহার চিত্ত সমাহিত সেই সাধু পুরুষ যে কুলে জন্মগ্রহণ করেন, সেই কুল পবিত্র, ঈদৃশ পুত্ররত্নকে গর্ভে ধারণ করিয়া তাঁহার জননী ধন্যা এবং পৃথিবী ও সেই মহাত্মাকে ধারণ করিয়া পুণ্যবতী বা পবিত্রা হইয়া থাকেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীপাঁচকড়ি চট্টোপাধ্যায়।

চিত্তানুশাসনম্।

(পূর্ব্বতোনুবৃত্তম্)

স্থাবরাঃ কৃময়শ্চাজাঃ পক্ষিণঃ পশবো নরাঃ।
ধার্ম্মিকাস্ত্রিদশাস্তদ্বন্মোক্ষিণশ্চ যথাক্রমম্॥
চতুর্ব্বিধশরীরাণি ধৃত্বামুক্ত্বা সহস্রশঃ।
সুকৃতান্মানবো ভূত্বা জ্ঞানীচেন্মোক্ষমাপ্নুয়াৎ॥
চতুরশীতিলক্ষেষু শরীরেষু শরীরিণাম্।
ন মানুষং বিনান্যত্র তত্ত্বজ্ঞানন্ত লভ্যতে॥
অত্র জন্মসহস্রাণাং সহস্রৈরপি কোটিভিঃ।
কদাচিল্লভতে জন্তুর্ম্মানুষ্যং পুণ্যসঞ্চয়াৎ॥
সোপানভূতং মোক্ষস্য মানুষ্যং প্রাপ্যদুর্লভং।
যস্তারয়তিনাত্মানং তস্মাৎ পাপতরোঽত্রকঃ॥
নরঃ প্রাপ্যেতরজন্ম লব্ধ্বা চেন্দ্রিয়সৌষ্ঠবং।
ন বেত্ত্যাত্মহিতং যস্তু সভবেদ্ব্রহ্মঘাতকঃ॥
বিনা দেহেন কস্যাপি পুরুষার্থো ন বিদ্যতে।
তস্মাদ্দেহং ধনং রক্ষেৎ পুণ্যকর্ম্মাণি সাধয়েৎ॥
রক্ষয়েৎ সর্ব্বদাত্মানমাত্মা সর্ব্বস্য ভাজনম্।
রক্ষণেযত্নমাতিষ্ঠেৎ জীবন্ ভদ্রাণি পশ্যতি॥
পুনর্গ্রাম পুনঃ ক্ষেত্রং পুনর্ব্বিত্তং পুনর্গৃহম্।
পুনঃ শুভাশুভং কর্ম্ম ন শরীরং পুনঃ পুনঃ॥
শরীররক্ষণোপায়ৈঃ ক্রিয়ন্তে সর্ব্বদা বুধৈঃ।
নেচ্ছন্তি ন পুনস্ত্যাগমপি কুষ্ঠাদিরোগিণঃ॥
যদ্ গোপিতং স্যাদ্ধর্ম্মার্থং ধর্ম্মোজ্ঞানার্থমেব চ।
জ্ঞানন্তু ধ্যানযোগার্থমচিরাৎ প্রবিমুচ্যতে॥
আত্মৈব যদি নাত্মানমহিতেভ্যো নিবারয়েৎ।
কোঽন্যোহিতকরস্তস্মাদাত্মানং কারয়িষ্যতি॥ (১)
ইহৈব নরকব্যাধেশ্চিকিৎসাং ন করোতি যঃ।
গত্বা নিরৌষধং দেশং ব্যাধিস্থঃ কিং করিষ্যতি॥
ব্যাঘ্রীবাস্তে জরাচায়ুর্যাতি ভিন্নঘটাম্বুবৎ।
নিঘ্নন্তি রিপুবদ্রোগাস্তস্মাচ্ছ্রেয়ঃ সমভ্যসেৎ॥
যাবন্নাশ্রয়তে দুঃখং যাবন্নায়ান্তি চাপদঃ।
যাবন্নেন্দ্রিয়বৈকল্যং তাবচ্ছ্রেয়ঃ সমভ্যসেৎ॥
যাবৎ তিষ্ঠতি দেহোঽয়ং তাবৎ তত্ত্বং সমভ্যসেৎ।
সন্দীপ্তকোণভবনে কূপং খনতি দুর্ম্মতিঃ॥
কালো ন জ্ঞায়তে নানাকার্য্যৈঃ সংসারসম্ভবৈঃ।
সুখং দুঃখং জনো হন্ত নবেত্তিহিতমাত্মনঃ॥

(১) এই শ্লোকগুলি কুলার্ণবতন্ত্রের প্রথমোল্লাসেও আছে। এই শ্লোকগুলি প্রথমতঃ সোনামুখীনিবাসী শ্রীযুক্ত পূজ্যপাদ নীলমাধব সিদ্ধান্ত মহাশয়ের নিকট শুনিয়াছিলাম। আমাদের বাসায় ভাগবতপাঠান্তে আমাদিগকে উপদেশ দিবার ছলে ঐ শ্লোকগুলি আবৃত্তি করিয়াছিলেন তদবধি আমি ঐ শ্লোকগুলি সমুদায় পাইতে ইচ্ছুক ছিলাম তাঁহার নিকট কতকগুলি লিখিয়া লইয়াছিলাম এইক্ষণ শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় সমুদায় শ্লোকগুলি গরুড়পুরাণের উত্তরখণ্ডে ৪৫ অধ্যায়ে পাইয়া প্রকাশ করিয়া সুখী হইলাম।

জাতানার্ত্তান্ মৃতানাপদভ্রষ্টান্ দৃষ্ট্বা চ দুঃখিতান্।
লোকোমোহসুরাং পীত্বা ন বিভেতি কদাচন॥
সম্পদঃ স্বপ্নসঙ্কাশা যৌবনং কুসুমোপমং।
তড়িচ্চপলমায়ুষ্যং কস্য স্যাজ্জানতোধৃতিঃ॥
শতং জীবিতমত্যল্পং নিদ্রালস্যৈস্তদর্দ্ধকম্।
বাল্যরোগজরাদুঃখৈরল্পং তদপি নিষ্ফলং॥
প্রারব্ধব্যে নিরুদ্যোগো জাগর্ত্তব্যে প্রসুপ্তকঃ।
বিশ্বস্তব্যো ভয়স্থানে হা নরঃ কোনহন্যতে॥
তোয়ফেন সমে দেহে জীবেনাক্রম্যসংস্থিতে।
অনিত্যপ্রিয়সম্বাসে কথং তিষ্ঠতি নির্ভয়ঃ॥
অহিতে হিতসংজ্ঞঃ স্যাদধ্রুবে ধ্রুবসংজ্ঞকঃ।
অনর্থে চার্থবিজ্ঞানঃ স্বমর্থং যো বেত্তি সঃ॥
পশ্যন্নপি প্রস্খলতি শৃণ্বন্নপি ন বুধ্যতি।
পঠন্নপি ন জানাতি দেবমায়া বিমোহিতঃ॥
তন্নিমজ্জজ্জগদিদং গম্ভীরে কালসাগরে।
মৃত্যুরোগজরাগ্রাহৈর্ন কশ্চিদপি বুধ্যতে॥
প্রতিক্ষণময়ং কালঃ ক্ষীয়মাণো ন লক্ষ্যতে।
অথ কুম্ভইবাম্ভঃস্থো বিশীর্ণো ন বিভাব্যতে॥
যুজ্যতে বেষ্টনং বায়োরাকাশস্য চ খণ্ডনম্।
গ্রথনঞ্চ তরঙ্গানামাস্থানায়ুষিযুজ্যতে॥
পৃথিবী দহ্যতে যেন মেরুশ্চাপি বিশীর্য্যতে।
শুষ্যতে সাগরজলং শরীরস্য চ কা কথা॥
অপত্যং মে কলত্রং মে ধনং মে বান্ধবাশ্চ মে।
জল্পন্তমিতি মর্ত্ত্যাজং হন্তি কালবৃকো বলাৎ॥
ইদং কৃতমিদং কার্য্যমিদমন্যৎ কৃতাকৃতম্।
এবমীহাসমাযুক্তং কৃতান্তঃ কুরুতে বশম্॥
শ্বকার্য্যমদ্যকুর্ব্বীত পূর্ব্বাহ্নে চাপরাহ্নিকম্।
ন হি মৃত্যুঃ প্রতীক্ষেত কৃতং বাপ্যথবা কৃতম্॥
জরাদর্শিতপন্থানং প্রচণ্ডব্যাধিসৈনিকম্।
মৃত্যুশত্রুমধিষ্ঠোসি ত্রাতারং কিং ন পশ্যতি॥
তৃষ্ণা সূচী বিনির্ভিন্নং সিক্তং বিষয়সর্পিষা।
রাগদ্বেষানলে পক্বং মৃত্যুরশ্নাতিমানবম্॥
বালাংশ্চ যৌবনস্থাংশ্চ বৃদ্ধান্ গর্ভগতানপি।
সর্ব্বানাবিশতে মৃত্যুরেবস্তুতমিদং জগৎ॥
স্বদেহমপি জীবোয়মুক্ত্বা যাতি যমালয়ম্।
স্ত্রীমাতৃ-পিতৃ-পুত্রাদিসম্বন্ধঃ কেন হেতুনা॥
দুঃখমূলং হি সংসারঃ স যস্যাস্তি স দুঃখিতঃ।
তস্য ত্যাগঃ কৃতো যেন সঃ সুখী নাপরঃ কচিৎ॥
প্রভবং সর্ব্বদুঃখানামালয়ং সকলাপদাম্।
আশ্রয়ং সর্ব্বপাপানাং সংসারং বর্জ্জয়েৎ ক্ষণাৎ॥
লোহদারুময়ৈঃ পাশৈঃ পুমান্ বদ্ধো বিমুচ্যতে।
পুত্রদারময়ৈঃ পাশৈর্মুচ্যতে ন কদাচন॥
যাবন্তঃ কুরুতে জন্তুঃ সম্বন্ধান্মনসঃ প্রিয়ান্।
তাবন্তোস্য নিখন্যন্তে হৃদয়ে শোকশঙ্কবঃ॥
বঞ্চিতাশেষবিত্তৈস্তৈর্নিত্যং লোকো বিনাশিতঃ।
হা হন্ত বিষয়াহারৈর্দেহস্থেন্দ্রিয়তস্করৈঃ॥
মাংসলুব্ধো যথা মৎস্যো লোহশঙ্কুং ন পশ্যতি।
সুখলুব্ধস্তথা দেহী যমবাধাং ন পশ্যতি॥
হিতাহিতং ন জানন্তো নিত্যমুন্মার্গগামিনঃ।
কুক্ষিপূরণনিষ্ঠা যে তে নরা নারকীঃ খগাঃ॥
নিদ্রাদি মৈথুনাহারাঃ সর্ব্বেষাং প্রাণিনাং সমাঃ।
জ্ঞানবান্ মানবঃ প্রোক্তো জ্ঞানহীনঃ পশুঃ স্মৃতঃ
প্রভাতে মলমূত্রাভ্যাং ক্ষুৎতৃড়্ভ্যাং মধ্যগে রবৌ
রাত্রৌ মদননিদ্রাভ্যাং বাধ্যন্তে মূঢ়মানবাঃ॥
স্বদেহধনদারাদি নিরতাঃ সর্ব্বজন্তবঃ।
জায়ন্তে চ ম্রিয়ন্তে চ হা হন্ত জ্ঞানমোহিতাঃ॥
তস্মাৎ সঙ্গঃ সদা ত্যাজ্যঃ সর্ব্বস্ত্যক্তুং ন শক্যতে।
মহদ্ভিঃ সহ কর্ত্তব্যঃ সন্তঃ সঙ্গস্য ভেষজম্॥

স্থাবর, কৃমি, পক্ষী, পশু, মনুষ্য, ধার্ম্মিক, দেবতাও মোক্ষপ্রাপ্ত এইরূপ যথাক্রমে সহস্রবার (স্বেদজ, অণ্ডজ প্রভৃতি) চতুর্ব্বিধ শরীর ধারণ ও ত্যাগ করিয়া সুকৃতিবশতঃ মনুষ্য হইয়া যদি জ্ঞানী হয় তাহা হইলে মোক্ষপ্রাপ্ত হয়। চুরাশী লক্ষ শরীরের মধ্যে মনুষ্য শরীর ভিন্ন তত্ত্বজ্ঞান লাভ করা যায় না। এই সংসারে সহস্র ও কোটিজন্ম পরে জন্তু পুণ্যসঞ্চয়বশতঃ মনুষ্য জন্মলাভ করে॥

মোক্ষের সোপানভূত দুর্লভ মনুষ্যজন্ম প্রাপ্ত

হইয়া যিনি আত্মাকে না ত্রাণ করেন তাঁহা-হইতে এ সংসারে আরে কে পাপী আছে ?

মনুষ্য জন্মলাভ করিয়া ও সমুদায় ইন্দ্রিয়-সৌষ্ঠব লাভ করিয়া যে আত্মহিত না জানিতে পারে সে ব্রহ্মঘাতী হয়॥

দেহব্যতিরেকে কাহারও পুরুষার্থ থাকে না তজ্জন্য দেহ ও ধনরক্ষা করিয়া পুণ্যকর্ম্ম করিবে॥ সমুদায় পুণ্যকর্ম্মের আধার আত্মাকে সর্ব্বদা রক্ষা করিবে কারণ বাঁচিয়া থাকিলে মঙ্গললাভ করা যায়॥ পুনরায় গ্রাম, পুনরায় ক্ষেত্র, পুনরায় ধন, পুনরায় গৃহ, পুনরায় শুভাশুভ কর্ম্ম লাভ করা যায় কিন্তু পুনঃ পুনঃ শরীর (মনুষ্য দেহ) লাভ করা যায় না॥ জ্ঞানী-লোক সর্ব্বদা শরীরের রক্ষণোপায় বিধান করেন, কুষ্ঠরোগাক্রান্ত ব্যক্তিও শরীর ত্যাগ ইচ্ছা করে না॥ ধর্ম্মের জন্য শরীর রক্ষা করিবে, জ্ঞানের জন্য ধর্ম্মরক্ষা করিবে, ধ্যানযোগের জন্য জ্ঞানলাভ করিবে এইরূপ করিলে অচিরে মুক্তিলাভ করিবে॥

যদি আত্মা আত্মাকে অমঙ্গল হইতে নিবা-রণ করিতে না পারে তাহাহইলে অন্য কোন্ হিতকারী নিবারণ করিবে ?

এই সংসারে যদি নরক ব্যাধির চিকিৎসা না করে তাহাহইলে ব্যাধিগ্রস্থ ব্যক্তি ঔষধশূন্য প্রদেশে গিয়া কি করিবে ? ব্যাঘ্রীর ন্যায় জরা সম্মুখে বর্ত্তমান ; আয়ু ও ভগ্ন ঘট হইতে জলের ন্যায় ক্ষয় পাইতেছে, শত্রুর ন্যায় রোগসকলও নষ্ট করিতেছে তজ্জন্য নিজ মঙ্গল অভ্যাস করিবে॥ যতক্ষণ দুঃখ আশ্রয় না করে, যত-ক্ষণ আপৎ না আইসে, যাবৎ ইন্দ্রিয় বৈকল্য না হয় তাবৎ নিজ মঙ্গলজন্য যত্ন করিবে॥

যতক্ষণ দেহ বর্ত্তমান থাকে ততক্ষণ তত্ত্ব অভ্যাস করিবে। নচেৎ গৃহ প্রজ্জলিত হইলে দুর্ম্মতি কূপ খনন করিয়া কি করিবে ? সংসার সম্বন্ধীয় কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া মনুষ্য কাল জানিতে পারে না। হায়! মনুষ্য সুখ, দুঃখ ও নিজের হিত জানিতে পারে না। মনুষ্যকে জাত, পীড়িত, মৃত, আপদদ্বারা ভ্রষ্ট ও দুঃখিত দেখিয়া মনুষ্য মোহ সুরাপান করিয়া কদাচ ভীত হয় না॥

স্বপ্নের ন্যায় সম্পদ্ কুসুমের ন্যায় যৌবন ও বিদ্যুতের ন্যায় আয়ুর চাঞ্চল্য দেখিয়া কাহার ধৈর্য্য থাকিতে পারে ?

মনুষ্যের শতবৎসর পরমায়ু; নিদ্রা ও আলস্যে তাহার অর্দ্ধেক গত হয় আরও বাল্য-কাল রোগ, জরা ও দুঃখদ্বারা অর্দ্ধেক নিষ্ফলগত হয়॥

প্রারব্ধব্য বিষয়ে উদ্‌যোগশূন্যতা, জাগর্ত্তব্য বিষয়ে প্রসুপ্ততা ও ভয়স্থানে বিশ্বস্ততা এরূপ হইলে হায়! কোন মনুষ্য নষ্ট না হইবে? জলের ফেণসমান (অনিত্য) দেহে জীবন ধারণ করিয়া আত্মীয় লোকের ক্ষণকাল মিলনে মনুষ্য কি প্রকারে নির্ভয় হইয়া থাকিবে ? যে ব্যক্তি নিজ হিত জানে না সে অমঙ্গল কার্য্যকে মঙ্গল বিবেচনা করে অনিশ্চিতকে নিশ্চিত ও অনর্থকে অর্থযুক্ত বিবেচনা করিয়া থাকে॥ সে দেবমায়ায় বিমোহিত হইয়া দেখিয়া ও স্খলিত পদ হয়, শুনিয়াও জ্ঞানলাভ করিতে পারে না ও পাঠ করিয়াও জানিতে পারে না। মৃত্যুরোগ জরারূপ জলজন্তু ব্যাপ্ত গম্ভীরকাল-সাগরে যে এই জগৎ মগ্ন হইয়া আছে ইহা কেহ বুঝিতে পারে না॥

অপক কুম্ভস্থ জল যেরূপ শুষ্ক হইয়া যায় তদ্রূপ এই কাল যে প্রতিক্ষণ ক্ষয় পাইতেছে তাহা কেহ লক্ষ্য করে না।

বায়ুকেও বেষ্টন করা যায় আকাশকেও খণ্ডন করা যায়, তরঙ্গকেও গণিতে পারা যায় কিন্তু আয়ুতে আস্থা রাখা যায় না॥

যখন পৃথিবীও দাহ হয়, মেরুও বিশিষ্ট হয়, সাগর জলও শুষ্ক হয় তখন শরীর যে ধ্বংশ হইবে তাহার বিচিত্র কি ?

"আমার পুত্র" "আমার স্ত্রী," "আমার ধন" "আমার বন্ধুবান্ধব" এইরূপ কথনশীল মানবকে কালব্যাঘ্র বলে হরণ করে॥

"এই কার্য্য করিয়াছি" "এই কার্য্য করি নাই" এইরূপ বাদী এবং ক্রিয়াযুক্ত লোককে কৃতান্তবশে আনয়ন করে॥

কল্যকার কার্য্য অদ্যই করিবে, অপরাহ্নের কার্য্য পূর্ব্বাহ্নেই করিবে কারণ মৃত্যু কৃত ও অকৃত কার্য্যের প্রতিলক্ষ্য রাখে না।

তুমি মৃত্যু শত্রুর মধ্যে বাস করিতেছ উহার পথ জরা প্রদর্শন করিতেছে ও প্রচণ্ড ব্যাধি রূপসৈন্যদ্বারা বেষ্টিত রক্ষাকর্ত্তাকে দেখিতেছ না কেন ?

তৃষ্ণারূপ সূচীদ্বারা বিদারিত, বিষয়রূপ ঘৃতদ্বারা সিক্ত, রাগ ও দ্বেষরূপ অনলে পক্ব মানবকে মৃত্যু ভক্ষণ করে।

বালক, যৌবনাবস্থ, বৃদ্ধ, গর্ভস্থ প্রভৃতি সকলকে মৃত্যু কবলীকৃত করে। সংসারের ত গতি এই !

যখন জীব স্বদেহ ত্যাগ করিয়া যমালয়ে গমন করে তখন স্ত্রী, মাতৃপিতৃ পুত্রাদি সম্বন্ধ কিজন্য ?

যাহার দুঃখমূল সংসার আছে সেই-দুঃখিত, উহাকে যিনি ত্যাগ করিতে পারেন তিনি সুখী অন্য কেহ নহে।

সকল দুঃখের আকর, সকল আপদের আলয় ও সকল পাপের আশ্রয় সংসারকে শীঘ্র পরিত্যাগ করিবে।

লৌহ ও দারুময়শৃঙ্খলে বদ্ধ হইলে, মনুষ্য মুক্তিলাভ করিতে পারে কিন্তু পুত্রদ্বারা মায়াপাশে বদ্ধ হইলে কখনও মুক্তিলাভ করিতে পারে না।

মনুষ্য যত সম্বন্ধকে মনের প্রিয় বলিয়া মনে করে তত তাহার হৃদয়ে শোকশৈল্য বিদ্ধ করে॥

আহারাদিবিষয় হরণকারী দেহস্থ ইন্দ্রিয়রূপ তস্করদ্বারা অশেষ ধন হইতে বঞ্চিত হইয়া মনুষ্য বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

যেরূপ মাংসলুব্ধ মৎস্য লৌহকণ্টক দেখিতে পায় না সেইরূপ সুখলুব্ধদেহী যমযন্ত্রণা দেখিতে পায় না।

(শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন) হে গরুড়! যাহারা হিতাহিত জানে না ও উন্মার্গগামী ও যাহারা কেবলমাত্র উদর পূরণে নিষ্ঠ তাহারা নারকী!

নিদ্রা, মৈথুন ও আহার সকল প্রাণীর সমান তন্মধ্যে যাহারা জ্ঞানী (অর্থাৎ এই সকলে আসক্তি নাই) তাহারা মনুষ্য ও যাহারা জ্ঞানহীন তাহারা পশু॥

প্রভাতে মলমূত্রাদিদ্বারা, মধ্যাহ্নে ক্ষুধা ও তৃষ্ণাদ্বারা ও রাত্রে মদন ও নিদ্রাদ্বারা মূঢ়ব্যক্তি সকল বাধ্য হয়।

সকলপ্রাণী স্বদেহ যে ধনদারাদি রক্ষণে নিরত হয়, তাহারা অজ্ঞানদ্বারা মোহিত হইয়া জন্মগ্রহণ করে ও মরিয়া যায়॥

তজ্জন্য সর্ব্বদা সঙ্গত্যাগ করিবে যদি সমুদায় সঙ্গত্যাগ করিতে না পার তাহাহইলে মহতের সহিত সঙ্গ করিবে কারণ সাধুসঙ্গ সমুদায় সঙ্গের ঔষধ॥

শ্রীবিধুভূষণ দেব।

যমুনাষ্টকম্।

কৃপাপারাবারাং তপনতনয়াং তাপশমনীং।
মুরারিপ্রেয়স্যাং ভবভয়দবাং ভক্তবরদাং।
বিয়জ্জ্বালামুক্তাং শ্রিয়মপি সুখাপ্তেঃ পরিদিনং
সদা ধীরো নূনং ভজতি যমুনাং নিত্যফলদাম্॥১॥

মধুবন চারিনি! ভাস্করবাহিনি জাহ্নবী-সঙ্গিনী সিন্ধুসুতে মধুরিপুভূষিণি মাধবতোষিণি গোকুলভীতি বিনাশকৃতে। জগদঘমোচনি মানসদায়িনি কেশব কেলিনিদানগতে জয়-যমুনে জয়ভীতি নিবারিনি শঙ্কটনাশিনি পাবয়-মাম্॥ ২॥

অয়িমধুরে মধুমোদবিলাসিনি শৈল-বিদারিণি বেগভরে পরিজনপালিনী দুষ্ট-নিসূদনি বাঞ্ছিত কামবিলাসধরে। ব্রজপুর-বাসিজনার্জ্জিত পাতকহারিণি বিশ্বজনোদ্ধারিকে জয়যমুনে জয়ভীতিনিবারিণি শঙ্কটনাশিনি পাবয়মাম্॥ ৩॥

কৃপাসমুদ্রস্বরূপা তপনতনয়া, তাপনাশ-কারিণী, শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী, ভবভয়দাবাগ্নিস্বরূপা, ভক্তজনের বরদাত্রী, আকাশেও যাঁহার প্রভা বিস্তৃত আছে, যিনি সুখপ্রাপ্তির নিত্য কারণ ধীর ব্যক্তি সর্ব্বদা নিত্য ফলদা যমুনাকে ভজনা করেন॥ ১॥

হে মধুবনচারিণি! হে ভাস্করবাহিনি! হে জাহ্নবীসঙ্গিনি! হে সিন্ধুকন্যে! হে মধুদৈত্য-বিনাশিনি! হে মাধবতোষিনি! হে গোকুল ভয়নাশিনি! হে জগতের পাপনাশিনি! হে মানসদায়িনি! হে কেশবের কেলির কারণ! হে ভয়নিবারিণি! হে সঙ্কট নাশিনি যমুনে আমাকে পবিত্র কর॥ ২॥

অতি বিপদম্বুধিমগ্নজনং ভবতাপশতাকুল-মানসকং গতিমতিহীনমশেষ ভয়াকুলমাগত-পাদসরোজযুগম্। ঋণভয়ভীতিমনিষ্কৃতিপাতক-কোটিশতাযুতপুঞ্জতরং জয়যমুনে জয়ভীতিনিবা-রিণি শঙ্কটনাশিনি পাবয়মাম্॥ ৪॥

নবজলদদ্যুতিকোটিলসৎ তনু হেমময়া-ভরণাঞ্চিতকে তড়িদবহেলিপদাঞ্চলচঞ্চল-শোভিত পীতসুচেলধরে। মণিময়ভূষণচিত্র-পটাসনরঞ্জিত গঞ্জিতভানুকরে জয়যমুনে জয়-ভীতিনিবারিণি শঙ্কটনাশিনি পাবয়মাম্॥ ৫॥

শুভপুলিনে মধুমত্ত যদূদ্ভবরাসমহোৎসব কেলিভরে উচ্চ কুলাচল রাজিত মৌক্তিকহার ময়া ভরয়োধাসিকে। নবমণি কোটিভাস্কর কঞ্চুকি শোভিত তারকহারযুতে জয় যমুনে জয় ভীতি নিবারিণী শঙ্কটনাশিনি পাবয়মাম্॥ ৬॥

হে মধুরে! হে বসন্তকালের আমোদ-বিলাসিনি! হে শৈলবিদারিণি! হে বেগভরে! হে পরিজন পালিনি! হে দুষ্ট নাশিনি! হে অভিলষিত কাম ও বিলাসধারিণি! হে ব্রজবাসিজনের অর্জিতপাতক হারিণি! হে বিশ্বজনের উদ্ধার কারিণি! হে যমুনে তুমি জয়যুক্তা হও। হে ভয়নিবারিণি! হে শঙ্কট-নাশিনি! আমাকে পবিত্র কর॥ ৩॥

আমি অতি বিপদসমুদ্রে মগ্ন আছি, সংসারে শত শত তাপদ্বারা আমার মানস আকুল হইয়াছে, আমি গতিমতিহীন, অশেষ ভয়দ্বারা আকুল আমি তোমার পাদপদ্ম যুগলে আগত হইয়াছি; আমি ঋণভয়ে ভীত, যে পাপ হইতে নিষ্কৃতি নাই এরূপ কোটি কোটি পাপযুক্ত। হে যমুনে! তুমি জয়যুক্তা হও, হে ভয়নিবা-রিণি! শঙ্কটনাশিনি! আমাকে পবিত্র কর॥ ৪॥

তোমার শরীর কোটী নবজলদশোভাদ্বারা শোভিত ও স্বর্ণময় আভরণদ্বারা শোভিত; তুমি যে পীত চঞ্চলবস্ত্রদ্বারা শোভিত হও তাহা

বিদ্যুতের শোভাকেও তুচ্ছ করে; তোমার মণিময় ভূষণ বিচিত্র রঞ্জিত পট্টবস্ত্র সূর্য্যকিরণকেও গঞ্জনা করে। হে যমুনে! তুমি জয়যুক্তা হও; হে ভয়নিবারিণি! হে শঙ্কটনাশিনি! আমাকে পবিত্র কর ॥ ৫ ॥

তোমার পুলিন মনোহর, শ্রীকৃষ্ণ মধুমত্ত হইয়া তাহাতে রাসমহোৎসব কেলি করিয়াছিলেন। তোমার তীরে উচ্চ কুলাচল শ্রেণী আছে তাহা তোমার মুক্তাহারের ন্যায় হইয়াছে। তোমার যে কোটি কোটি নবমণি আছে তাহা সূর্য্যকিরণ প্রাপ্ত হইয়া তোমার তারকার হারের কার্য্য করিতেছে। হে যমুনে! তুমি জয়যুক্তা হও; হে ভয়নিবারিণি! হে শঙ্কটনাশিনি! আমাকে পবিত্র কর ॥ ৬ ॥

করিবরমৌক্তিক নাসিকভূষণ বাতচমৎকৃত চঞ্চলকে, মুখকমলামলসৌরভ চঞ্চলমত্তমধুব্রতলোচনিকে। মণিগণকুণ্ডল লোলপরিস্ফুরদাকুলগণ্ডযুগামলকে, জয় যমুনে জয় ভীতিনিবারিণি শঙ্কটনাশিনি পাবয়মাম্ ॥ ৭ ॥

কলরবনূপুর হেমময়াচিত পাদসরোরুহ সারুণিকে, ধিমি ধিমি ধিমি ধিমি তালবিনোদিতমানসমঞ্জুলপাদগতে। ভবপদপঙ্কজমাশ্রিতমানবচিত্ত সদাখিলতাপহরে, জয় যমুনে জয় ভীতিনিবারিণি শঙ্কটনাশিনি পাবয়মাম্ ॥ ৮ ॥

ভবোত্তাপাম্ভোধৌ নিপতিতজনো দুর্গতিযুতো যদি স্তৌতি প্রাতঃ প্রতিদিনমনন্যাশ্রয়তয়া। হয়াহ্রেষৈঃ কামং করকুসুমপুঞ্জৈ রবিসুতাং সদা ভোক্তা ভোগান্মরণসময়ে যাতি হরিতাম্ ॥ ৯ ॥

ইতি শ্রীভগবান্ শঙ্করাচার্য্যবিরচিতাং যমুনাষ্টকং সম্পূর্ণম্।

তোমার নাসিকাতে করিবরের মুক্তা ভূষণ আছে তাহা বায়ুদ্বারা চঞ্চল হইয়া অতি চমৎকারভাব ধারণ করিতেছে; তোমার মুখপদ্মের সৌরভে চঞ্চল হইয়া মধুকরগণ মত্ত হইয়াছে উহারাই তোমার চক্ষুস্বরূপ। তোমার কুণ্ডলে যে সকল মণি তাহা দুলিতেছে ও তাহার শোভাদ্বারা তোমার গণ্ডযুগল নির্ম্মল হইয়াছে হে যমুনে! হে ভয়নিবারিণি! হে শঙ্কটনাশিনি! তুমি আমাকে পবিত্র কর ॥ ৭ ॥

গমনকালে তোমার অরুণবর্ণ চরণপদ্মে হেমময় নূপুরের "ধিমি ধিমি" তালে শব্দ হইতেছে তাহাতে মন মুগ্ধ হইয়া থাকে। মনুষ্য তোমার পাদপদ্ম আশ্রয় করিলে সমুদায় তাপ দূর করে। হে যমুনে! হে ভয়নিবারিণি! হে শঙ্কটনাশিনি! আমাকে পবিত্র কর ॥ ৮ ॥

সংসাররূপ উত্তাপসমুদ্রে পতিত হইয়া মনুষ্য দুর্গতিযুক্ত হইয়া যদি প্রতিদিন প্রাতঃকালে অনন্যমনে তোমার স্তব করে ও হস্তস্থিত কুসুমসমূহদ্বারা রবিসুতাকে পূজা করে তাহা হইলে ইহকালে বিবিধ সুখভোগ করিয়া মৃত্যুকালে হরিপদ প্রাপ্ত হয় ॥ ৯

শ্রীবিধুভূষণ দেব।

যমুনাষ্টকস্তোত্রম্।

মুরারিকায়কালিমা ললামবারিধারিণী তৃণীকৃত ত্রিবিষ্টপা ত্রিলোকশোকহারিণী। মনোনুকূলকূলকুঞ্জপুঞ্জধূতদুর্ম্মদা ধুনোতু মে মনোমলং কলিন্দনন্দিনী সদা॥ ১॥

মলাপহারি-বারি-পূরি-ভূরিমণ্ডিতামৃতা ভৃশং প্রপাতক প্রপঞ্চনাতিপণ্ডিতা নিশা। সুনন্দনন্দিনাঙ্গসঙ্গ রাগরঞ্জিতা হিতা ধুনোতু মে মনোমলং কলিন্দনন্দিনী সদা॥ ২॥

লসৎ তরঙ্গসঙ্গধূতভূতজাতপাতকা নবীনমাধুরীধুরীণভক্তিজাত চাতকা। তটান্তবাসদাসহংসসংস্থতাহ্নি কামদা ধুনোতু মে মনোমলং কলিন্দনন্দিনী সদা॥ ৩॥

যাঁহার শরীর শ্রীকৃষ্ণের শরীরের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ, যিনি মনোহর বারিধারিণী, যিনি স্বর্গকেও তুচ্ছ করেন, যিনি ত্রিলোকের শোক হরণ করেন, যিনি স্বীয় তীরের কুঞ্জ সকলের মলা ধৌত করেন সেই যমুনা সর্ব্বদা আমার মনের ময়লা ধৌত করুন॥ ১॥

যাঁহার জল মলাপহারী, যিনি প্রচুর জলপরিপূর্ণ হইয়া শোভা পাইতেছেন, যিনি অত্যন্ত পাতক নাশ করেন, যিনি পাতকের নিশাস্বরূপ, যিনি গোপরমণীগণের অঙ্গরাগে রঞ্জিতা হন্ সেই যমুনা সর্ব্বদা আমার মনের ময়লা ধৌত করুন॥ ২॥

যাঁহার তরঙ্গ সঙ্গে জীবগণ পাপ হইতে মুক্ত হন, যাঁহার নবীন জলমাধুরীতে মুগ্ধ হইয়া চাতকগণও সেবা করে, যাঁহার তীরে হংসগণ ভৃত্যের ন্যায় বাস করে যিনি হংস সকলের কামনাপূর্ণ করেন সেই যমুনা সর্ব্বদা আমার মনের ময়লা ধৌত করুন॥ ৩॥

বিহাররাসখেদভেদ-ধীর-তীর-মারুতা গতা গিরামগোচরে যদীয় নীর চারুতা। প্রবাহ সাহচর্য্যপূত মেদিনী নদী নদা, ধুনোতু মে মনোমলং কলিন্দনন্দিনী সদা॥ ৪॥

তরঙ্গসঙ্গসৈকতান্তরান্বিতং সদা সিতা, শরন্নিশাকরাংশুমঞ্জুমঞ্জরী সভাজিতা। ভবার্চ্চনা প্রচারনাম্বুনাধুনা বিশারদা, ধুনোতু মে মনোমলং কলিন্দনন্দিনী সদা॥ ৫॥

জলান্তকেলিকারি চারু রাধিকাঙ্গরাগিণী, স্বভর্ত্তুরন্য দুর্লভাঙ্গতাঙ্গতাংশভাগিনী। স্বদত্ত সুপ্তসপ্তসিন্ধুভেদিনাতি কোবিদা, ধুনোতু মে মনোমলং কলিন্দনন্দিনী সদা॥ ৬॥

যাঁহার তীরের মনোহর পবন রাসক্রীড়ার ক্লেশ নাশ করে, যাঁহার জলের গুণ বাক্যদ্বারা শেষ করা যায় না, যাঁহার প্রবাহ সাহায্যে পৃথিবী, নদী ও নদসকল পবিত্র হইতেছে, সেই যমুনা সর্ব্বদা আমার মনের ময়লা ধৌত করুন॥ ৪॥

যিনি তরঙ্গসঙ্গে স্থিত সৈকত প্রদেশস্থ বালুকাদ্বারা সর্ব্বদা শুভ্রবর্ণা, যিনি শরচ্চন্দ্রের কিরণসমূহদ্বারা শোভিতা, যাঁহার জলে মহাদেবের পূজা করিলে মন নির্ম্মল হয়, সেই যমুনা সর্ব্বদা আমার মনের ময়লা ধৌত করুন॥ ৫॥

যাঁহার জলমধ্যে ক্রীড়া করিয়া শ্রীরাধার অঙ্গের চারুতাবৃদ্ধি করে, যিনি স্বীয় পতি ব্যতিরেকে অন্যের দুর্লভ ও যিনি স্বামীর অর্দ্ধাংশভাগিনী, যিনি সপ্তসিন্ধুকে জলদানে পরিজ্ঞাতা, সেই যমুনা সর্ব্বদা আমার মনের ময়লা ধৌত করুন॥ ৬॥

জলচ্যুতাচ্যুতাঙ্গরাগলম্পটালিশালিনী, বিলোল রাধিকা কচান্তচম্পকালিমালিনী। সদাবগাহনাবতীর্ণভর্ত্তৃভৃত্য নারদা, ধুনোতু মে মনোমলং কলিন্দনন্দিনী সদা॥ ৭॥

সদৈব নন্দিনন্দকেলিশালি কুঞ্জমঞ্জুলা তটোত্থ-

ফুল্লমল্লিকাকদম্বরেণুসূজ্জ্বলা। জলাবগাহিনাং নৃণাং ভবাব্ধিসিন্ধুপারদা ধুনোতু মে মনোমলং কলিন্দনন্দিনী সদা॥ ৮॥

শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যবিরচিতং যমুনাষ্টক-

স্তোত্রং সমাপ্তং।

যাঁহার জলে পরিত্যক্ত শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গরাগ মুগ্ধ হইয়া শ্রীমতী শ্রীকৃষ্ণের প্রণয়শালিনী হইয়াছিলেন, শ্রীরাধিকার কেশকলাপ হইতে চম্পকমাল্য পতিত হইলে যদ্দ্বারা শোভিতা হইতেন, সর্ব্বদা অবগাহন করিলে যাঁহার জল ভর্ত্তৃভৃত্যভাব দূর করেন, সেই যমুনা সর্ব্বদা আমার মনের ময়লা ধৌত করুন॥ ৭॥

যাঁহার জলে কেলি করিয়া সকলেই সর্ব্বদা আনন্দিত থাকেন, যিনি কুঞ্জশোভা বৃদ্ধি করেন যাঁহার তীরে প্রস্ফুটিত মল্লিকা ও কদম্বরেণু দ্বারা যিনি শোভিতা হন, তাঁহার জলে যাঁহারা সর্ব্বদা অবগাহন করেন তাঁহারা ভবসাগরের পারে গমন করিতে পারেন সেই যমুনা সর্ব্বদা আমার মনের ময়লা ধৌত করুন॥ ৮॥

শ্রীবিধুভূষণ দেব।

পঞ্চদশী।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

বৃক্ষস্য স্বগতো ভেদঃ পত্রপুষ্পফলাদিভিঃ।
বৃক্ষান্তরাৎ সজাতীয়ো বিজাতীয়ঃ শিলাদিতঃ॥১৫
তথা সদ্বস্তুনোঃ ভেদত্রয়ং প্রাপ্তং নিবার্য্যতে।
ঐক্যাবধারণদ্বৈতপ্রতিষেধৈস্ত্রিভিঃ ক্রমাৎ॥১৬॥

পূর্ব্বশ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, জগৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে কেবল স্বগত, স্বজাতীয় ও বিজাতীয় ভেদশূন্য পরমাত্মা পরংব্রহ্মই বিদ্যমান ছিলেন, কিন্তু এই শ্লোকে দৃষ্টান্তত্রয় প্রদর্শন করিয়া সেই ভেদত্রয়ের নিরূপণদ্বারা পরমাত্মার স্বরূপ নির্ণয় করিতেছেন। যেমন একটী বৃক্ষ স্বীয় পত্র, পুষ্প ও ফল হইতে পৃথক্, তাহার পত্র, পুষ্প অথবা ফল প্রভৃতি কিছুকেই সেই বৃক্ষ বলা যায় না, এইপ্রকার ভেদজ্ঞানকে স্বগত ভেদ বলে॥ ঐরূপ স্বজাতীয় বৃক্ষমধ্যে বিভিন্ন একটী বৃক্ষকেও সেই বৃক্ষ বলিয়া প্রতীত হয় না, এইপ্রকার বিভিন্নতাকে স্বজাতীয় ভেদ বলা যায়। পরন্ত প্রস্তরাদি হইতে বৃক্ষের পার্থক্য সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয় ইহাকে (এইরূপ ভেদজ্ঞানকে) বিজাতীয় ভেদ বলে। সেইপ্রকার সৎস্বরূপ পরমাত্মাতে উক্তরূপ ভেদত্রয় দৃষ্ট হয় না। "একং, এব ও অদ্বিতীয়" এই তিন বিশেষণদ্বারা পরমাত্মার পূর্ব্বোক্ত ভেদত্রয় নিবারিত হইয়াছে। সৎস্বরূপ পরমাত্মা "একং" অর্থাৎ তিনি অদ্বিতীয় বা শ্রেষ্ঠ; এই বিশেষণ থাকা প্রযুক্ত তাঁহার স্বগত ভেদ নাই। এইরূপ "এব" তিনিই এই বিশেষণ থাকাপ্রযুক্ত অর্থাৎ তিনি নিশ্চয়তঃ নিত্য ও সত্য, এই নিমিত্ত তাঁহার স্বজাতীয় ভেদ অসম্ভব এবং তিনি "অদ্বিতীয়" এই জন্য পরমাত্মার বিজাতীয় ভেদ সম্ভব হয় না॥ ১৫-১৬॥

সতো নাবয়বাঃ শঙ্ক্যাস্তদংশস্য নিরূপণাৎ।
নামরূপেণ তস্যাংশৌ তয়োরদ্যাপ্যনুদ্ভবাৎ॥১৭॥

পরমাত্মা পরংব্রহ্ম নিরাকার, তাঁহার স্বরূপের কোন অবয়ব নাই, এই নিমিত্ত তাঁহার স্বরূপের স্বগত ভেদ অর্থাৎ অবয়বের বিভিন্নতা অসম্ভব, যেহেতু জগৎ-কারণ ব্রহ্ম সদ্বস্তুর কোন অবয়বের

নিরূপণ হইতে পারে না। এই নিমিত্ত সেই আদি কারণ জগৎপাতা জগদীশ্বরের স্বরূপের কোন অবয়বের আশঙ্কা হইতে পারে না এবং ঘটপটাদি সাধারণ বস্তুর ন্যায় ব্রহ্মের কোন প্রকার রূপ বা নামের আশঙ্কাও সম্ভবপর নহে এবং নাম বা রূপ ইহারাও তাঁহার স্বরূপের অংশ হইতে পারে না। যখন নাম বা রূপের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার পূর্ব্বেও সচ্চিদানন্দ, সনাতন সিদ্ধরূপী পরাৎপর পরংব্রহ্ম বিদ্যমান ছিলেন॥ ১৭॥

নামরূপোদ্ভবস্যৈব সৃষ্টিত্বাৎ সৃষ্টিতঃ পুরা।
ন তয়োরুদ্ভবস্তস্মাৎ সন্নিরংশং যথা বিয়ৎ॥১৮॥

নাম ও রূপের উৎপত্তিকে সৃষ্টি বলা যায়। কোন এক বস্তুর সৃষ্টি হইলেই তাহার নাম ও রূপের সম্ভব হয়, সৃষ্টির পূর্ব্বে নাম ও রূপের সত্ত্বার কথনই সম্ভব হয় না। অতএব যেমন আকাশের স্বগতভেদ অসম্ভব উক্ত হইয়াছে সেইপ্রকার পরম ব্রহ্মেরও স্বগত ভেদের সম্ভব হইতে পারে না॥ ১৮॥

সদন্তরং সজাতীয়ং ন বৈলক্ষণ্যবর্জ্জনাৎ।
নামরূপোপাধিভেদং বিনা নৈব সতোভিদা॥১৯

সচ্চিদানন্দ পরম ব্রহ্মের স্বজাতীয়ভেদও অসম্ভব, অর্থাৎ সর্ব্বনিয়ন্তা সর্ব্বেশ্বরের স্বজাতীয় কোন পদার্থ নাই। যেহেতু সচ্চিদানন্দ পুরুষোত্তম পরব্রহ্মের স্বরূপের কোনপ্রকার ভেদ নাই, তিনি একরূপ ও অদ্বিতীয় সুতরাং তাঁহার সমানরূপী ও স্বজাতীয় অন্য কোন পদার্থ নাই এবং নামরূপাদি উপাধি ব্যতিরেকেও সেই নিত্যানন্দময় পরম ব্রহ্মের স্বরূপের প্রভেদ সম্ভব হয় না এবং নাম ও রূপদ্বারা এবং উপাধিদ্বারা যে প্রভেদ হয়, তাহা প্রকৃত পদার্থের বা স্বরূপের প্রভেদ নহে; এক জাতীয় পদার্থের নানাপ্রকার নাম ও রূপ থাকে, কিন্তু সেই সকল নাম ও রূপের ভেদে কদাচ প্রকৃত পদার্থের ভেদ হইতে পারে না, কেবলমাত্র নামরূপাদি উপাধির ভেদ হইয়া থাকে॥ ১৯॥

বিজাতীয়মসৎ তৎ তু ন খল্বস্তীতি গম্যতে।
নাস্যাতঃ প্রতিযোগিত্বং বিজাতীয়াদ্ভিদা কুতঃ॥২০

এইক্ষণে সেই সৎরূপ পরম পুরুষ পরম ব্রহ্মের বিজাতীয়ভেদের অভাব বিবৃত হইতেছে। সেই পুরুষোত্তম অনাদি অদ্বিতীয় ব্রহ্ম হইতে বিভিন্ন জাতীয় অন্য কোন পদার্থ এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে বিদ্যমান নাই। এই পরিদৃশ্যমান জগতে কেবল জগৎকর্ত্তা জগদীশ্বর ব্রহ্মই সৎ পদার্থ, তিনিই অনন্তকাল বিদ্যমান থাকেন। অন্য কোন পদার্থের অনন্তকাল বিদ্যমানতা দেখা যায় না; এই নিমিত্ত ব্রহ্ম ভিন্ন সকল পদার্থকেই অসৎ বলা যায় এবং তাহারা অসৎরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যাহাকে অসৎ বলা যায়, তাহার আর সৎস্বরূপ কোথায়? অতএব অসৎ বস্তুদ্বারা সৎস্বরূপ পরম ব্রহ্মের প্রভেদ হইতে পারে না॥ ২০॥

উপরোক্ত পঞ্চদশ শ্লোক হইতে বিংশতি শ্লোকপর্য্যন্ত সরল ব্যাখ্যা—

একমেব দ্বিতীয় সতের স্বগত, সজাতীয় ও বিজাতীয় কোনপ্রকার ভেদ নাই, এস্থানে এই তিন প্রকার ভেদ নাই বলার তাৎপর্য্য এই যে বস্তুর তিনপ্রকার ভেদ ব্যতীত আর কোন প্রকার ভেদ বুঝাইতে পারে না, যথা (১) বস্তুর স্বগত ভেদ অর্থাৎ নিজের অন্তর্গত বস্তুর মধ্যে পরস্পরের যে ভেদ তাহাকে স্বগত ভেদ কহে যেমন বৃক্ষের পত্র, পুষ্প ও শাখা কাণ্ড ফল ইত্যাদি, মনুষ্যের হস্ত, পদ, চক্ষু, কর্ণ ইত্যাদি। (২) স্বজাতীয় ভেদ অর্থাৎ নিজের সমশ্রেণীস্থ কোন বস্তুর সহিত নিজের যে ভেদ তাহাকে স্বজাতীয় ভেদ বলে যেমন দুইটী বৃক্ষের মধ্যে বা দুইটী মনুষ্যের মধ্যে পরস্পরের ভেদ। (৩) বিজাতীয় ভেদ অর্থাৎ নিজের অসমশ্রেণীর মধ্যে

পরস্পরের যে ভেদ তাহাকে বিজাতীয় ভেদ কহে যেমন বৃক্ষের সহিত পর্ব্বতের মনুষ্যের সহিত গবাদি পশুর ভেদ। সৎ অর্থাৎ পর-ব্রহ্মের এই তিন প্রকারের কোন প্রকার ভেদ না থাকার কারণ এই যে সৎ অর্থে অস্তিত্ব বা আছে, অস্তিত্বের প্রতিযোগী কোন বস্তু নাই। বস্তু স্বীকার করিলেই তাহার অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইবে অতএব অস্তিত্ব অস্তিত্বের প্রতি-যোগী কি বিজাতীয় নহে? ঐ অস্তিত্বের সহিত নাস্তিত্বের ভেদ হইতে পারে না, যাহা নাই তাঁহার সহিত আর ভেদ হইবে কিসের? অতএব নাস্তিত্ব অস্তিত্বের প্রতিযোগী নহে বা নাস্তিত্ব কোন বস্তু নহে, সুতরাং নাস্তিত্বের সহিত অস্তিত্বের বিজাতীয় ভেদ অসম্ভব। ঐ সৎই একমাত্র অস্তিত্ব ঐ একমেবাদ্বিতীয় সদ্ব্রহ্মের সমশ্রেণীস্থ আর দ্বিতীয় কিছুই নাই, সুতরাং স্বজাতীয় ভেদও হইতে পারে না। ঐ সৎ বা অস্তিত্ব নিরংশ, যেমন দেহের মধ্যে মস্তক, হস্ত, পদ, অঙ্গুলি, নাসিকা, চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি পৃথক্ পৃথক্ বস্তু আছে; বৃক্ষের মধ্যে কাণ্ড, শাখা, পল্লব, পত্র, ফল ও পুষ্প ইত্যাদি পৃথক্ পৃথক্ পদার্থ আছে, সেইরূপ সদ্ব্রহ্মের মধ্যে পৃথক্ পৃথক্ কোন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নাই; কে কাণ্ড শাখা পত্র পুষ্পের ন্যায় পৃথক্ পৃথক্ বস্তু নাই। আকার বিশিষ্ট বস্তুর পৃথক্ পৃথক্ অংশ আছে, যাহার আকার নাই, গুণ নাই, অসীম অনন্ত নিরাকার ও নির্গুণ তাহার মধ্যে অংশাংশি ভাব থাকিতে পারে না। কোন বস্তুর অংশ করিতে হইলে ঐ উভয় অংশের মধ্যে কোন সীমা, চিহ্ন বা রেখা কি অবকাশ ব্যতীত বস্তুর পার্থক্য নির্ণীত হইতে পারে না। কিন্তু যাহার সীমা আকার বা গুণ নাই, তাহার অংশ কি প্রকারে হইবে? যেমন আকাশের অংশ হইতে পারে না। আকাশ নিরাকার তাহার কোন স্বগত বা অন্তর্গত ভেদ নাই, সতের ও স্বগতভেদ অসম্ভব। আকাশ শূন্য কিন্তু সৎ শূন্য নহে, সৎ অর্থে অস্তিত্ব বা আছে। এইক্ষণ বিপক্ষ বাদীরা এই বলিয়া তর্ক করিতে পারেন যে, যাহার আকার নাই, গুণ নাই, চিহ্ন নাই, বা কোন প্রকারে নির্দ্দেশ করিবার উপায় নাই, তাহা জ্ঞানানুভবের অতীত অতএব যাহা ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধিদ্বারা কোন প্রকারে ধারণা বা অনুভব করা যায় না, তাহা আছে স্বীকার করিব কেন? ইহার উত্তরে জিজ্ঞাস্য এই যে ঐ অনুভব করে কে? তুমি উত্তরে বলিবে আমি অনুভব করি, তদু-ত্তরে আমি পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করি যে তুমি বলিতেছ যে আমি অনুভব করি, তোমার সে আমি কে? বা কি পদার্থ? ইহার উত্তর তুমি সহজে দিতে পারিবে না। উত্তর দিতে না পারিয়া অবশেষে তোমার বাধ্য হইয়া বলিতে হইবে যে আমার জ্ঞানই বিষয় অনুভব করে, অবশ্য ঐ জ্ঞানের আকার তুমি দেখিতে পাও না বা গুণও অনুভব করিতে পার না, কারণ স্বয়ং জ্ঞানই বিষয় অনুভব করে, জ্ঞান অন্য কোন বিষয় দ্বারা অনুভূত হইতে পারে না। তোমার যে জ্ঞান আছে ইহা তুমি স্বীকার করিতে বাধ্য, যেহেতু তুমি জ্ঞানদ্বারা অনুভব করিতেছ যে তুমি আছ, অতএব যখন তুমি আছ তখন তোমার জ্ঞানও আছে স্বীকার করিতে হইবে। তুমি যে বলিতে ছিলে যে যাহার আকার নাই, গুণ নাই তাহা আছে স্বীকার করিব কেন? ঐ স্বীকার করিব না ভাবটি কে প্রকাশ করিতেছে? অবশ্যই ঐ ভাবটি জ্ঞানকর্ত্তৃক উপলব্ধ হইয়া ঐ জ্ঞানই ভাষাদ্বারা ব্যক্ত করিতেছে অতএব তোমার জ্ঞান আছে ইহা নিশ্চিত। জ্ঞান না থাকিলে তুমিও থাকিতে পার না, কিন্তু তুমি না থাকিলেও জগতে

জ্ঞানের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয় না যেহেতু জগতে জ্ঞান না থাকিলে জগৎ অপ্রকাশ হয় অর্থাৎ জগৎ বা জগতের কোন বিষয় প্রকাশ থাকে না। কারণ জ্ঞানের অভাব হইলে জগৎ বা জগতের বিষয়কে কে অনুভব করিবে? অতএব জ্ঞানের উপরিভাগে জগৎ বা জাগতিক বিষয় সকল ভাসমান আছে। বিষয় না থাকিলেও জ্ঞান থাকিতে পারে, যখন কিছুই না থাকে তখন শূন্য বা কিছুই নাই অনুভব হয়। ঐ শূন্য বা নাস্তি কে অনুভব করে? অবশ্য জ্ঞানই শূন্য বা কিছু নাই অনুভব করে, ভাষান্তরে বলিতে হইলে যখন কিছুই না থাকে, তখন শূন্য বা কিছুই নাই এই অনুভূতি মাত্র জ্ঞানের উপর ভাসমান হয়। অতএব জ্ঞানে বা চৈতন্যই নিত্য সৎ ব্রহ্ম। যখন জ্ঞানে বা চৈতন্যে কিছুই ভাসমান না হয় তখন বিষয়াভাবে ঐ জ্ঞান কেবল নিরবচ্ছিন্ন আনন্দমাত্রে পর্য্যবসিত হইয়া অব্যক্ত হয়, কেবল জ্ঞানেই জ্ঞানের অস্তিত্ব মাত্র থাকে। অতএব তিনি সৎ-চিৎ-আনন্দ—সচ্চিদানন্দ। এখন তুমি বলিতে পার যে জ্ঞানই যদি সৎ হন তবে তাহার বিকাশাবস্থায় নামরূপও ব্যক্ত হয়। সমষ্টি জ্ঞানের বিকাশই ঈশ্বর এবং তাঁহার অংশস্বরূপ ব্যষ্টিজ্ঞানের আধার জীব হইতেছে, সুতরাং ঈশ্বর ও জীব প্রভৃতির মধ্যে ভেদ ও নামরূপ ব্যক্ত আছে। তাহাহইলে ঐ নাম ও রূপদ্বারা তাঁহার স্বগতভেদ না হইবে কেন? যেমন তোমার চক্ষু কর্ণ হস্ত পদাদি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের দ্বারা তোমার দেহের স্বগত ভেদ আছে, যেমন বৃক্ষের পত্র, পুষ্প, ফল, শাখাপ্রভৃতিদ্বারা বৃক্ষের স্বগত ভেদ আছে সেই রূপসমষ্টি ঈশ্বরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বা অংশস্বরূপ ব্যষ্টি জীবসমূহের দ্বারা ঈশ্বরের স্বগতভেদ স্বীকার করিতে হইবে *

* তাৎপর্য্য এই যে ঈশ্বর যেন বৃক্ষ জীবাদি তাহার পত্র পুষ্প ফল প্রভৃতিস্বরূপ ইহা বিপক্ষের তর্ক।

আবার জীবন যখন আংশিক জ্ঞানের আধার। তখন পরস্পর জীবের মধ্যে স্বজাতীয় ও বিজাতীয় ভেদ আছে। তোমার উপরোক্ত তর্ক নিতান্ত অমূলক, যেহেতু নামরূপ ও উপাধি কল্পিত পদার্থ যদি এক ব্যক্তির দশটী উপাধি বা দশটী নাম থাকে এবং সেই ব্যক্তি ইন্দ্রজালিকের ন্যায় দশপ্রকার রূপ ধারণ করিতে পারে তাহাহইলে ঐ এক ব্যক্তির দশটী নাম বা রূপের দ্বারা তাহার মধ্যে, কখন স্বগত বা স্বজাতীয় কি বিজাতীয় ভেদ হইতে পারে না। * তুমি বলিয়াছ সমষ্টিই ঈশ্বর, জীব তাহার অংশ বা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, কিন্তু স্বরূপতঃ ঈশ্বর বা জীব প্রকৃত বস্তু নহে। ঈশ্বর শক্তি উপাধিমাত্র, জীবও তদন্তর্গত বহু নামরূপধারি কোষোপাধি মাত্র। যেমন রামচন্দ্র, রায় বাহাদুর উপাধিপ্রাপ্ত হইয়া তিনি ডেপুটী মাজেষ্ট্রেরী, ডেপুটী কালেক্টরী, মুনসেফী, ডাক্তারী, ইঞ্জিনিয়ারি, মানেজারি প্রভৃতি বহুতর কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া সেই সেই নামে বিখ্যাত হইয়া সেই সেই উপাধি পাইলেন, তাঁহার ঐ সমস্ত উপাধির সমষ্টিই তাঁহার রায়বাহাদুর উপাধি, অথবা অন্য আর একভাবে দেখিলে দেখিতে পাইবেন যে রামচন্দ্র সবডিভিজনাল অফিসার হইয়া তদন্তর্গত ডেপুটীমাজেষ্ট্রেট্, ডেপুটীকালেক্টর ট্রেজেরার জেল-সুপারিনটেণ্ডেণ্ট, মিউনিসিপাল চেয়ারম্যান, লোকালবোর্ডের চেয়ারম্যান্ ইত্যাদি পদপ্রাপ্ত হইলেন, ঐ সমস্ত পদ বা উপাধিগুলি রামচন্দ্রের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নহে,

* এক ব্যক্তির বহু উপাধিসম্বন্ধীয় উদাহরণটী এক দেশ সাদৃশ্য মাত্র তদ্ভিন্ন অনন্ত কখন সান্ত বা উপাধিবিশিষ্ট হইতে পারে না। জগৎ তাঁহার ভাবের প্রতিবিম্ব বা ছায়া মাত্র এ প্রতিবিম্বের উপধি বা নামরূপ ব্যক্ত হয়। তাঁহার ভাবের প্রতিবিম্ব বলিয়া তাঁহার উপধি কল্পিত হয়। স্বরূপতঃ তিনি নিরুপাধি।

সবডিভিজনাল অফিসের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অতএব ঐ সকল পদ বা উপাধিদ্বারা প্রকৃত রামচন্দ্রকে স্বগত বা স্বজাতীয় বিজাতীয় প্রভৃতি কোন প্রকার ভেদ করা যাইতে পারে না, যেহেতু ঐ সমস্ত উপাধিই একা রামচন্দ্রের, ঐ সকল উপাধি গ্রহণের পূর্ব্বে যে রামচন্দ্র ছিলেন ঐ উপাধি গ্রহণের পরেও সেই রামচন্দ্র আছেন, উপাধিদ্বারা রামচন্দ্রের মধ্যে কোন ভেদ হয় নাই। রামচন্দ্রের ঐ পদ বা উপাধি পূর্ব্বেও ছিলনা, পরেও থাকিবে না, কিন্তু প্রকৃত রামচন্দ্র (আত্মা) চির অমর, তাঁহার (আত্মার) কোনও উপাধি বা পদ কিছুই নাই, কেবল রামচন্দ্রের মাটীর দেহ ঐ সকল উপাধি বা পদের অভিমানী। ঐ মাটীর দেহ মাটীতেই মিশিবে, দেহ মুক্ত হইলে তাঁহার ঐ সকল পদের অভিমান থাকিবে না, সেইরূপ ব্রহ্মের প্রকৃতি-রূপ শক্তিময় দেহ ঈশ্বরোপাধির অভিমানী, আবার প্রকৃতির বিকাররূপ পঞ্চকোষময় দেহ * জীবোপাধির অভিমানী। ঐ জীবই দেবতা, মনুষ্য, পশুপক্ষীরূপে প্রকাশিত এবং ঐ সকল দেব মানবাদি নামে অভিহিত হন। ঐ সকল নামরূপ জীবের হইতেছে, জীব উপাধি মাত্র, অতএব শক্তি এবং কোষ হইতে বিচ্ছিন্ন হইলেন প্রকৃত সদ্বস্তুর কোন উপাধি বা নাম রূপ থাকিতে পারে না। এতাবতায় অবধারিত হইল যে উপাধি ও নাম-রূপদ্বারা সদ্ব্রহ্মের স্বগত বা স্বজাতীয় কি বিজাতীয় কোন ভেদ নাই। এই পঞ্চদশী ব্যাখ্যার পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রবন্ধে প্রমাণিত হইয়াছে যে ব্রহ্মের ত্রিগুণময়ী শক্তি বা প্রকৃতি ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ পদার্থ নহে † আবার ঐ শক্তি স্বয়ং ব্রহ্মও নহে যেমন অগ্নির দাহিকাশক্তি অগ্নি হইতে পৃথক্ নহে এবং দাহিকাশক্তি স্বয়ং অগ্নি ও নহে উহা অগ্নির ক্রিয়াশক্তি বা স্বভাব, সেইরূপ ব্রহ্মশক্তিও স্বভাব বা প্রকৃতি নামে উক্ত হয়। ঐ শক্তি বা স্বভাব চিন্ময় ব্রহ্মের চিজ্জ্যোতি-দ্বারা চেতনবৎ হইয়া মহত্তত্ত্বে (সমষ্টি বুদ্ধিতত্ত্বে) পরিণত হয়। যেমন দাহিকাশক্তিদ্বারা অগ্নির অগ্নিত্ব প্রকাশিত হয়। সেইরূপ বুদ্ধিকর্ত্তৃক জ্ঞান-জ্যোতি প্রকাশিত হয় ঐ মহদ্বুদ্ধিই চিৎ বা জ্ঞান জ্যোতি প্রকাশের মহদ্দর্পণস্বরূপ। ঐ মহৎ বুদ্ধিরূপ দর্পনস্থ চিদ্বিম্ব (ঈশ্বর) ঐ দর্পণে সৃষ্টি কল্পনা কারি মহামানসাকার প্রকটন করিয়া ও তদাকারে প্রতিবিম্বিত হইয়া আমি সৃষ্টিকর্ত্তা (হিরণ্যগর্ভ) এই অভিমানী হন এবং মহামনের গর্ভ (অন্তর) হইতে বহুবিধ ভাব প্রকটন করিয়া সেই বহুবিধভাবে প্রতিবিম্বিত হইয়া বিরাট বা বৈশ্বানর নামে অভিহিত হন এবং সেই সকল পৃথক পৃথক্ ভাব পৃথক পৃথকরূপে গ্রহণ ও তদাকার ধারণ করিয়া আমি দেব, আমি মানব ইত্যাদি অভিমানী হইয়া বহুতর নাম ও রূপে ব্যক্ত হন *

* ১৩০২ বঙ্গাব্দের হিন্দুপত্রিকার (পঞ্চদশীর তত্ত্ববিবেক) ২০৮।২২২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য তাহাতে পঞ্চকোষের বিস্তারিত বিবরণ আছে।

† ১৩০৩ বঙ্গাব্দের হিন্দুপত্রিকার ২১০।২১১ পৃষ্ঠা এবং ১৩০২ বঙ্গাব্দের শেষ সংখ্যার ১২৯।১৩০।১৩১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য এক ব্রহ্ম কারণ সূক্ষ্ম ও স্থূল উপাধিভেদে ঈশ্বর হিরণ্যগর্ভ ও বিরাট নামে যে অভিহিত হন তাহা ক্রমে ব্যক্ত হইবে।

* পাঠককে পুনর্ব্বার স্মরণ করাইয়া দেই যে অনন্ত কখন সান্ত বা সীমাবিশিষ্ট হয় না বা তাঁহার নাম-রূপও নাই উহা তাঁহার সৃষ্টিকারিণীশক্তি হইতে যে ভাব প্রকটিত হয় সেই ভাবের প্রতিবিম্ব ইংরাজিতে উহাকে objective self বলা যাইতে পারে। আমার ইহা বারম্বার বলিবার তাৎপর্য্য এই যে সম্প্রতি বিগত ৮ই ডিসেম্বর তারিখের ইংরাজী ভাষায় উপাধ্যায় ব্রহ্মবন্ধুর বক্তৃতায় বেদান্ত ব্যাখ্যা সম্বন্ধে যে সকল দোষ উল্লিখিত হইয়াছে (যাহা সত্বর প্রবন্ধে খণ্ডন করিব) উহা যে বাস্তবিক দোষ নহে, তাহাই সংক্ষেপে

যেমন গুঁটিপোকা আপন লাল হইতে সূত্র বাহির করিয়া ও ঐ সূত্রদ্বারা গুঁটি প্রস্তুত করিয়া তন্মধ্যে বদ্ধ হয় সেইপ্রকারে ঐ ভাবময় চিদাভাস (অর্থাৎ চৈতন্যের আভাসরূপ-জীব) স্বীয়ভাব বা স্বভাব হইতে ত্রিগুণসূত্র বাহির করিয়া তদ্দ্বারা গুঁটীর ন্যায় পঞ্চকোষ অর্থাৎ আনন্দময়, বিজ্ঞানময়, মনোময়, প্রাণময় ও অন্নময়কোষ নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে বদ্ধ কোষোপাধি অর্থাৎ আনন্দ, বুদ্ধিমন, প্রাণ ও দেহবিশিষ্ট হইয়া ভিন্ন ভিন্ন নামরূপে ব্যক্ত হয় * এইজন্য জীবাত্মার অপর নাম সূত্রাত্মা। ইহাদ্বারা সাব্যস্ত হইতেছে যে ঐ সকল নামরূপ উপাধি (অর্থাৎ ঈশ্বর ও জীবোপাধি) মায়া বা কল্পনাশক্তি ও কল্পিতভাব ব্যতীত তাঁহার অংশ বা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নহে। অতএব সদ্ব্রহ্ম এক ও অদ্বিতীয় তাঁহার মধ্যে কোন প্রকার ভেদ নাই। আমরা যে সকল বাহ্যবস্তুর রূপ বা আকার চক্ষুদ্বারা দর্শন করি তাহা যে ভিন্ন ভিন্ন পদার্থস্থ সৌরকিরণ বা জ্যোতির প্রতিবিম্ব ব্যতীত অন্য কিছুই নহে তাহা ইতিপূর্ব্বে অনেকবার দর্শাইয়াছি, পদার্থের সহিত আলোক-জ্যোতি এবং চক্ষুর দৃষ্টি শক্তির তারতম্যানুসারে বস্তুর আকার দৃষ্ট হয় তদ্ভিন্ন প্রকৃত বস্তু আমরা দেখিতে পাই না বা অনুভব করিতে পারি না, তাহা যে বিজ্ঞানসম্মত তাহা বিজ্ঞানাভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করিবেন তৎপক্ষে সন্দেহ নাই। যেমন সূর্য্যকিরণ বা আলোক যে পদার্থের উপর পতিত হয় সেই পদার্থাকারে চক্ষে প্রতিবিম্বিত হওয়ায় আমরা সেই পদার্থের রূপ বা আকার দর্শন করি * সেই মত জ্ঞানজ্যোতি এক একটী ভাবস্থ হইয়া তদাকারে বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বিত হওয়ায় দেব. মনুষ্য, পশু, পক্ষী প্রভৃতি নাম ও রূপ অনুভব করি। অর্থাৎ সূর্য্যকিরণ বৃক্ষে পতিত হওয়ায় বৃক্ষের আকার, পর্ব্বতে পতিত হওয়ায় পর্ব্বতাকার, দেহে পতিত হওয়ায় দেহ বা শরীরাকারে চক্ষে প্রতিবিম্বিত হয় তদ্ধেতু বৃক্ষ পর্ব্বত ও জীবজন্তুর রূপ প্রকাশিত হয় এবং ঐ বৃক্ষ পর্ব্বত ও জীবজন্তু ভিন্ন ভিন্ন নামরূপে ব্যক্ত হয় অর্থাৎ আমরা ভিন্ন ভিন্ন জীবও জড়দেহ অনুভব করি। যেমন সূর্য্য বা সূর্য্যকিরণ এক হইয়াও যে যে পদার্থের উপর পতিত হয় সেই সেই পদার্থের ও চক্ষের দৃষ্টিশক্তির অবস্থা ও গুণানুসারে সেই সেইরূপে প্রতিবিম্বিত ও তদাকারে ব্যক্ত হয় যথা বৃক্ষ পর্ব্বত প্রভৃতি, সেইরূপ জ্ঞান বা জ্ঞানজ্যোতি অদ্বৈত হইয়াও যে যে ভাবস্থ হয় সেই সেই ভাব ও বুদ্ধির তারতম্যানুসারে অর্থাৎ তাহাদিগের (সত্ত্ব-রজ-তম) গুণানুসারে জীব নানারূপে ব্যক্ত হয় যথা দেব, † মানব, পশু, পক্ষী ইত্যাদি। ইহাদ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে

বর্ণান উদ্দেশ্য। ১৮৯৭।১৪ ডিসেম্বর তারিখের ষ্টেটসম্যান পত্রিকায় উক্ত বক্তৃতার সারাংশ প্রকাশ আছে।

* পূর্ব্বোক্ত কল্পিতভাবসমূহ কি প্রকারে আকাশ, বায়ু, তেজ, জল ও ক্ষিতিতত্ত্বে বিবর্ত্তিত হইয়া সূর্য্য, চন্দ্র গ্রহ, নক্ষত্র, পৃথিবী ও পার্থিব জড় ও জীবজন্তুর দেহ প্রাণ, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধিতত্ত্বে যে পরিণত হয় তাহার বিবরণ এই পত্রিকায় আমার রচিত পুনর্জ্জন্মতত্ত্ব প্রবন্ধে বিশদভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

* আমার রচিত হিন্দুপত্রিকায় "পুনর্জ্জন্ম" প্রবন্ধের শেষাংশ দ্রষ্টব্য উহাতে প্রতিবিম্বে যে তৈজস অণু আছে তাহা প্রমাণিত হইয়াছে এবং উহা বিজ্ঞানসম্মত।

† দেবতা ও জীব তবে পার্থিব জীবের ন্যায় স্থূল-ভাবাপন্ন নহে। এই জগতে স্থূল ও সূক্ষ্ম উভয়প্রকার জীব আছে যেমন স্থূলজীব মানব বা পশু প্রভৃতি সেই-রূপ সূক্ষ্মজীব দেব, গন্ধর্ব্ব, পিশাচ প্রভৃতি। ইহার (বিশদব্যাখ্যা) পুনর্জ্জন্মতত্ত্বে বর্ণিত হইয়াছে।

যেমন বৃক্ষপর্ব্বতপ্রতিবিম্বিত সূর্য্যকিরণ চক্ষে ভিন্ন ভিন্ন প্রতিভাত হইলে ও সূর্য্যের আলোকের মধ্যে স্বগত স্বজাতীয় বা বিজাতীয় ভেদ নাই, সেইরূপ ভিন্ন ভিন্ন ভাব প্রতিবিম্বিত জ্ঞান জ্যোতি বুদ্ধিতে ভিন্ন ভিন্ন জীবরূপে প্রতি জ্ঞান বা চৈতন্যের কোন প্রকার ভেদ নাই। প্রকৃতপক্ষে সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম এক ও অদ্বিতীয় তাঁহার মধ্যে স্বগত স্বজাতীয় বিজাতীয় ভেদ নাই সাব্যস্ত হইল।

মায়াবাদ।

শ্রবণেন্দ্রিয়।

চক্ষু মহাশয়ের সম্বন্ধে বলার পর শ্রবণেন্দ্রিয় কর্ণ মহাশয়ের কিছু পরিচয় দিব। দর্শনেন্দ্রিয় দ্বারা আমরা নিরপেক্ষরূপ দর্শন করিতে পারি না; কর্ণদ্বারা নিরপেক্ষ শব্দই কি আমরা শুনিতে পাই? কখনই না। একটা হাটে শত শত লোক কথা বলিতেছে:—কেহ কান্দিতেছে, কেহ হাসিতেছে, কেহ দর জিজ্ঞাসা করিতেছে, কেহ দর বলিতেছে, কোথাও মারামারি, কোথাও কাড়াকাড়ি, কোন স্থানে ছাগগণের ক্ষীণরব, স্থানান্তরে বলীবর্দ্দের গভীর নিনাদ, আমি প্রায় তিন ক্রোশ দূর হইতে এ সকলের কিছুই শুনিতে পাইতেছি না। ক্রমে যতই সেই হাটের অভিমুখে অগ্রসর হইতেছি, ততই ক্রমে কিছু কিছু শুনিতে পাইতেছি:—প্রথমতঃ অতি অস্ফুট অব্যক্ত শব্দ, তাহার পর কিঞ্চিৎ স্ফুট একটা হৈ চৈ শব্দ, তাহার পর আরো কিছু অগ্রসর হইয়া নানাপ্রকার শব্দ শুনিতে পাইলাম। একই প্রকার রব শব্দ কেবল দূরত্বভেদে আমার কর্ণে ভিন্ন ভিন্ন আকারে প্রতিঘাত হইতেছে। এই প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া আকাশ সমুদ্রে অসংখ্য শব্দতরঙ্গ ছুটিতেছে, তাহাদের পরস্পরের ঘাত প্রতিঘাতে কোন তরঙ্গ লুপ্ত, কোন তরঙ্গ স্ফুট হইতেছে এবং তাহার পরিণামে যে এক মিশ্রিত তরঙ্গ উৎপন্ন হইতেছে তাহাই আমার শ্রবণেন্দ্রিয়ের বিষয় হইতেছে। কোলাহলময়ী এই পৃথুলবক্ষা পৃথিবী প্রবলবেগে সূর্য্যকে বেষ্টন করিয়া ঘুরিতেছে, এ কি নিঃশব্দে? আমার শরীরের অভ্যন্তরে রসরক্তাদি অসংখ্যপথে খরতরবেগে প্রবাহিত হইতেছে, এ কি নিঃশব্দে? ভক্ষিত পদার্থ সকল আমার জঠরাগ্নিতে অহর্নিশ ভস্মীভূত হইতেছে, ইহাও কি নিঃশব্দে? না তাহা নহে। পৃথিবীর ঘূর্ণনশব্দ, শোণিতের সঞ্চালন শব্দ, পরিপাক-যন্ত্রের সর্ব্বপরিপাচক প্রখরাগ্নির টগবগ শব্দ, সকলেই অবিশ্রামে চারিদিক নিনাদিত করিতেছে, কিন্তু আমরা বিন্দু-বিসর্গও শুনিতে পাইতেছি না!!

যে কয় অবস্থায় চক্ষু দ্বারা রূপ দর্শন করিতে পারি না, সেই কয় অবস্থায় কোন ইন্দ্রিয়দ্বারাই কোন ইন্দ্রিয়ের বিষয়কে ধারণা করা যায় না সুতরাং দূরত্বাদি প্রযুক্ত কর্ণদ্বারাও কিছু শুনা যায় না। ইংলণ্ডে যে সকল কথাবার্ত্তা হইতেছে তাহা আমরা শুনিতে পাই না, আবার কর্ণের মধ্যেই যে শোণিত প্রবাহিত হইতেছে তাহার শব্দও শুনিতে পাই না। কর্ণের বিকার হইলে আমি বধির হই এবং

মন অন্য বিষয়ে নিবিষ্ট থাকিলেও আমি কর্ণে কিছুই শুনিতে পাই না। অতি মৃদু অস্ফুট শব্দ আমার কর্ণে ধরে না, পাশাপাশি দুইটী কামরায় একটীতে বসিয়া অন্যে যে কথা কহে দেয়ালের ব্যবধানে আমি তাহা শুনিতে পাই না। পুনশ্চ, দশটা ঢাক যে সময়ে বাজে সে সময়ে অজাপুত্রের ক্ষীণরব কর্ণে প্রবেশ করে না এবং বহুজন এক কালে একই শব্দ করিলে কে কোন শব্দ করিল তাহাও আমি নির্ণয় করিতে পারি না।

শব্দ শুনিয়া আমরা সচরাচর শব্দের উৎপত্তির দিক্ ও দূরত্ব নির্ণয় করি, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে শব্দ শুনিয়া আমরা তাহার দিক ও দূরত্ব নির্ণয় করিতে পারি না। দূরত্বভেদে শব্দের ঘাত প্রতিঘাতের ন্যূনাধিক্য হয়, এই ভূয়ো দর্শনের উপর নির্ভর করিয়া আমরা অস্ফুট নীচ শব্দকে দূরাগত এবং উচ্চ শব্দকে নিকটাগত মনে করি। এই প্রকার অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া শুদ্ধ কর্ণে শুনিয়া শব্দের উৎপত্তি স্থানে দূরত্ব ও দিক নির্দেশ করিতে যাইয়া, আমরা স্থলবিশেষে উপহাসযোগ্য সিদ্ধান্তে উপনীত হই। আমাদের এই অসতর্কতা বা অক্ষমতার পরিচয় পাইয়া প্রেত সাধকেরা আমাদের পার্শ্বে বসিয়াই আমাদিগকে কত ভূতের শব্দ শুনাইয়া থাকে। শব্দ সাধকপুরুষ আমার সম্মুখে বসিয়াই কথা বলিতেছে, কিন্তু আমার নিকট বোধ হইতেছে যে সে নীরবেই রহিয়াছে এবং দূরস্থ অন্য কোন স্থান হইতে অন্য কেহ কথা কহিতেছে!

দূরত্বের হ্রাস বৃদ্ধিতে আমরা শব্দের উচ্চনীচতা অনুমান করি, আবার কর্ণ পটহের স্থূলাস্থূলত্ব জন্যও শব্দের উচ্চনীচতা অনুভূত হয়। আজ যতদূরের শব্দকে যত উচ্চ বোধ হইতেছে বৃদ্ধাবস্থায় বা অন্য কোন কারণে কর্ণ পটহের স্থূলত্ব উপস্থিত হইলে তত দূরের তত উচ্চ শব্দকে আর তেমন উচ্চ শুনা যাইবে না। সুতরাং শব্দের নিরপেক্ষ কোন মান থাকিলেও তাহা আমাদের অজ্ঞেয় শ্রুত শব্দের বাহ্য অস্তিত্বও জ্ঞেয় নহে। শব্দের রূপাদি কিছু নাই, সুতরাং চক্ষুঃ নাসাদি ইন্দ্রিয় চতুষ্টয় শব্দ সম্বন্ধে কোন কথা বলে না। কেবল কর্ণদ্বারাই শব্দের যা কিছু বুঝিতে পারি। কিন্তু কর্ণের সাক্ষ্যও অস্পষ্ট। শব্দ অনুভব করিবার পূর্ব্বে তাহা বাহিরে ছিল কি না এবং বাহিরে থাকিলে কি আকারে ছিল এবং আমার কর্ণে কি আকার ধারণ করিল ইহা বুঝা যায় না। তবে শব্দের অপরিচিত রূপ ও স্পর্শেন্দ্রিয়ের সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করিয়া আমরা শব্দের বাহ্যাস্তিত্ব সম্বন্ধে কতকগুলি ভুল বুঝিয়া থাকি। দূরে একটী মনুষ্যরূপীকে ওষ্ঠ প্রকম্পন করিতে দেখিলাম। আর তাহার একটু পরেই একটা শব্দ শুনিলাম। সেই প্রকার ওষ্ঠ কম্পন যখনই দেখি তখনই একটু পরে সেই প্রকার শব্দ শুনি। তাহা হইতে সিদ্ধান্ত করি যে ঐ দূরস্থ ওষ্ঠ কম্পন হইতে শব্দ উৎপন্ন হইয়া আমার কর্ণে সঞ্চারিত হয়। ওষ্ঠ কম্পন হইতেছে দর্শনেন্দ্রিয় গ্রাহ্য, আর শব্দ হইল শ্রবণেন্দ্রিয় গ্রাহ্য; এরূপ অবস্থায় ওষ্ঠ কম্পনের সহিত শব্দানুভূতির কার্য্যকারণসম্বন্ধ কাল্পনিক ব্যাপার ভিন্ন আর কি হইতে পারে? ফলতঃ শব্দের বাহ্যাস্তিত্ব প্রত্যক্ষ গন্ধ অনুভব সিদ্ধ জ্ঞান নহে অনুমান সিদ্ধ কাল্পনিক জ্ঞান মাত্র।

পুনশ্চ, যদি মনে করাও যায় যে ওষ্ঠ কম্পন জন্য বায়ু সমুদ্রে যে তরঙ্গ উঠে, সেই তরঙ্গ কর্ণ পটহে প্রতিঘাত হইয়া শব্দের জ্ঞান জন্মায়, তাহা হইলেও শব্দকে বাহ্যবস্তু বা বাহ্যবস্তুনিষ্ঠ কোন গুণ বলিয়া মনে করা উচিত নহে; কেন না শব্দ যতক্ষণ বাহিরে থাকে ততক্ষণ

আর তাহার শব্দত্ব জন্মে না; পূর্ব্বে যাহা কি রকম কি একটা আন্দোলনরূপে থাকে, তাহা কর্ণপটহে প্রতিঘাত হইলে শব্দরূপে পরিণত হয়। বাহিরে যাহা ওষ্ঠ কম্পন, পরে বায়ু সমুদ্রে তথা কথিত শাব্দিকাকাশের অনুমান সিদ্ধ আন্দোলন, তাহাই জীবন্ত অ-বধির মনুষ্য কর্ণে প্রবেশ করিয়া শব্দরূপে পরিণত হয়। শুদ্ধ তাহাই নহে; আমাদের দুইটি কর্ণ। যে কোন ও শব্দের তরঙ্গাকৃতি উভয় কর্ণেই প্রতিঘাত হয়। একটী কর্ণে যে তরঙ্গগুলি প্রতিঘাত হয়, অপর কর্ণে তদিতর অপর কতকগুলি তরঙ্গ প্রতিঘাত হয়। সুতরাং দুইটী কর্ণে দুইটী তরঙ্গ প্রতিঘাত হইয়া যে কালে দুইটী শব্দের জ্ঞান জন্মাইবার সম্ভাবনা দেখা যায়, সে কালে একটী মাত্র শব্দের জ্ঞান হয়। অপর একটী পদার্থে অন্য একটী পদার্থের আঘাত হইলে ঘাত ঘাতক উভয় পদার্থই গতিশীল হইয়া উঠে। উভয়ের গতি একই দিকে হয় না। ঘাত পদার্থের গতি যে দিকে হয় ঘাতক পদার্থের গতি তাহার অপর দিকে হয় এবং আঘাত স্থান হইতে ঘাত ও ঘাতক উভয়ই দূরে সরিয়া যায়, কিন্তু আঘাত স্থানে বায়ু সমুদ্রে যে তরঙ্গ উৎপন্ন হয়, তাহা কেবল ঘাত ঘাতকের দিকে নহে, চারি দিকেই অসংখ্য সরলপথে সঞ্চালিত হয়। চতুর্দ্দিকে সঞ্চালিত অসংখ্য তরঙ্গের কোনও তরঙ্গ পথে বাধা পাইলে আবার তাহার কিয়দংশ সেই বাধক পদার্থে বিলুপ্ত হয়, কতক তাহা হইতে প্রতিক্ষিপ্ত হইয়া বিপরীত পথে গমন করে এবং অসংখ্য তরঙ্গের কোন একটির পথে প্রত্যাবর্ত্তন করে। এইরূপে প্রতিধ্বনি উৎপন্ন হইয়া থাকে। অবাধিত শব্দ তরঙ্গটী অগ্রে পথে সরল পথে এবং প্রত্যাবর্ত্তিত তরঙ্গটী পরে বক্র কর্ণপটহে প্রবেশ করে। ধ্বনি ও প্রতিধ্বনির মূল কারণ এক হইলেও তরঙ্গের সরল ও বক্রপথে আগমন এবং সেই পথের দূরতার ইতরবিশেষে ধ্বনির সহিত প্রতিধ্বনির শব্দগত অনেক বিভিন্নতা ঘটে। এখন যদি মনে করা যায় যে চারিদিকে নানাবিধ পদার্থের ঘাত প্রতিঘাত জন্য একই কালে চারি দিকে অসংখ্য বিধ তরঙ্গ ছুটিতেছে, তাহা হইলে বুঝা যায় যে একবিধ তরঙ্গ অন্যবিধ তরঙ্গের সহিত অসংখ্য অপরিজ্ঞাত স্থানে ঘাত প্রতিঘাত হইয়া কেমন এক জটিল তরঙ্গ উৎপন্ন করে এবং এই জটিল তরঙ্গজাত শব্দকে বিশ্লেষণ করিয়া প্রত্যেক তরঙ্গের বাহ্য অবস্থান অনুভব করা কেমন অসম্ভব।

শব্দ সঞ্চালক পদার্থের শব্দ-পরিচালনী-শক্তির তারতম্যানুসারে শব্দের গতির হ্রাস-বৃদ্ধি হয়। বায়ুমধ্য দিয়া শব্দতরঙ্গ এক সেকেণ্ডে ১১২৮ ফিট যায়। বায়ুর শীতলতায় সুতরাং গাঢ়তায় শব্দতরঙ্গের গতি হ্রাস হয়। অপরাপর বায়বীয় পদার্থের গাঢ়তার ইতর বিশেষেও শব্দগতির ইতর বিশেষ হয়। কার্ব্বণিক এ্যাসিড গ্যাসে সেকেণ্ডে ৮৪৬ ফিট, অক্সিজেন গ্যাসে ১০৪০ ফিট, হাইড্রোজেন গ্যাসে সেকেণ্ডে ৪১৬৩ ফিট গতি হয়। তৈল-জল ইত্যাদি তরল পদার্থে এবং কাষ্ঠ লৌহাদি কঠিন পদার্থে শব্দের গতি বৃদ্ধি হয়। জলে সেকেণ্ডে ৪৭০৮ ফিট গতি হয়। লৌহে ১৬৮০০ ফিট, তাম্রে ১১৬৭০, ওককাষ্ঠে ১০৯০০ এবং পাইন কাষ্ঠে ১৫২২০ ফিট গতি হয়। আবার এদিকে শূন্যস্থান দিয়া শব্দ অনুভূত হয় না।

কোন একটী শাব্দিকতরঙ্গমালাকে যদি পৃথকভাবে শূন্যপ্রদেশ, বায়ু, জল বা তাম্রতরের মধ্য দিয়া সঞ্চালিত করা যায়, তাহা হইলে যে তরঙ্গটী শূন্যস্থান পথে যাইবে তাহার কোন শব্দই কেহ শুনিতে পাইবে না, বায়ুপথে যে

তরঙ্গটী সঞ্চালিত হইবে তাহা শ হাতের বেশী দূরে শুনা যাইবে না, লৌহপথে সঞ্চালিত হইলে তদপেক্ষা অধিক দূরে শুনা যাইবে এবং তাড়িত তারে প্রবাহিত হইলে সাতসমুদ্র পারেও শুনা যাইবে। সুতরাং শব্দবাহক পদার্থের ইতর বিশেষে এবং দূরত্বের তারতম্যানুসারে একই শব্দকে কখন বিলম্বে কখন অবিলম্বে শুনা যায় এবং কখন শুনা যায় কখনও শুনা যায়ও না। ইহাতে এমন হয় যে নিকটের লোক শব্দ শুনিল পরে, দূরের লোক শব্দ শুনিল অগ্রে। নিকটের লোক হয়তো যে কালে কিছুই শুনিতে পাইল না, সে কালে দূরের লোক সুন্দররূপে শুনিতে পাইল।

শব্দায়মান পদার্থের স্পন্দনের ন্যূনাধিক্যে শব্দের মাত্রার হ্রাস বৃদ্ধি হয়। পদার্থের দৈর্ঘ্য বিস্তৃতির হ্রাস বৃদ্ধিতে আবার স্পন্দনের হ্রাস বৃদ্ধি হয়। কোন পদার্থের সকল দেহও আবার সমান স্পন্দিত হয় না। ক্ষুদ্রায়তন স্থূল তাম্র থালিতে আঘাত করিলে, কেন্দ্রস্থান যেমন স্পন্দিত হয় তাহার পরিধি স্থান তেমন স্পন্দিত হয় না; আবার বৃহদায়তন সূক্ষ্ম তাম্রথালিতেও সে আঘাতে তেমন স্পন্দিত হয় না। একটী তাম্র থালীকে ধরণীর সমান্তরালভাবে কোন লৌহস্তম্ভপার্শ্বে আবদ্ধ করিয়া যদি তাহার উপর বালুকা ছড়াইয়া দিয়া থালীর এক পার্শ্বে বেহালার ছড় ঘর্ষণ করা যায়, তাহাহইলে থালীর স্পন্দন জন্য উপরিস্থ বালুকাগুলি নাচিতে নাচিতে একটী বিশেষ জ্যামিতিক আকারে বিন্যস্ত হয়। সুতরাং ঘর্ষিত থালীর সকল প্রদেশ সমান স্পন্দিত হয় এমন বলিতে পারা যায় না। শব্দায়মান পদার্থের স্পন্দন জন্যই শব্দ জ্ঞান জন্মে এবং একই শব্দায়মান পদার্থের ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গের স্পন্দন যদি ভিন্ন ভিন্নরূপের হইল, তাহাহইলে শব্দায়মান পদার্থ হইতে সকলদিকে সমান প্রকৃতির শাব্দিক-স্পন্দন সঞ্চালিত হইয়া থাকে তাহা বলা যায় না, সুতরাং শ্রোতৃগণের দেশ-কাল-পাত্রভেদে তথা কথিত একই শব্দতরঙ্গদ্বারা একই শব্দ জ্ঞান হইবার কথা নহে। অথচ সচরাচর শব্দায়মান পদার্থের একত্বে আমাদের দশজনের কর্ণগত শব্দের একত্ব সিদ্ধান্ত করিয়া থাকি!!

ঘ্রাণেন্দ্রিয়।

রূপ ও শব্দের এবং তাহাদের অনুবোধক ইন্দ্রিয় মহাশয়দিগের পরিচয় দিলাম এখন গন্ধ এবং তদনুভাবক ইন্দ্রিয়ের পরিচয় দিব। গন্ধ এক প্রকার অনুভূতি যাহা আমরা নাসিকাধিষ্ঠিত ঘ্রাণেন্দ্রিয়দ্বারা অনুভব করি। গন্ধের পরিচায়ক ঘ্রাণেন্দ্রিয় এবং ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের পরিচয় দেয় গন্ধ। সুতরাং অন্যান্য ইন্দ্রিয় এবং তাহাদের বিষয়ের মত ইহাদেরও একটীর জ্ঞানাভাবে অন্যটীর জ্ঞান হয় না। আবার ইহাদের একের পরিচয়ে যে অপরের জ্ঞান হয় তাহাও অনাপেক্ষিক নহে। আমি দূরস্থ গন্ধ অনুভব করিতে পারি না, আবার নাসিকার অন্তর্গত শ্লেষ্মার গন্ধও পাই না। অনবরত এক গন্ধ দীর্ঘকাল অনুভব করিতে গেলে ক্রমেই সে গন্ধ ক্ষীণ হইয়া একবারে অন্তর্হিত হয়। উগ্র গন্ধের উপস্থিতকালে মৃদুগন্ধ অনুভবে আসে না, দুইটি আভ্রের মিলিত গন্ধকেও বিশ্লেষণ করিয়া পৃথক্‌রূপে অনুভব করা অসাধ্য। ফলতঃ আমরা প্রায়ই প্রকৃত গন্ধ কি তাহা বুঝিতে পারি না। আমরা যে বায়ুসাগরে ডুবিয়া আছি এবং প্রতিনিয়ত যাহা নাসাপথে আকর্ষণ ও বিসর্জ্জন করিতেছি তাহার কি গন্ধ তাহা জানিতে পারি না। এবং নিজের অক্ষমতা ঢাকিবার জন্য বায়ুর গন্ধের অস্তিত্ব স্বীকার করি না। কিন্তু যদি অন্যান্য পদার্থে গন্ধ থাকে তবে বায়ুর যে কেন গন্ধ থাকিবে না

ইহার কোন সঙ্গত কারণ নাই। বস্তুতঃ যে কারণে বায়ুর রূপ থাকা অস্বীকার করা হয় সেইরূপ কারণে বায়ুর গন্ধও অস্বীকার করা হয়। বায়ু সর্ব্বদাই আমার ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের বাহ্যাঙ্গের সহিত সংযুক্ত থাকে বলিয়া আমি বায়ুর গন্ধ অনুভব করি না। পুনশ্চ অন্যপ্রকার গন্ধ অনুভব করি, সকলই বায়ুদ্বারা বাহিত হইয়া আমার ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের সম্পর্কে আসে। এরূপ অবস্থায় বিবিধ গন্ধসংযুক্ত বায়ু ভিন্ন বিশুদ্ধ বায়ুর সহিত আমার ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের সংস্পর্শ কখনই ঘটে না। সুতরাং প্রতিকুল ধর্ম্মবিশিষ্ট অসংখ্য গন্ধাণু মিলিত হইয়া পরস্পরের ঘাত-প্রতিঘাতে কোন গন্ধাণু জড়িত হইয়া যে এক যৌগিক গন্ধাণু সংঘটিত হয় তাহাই আমার অনুভবে আসে। এই মিশ্রিতগন্ধ অনুভব করিয়া বলা যাইতে পারে না যে আমি যে গন্ধ অনুভব করিতেছি ইহাতে বায়ুর গন্ধাংশ অথবা সম্মুখস্থ অন্যান্য কোন পদার্থের গন্ধাংশ নাই।

আমি গন্ধ অনুভব করি কিন্তু গন্ধাণুর কোন বাস্তবিক অস্তিত্ব অনুভব করি কি? গন্ধাণুর না আছে রূপ, না আছে রস, না আছে শব্দ, না আছে স্পর্শ। দশ হস্ত দূরে একটী পক্কাম্র রহিয়াছে এবং সেই আম্র হইতে কি না কি একটী আসিয়া আমার নাসাপথে যায়, আর তাহাতে আমি সেই আম্রের গন্ধানুভ করি!! সেই যে কি একটা কি যাহাকে গন্ধাণু বলি তাহাকে দেখিতে শুনিতে চিবাইতে বা ছুঁইতে পারি না। তাহার পর সেই অপরিচিত গন্ধাণুকে আমার এক এক অবস্থায় এক একরূপ অনুভব করি। আমার সর্দ্দি লাগিলে সে আম্রের গন্ধ পাই না অথবা অন্যরূপ গন্ধ পাই। পুনশ্চ আমি পলাণ্ডু রশুনের গন্ধকে এক সময়ে নিতান্ত অপ্রীতিকর জ্ঞান করিলেও অন্য সময়ে তাহাকে অতি উপাদেয় জ্ঞান করি এবং হয় ত এলাচী কর্পূরাদি সম্মিলিত তাম্বুলচর্ব্বণে কোন সময়ে আমার মুখের যে দুর্গন্ধ হয় তাহা সেই পলাণ্ডু রশুনের সুগন্ধে বিদূরিত করিতে প্রয়াস পাই!!

বস্তুতঃ গন্ধজ্ঞানটী প্রত্যক্ষসিদ্ধ বিষয় কিন্তু গন্ধের বাহ্যাধারের জ্ঞানটী প্রত্যক্ষসিদ্ধ নহে, অনুমানসিদ্ধ। এবং সেই অনুমানও ভ্রান্ত দর্শন ও স্পর্শনেন্দ্রিয়ের সাহায্য সাপেক্ষ। যে ব্যক্তি জন্মান্ধ সুতরাং বাহ্যবস্তুর রূপানুভব করে না এবং স্পর্শের দ্বারাও বাহ্যবস্তুকে ছুঁইতে না পারে, তাহার সম্মুখে গন্ধবান্ কোন পদার্থ রাখিলে সে গন্ধানুভব করিয়াও গন্ধাধারের বাহ্যাস্তিত্ব কল্পনা করিতে পারে না। আবার আমার অবস্থাবিশেষে বাহ্য কোন গন্ধবান্ পদার্থ না থাকিলে গন্ধ অনুভব করিয়া থাকি। বৈদ্যুতিক ক্রিয়াযোগে অথবা স্বপ্নকালে আমি বহুবিধ গন্ধ অনুভব করিতে পারি। এই সকল কারণে একটু স্থিরচিত্তে বিবেচনা করিলে বুঝিতে পারি যে গন্ধাণুর বাহ্যাস্তিত্ব সম্পূর্ণ আনুমানিক এবং সেই অনুমান গন্ধবিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ সুতরাং অবিশ্বাস্য রূপাদির অনুভবের উপর নির্ভর করে!!

রস ও রসনেন্দ্রিয়ের বিষয় সমালোচনা করিতে যাইয়াও আমরা রসের বাহ্যাস্তিত্ববিষয়ে ভুলসিদ্ধান্ত করিয়া বসি। নিজের অবস্থার ইতরবিশেষে একই রসাণুকে আমি এক এক সময়ে এক একরূপ অনুমান করি। যখনই কোন বস্তুর রস অনুভব করি তখনই সেই রসাত্মক অণু সকলকে মুখ গহ্বরান্তর্গত লালায় মিশ্রিত করিয়া তাহার প্রকৃত রসকে বিকৃত করিয়া অনুভব করি। অবিকৃত রস অনুভব করিতে পারি না, রসাণু বলিয়া কোন বাহ্যবস্তু যদি থাকে তাহা শব্দ-স্পর্শ-রূপগন্ধাদি হইতে

স্বতন্ত্র এবং তাহাদের পরিচায়ক ইন্দ্রিয়চতুষ্টয়ের সম্পূর্ণ অপরিচিত। অথচ সেই অপরিচিত রূপস্পর্শের সাক্ষ্যের প্রতি বিশ্বাস করিয়া রসাণুর বাহ্যাস্তিত্ব অনুমান করি। রস অনুভব করি কিন্তু রসাণু অনুভব করিতে পারি না! ফলতঃ রসাণু একটী সম্পূর্ণ কাল্পনিক পদার্থ। রস অনন্ত প্রকার হইলেও সাধারণতঃ আমরা রসকে কটু অম্ল লবণ তিক্ত কষায় মধুর ভেদে ছয় প্রকার জ্ঞান করিয়া থাকি। কিন্তু যাহা আমার রসনায় তিক্ত তাহা হয়তো বালক বা বৃদ্ধ কিম্বা অন্য জীবের রসনায় মিষ্ট বা কষায় জ্ঞান হইতে পারে। যাহা আমার নিকট কটু তাহা গবাদির নিকট মধুর হইতে পারে। সুতরাং প্রাণী সকলের অবস্থা বিশেষে আমার অনুভূত রসাণুর ভিন্ন ভিন্ন রস উৎপন্ন হইতে পারে।

স্পার্শেন্দ্রিয়।

চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয় চতুষ্টয়ের কথা বলা হইল এখন ত্বগাধিষ্ঠিত স্পর্শেন্দ্রিয়ের কথা বলিব। ত্বক্ ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে জ্যেষ্ঠ এবং শ্রেষ্ঠ। অন্যান্য ইন্দ্রিয় নিতান্ত সীমাবদ্ধ, ত্বক্ তেমন সীমাবদ্ধ নহে দেহের সর্ব্বাংশে ব্যাপিয়া রহিয়াছে। ত্বক্ সর্ব্বত্র ব্যাপিয়া আছে কিন্তু সর্ব্বত্র সমানভাবে ব্যাপিয়া নাই। স্থানভেদে ত্বকের অবস্থাভেদে সামান্যতঃ অনুভূত একই একই স্পর্শকে ভিন্ন ভিন্নরূপ জ্ঞান হয়। আমরা ত্বক্‌দ্বারা স্পর্শানুভব করি। কিন্তু স্পর্শ কি? ত্বকের দ্বারা যাহা অনুভব করি—কোন একটী পদার্থ আমাদের গাত্রস্পৃষ্ট হইলে আমরা যাহা অনুভব করি তাহা স্পর্শ। কোন পদার্থ ত্বকের সহিত সংলগ্ন হইলে আমাদের যে সকল অনুভূতি জন্মে তাহাদিগকে আমরা শীতলতা, উষ্ণতা, মসৃণতা, বন্ধুরতা ইত্যাদি নাম দিয়া থাকি। চিন্তা করিয়া দেখিলে মসৃণাসৃণত্ব, লঘুগুরুত্ব, কঠিন-কোমলতা ইত্যাদি জ্ঞান ঠিক স্পর্শজ জ্ঞান বলিয়া বোধ হয় না, ইন্দ্রিয়ান্তরের বিষয় বলিয়া অনুমান হয়। প্রাচীন দার্শনিকগণ পঞ্চ-ইন্দ্রিয়ের অধিক স্বীকার করিতেন না এবং সেই জন্য পঞ্চাতিরিক্ত ইন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত কতকগুলি অনুভূতিকে পঞ্চমেন্দ্রিয়ের বিষয় স্পর্শরূপে ধরিয়া লইতেন। কিন্তু আধুনিক দার্শনিকদিগের মধ্যে অনেকে পঞ্চেন্দ্রিয়ের অতীত আরো কতকগুলি ইন্দ্রিয়ের অস্তিত্ব স্বীকার করেন এবং মসৃণামসৃণত্ব, লঘুত্বগুরুত্ব, কঠিন-কোমলতাদির জ্ঞান ত্বকের দ্বারা না হইয়া অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়াদির অন্যতম পৈশিক কুঞ্চনাকুঞ্চনাদিদ্বারা হওয়া বলেন। মনে কর, এই যে মস্যাধার সম্মুখে রহিয়াছে, ইহার উপরে হস্তস্থাপন করিয়াই কি ইহার গুরুত্বাদি অনুভব করা যায়? এই যে চেয়ারে বসিয়া আছি সুতরাং যাহা স্পর্শ করিয়া রহিয়াছি তাহার গুরুত্ব কি চেয়ার তুলিতে চেষ্টা না করিয়া বুঝিতে পারি? তাহা পারি না এবং সেইজন্য গুরুত্বাদিকে ইন্দ্রিয়ান্তরের বিষয় বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। যাহা হউক শীতাতপের ন্যায় বন্ধুরাবন্ধুরত্ব গুরুলঘুত্বাদিকে স্পর্শেন্দ্রিয়ের অন্তর্নিবিষ্ট বলিয়া মনে করিয়া সমালোচনা করা যাউক। রূপাদির জ্ঞানসম্বন্ধে পূর্ব্বে যে সকল বিঘ্নের উল্লেখ করা হইয়াছে স্পর্শজ্ঞানসম্বন্ধেও সেই সকল বাধা জন্মিয়া থাকে। প্রকৃত স্পর্শজ্ঞান হইতে স্পর্শনীয় পদার্থ ও ত্বক্ পরস্পর সংস্পৃষ্ট হওয়া চাই। তাহা না হইয়া যদি একটী অন্যটী হইতে অধিক দূরে থাকে অথবা পরস্পর অত্যন্ত চাপাচাপি করিয়া থাকে তবে প্রকৃত স্পর্শজ্ঞান হয় না। দূরত্বে স্পর্শজ্ঞানের অভাব অতি চাপে স্পর্শজ্ঞান ঢাকিয়া বেদনা জ্ঞান জন্মে। পক্ষাঘাত রোগে ত্বক্ বিকৃত হইলে বা মন অন্য বিষয়ে নিবিষ্ট থাকিলে স্পর্শজ্ঞান জন্মে না। গাত্রে একটী কার্পাসতন্তুকণা

পড়িলে তাহা অনুভবে আসে না আবার গাত্র বস্ত্রাবৃত থাকিলে মক্ষিকা পতনানুভবও করা যায় না। পুনশ্চ ঈষদুষ্ণ এবং অত্যুষ্ণ দুই খানি লৌহফলক যুগপৎ গাত্রে স্পর্শ করাইলে প্রচণ্ড উত্তাপের অন্তর্দ্দাহক স্পর্শে কদুষ্ণের মৃদুস্পর্শ কেমন ডুবিয়া যায়। আবার আপনার টাকাটী আর দশটী টাকার সহিত মিশাইয়া দিলে স্পর্শ-দ্বারা তাহাকে চিনিয়া বাহির করা কেমন অসম্ভব।

কি প্রকার অবস্থায় স্পর্শজ্ঞান অসম্ভব তাহা বলার পর একবার দেখা যাউক স্পর্শজ্ঞান কতদূর সত্য। স্পর্শেন্দ্রিয়ের দ্বারা আমরা বাহ্য-বস্তুর স্পর্শানুভব করি, কিন্তু আমাদের চতুর্দ্দিকের ভূবায়ু যে অবিচ্ছেদে আমাদের স্কন্ধে চাপিয়া রহিয়াছে তাহা আমরা কি বুঝিতে পারি? অবিচ্ছিন্ন জ্ঞান মানুষের অসম্ভব; অবিচ্ছিন্ন রূপ, অবিচ্ছিন্ন শব্দ, অবিচ্ছিন্ন গন্ধ, অবিচ্ছিন্ন রস, অবিচ্ছিন্ন স্পর্শ সমুদায়ই মানুষ-জ্ঞানের অতীত। ভূবায়ু যখন শরীরের চারিদিকে সমানভাবে স্পর্শ করিয়া থাকে তখন তাহার স্পর্শই আমরা অনুভব করিতে পারি না। কিন্তু যখন কেহ তালবৃন্ত হস্তে বায়ুসাগর বিতাড়িত করিয়া তাহাতে তরঙ্গ উৎপাদন করে তখন সেই বায়ুতরঙ্গ থাকিয়া থাকিয়া একটীর পর অপরটী শরীরে ন্যূনাধিক বলে আঘাত করে আর আমরা স্পর্শ অনুভব করি। আমার শরীরের চারিদিকে বায়ু যে বলে চাপিয়া রহিয়াছে তাহা একবার বাড়াইয়া একবার কমাইয়া না দিয়া একভাবে রাখিলে সেই অবিচ্ছিন্ন চাপ আমরা অনুভব করিতে পারি না। যেমন রূপ জ্ঞান হইতে রূপ ও রূপাভাবের সীমানির্ণয় করিয়া লইতে হয় তেমনি স্পর্শ অনুভব করিতেও এক স্পর্শকে স্পর্শান্তরের দ্বারা বিচ্ছিন্ন করিয়া লইতে হয়। উষ্ণ স্পর্শকে শীতস্পর্শদ্বারা বা শীতস্পর্শকে উষ্ণঃ স্পর্শদ্বারা বিচ্ছিন্ন কর, মসৃণ স্পর্শকে বন্ধুর স্পর্শদ্বারা বিচ্ছিন্ন কর, লঘুস্পর্শকে গুরুস্পর্শ-দ্বারা অথবা গুরুস্পর্শকে লঘুস্পর্শদ্বারা বিচ্ছিন্ন কর; তবে শীতাতপ অনুভব করিতে পারিবে, মসৃণ বন্ধুর বুঝিতে পারিবে, লঘুগুরু জানিতে পারিবে। কিন্তু শীতোষ্ণ, লঘুগুরু, বলিয়া কোন নিরপেক্ষ গুণ আছে কি? যাহা আমার সম্বন্ধে শীত তাহা কি সকলের সম্বন্ধেই শীত? বাস্তবিক নিরপেক্ষ শীত বা উষ্ণতা; নিরপেক্ষ লঘুতা বা গুরুত্ব নিরপেক্ষ কঠিনতা বা কোমলতা, আমাদের জ্ঞানের অতীত। নিরপেক্ষ জ্ঞানের হ্রাসবৃদ্ধিনাই—তারতম্য নাই। অল্প শীত বা অধিক শীত, অল্প লঘু বা অধিক লঘু, এ সকল কথা আমরা সর্ব্বদাই প্রয়োগ করি বটে, কিন্তু ঐ সকল গুণ আমরা সম্যক্ বুঝিতে পারি না। সেই জন্য স্পর্শজ্ঞ একটী গুণকে দেশ-কাল পাত্রভেদে তদ্বিপরীত গুণের সহিত অভিন্নরূপে অনুভূত হয়। যাহা আমার সম্বন্ধে শীত, তাহা অন্যের সম্বন্ধে উষ্ণ, যাহা আমার সম্বন্ধে লঘু তাহা অন্যের সম্বন্ধে গুরু হইতে পারে। যাহা আমার এক অবস্থায় উষ্ণ ও লঘু তাহা আমার অন্য-বস্থায় শীতল ও গুরু বলিয়া জ্ঞান হইতে পারে। একখানি হস্ত অর্দ্ধফুটন্তজলে এবং আর একখানি হস্ত বরফ শীতল জলে কিছুক্ষণ ডুবাইয়া রাখিয়া যুগপৎ হস্তদ্বয় সাধারণ জলে প্রবেশ করাইলে বুঝিতে পারা যায় সেই একই জলের শীতোষ্ণতর সম্বন্ধে হস্ত দুটী কেমন বিসদৃশ সাক্ষ্য প্রদান করে। একই জল এক হস্তের সম্বন্ধে শীতল এবং অপর হস্তের সম্বন্ধে উষ্ণ জ্ঞান হয়!! সহজ শরীরে যে পদার্থকে যত শীতল বোধ হয় জ্বরাদি জন্য শরীরের তাপ বৃদ্ধি হইলে সেই পদার্থকে তদপেক্ষা অধিক

শীতল জ্ঞান হয়!! সুতরাং বাহ্যবস্তুর শীতাতপের ইতর বিশেষেই যে আমাদের শীতাতপ জ্ঞানের ইতরবিশেষ হয় তাহা নহে, আমাদের শরীরের অবস্থাভেদেও বাহ্যবস্তুর শীতাতপের হ্রাস বৃদ্ধি হয়। অতএব শীতাতপকে কোন বাহ্যবস্তু নিষ্ঠ গুণ বলিয়া না বুঝিয়া আমাদের দৈহিক অবস্থা বিশেষ বলিয়াই বুঝা উচিত।

স্পর্শদ্বারা আমরা সচরাচর গতির জ্ঞানও লাভ করি। কিন্তু এ জ্ঞানও যে ভ্রমসঙ্কুল নহে ইহা বলা যায় না। স্পর্শদ্বারা গতির জ্ঞান হইতে প্রকৃতপক্ষে গতির জ্ঞান হয় না, হয় কেবল স্পর্শজ্ঞান শীতোষ্ণতার জ্ঞান কিন্তু আমরা ভ্রমবশতঃ তদতিরিক্ত গতির জ্ঞানও হইয়াছে অনুমান করিয়া থাকি। তাহাতে কত সময়ে কেবল স্পর্শ করিয়া স্থিরপদার্থকে গতিশীল এবং গতিশীল পদার্থকে স্থির মনে করি। আমাদের পদস্পৃষ্টা ধরণী যে এত বেগে ঘুরিতেছে তাহা আমরা জানিতে পারি না। অন্ধকার রজনীতে সমবেগ চালিতা অনান্দোলিতা তরণীতে বসিয়া কি তাহার গতি অনুভব করি? বরং গতিশীলা তরণীকে গতিহীনা মনে করিয়া আপনাকেও গতিহীন মনে করি; এবং সেই সময়ে পার্শ্বস্থ কোন স্থিরা তরণীর কোন অংশে আপনার গাত্র সংঘৃষ্ট হইলে সেই ঘৃষ্টা তরণীকে চলিষ্ণু বলিয়া জ্ঞান করি। ষ্টেশনে দুইখানি গাড়ী পার্শ্বাপার্শ্বি থাকিলে কখন আপনার চলিষ্ণু গাড়ীকে অচল মনে করিয়া পার্শ্বস্থ স্থির গাড়ীকে গতিশীল জ্ঞান করি। এই সকল স্থলে আমাদের চক্ষু এবং স্পর্শেন্দ্রিয় দুইই যেন যুক্তি করিয়া আমাদিগকে ভুলাইয়া থাকে।

ঐন্দ্রিকজ্ঞান সমালোচন।

পঞ্চেন্দ্রিয়ের এবং তাহাদের বিষয়ের একরূপ পরিচয় দেওয়া হইল। এখন তাহারা কিরূপে পরস্পরের সাহায্য করিয়া একই পদার্থের জ্ঞান জন্মায় তাহার সমালোচনা করিব। সম্মুখে একটী পক্কাম্র রহিয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইতেছে; আমি তাহার রূপ দেখিতেছি, সেই রূপ যেন হরিদ্বর্ণ; তাহার একটী রস অনুভব করিতেছি, তাহা অম্লমধুর একটী গন্ধ অনুভব করিতেছি, তাহা সুরভি একটী স্পর্শানুভব করিতেছি, তাহা নাতিশীতোষ্ণ মসৃণ কোমল; এবং ঘাত প্রতিঘাত করিয়া তাহার একটী শব্দ শুনিলাম তাহা ধপ্ করিয়া উঠিল। একটু চিন্তা করিলেই বুঝা যায় যে আমি একটী হরিদ্বর্ণ, একটী অম্লমধুর রস, একটী সুরভিগন্ধ, একটী নাতিশীতোষ্ণ মসৃণ কোমল স্পর্শ এবং ধপ্ করিয়া একটা শব্দমাত্রই অনুভব করিতেছি; কিন্তু এই সকল অনুভবেই আমার বিশ্বাসকে আবদ্ধ না রাখিয়া এই সকল অনুভূতির প্রত্যেকের এক একটী আধারের বাহ্যাস্তিত্বেও বিশ্বাস করিতেছি, অথচ সেই আধার গুলিকে কোন ইন্দ্রিয়দ্বারাই ধরিতে ছুঁইতে পারিতেছি না। পুনশ্চ হরিদ্বর্ণই কি একটা অমিশ্র বর্ণ, অম্লমধুর রসই কি একটা অমিশ্র রস, মৃদুসুরভি গন্ধই কি একটা অমিশ্র গন্ধ, নাতিশীতোষ্ণ-মসৃণ-কোমলতাই কি একটা অমিশ্র স্পর্শ, ধপ্ করিয়া যে শব্দ হইল তাহাই কি অমিশ্র একটী শব্দ? যাহাকে হরিদ্বর্ণ বলি তাহাতে না জানি কতই বর্ণের সমাবেশ আছে, অম্লমধুর রসেও না জানি কতই রস মিলিত আছে। মৃদুসুরভি আম্র গন্ধটীও অমিশ্র গন্ধ নহে। নাতিশীতোষ্ণ মসৃণ কোমলতাও বহুস্পর্শের যোগফল এবং ধপ্ করিয়া যে শব্দটী হইল তাহাও বহুবিধ শাব্দিককম্পনপ্রকম্পনের সমষ্টি। অতএব বলিতে হয় যে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের

অনেক রূপাণুমিলিত হইয়া হরিদ্বর্ণাণু গঠিত হইয়াছে, অনেক বিপরীত ধর্ম্মাক্রান্ত রসাণু মিলিত হইয়া অম্লমধুর রসাণু জন্মিয়াছে, অনেক বিরুদ্ধধর্ম্মী গন্ধাণু একত্র হইয়া মৃদুসুরভি গন্ধাণু হইয়াছে, বহুবিধ স্পর্শানুসংযোগে একটি নাতিশীতোষ্ণ মসৃণ কোমল স্পর্শাণু রচিত হইয়াছে এবং একাধিক শব্দাণু সংমিশ্রিত হইয়া একটি ধপ্ শব্দাণু সংগঠিত হইয়াছে এখন একবার চিন্তা করিয়া দেখ যে আম্রটী কি? আম্রকে সাধারণতঃ একটি বস্তু বলিয়া ধরিয়া লইলেইও তাহার প্রধান পাঁচটী অঙ্গ দেখা যাইতেছে, হইতে পারে তাহার অসংখ্য অঙ্গ রহিয়াছে, কিন্তু আমরা তাহার পাঁচটীমাত্র অঙ্গ দেখিতেছি বা জানিতে পারিতেছি। সুতরাং আম্রের যখন ন্যুনকল্পে রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ থাকা স্বীকার করা যাইতেছে এবং সেই রূপাদি বিনা আধারে থাকিতে পারে না ভাবিয়া রূপাণু, রসাণু প্রভৃতির অস্তিত্ব সম্ভাবনা করিতেছি তখন রূপাদি পাঁচ জাতীয় অণুর সংঘাতেই আম্র প্রস্তুত হইয়াছে বলিয়া স্বীকার করিতে হইতেছে। ইহাতে এই সিদ্ধান্ত হয় যে আম্র এমন একটী পদার্থ যাহার একাংশ বহুবিধ রূপাণু, দ্বিতীয়াংশ বহুবিধ রসাণু, তৃতীয়াংশ বহুবিধ গন্ধাণু, চতুর্থাংশ বহুবিধ স্পর্শাণু এবং পঞ্চমাংশ বহুবিধ শব্দাণুদ্বারা রচিত। এই হিসাবে আম্র একটি পঞ্চক পদার্থ যাহাতে রূপাণু প্রভৃতি পাঁচ জাতীয় অণু একটি অচ্ছেদ্য বন্ধনে বাধা পড়িয়াছে এবং এই বন্ধনই কি আম্র নহে? সেই অপরিচিত রূপাণু, রসাণু, গন্ধাণু স্পর্শাণু শব্দাণু সকলে সমষ্টি ও ব্যষ্টিভাবে আম্র নহে, এতৎ সকলের সেই নির্দ্দিষ্ট বন্ধনই আম্র। আম্রকে ঢেঁকিতে কুটিয়া ফেলিলে তাহার অপরিজ্ঞেয় রূপরসাণু সকল পূর্ব্ববৎ বর্ত্তমান থাকিলেও কেবল তাহাদের বন্ধনটী তখন ছিন্ন হওয়ায় তাহার রূপরসাদিও অন্যরূপ হইয়া যায় এবং তাহাকে আর তখন আম্র বলিয়া বুঝি না। কিন্তু সেই বন্ধনটী যে কি তাহা আমি ইন্দ্রিয়গণের সাহায্যে বুঝিতে পারি না। সেই বন্ধনের রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ কিছুই নাই; তাহা একটি মানসিক অনুমান একটী কল্পনা স্তবক মাত্র। ফলতঃ আম্রটীর অস্তিত্ব বাস্তবিক নহে কাল্পনিক। এই সেই কল্পনার বিশ্লেষণ করিয়া আম্রের রূপ, আম্রের রস, আম্রের গন্ধ, আম্রের স্পর্শ, আম্রের শব্দ বলিয়া থাকি।

আম্রের বাস্তবিকতায় অলীকত্ব অন্য প্রকারেও বুঝা যায়। আম্রের রূপ কি? কোন নির্দ্দিষ্ট বর্ণ, কোন নির্দ্দিষ্ট আয়তন কোন নির্দ্দিষ্ট গঠন আম্রের আছে কি? কোনটি সিন্দুরে, কোনটি হলুদে, কোনটি ঈষৎ পীতাভ সবুজ;—আম্র নানাবর্ণের হইতে পারে। কোন নির্দ্দিষ্ট স্পর্শই কি আছে? কোনটি নমনীয়, কোনটী স্থিতিস্থাপক, কোনটী কোমল কোনটী কঠিন, কোনটী শীতল, কোনটি উষ্ণ, কোন বর্ত্তুল, কোনটী দীর্ঘাকৃতি, কোনটী চেপ্টা, তাই বলিতেছি যে আম্রের দ্রব্যধাতুবিশিষ্ট কোন রূপ বা স্পর্শ নাই। একটী নির্দ্দিষ্ট রসই কি তাহার আছে? কোনটী মধুটুকী, কোনটী গোপালভোগ, কোন চিড়াভিজানী, কোনটী অম্লমধুর, কোনটী শূকর চেঁচানী। গন্ধও সকল আম্রের একমত নহে। এখন একবার বিবেচনা করিয়া দেখদেখি কাহাকে আম্র বলিতেছ? কতকগুলি রূপ, কতকগুলি রস, কতকগুলি গন্ধ, কতকগুলি স্পর্শকে নানাভাগে সংমিশ্রিত করিয়া তোমার ইচ্ছামত একটা নাম দিয়া ডাকিতেছ কিনা? একটী হইতে অপরটী রূপে, রসে, গন্ধে, স্পর্শে অন্যরূপ হইলেও তাহাদিগকে একই আম্র নামে অভিহিত করিতেছে। পুনশ্চ আজ যে আম্রটীকে দেখিলে এক মাস পর তাহাকে দেখিয়া তাহার রূপের, রসের, গন্ধের, স্পর্শের বিভিন্নতা বুঝিয়াও তুমি তাহাকে সেই আম্রই বলিতে চাহিতেছ!! ভিন্ন ভিন্ন সময়ে রূপে, রসে, গন্ধে, স্পর্শে এত বিভিন্নতা বুঝিয়াও দুয়ের মধ্যে প্রকৃত একতার কি পাইলে বলদেখি?

শ্রীশ্রীহরিঃ।

[১৮৪৭ সালের ২০ আইনমতে রেজিষ্ট্রীকৃত।]

হিন্দু-পত্রিকা।

৪র্থ বর্ষ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ১১শ ও ১২শ সংখ্যা। | ১৩০৪ সাল। ১৮১৯ শকাব্দা। | ফাল্গুন ও চৈত্র।

আমিত্বের প্রসার।

শূদ্র

মানব সমাজে যিনি যতই শ্রেষ্ঠ হউন না কেন, তাঁহাতে শূদ্রত্বের বীজ রহিয়াছে। ন্যুনাধিক পরিমাণে আমরা সকলেই শূদ্র। পক্ষান্তরে, মানব যতই নিকৃষ্ট হউক না কেন, তাহাতে শ্রেষ্ঠত্বের বীজ রহিয়াছে; উহাকে অঙ্কুরিত—পরিবর্দ্ধিত করিতে পারিলেই তাহার নীচত্বের বীজ ক্রমে নিস্তেজ—নিরঙ্কুরিত অবস্থায় থাকিয়া যায়। অসভ্য বর্ব্বর চণ্ডালেতেও ব্রাহ্মণত্বের বীজ রহিয়াছে এবং সুসভ্য ধীমান ব্রাহ্মণেতেও চণ্ডালত্বের বীজ রহিয়াছে। প্রভেদ এই, চণ্ডালে চণ্ডালত্বের বীজ অঙ্কুরিত ও পরিবর্দ্ধিত, ব্রাহ্মণত্বের বীজ অনঙ্কুরিত এবং ব্রাহ্মণে ব্রাহ্মণত্বের বীজ অঙ্কুরিত ও পরিবর্দ্ধিত এবং চণ্ডালত্বের বীজ অনঙ্কুরিত। ফলে কিন্তু সকলেই মুক্তি তীর্থের যাত্রী, সন্দেহ নাই।

মানব যতই নিকৃষ্ট হউক না কেন, তাহার এক অসাধারণ অন্তর্নিহিত শক্তি রহিয়াছে। ইতরপ্রাণীদিগের উহা নাই, তজ্জন্য তাহারা চিরকাল একই অবস্থায় রহিয়া যায়। কিন্তু মানবের অসাধারণ শক্তি থাকায়, সে তৎসাধনায় পশুসদৃশ অবস্থা হইতে দেবসদৃশ অবস্থায় উন্নত হইয়া থাকে। জগতের ইতিহাস পর্য্যালোচনা কর, দেখিবে, যাহারা গৃহ-নির্ম্মাণ-প্রণালী অবগত না থাকায়, পর্ব্বত-গুহা বা বৃক্ষ-কোটরে বাস করিত, আজ তাহারা সুরম্য হর্ম্ম্যে বিরাজ করিতেছে। যাহারা বস্ত্রবয়ন-প্রণালী অবগত না থাকায়, বৃক্ষ-বল্কল দ্বারা দেহ আচ্ছাদন করিত, তাহারা নানাবিধ মনোহর বস্ত্রে সুশোভিত হইতেছে। যাহারা অগ্নি-উৎপাদন-প্রণালী অবগত না থাকায়, দাবানলাদি দৈবলব্ধ অগ্নি সযত্নে রক্ষা করিত, তাহারা ক্রমশঃ অরণি, পরে লৌহ-প্রস্তর, তৎপরে ক্রমে রাসায়ণিক জ্ঞানলব্ধ দীপশলাকাদ্বারা পলকে অগ্নি উৎপাদন করিতে শিক্ষা করিয়াছে। ইউরোপ খণ্ডের বর্ত্তমান অনেক সুসভ্য জাতি কতিপয় শতাব্দী পূর্ব্বেই অত্যন্ত অসভ্য ছিল। পশু সদৃশ মানবও চিরকাল পশুসদৃশ থাকিতে পারে না। তাহার অন্তর্নিহিত শক্তি তাহাকে উত্তেজিত—উন্নমিত করিয়া তুলে। কোন সমাজেই সকল ব্যক্তিরই তুল্য শক্তি থাকে না; কিন্তু যাহার যে বিষয়ে শক্তির আধিক্য থাকে, তাহার বিকাশ হইলেই সেই শক্তি-লব্ধ-ফল সাধারণের সম্পত্তি হইয়া

যায়। অদ্য কোন এক ব্যক্তি তড়িৎসাহায্যে সংবাদ প্রেরণের তত্ত্ব আবিষ্কার করিলেন, রাত্রি প্রভাত হইতে না হইতেই পৃথিবীর সর্ব্বত্রই সেই তত্ত্ব-লব্ধ-ফলের অধিকারী হইল। যে সমাজেই যে বাস করুক না কেন, সেই সমাজেই জ্ঞানের ইতরবিশেষ আছে। অতি সুসভ্য সমাজেও যেরূপ জ্ঞানী ও মূর্খ দৃষ্ট হয়, অতি অসভ্য সমাজেও তাহারই প্রাকৃতিক অনুপাত অনুসারে সেইরূপ জ্ঞানী ও মূর্খ দৃষ্ট হয়; প্রভেদ এই যে, অসভ্য সমাজের জ্ঞানীরও হয়ত অনেক সুসভ্য সমাজের মূর্খের অপেক্ষা অনেক বিষয়ে জ্ঞান কম। অনেক পাঠশালার বালকেরাও এইক্ষণে জানে যে, সূর্য্যমণ্ডলে চন্দ্র-মণ্ডলের ছায়া নিপতিত হওয়ায় সূর্য্যগ্রহণ হয়, কিন্তু হয়ত অনেক সমাজের প্রাচীন অবস্থায় অহার সুসভ্য পণ্ডিতেরাও গ্রহণ-তত্ত্ব অবগত ছিলেন না। কাষ্ঠ ঘর্ষণে অগ্নি-উৎপাদন-বিধি প্রকৃষ্ট নহে বলিয়া আমরা এইক্ষণ বলিতে পারি, কিন্তু প্রাচীন কালে যখন অগ্নি-উৎপাদন-বিধি একেবারে পরিজ্ঞাত ছিল না, তখন যে ব্যক্তি অগ্নি উৎপাদনের এই আবিষ্ক্রিয়া করিয়াছিলেন, তাঁহাকে কি বাষ্পযানাদি-আবিষ্কর্ত্তাদিগের অপেক্ষা কম বুদ্ধিমান বলিতে হইবে? মনে কর, আজ যদি মানবমাত্রেই কোন দৈবকারণে অগ্নি-উৎপাদনবিধি একেবারে বিস্মৃত হইয়া যায়, তাহাহইলে আমাদের মধ্যে কয় জনে কাষ্ঠ ঘর্ষণে অগ্নি-উৎপাদন-তথ্য আবিষ্কার করিয়া উঠিতে পারে? কাষ্ঠের মধ্যে অগ্নি নিহিত আছে, এ তত্ত্ব এখনইবা সুসভ্য সমাজের কয় জনে ঠিক্ জানে? মৃত্তিকা-নির্ম্মিত পাত্রে আমরা রন্ধনাদি কার্য্য করিয়া থাকি, কিন্তু যে ব্যক্তি প্রথমে মৃত্তিকা হইতে এইরূপ পাত্র প্রস্তুত করার কৌশল আবিষ্কার করেন, তাঁহার বুদ্ধির প্রশংসা শতমুখে করিয়া তৃপ্ত হয় না। লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরিয়া আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ আমাদের জন্য যাহা করিয়া গিয়াছেন, বিনাশ্রমে তাহা লাভ করিয়া আমরা আমাদিগকে জ্ঞানী মনে করি। কিন্তু যদি আমাদের এক্ষণে নিজের সব করিয়া লইতে হয়, যদি আমরা কোন বিষয়ে পূর্ব্বার্জ্জিত জ্ঞানের সাহায্য না পাই, তাহাহইলে আমাদের দশা কি হয়? আজ যদি পৃথিবীর তাবৎ গৃহ নষ্ট হইয়া যায় এবং আমরা সকলেই দৈব-বিড়ম্বনাবশতঃ গৃহনির্ম্মাণ-প্রণালী ভুলিয়া যাই, তাহাহইলে আমাদের মধ্যে কয় জনের মস্তিষ্ক হঠাৎ ঘর বাঁধিয়া উঠিতে পারে? প্রত্যেক সমাজে হয়ত দুই একজন লোক ক্রমে স্বীয় বুদ্ধির কৌশলে পুনর্ব্বার গৃহনির্ম্মাণ-প্রণালী আবিষ্কার করিতে পারেন। ক্রমে সহস্র সহস্র লোক তাঁহাদের আবিষ্কার-লব্ধ-ফল ভোগে আপনাদিগকেও জ্ঞানী বা সভ্য বিবেচনা করে! আজ দশবৎসরের বালিকাও রন্ধনপ্রণালী অবগত আছে, কিন্তু যিনি রন্ধন-প্রণালী প্রথম আবিষ্কার করিয়া পশুর ও মনুষ্যের আহার-প্রণালীর বিভিন্নতা সম্পাদন করিয়াছিলেন, তিনি এক্ষণকার ঐ বালিকা হইতে অনেক বিষয়ে অনভিজ্ঞ হইলেও তাঁহার বুদ্ধির সহিত ঐ বালিকার বুদ্ধির তুলনা করা যাইতে পারে না। পৈত্রিক ধনবত্তায় স্বীয় ধন-পুরুষকারের গৌরব কোথায়?

উপরে যাহা বলা হইল, তাহাদ্বারা উপলব্ধি হইবে যে, অতি সুসভ্য সমাজেও মানবের যে অন্তর্নিহিত শক্তি আছে, অতি অসভ্যসমাজেও সেই শক্তি আছে। প্রভেদ এই, অসভ্য-সমাজে জ্ঞাতবস্তুর সংখ্যা কম এবং সুসভ্য-সমাজে জ্ঞাতবস্তুর সংখ্যা অধিক। অসভ্য সমাজে আজ যাহা আবিষ্কৃত হইতেছে, সুসভ্য-সমাজে তাহা হয়ত দশসহস্র বৎসর পূর্ব্বে

আবিষ্কৃত হইয়াছে। আবার ঐ অসভ্যসমাজ যদি ঈশ্বরেচ্ছায় বাহ্য উপযোগিতার সাহায্য পায়, তাহাহইলে হয়ত দশবৎসরের মধ্যেই সুসভ্য সমাজের দশ সহস্র বৎসরের চেষ্টার ফল অধিকার করিয়া লইতে পারে। জানিনা, জ্যোতির্ব্বিদ্যা ভারত হইতে না গেলে, কতদিনে স্বাধীনভাবে ইউরোপে উহা আবিষ্কৃত হইত; কিন্তু কোন সময়ে না কোন সময়ে যে উহার তদ্দেশে আবিষ্কার হইত, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। হয়ত পাশ্চাত্যেরা নিজে যাহা বহুকাল পরে আবিষ্কার করিতে পারিত, প্রাচ্যজাতির সংস্রবে আসিয়া তাহারা বিনাশ্রমে তাহা অধিকার করিয়াছে।

ব্যক্তিবিশেষের পক্ষেও ঐরূপ। প্রত্যেক বালকের যদি গণিত শাস্ত্রাদির প্রত্যেক তত্ত্ব নিজের আবিষ্কার করিয়া লইতে হয়. তাহা-হইলে লক্ষ লক্ষ বালকের হয়ত গণিতশাস্ত্র আদৌ শিক্ষা করা হইবে না; দুই চারি জনের হয়ত আংশিক শিক্ষা হইবে। জ্ঞানীদিগের জ্ঞান-লব্ধ ফল গ্রহণ করিতে পারিলেই, স্বাভাবিক অল্পসত্ত্ব অজ্ঞানীরা সহজে উন্নতির সোপানে আরোহণ করিতে পারে। কেবল অজ্ঞানী-দিগের যদি একটি সমাজ কল্পনা করা যায়, তাহাহইলে সেই সমাজ জ্ঞানীর জ্ঞানলব্ধ ফল হইতে বঞ্চিত হইলেও শত শত বৎসর পরে উহা ক্রমে সুসভ্য হইতে পারে। লক্ষ লক্ষ ব্যক্তি অজ্ঞানাবস্থায় ইহসংসার পরি-ত্যাগ করিয়া গেলেও, তাহাদের বংশ-পরম্পরা যে ক্রমে জ্ঞানমার্গে অধিরোহণ করিবে, তদ্বি-ষয়ে কোন সংশয় নাই; কারণ কর্ম্মদেহ-মানবজীবনে জ্ঞানোন্নতির বীজ নিহিতই আছে। জগতের ইতিহাস পর্য্যালোচনায় দেখা যায়, সভ্যজাতিরা অসভ্য জাতিদের সংস্পর্শে আসিয়া বিনা আয়াসে সভ্যজাতিদের বহুযত্ন ও বহু-শ্রমের ফলগুলি নিজস্ব করিয়া লইতেছে। সভ্য জাতিরাও সযত্নে অসভ্য জাতিদিগকে স্বীয় স্বীয় জ্ঞানোন্নত সুসভ্য অবস্থায় আনিবার চেষ্টা করিতেছে। জগৎ যেন নিত্য-বিবর্ত্ত-বিলাসময়ী প্রকৃতির গতিতে উন্নতির দিকেই ধাবমান।

একজন ব্রাহ্মণ যে ব্রাহ্মণ, একজন ক্ষত্রিয় যে ক্ষত্রিয়, একজন বৈশ্য যে বৈশ্য, সে কি কেবল তাহাদের স্বকীয় পরিশ্রম-লব্ধ ফল, না সহস্র সহস্র বৎসরের পর-লব্ধজ্ঞানের ফল? পরের সাহায্য ব্যতীত যদি প্রত্যেকেরই ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিতে হয়, তাহাহইলে এক এক সমাজে তাহা কয় জনের সাধ্যায়ত্ত হইবে? আজ এক জন ব্রাহ্মণ যে 'ব্রাহ্মণ' সে কেবল তাঁহার নিজের অন্তর্নিহিত শক্তিপ্রভাবে নহে, তিনি সহস্র সহস্র পূর্ব্বপুরুষের জ্ঞানের উত্তরাধিকারী হইয়াছেন বলিয়া। তোমাতে যতই অসাধারণ-শক্তি থাকুক্ না কেন, শারীরিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক, সর্ব্ববিষয়ক উন্নতিতেই যদি নিজের উপর তোমার নির্ভর করিতে হয়, তাহাহইলে তোমার কি শোচনীয় অবস্থায় পতিত হইতে হয়! সুতরাং স্বীয় অবস্থা বিবেচনা করিয়া, তোমার অনুন্নত ভ্রাতাদিগকে অজ্ঞানী, মূর্খ ইত্যাদি বলিয়া ঘৃণা করিও না। তোমাকে এবং তোমার অনুন্নত ভ্রাতাকে বাল্যকাল হইতে একই অবস্থায় রাখিলে, হয়ত তোমার ও তোমার অনুন্নত ভ্রাতার মধ্যে আজ কোন প্রভেদ থাকিত না। তুমি যে উন্নত, সে কেবল তুমি পর-সাধিত জ্ঞানের সুবিধা পাইয়াছ বলিয়া। আর তোমার ঐ ভ্রাতা যে অনুন্নত, সে সেই সুবিধা পায় না বলিয়া; এইমাত্র প্রভেদ। আমি মাত্র সামাজিক শূদ্র বা সামাজিক ব্রাহ্মণের কথা বলিতেছিনা। সামাজিক ব্রাহ্মণের মধ্যেও অনেক যথার্থ শূদ্র ও যথার্থ ব্রাহ্মণ রহিয়া-

ছেন এবং সামাজিক শূদ্রের মধ্যেও অনেক যথার্থ ব্রাহ্মণ ও যথার্থ শূদ্র আছেন। আমি যথার্থ ব্রাহ্মণ ও যথার্থ শূদ্রের কথা বলিতেছি। যাঁহার আমিত্বের সম্পূর্ণ প্রসার হইয়াছে, যিনি সর্ব্বভূতে আত্মাদর্শন ও আত্মাতে সর্ব্বভূত-দর্শন করেন, যিনি জ্ঞান-বিজ্ঞানাদি-বিভূষিত, যাঁহার হৃদয়তন্ত্রীর সুর বিশ্ব-তন্ত্রীর সুরের সহিত একতান হইয়া গিয়াছে, তিনি সর্ব্বদা বিশ্বের হিতচিন্তায় মগ্ন হইলেই যথার্থ ব্রাহ্মণ, আর যাহার প্রকৃতি অসংযত রহিয়াছে, যাহার সর্ব্বত্র ভেদ-দৃষ্টি হয়, যাহার আত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধেও জ্ঞান-দার্ঢ্য নাই, যাহার খাদ্যাখাদ্য, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের জ্ঞান নাই, যে অনক্ষর মূর্খ, সেই ব্যক্তিই যথার্থ শূদ্র। ব্রাহ্মণত্ব আদর্শ, তবে শূদ্রত্বও বিশ্বের বিধানে অপরিহার্য্য। আদর্শ থাকিলেই গঠিতব্য আছে উপযোগী বাহ্যসাহায্য ব্যতিরেকেও যে শূদ্র ব্রাহ্মণস্বরূপ আদর্শে প্রকৃতির ক্রমবিকাশধর্ম্মের নিরপেক্ষ নিয়তিতে কোনদিন না কোনদিন উপনীত হইবে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই; তবে কিনা বাহ্যসাহায্য পাইলে, উহা সুলভ হইবে।

পূর্ব্বে অনেকবার বলিয়াছি যে, উন্নতির ক্রম অতিক্রম করা যায় না। শূদ্র একেবারে ব্রাহ্মণত্ব অধিকার করিতে পারে না। ক্ষত্রিয়ত্ব ও বৈশ্যত্ব ক্রমে অধিকার করিয়া, পরে ব্রাহ্মণত্বরূপ আদর্শে উপস্থিত হইতে হইবে। তম-রজ পার হইয়া, পরে সত্বে স্বত্ববান্ হইতে হইবে।

উন্নতিসাধনের প্রধান উপায় আজ্ঞাপ্রতিপালন। পুত্র যদি পিতার আজ্ঞাপ্রতিপালন না করে, শিষ্য যদি গুরুর আজ্ঞাপ্রতিপালন না করে, ভৃত্য যদি প্রভুর আজ্ঞাপ্রতিপালন না করে, তাহাহইলে সমাজে শৃঙ্খলতা থাকে না। আজ্ঞাপ্রতিপালন যেমন সামাজিক উন্নতির ভিত্তিস্বরূপ, তদ্রূপ ব্যক্তিগত উন্নতিরও অপরিহার্য্য উপাদান। যে বালক পিতা-মাতা-শিক্ষকের অবাধ্য হইল, তাহার পরিণাম অতি শোচনীয়। যাহার যে বিষয়ে অধিকার, সে বিষয়ে অনধিকারী ব্যক্তির তাঁহার নিকট আজ্ঞাধীন হইতেই হইবে। রোগী চিকিৎসকের আজ্ঞাধীন না হইলে, কখনও রোগমুক্ত হইতে পারে না। অজ্ঞ ব্যক্তি জ্ঞানীর আজ্ঞাধীন না হইলে কখনও জ্ঞানলাভ করিতে পারে না। বর্ত্তমানে আমাদের সমাজে আজ্ঞাপ্রতিপালন-শিক্ষা নাই বলিয়াই আমরা অধুনা এত অনুন্নত হইয়া পড়িয়াছি। আমরা সকলেই স্ব-স্ব-প্রধান। কি ধর্ম্মসংস্কার, কি সমাজসংস্কার, কি রাজনৈতিকসংস্কার, সর্ব্ববিষয়েই আমাদের প্রত্যেকের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র মত। অধিকারীর তারতম্য নাই; যে ব্যক্তি যে বিষয় কখনও যথাযথ আলোচনা করে নাই, সে ব্যক্তিও নিজে তাহাতে স্বতন্ত্র মত সংস্থাপনে যত্নবান। আজ পাঁচ জনে মিলিয়া একটী কার্য্যারম্ভ করিল, আগামী কল্য পাঁচজনের পাঁচটী মত হইল এবং আরব্ধ কার্য্য ধ্বংস হইয়া গেল। অনধিকারী-পক্ষে অধিকারীর আজ্ঞা প্রতিপালন সামাজিক ও ব্যক্তিগত জীবনের উন্নতির মূল। যে পর্য্যন্ত স্বাধীন চিন্তা করিয়া কোন বিষয়ের তত্ত্ব অবগত হইবার ক্ষমতা না হয়, সে পর্য্যন্ত উক্ত তত্ত্ব-বিষয়ক অধিকারী ব্যক্তির আজ্ঞা প্রতিপালন করিয়াই উন্নতি-সোপানে আরোহণ করিতে হয়। অজ্ঞানী এবং বালকে কোন প্রভেদ নাই; বালক পিতা বা গুরুর আজ্ঞা প্রতিপালন না করিলে, সমাজ তাঁহাদের হস্তে আজ্ঞা প্রতিপালন করাইবার জন্য দণ্ডের ক্ষমতা অর্পণ করিয়াছেন এবং সেই দণ্ড-পরিচালনে পিতা বা গুরু স্বীয় স্বীয় পুত্রাদিকে আজ্ঞাধীন করিয়া থাকেন; কিন্তু যদি আজ্ঞাধীন না করা যায়

এবং তাহাকে আজ্ঞাধীন করিবারও কোন উপায় না থাকে, তাহাহইলে তাহার অনধিকৃত বিষয়ে কখনও অধিকার সুসম্ভাবিত হইতে পারে না। যথার্থ শূদ্রও যথার্থ ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্যাদি দ্বিজাতির নিকট বালক স্বরূপ। যথার্থ শূদ্র যথার্থ ব্রাহ্মণাদির আজ্ঞাবহ না হইলে, কখনও উন্নতিমার্গে আরোহণ করিতে পারিবে না। মানবীয় উন্নতির সর্ব্ববিষয়ে সম্পূর্ণ অনধিকারী ব্যক্তিই শূদ্র; অধিকারীর সাহায্য ব্যতীত কিরূপে সে অনধিকৃত বিষয়সমূহ অধিকার করিবে? যথার্থ শূদ্রেরও যেরূপ যথার্থ বৈশ্যাদি-পরম্পরায় উচ্চাধিকারীদিগের আজ্ঞাধীন হওয়া বিধি, দ্বিজাতি ব্রহ্মচারীদিগেরও তদ্রূপ গুরুর আজ্ঞাধীন হওয়া বিধি। প্রভেদ এই যে, ব্রহ্মচারীদিগের পূর্ব্বজাত সংস্কারহেতু তাহাদিগকে যত শীঘ্র উচ্চ অধিকারের বিষয় অবগত করান বিধি, শূদ্রের পূর্ব্বসংস্কারাভাবহেতু তাহা করান বিধি নহে। কোন অধিকারের স্ফুরণ দেখিলেই তৎশিক্ষা-সাধনায় প্রবিষ্ট করাইবার কোন বাধা নাই। যথার্থ শূদ্রের যেরূপ অকপটে যথার্থ ব্রাহ্মণাদির আজ্ঞাবহ হওয়া উচিত, যথার্থ ব্রাহ্মণাদিরও তদ্রূপ অকপটে যথার্থ শূদ্রকে উচ্চ অধিকারে প্রবিষ্ট করাইবার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। যথার্থ শূদ্র যথার্থ ব্রাহ্মণাদির আজ্ঞাবহ না হইলে যেরূপ উন্নতিপথে উঠিতে পারিবে না, যথার্থ ব্রাহ্মণাদিও যথার্থ শূদ্রেরমঙ্গল কামনা না করিলে, তাঁহাদের আমিত্বের প্রসার অক্ষুণ্ণ থাকিবে না এবং তদ্ধেতু তাঁহাদের গুণগতবর্ণ-প্রাধান্যও অব্যাহত রহিবে না। আর শূদ্রের পক্ষে আজ্ঞা-প্রতিপালনই আমিত্বের প্রসারের প্রধান উপায়। জ্ঞানী ব্যক্তিদিগের সংস্রবে থাকিয়া, তাঁহাদের আজ্ঞাবহ হইয়া তাঁহাদের আদিষ্ট কার্য্য করিলেই শূদ্র শূদ্রত্ব পরিহার পূর্ব্বক উচ্চাধিকারে প্রবেশ করিতে পারিবে। কিন্তু যদি শূদ্র স্বীয় বুদ্ধির উপর নির্ভর করে, তাহাহইলে সে কত শত বৎসর পরে যে নিজের উন্নতিসাধন করিতে পারিবে, তাহা কে বলিবে? অতএব হে শূদ্র! তুমি যদি আমিত্বের প্রসার করিতে চাহ, তবে ব্রাহ্মণ হও; যদি ব্রাহ্মণ হইতে চাহ, ক্ষত্রিয় হও; যদি ক্ষত্রিয় হইতে চাহ, বৈশ্য হও; যদি বৈশ্য হইতে চাহ, তাহাহইলে অকপটে ব্রাহ্মণাদির আজ্ঞাবহ শূদ্র হও। ভক্তিদ্বারাই ভগবানের প্রতি ভক্তের, গুরুর প্রতি শিষ্যের, পিতার প্রতি পুত্রের আমিত্বের প্রসার হয়। অতএব ভক্তিদ্বারাই উচ্চাধিকারী যথার্থ ব্রাহ্মণাদির প্রতি শূদ্রের আমিত্বের প্রসার সাধিত ও তাহারই ফলে অভিপ্সিত ধর্ম্মোন্নতি সম্পাদিত হয়।

(কস্যচিদ্‌পরিব্রাজকস্য।)

মায়াবাদ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

বাহ্যজগতের অবাস্তবিকতা।

পূর্ব্বে যেরূপ আলোচনা করা হইয়াছে, তাহাতে বেশ বুঝা গিয়াছে যে, ইন্দ্রিয় সকলের সাহায্যে বাহ্যজগতের প্রকৃত নিরপেক্ষ অবস্থা আমরা জানিতে পারি না; পরন্তু বাহ্যজগতের দ্রব্য-ধাতুগত আপেক্ষিক অস্তিত্বই কি আমরা নিঃসন্দেহে জানিতে পারি? বাহ্যজগতের সহিত সাক্ষাৎসম্বন্ধে আমাদের বস্তুগত কোন প্রকার পরিচয় নাই। আমরা কেবল মাত্র রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দপ্রভৃতি কতকগুলি ভাব অনুভব করি এবং বিশেষ বিবেচনা না করিয়াই সেই সকল ভাবকে মদিতর বাহ্যবস্তুর গুণ বলিয়া মানিয়া লই; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে রূপাদি কোন বাহ্যবস্তুর বিশেষ গুণ নহে; সে সকল আমাদের দেহেরই এক প্রকার অবস্থা মাত্র, যাহা বাহ্যবস্তুতে সম্ভবে না। সত্য বটে, রূপাদি অনুভব করিতে বাহ্যবস্তুর অস্তিত্ব আবশ্যক বলিয়া মনে করি, কিন্তু তাহা হইলেও তাহারা বাহ্যবস্তুর গুণ নহে, আমাদেরই দৈহিক এক অবস্থাবিশেষ। সেই জন্য কখনও বাহ্যবস্তুর বিদ্যমানতা স্বীকার করিয়াও তাহার রূপাদি দেখিতে পাই না, আবার কখনও বাহ্যবস্তুর বিদ্যমানতা অস্বীকার করিয়াও তাহার রূপাদি দর্শন করিতে পারি। বাহ্যবস্তু আমাদের এমন কোন জ্ঞানই জন্মাইয়া দিতে পারে না, যাহা আভ্যন্তরীণ কারণে, বাহ্যবস্তুর অবর্ত্তমানে আমরা অনুভব করিতে পারি না। স্বপ্নে আমরা কত কি অবর্ত্তমান বস্তুর রূপাদি দর্শন করি, জাগ্রত সময়েও কত কি অদ্ভুত-ভৌতিকক্রিয়া দেখিতে পাই। সান্নিপাত রোগগ্রস্ত ব্যক্তি বা সুরাতঙ্কিত ব্যক্তি বাহ্যবস্তুর সংসর্গ-নিরপেক্ষ আভ্যন্তরীণ কারণে কত কি বিভীষিকা দেখে, আবার যখন আমরা ঘুমাইয়া থাকি, তখন সম্মুখে বাহ্যজগৎ যদিও বাস্তবিকতার জ্বলন্ত দীপ্তিতে বর্ত্তমান থাকে, তথাপি তাহার কোন রূপ দেখিতে পাই না। জাগ্রত-সময়েও যখন মন কোন চিন্তায় ডুবিয়া যায়, তখন বাহ্যবস্তুর বাস্তবিকতা অনুভব করিতে পারি না। শকুন্তলা যখন দুষ্মন্তের চিন্তায় আত্মহারা হইয়াছিলেন, তখন তিনি দুর্ব্বাসার ভ্রূকুটি-কুটিলনেত্রের বিজলী-জ্যোতিও দেখিতে পান নাই, তাঁহার সেই শ্রবণবিদারক অভিসম্পাতের তীব্র বজ্রধ্বনিও শুনিতে পান নাই!

অসাধারণ মনীষাসম্পন্ন ধ্যানপরায়ণ মহাত্মা সকলের মধ্যে অনেকেই বাহ্যজগতের অস্তিত্ব বুঝিতে চেষ্টা করিয়া এপর্য্যন্ত বেশ বুঝিতে পারিয়াছেন যে, তাঁহাদের চক্ষে ভেল্কি লাগিয়াছে এবং সেই ভেল্কি না ভাঙ্গিলে ভব-ভেল্কি ভাঙ্গিবার চেষ্টা বৃথা। ইহাঁরা বলেন যে, রূপাদির জ্ঞান হইতে বাহ্যবস্তুর বাস্তবিক অস্তিত্ব এত প্রয়োজনীয় নহে। রাশি রাশি রূপ বাহিরে ছড়াইয়া পড়িয়া থাকুক, তোমার যদি দর্শেন্দ্রিয় না থাকে, দর্শনশক্তি না থাকে, তবে সে রূপ দেখে কে? পক্ষান্তরে, যদি আমার দর্শনশক্তি থাকে, তবে বাহ্যরূপ একেবারেই বিলুপ্ত হইয়া যাউক, আমি রূপের হাট বসাইতে পারি! অন্ধকার গৃহ, চক্ষুও মুদ্রিত, ঘরের কোথাও কোন রূপ দেখা যাইতেছে না, একবার আমার চক্ষুগোলকেরর একটী পার্শ্ব যদি টিপিয়া ধরি, তাহাহইলে দেখিতে পাইব, অদৃষ্টপূর্ব্ব কেমন উজ্জল আলোকচক্র আমার চক্ষুর অনতিদূরে অপূর্ব্ব-শোভা-সঞ্চার করিতেছে। পুনশ্চ, আমি হয়ত দ্বার রুদ্ধ করিয়া নির্জ্জনে

অন্ধকার গৃহে ঘুমাইয়া রহিয়াছি, ঘরে কত কত সামগ্রী সাজান রহিয়াছে, আমি তাহার কিছুই দেখিতেছি না, তবু কিন্তু যে সকল বস্তু পূর্ব্বে সে ঘরে দেখি নাই এবং ঘুম ভাঙ্গিলেও যাহা দেখিতে পাইব না, আমি ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া কেবল তাহাই দেখিতেছি!! আমার এই অবস্থা—যাহাকে আমি স্বপ্ন বলি, তাহা যদি এত দীর্ঘকালস্থায়ী হইত যে, আমি জাগরিত হইবার পূর্ব্বে পূর্ব্বপরিচিত পদার্থ সকল আমার সম্মুখ হইতে চিরকালের জন্য সম্পূর্ণরূপে অপসৃত হইয়াছে, আমার মানসপট হইতে তাহাদের স্মৃতি-রেখাপর্য্যন্তও মুছিয়া গিয়াছে, তাহাহইলে কি আমি আমার সেই সুদীর্ঘ সুপরিচিত স্বপ্নরাজ্যের বিনিময়ে ক্ষণস্থায়ী অপরিচিত জাগ্রত-রাজ্যের কামনা করিতাম? যে ব্যক্তি উন্মত্ত অবস্থায় কল্পনা-বলে এই প্রত্যক্ষ-পরিদৃশ্যমান বাহ্য-জগৎকে ভুলিয়া, তাহার স্থানে নূতন জগৎ গড়াইয়া, তাহাকেই আপনার সাম্রাজ্য জ্ঞান করিয়া থাকে, সে কি সেই মত্ততার বিনিময়ে এমন অপ্রমত্তাবস্থা কামনা করে, যাহাতে সে তাহার সুখের রাজ্য হারাইয়া, বিকট বিভীষিকাময় দারিদ্র্যের জলন্ত আলিঙ্গনে জীবন্তই জলিয়া পুড়িয়া মরিতে যাইবে? ধ্যানমগ্ন যোগী যে এই সর্ব্বদুঃখালয় জগৎকে তাঁহার মনঃপ্রদেশ হইতে টানিয়া ফেলিয়া দিয়া, তাহার স্থানে সর্ব্বসুখালয় শান্তি-প্রদ অধ্যাত্মজগৎ সৃষ্টি করিয়া, তাহারই শান্তিময়ক্রোড়ে বসিয়া ভূমানন্দ-সুধা পান করিতেছেন, তিনি কি আবার সাধ করিয়া পার্থিব-গরল পানের জন্য ব্যস্ত হইবেন?

স্বপ্নাদি অবস্থার বিচার করিয়াও আমরা সাধারণতঃ বাহ্যবস্তুর অলীকতা স্বীকার করিতে চাই না। আমরা শৈশব হইতে পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের—পঞ্চ অন্তরঙ্গের সঙ্গে থাকিয়া শিখিয়াছি যে, আমি স্বপ্নে যাহা দেখি, তাহা মিথ্যা, আর জাগ্রতে যাহা দেখি, তাহা সত্য; কিন্তু একবার ভাবিয়া দেখা উচিত যে, আমি সহজ অবস্থায়—জাগ্রতঅবস্থায় যাহা দেখি, তাহাই বা কিসে সত্য, আর স্বপ্নোন্মত্ততাদি অবস্থায় যাহা দেখি, তাহাই বা কিসে মিথ্যা? স্বপ্নে যাহা দেখি, তাহা যে মিথ্যা, একথা কি আমি স্বপ্নসময়ে মনে করিতে পারি? যে উন্মত্ত, সে তাহার উন্মত্ত অবস্থা অনুন্মত্তের মত জানিতে পারে না; আমিও যতক্ষণ স্বপ্ন দেখি, ততক্ষণ বুঝিতে পারি না যে, আমি স্বপ্ন দেখিতেছি এবং সেই স্বপ্নদৃষ্ট সমুদয় বিষয়ই অলীক। জাগ্রতসময়ে আমার সকল ইন্দ্রিয় যেমন মিলিয়া মিশিয়া আমার নিকট বাহ্যজগতের পরিচয় দিয়া থাকে, আমার স্বপ্নসময়েও তাহারা ঠিক তেমনি করিয়া মিলিয়া মিশিয়া আমার নিকট স্বপ্ন-কল্পিত জগতের পরিচয় দিয়া থাকে! যতক্ষণ আমি জাগ্রত থাকি, ততক্ষণ আমি যেমন মনে করি না যে, আমি যাহা দেখি, তাহা অলীক, তেমনি যতক্ষণ আমি স্বপ্ন দেখি, ততক্ষণও আমি ভাবি না যে, আমি যাহা দেখি, তাহা অলীক। যাহার জাগরণের বিরাম নাই, তাহার নিকট তাহার জাগ্রৎজগৎ যেমন সত্য, যাহার স্বপ্ন ভাঙ্গে না, তাহার নিকট তাহার স্বপ্নজগৎও তেমনই সত্য। স্বপ্ন ভাবিলে, জাগরণে দৃষ্টপদার্থ বা ঘটনার তুলনায় স্বপ্নে দৃষ্টপদার্থ বা ঘটনাকে মিথ্যা বলিলে, জাগরণের অভাব কালের স্বপ্ন-দৃষ্ট ঘটনার তুলনায় জাগ্রৎকালের ঘটনাকেও মিথ্যা বলিতে প্রস্তুত থাকা উচিত। মনে রাখা উচিত যে, স্বপ্ন যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণ স্বপ্ন নহে—স্বপ্নও জাগরণ; জাগরণ কালের জাগরণ যেমন ঠিক, তেমনই জাগরণ। আর যাহাকে আমি জাগরণাবস্থা বলি, জন্মের পূর্ব্ব ও মৃত্যুর পরের

মহাসুষুপ্তির অবস্থার সহিত তুলনায় তাহাকে একটী ক্ষুদ্র স্বপ্ন বলিয়া বুঝিতে কোন বাধা দেখা যায় না।

জাগরণ ও স্বপ্ন, দুইটীই আমারই অবস্থা এবং এই দুইটী অবস্থাকে ব্যবহারিক দৃষ্টিতে অবিদ্যার আলো-আঁধারিতে যতই বিসদৃশ বলিয়া জ্ঞান করি, ফলে পারমার্থিক জ্ঞানের দৃষ্টিতে উভয়ই এক প্রকৃতির। উভয় অবস্থাতেই মন বা আত্মা নিষ্ক্রিয় থাকে না। জাগ্রত-কালে মন যেমন তাহার পরিকল্পিত জগতের সুখদুঃখে হৃষ্ট ও ক্লিষ্ট হয়, স্বপ্নকালেও মন তেমনই তাহার সেই সময়ের পরিকল্পিত জগ-তের সুখদুঃখে হৃষ্ট ও ক্লিষ্ট হইয়া থাকে। প্রভেদ এইটুকু যে, স্বপ্নকালের সেই সকল কল্পনা জাগরণকালে এবং জাগরণকালের কল্পনা স্বপ্নকালে পুনরাবর্ত্তন করে না এবং সেই জন্য স্বপ্ন-জগতের কল্পিত বস্তু জাগরণকালের কল্পিত বস্তুর সহিত মিলে না; কিন্তু এক অবস্থার অনুভূতি অন্য অবস্থার অনুভূতির সহিত না মিলিলেও, তাহাদের মধ্যে নির্দ্দিষ্ট একটীকে বস্তুগত সত্য মনে করিয়া, নির্দ্দিষ্ট অন্যটীকে বস্তুগত মিথ্যা বলিবার কি কারণ আছে? কেন, স্বপ্নজগতকেই বস্তুগত সত্য ধরিয়া লইয়া, জাগ-রণ-জগতকেই কেন মিথ্যা বলি না? * ঘুমের ঘোরে যখন সঞ্চরণ করিয়া থাকি, তখন ত প্রায়ই জাগরণকালের অপেক্ষা অধিকতর বিদ্যা-বুদ্ধি দেখাইয়া সময়ে সময়ে এমন সকল জ্ঞান-কর্ম্মেন্দ্রিয়ের কার্য্য করিয়া থাকি যে, স্বপ্নের পর জাগরণকালে তাহার বিন্দুমাত্রও মনে ধারণা করিয়া উঠিতে না পারিয়াও, তাহার সত্যতা অস্বীকার করিবার সাহস পাই না। পুনশ্চ, যদি এইরূপ স্বপ্ন-সঞ্চরণকালে প্রত্যহ একই ধরণের কার্য্যের পুনরাবৃত্তি করি এবং তৎকালে যদি পূর্ব্ব পূর্ব্ব স্বপ্নকালের কার্য্য স্মরণে আনিতে পারি, আর জাগরণকালে যদি নিত্য নূতন নূতন কার্য্য করি এবং কোন এক সময়ের কার্য্য যদি অন্য সময়ে মনে করিতে না পারি, তাহাহইলে বরং স্বপ্নজগৎকেই সত্য জ্ঞান করিয়া আমার জাগরণ-জগৎকেই মিথ্যা বলিতে চাহিব! আবার দেখ, স্বপ্ন-জগতের বাস্তবিক অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়াও স্বপ্নের অস্তিত্ব জাগ্রতে অস্বীকার করিতে পারি না। জাগরণের পূর্ব্বে যে স্বপ্নাবস্থায় ছিলাম, তাহা জাগরণকালে বেশ মনে পড়ে, কিন্তু জাগরণকালের কোন অনুভূতিরই জ্ঞান স্বপ্ন-কালে থাকে না! জাগরণকালের সর্ব্বপ্রকার শোক, সন্তাপ, জ্বালা, যন্ত্রণা, স্বপ্নের যাদু-দণ্ড-স্পর্শে কোথায় চলিয়া যায়! তাহার স্মৃতিমাত্রও হয়ত স্বপ্ন সময়ে থাকে না; কিন্তু জাগরণকালে স্বপ্নের শোক-সন্তাপ বা আনন্দ-উল্লাস সকলই আমি ভুলিয়া যাই না; সুতরাং জাগরণের সাক্ষ্য-প্রমাণে স্বপ্নাবস্থার স্বতন্ত্র বর্ত্তমানতা সিদ্ধ হইতেছে, কিন্তু স্বপ্নাবস্থার সাক্ষ্য-প্রমাণে জাগরণাবস্থার স্বতন্ত্র বর্ত্তমানতা সিদ্ধ হইতেছে না। আবার ইহাও বিবেচনা করা উচিত যে, যাহাকে আমি জাগরণাবস্থা বলি, তাহার মধ্যে সুষুপ্তি ও স্বপ্ন-অবস্থাকে দেখিতে পাই না, কিন্তু স্বপ্নাবস্থার মধ্যে জাগরণ, সুষুপ্তি ও স্বপ্ন, সকল অবস্থারই অভিনয় করিতে পারি! স্বপ্ন যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণ ত স্বপ্নই আমার জাগ্রদ-বস্থা; তাহারপর স্বপ্নে নিদ্রা ও স্বপ্নবিষয়েও স্বপ্ন দেখা যায়! সুতরাং লক্ষ্মণের ন্যায় যে চৌদ্দ বৎসর একাধিক্রমে জাগরিত থাকে এবং তাহাই যাহার চূড়ান্ত আয়ুষ্কাল, তাহার সুষুপ্তি

* যদি সম্ভব হইত, তবে সেটা স্বপ্নাবস্থাতেই চলিত; এ বিচারণা, এ প্রবন্ধ লেখা বা চিন্তা, এসব যে জাগ-রণাবস্থার। কাজেই ইহাকে (আপাততঃ) প্রাধান্য দিতেই হইবে।

ও স্বপ্নের জ্ঞান আদৌ হইবার নহে; পরন্তু কুম্ভকর্ণের মত যে ছয় মাস একাদিক্রমে স্বপ্ন দেখে, সে সেই স্বপ্নের মধ্যেও জাগরণ, সুষুপ্তি ও স্বপ্নের জ্ঞান লাভ করিতে পারে।

জাগরণ, সুষুপ্তি ও স্বপ্ন, কোনটীই আমার নিষ্ক্রিয়াবস্থা নহে। সুনিদ্রাকালে আমি নিষ্ক্রিয় থাকি বলিয়া যে মনে করি, তাহা ভ্রম মাত্র। উপনিষৎ-শাস্ত্র জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি, এই তিনাবস্থার অতীত চতুর্থ বা তুরীয় অবস্থাকেই সংপূর্ণ নিষ্ক্রিয় ও নির্গুণ অবস্থা বলিয়াছেন। উহাই ব্রহ্মের স্বরূপলক্ষণের অবস্থা; সাধক সুষুপ্তি বা সমাধি-সাধনেই সে তত্ত্ব স্বীকার করিতে পারেন। সাধারণ মানব সুষুপ্তি বা স্বপ্ন-তত্ত্বও বুঝে না। ঘুমের ঘোরে যে আমি নিশ্চিন্ত থাকি না, স্বপ্নসঞ্চরণই তাহার জীবন্ত প্রমাণ। তদ্ভিন্ন স্বপ্নসঞ্চরণ-অবস্থার বিষয় সম্যক্ পর্য্যালোচনা করিলে বুঝিতে পারি যে, যদিও আমার কর্ম্মেন্দ্রিয়গণ তৎকালে সচেষ্ট থাকে এবং জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রীদেবী যদিও সজাগ থাকেন, তথাপি চক্ষুকর্ণাদি জ্ঞানেন্দ্রিয় সকল নিশ্চেষ্ট থাকে। বাস্তবিক স্বপ্নসঞ্চরণকারী একরূপ—

"পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ।"

সে নিমীলিতনেত্রেও উন্মীলিতনেত্রের ন্যায় দেখিয়া কার্য্য করিতে পারে। তাহার বাহ্যকর্ণের নিকট বন্দুকের আওয়াজ্ করিলেও সে তাহা না শুনিতে পারে, অত্যুগ্র গন্ধও তাহার বাহ্য নাসিকাকে উদ্বিগ্ন না করিতে পারে এবং তাহার গাত্রে নানাপ্রকার ব্যথা দিলেও সে তাহা সহজে অনুভবে না আনিতে পারে, অথচ কিন্তু অভৌতিক সত্তা সমূহ তাহার তাৎকালিক অন্তর্মুখী ইন্দ্রিয়-নিচয়ে ভৌতিকবৎ প্রতীয়মান হয়। আধুনিক "মেস্‌মেরিজম্" "ক্লায়ার্‌ভয়েন্‌স্" প্রভৃতি তত্ত্বেও এই মুক্তা প্রমাণিত

স্বপ্নসঞ্চরণকালে আমি যেমন নিষ্ক্রিয় থাকি না, সাধারণ স্বপ্নকালেও আমি তেমনি নিষ্ক্রিয় থাকি না। জীবের সক্রিয়ত্ব দৈহিক সচলত্বেরই একান্ত অধীন নহে। তখন নিষ্ক্রিয় থাকা সম্ভব হইলে, স্বপ্নকার্য্যটীই মিথ্যা হইত; কিন্তু স্বপ্নদৃষ্ট জগতের বাস্তবিক অস্তিত্ব থাকুক আর নাই থাকুক, স্বপ্নব্যাপারটী অস্বীকার করা যাইতে পারে না, কেন না জাগ্রতকালে যেমন ইন্দ্রিয়সকলকে মধ্যে রাখিয়া আমি সজ্ঞানে কার্য্য করি, স্বপ্নকালেও তাৎকালিক জ্ঞান-কর্ম্মেন্দ্রিয়সকলকে মধ্যে রাখিয়া আমি তেমনি সজ্ঞানে সকল কার্য্য করিয়া থাকি। স্বপ্ন জগৎকে আমি সাধারণতঃ হেয় মনে করি সত্য, কিন্তু তাহার কারণ ইহা নহে যে, স্বপ্ন-জগৎ একেবারেই অলীক; পরন্তু স্বপ্নাবস্থা অপেক্ষাকৃত অল্পকালস্থায়ী এবং জাগরণ-অবস্থার ন্যায় ইহার কোন এক অবস্থার পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি প্রায় হয় না; এই কারণে স্বপ্ন-জগতের কোন একটী কল্পনায় আমি অভ্যস্ত বা সংস্কারবদ্ধ হইতে না পারিয়া তাহাকে অলীক মনে করি; কিন্তু যদি কখনও নিদ্রাকাল ব্যাপিয়া প্রত্যহ একই ধরণের স্বপ্ন দেখি এবং জাগরণকালে যদি কখনও একই ধরণের কার্য্য না দেখি, তাহাহইলে আমি জাগরণ-দৃষ্ট জগৎকেই অলীক এবং স্বপ্ন দৃষ্ট জগৎকেই সত্য বলিয়া গ্রহণ করিব। প্রকৃতপক্ষে মন কি স্বপ্নে কি জাগরণে, কোনকালেই নিষ্ক্রিয় হয় না। মৃত্যু-তত্ত্ব বুঝাইতে গীতা বলেন,—

"বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্নাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা-
—ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী।"

ফলে মরণের পর যেমন স্থূলদেহ ছাড়া আর সবই থাকে, স্বপ্নকালেও প্রায় তদ্রূপ।

স্বপ্নকালে জাগরণকালের জ্ঞান কর্ম্মেন্দ্রিয়ের সঙ্গত্যাগ করে ও নূতনবিধ জ্ঞান কর্ম্মেন্দ্রিয়ের সঙ্গ লইয়া থাকে।

স্বপ্ন বা স্বপ্নসঞ্চরণকালে আমি নিষ্ক্রিয় থাকি না, ইহা বেশ বুঝা গেল, কিন্তু সুষুপ্তিকালে আমি কি অবস্থায় থাকি? তখন কি আমি বাহ্য-নিষ্ক্রিয় হইয়াও সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় থাকি? প্রচলিত মত বা সংস্কার তাহাই বটে। আমরা সাধারণতঃ মনে করি যে, সুষুপ্তিকালে আমরা সর্ব্বপ্রকার মানসিক কার্য্য হইতে নিবৃত্ত থাকি এবং তৎকালের সজ্ঞান অবস্থার কোনরূপ স্মৃতিই কি সুষুপ্তিকালে, কি জাগরণকালে, কোনকালেই থাকে না; কিন্তু সুষুপ্তাবস্থায় সজ্ঞানে থাকার কোন স্মৃতি-প্রমাণ পাই না বলিয়া কি সত্যসত্যই আমি সে সময়ে অজ্ঞানে ছিলাম, বিবেচনা করা উচিত? একটু স্থির হইয়া চিন্তা করিলে বুঝা যায় যে, নিদ্রাকালে আমি ইন্দ্রিয়-সাধ্য কার্য্য হইতে নিবৃত্ত থাকি ভিন্ন একেবারে নিষ্ক্রিয় বা অজ্ঞান থাকি না। জাগরণকালে আমি যেমন জ্ঞান-কর্ম্মেন্দ্রিয়ের কল্পনা করিয়া তন্মধ্যবর্ত্তিতায় কার্য্য করি, কিম্বা স্বপ্নসঞ্চরণকালে যেমন পূর্ব্বকল্পিত জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অপেক্ষা না করিয়া নবকল্পিত জ্ঞানেন্দ্রিয়ের মধ্যস্থতায় কার্য্য করি, অথবা স্বপ্নকালে যেমন স্বপ্নকল্পিত নূতন জ্ঞান-কর্ম্মেন্দ্রিয়ের সহায়তায় কার্য্য করি, সুষুপ্তিকালে তেমন না করিয়া সর্ব্বপ্রকারে বাহ্যজ্ঞান-কর্ম্মেন্দ্রিয়ের কল্পনা ত্যাগ করিয়া কেবল মানসিক সক্রিয়-সত্বায় বিদ্যমান থাকি। অতএব,

"তদা স্বরূপেঽবস্থানম্"

নিদ্রা সময়ে আমি চিন্ময়স্বরূপেই অবস্থান করি। সেই জন্য কদাচিৎ কল্পিত জ্ঞানকর্ম্মেন্দ্রিয় সকলকে নিশ্চেষ্ট দেখিয়াও;—

"য এষ সুপ্তেষু জাগর্ত্তিকামম্পুরুষো নির্ম্মিমাণঃ। তদেব শুক্রন্তদ্ ব্রহ্ম"

এই ব্রহ্মরূপে আমার তাৎকালিক সজ্ঞান অবস্থার অন্যবিধ পরিচয়ে সেই অবস্থাকে জাগ্রদবস্থা বলিয়াই বুঝা উচিত।

নিদ্রাবস্থায় যে আমি অজ্ঞানে থাকি না, একটু ভাবনা করিলেই তাহা বুঝা যায়। নিদ্রার পূর্ব্বে যদি কোন একটী নির্দ্দিষ্ট সময়ে জাগরিত হইবার দৃঢ়সঙ্কল্প করিয়া নিদ্রা যাই, তাহা-হইলে প্রায়ই সেই সময়ে জাগরিত হইতে সক্ষম হই। আবার যখন কোন কোলাহলময়ী নগরীতে যাই, তখন চতুর্দ্দিকের কোলাহলে বিরক্ত হইয়া, প্রথম প্রথম হয়ত ঘুমাইতে পারি না, পরে কোলাহলের মধ্যেই ঘুমাইতে পারি। উভয় অবস্থাতেই কোলাহল তুল্যরূপে বর্ত্তমান থাকিলেও এবং উভয় অবস্থাতেই ইন্দ্রিয়গ্রাম তুল্যরূপে ঘাতপ্রাপ্ত হইলেও, কেবল মনের তিতিক্ষা-শক্তির সচেতন অবস্থার জন্য নিদ্রাকালে সেই বিরক্তি অনুভব করি না। পুনশ্চ, যখন কোন রোগীর শুশ্রূষা করিবার ভার লইয়া তৎপার্শ্বে ঘুমাইয়া পড়ি, তখন রোগীর অসম্পর্কিত কোন উচ্চ শব্দেও উত্যক্ত না হইয়া, রোগীর শুভাশুভ জ্ঞাপক প্রত্যেক সামান্য পরিবর্ত্তনেও জাগিয়া উঠি। জ্ঞানেন্দ্রিয়ের উপর পতিত প্রবলতর ক্রিয়াকে উপেক্ষা করিয়া তদপেক্ষা ক্ষীণতর ক্রিয়ার প্রতি মন এত তীক্ষ্ণ-দৃষ্টি রাখিতে পারে কেন? এ সকলই কি মনের সার্ব্বকালিক সক্রিয়াবস্থার—আত্মার সর্ব্বদা সজ্ঞানে থাকিবার পরিচায়ক নহে? স্বীকার করি-যে, নিদ্রাকালে যে আমি সজ্ঞানে থাকি, তাহা সহজে বুঝিতে পারি না, কিন্তু জাগরণকালের সজ্ঞানাবস্থাই কি আমি সহজে বুঝিতে পারি? জাগরণকালের অনেক জ্ঞানকেই বিস্মৃতির বিবরে লুক্কায়িত দেখি।

আবার স্মৃতি-বিস্মৃতি উভয়ই পরস্পরের অনুগত। সেই জন্য প্রত্যেক স্মৃতির কার্য্যে বিস্মৃতি এবং প্রত্যেক বিস্মৃতির কার্য্যে স্মৃতিকে জড়িত দেখি। আমরা যখনই কোন অতীত ঘটনা স্মরণ করিতে যাই, তখনই বর্ত্তমানের ঘটনাকে অন্তরালে ফেলি, অথচ বর্ত্তমানকাল আদ্যন্তহীন কালচক্রের সর্ব্বত্রই কেন্দ্ররূপে দেদীপ্যমান। যাহাকে আমি ভূত বা অতীত বলি, তাহা এই বর্ত্তমানেরই শিশুভাব এবং যাহা ভবিষ্যৎ, তাহা বর্ত্তমানেরই অবশ্যম্ভাবী বৃদ্ধভাব। যুবা যেমন তাহার যৌবন বজায় রাখিয়া বাল্যাবস্থা বা বৃদ্ধাবস্থা ভোগ করিতে পারে না, তেমনি বর্ত্তমানের জ্ঞানকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া, আমি অতীত বা ভবিষ্যৎ চিন্তার সজ্ঞানাবস্থা ভোগ করিতে পারি না। আমি যখনই অতীত বা ভবিষ্যৎ বিষয় চিন্তা করি; তখনই বর্ত্তমানের ঐন্দ্রিয়িক বিশেষ অনুভূতি বা চিন্তা অদৃশ্য হয় এবং সময়ান্তরে এই সকল অবিশেষ এবং নিরৈন্দ্রিয়িক জ্ঞান-কার্য্যগুলি স্মরণ করিতে যাইয়া যখন আমি তাৎকালিক জ্ঞান-কর্ম্মেন্দ্রিয়-সাধ্য কোন কার্য্য দেখিতে পাই না, তখন নিরৈন্দ্রিয়িক ভূমাজ্ঞানকে বিশেষরূপে অবধারণ করিতে না পারিয়া, অসতর্কিতভাবে তদবস্থাকে আপনার নিষ্ক্রিয়াবস্থা বলিয়া মনে করি; কিন্তু পরমার্থতঃ আমি—অর্থাৎ আত্মা কখনও সর্ব্বথা নিষ্ক্রিয়—জ্ঞানশূন্য হইতে পারে না। জীবাত্মা নিত্য-সগুণত্বে সদা সক্রিয় ও নিত্য-চৈতন্য-স্বরূপত্বে সদা সজ্ঞান।

নিদ্রার সময়ে আমি সজ্ঞানে থাকিয়াও যেমন সে সময়কার সজ্ঞান অবস্থার বিশেষাবধারণা করিতে পারি না, তেমনই আমার অতীত শিশুজীবনের যে প্রথম দিনে জননী জঠরের ঘোর অন্ধকার হইতে নিঃসৃত হইয়া রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দময়ী পৃথিবীর আলোকে অবতীর্ণ হইয়াছি, সেই দিনের এবং তৎপূর্ব্বের অবস্থা স্মরণ করিতে যাইয়া আমি তাৎকালিক সজ্ঞানাবস্থার কোন বিশেষ অবধারণা করিতে পারি না; অথচ সে সময়ে যে একেবারে অজ্ঞানে ছিলাম, একথা বলিতে সাহস পাই না, কিন্তু কিপ্রকার জ্ঞানের অবস্থায় ছিলাম, তাহারও ঠিক প্রতীতি করিতে পারি না। ফলতঃ আমার বর্ত্তমান জীবনের প্রারম্ভাভিমুখে যতই অগ্রসর হই, ততই যেন কুহেলিকার মধ্যে পড়ি এবং সেই কুহেলিকা ভেদ করিয়া তাৎকালিক সজ্ঞান অবস্থার একটী ক্ষীণ আলোকরেখাও আমার স্মৃতিপটে সুপ্রতিফলিত হইতে দেখা যায় না বটে, কিন্তু কুহেলিকাবৃত বালারুণ-জ্যোতিবৎ শৈশব-জ্ঞানের শান্তমূর্ত্তির আভাস পাইয়া থাকি। ভ্রূণাবস্থায়ও যে আমি একেবারে নিষ্ক্রিয় বা অজ্ঞান ছিলাম, এমনটা ধারণা করিতে পারি না; পরন্তু একটু চিন্তা করিলেই বেশ বুঝা যায় যে, আমার জ্ঞান-প্রবাহ যেন একটী অবিচ্ছিন্ন ধারায় অতীতের অনধিগম্য কন্দর হইতে নিঃসৃত হইয়া, ভবিষ্যতের দুর্গম প্রদেশে প্রধাবিত হইতেছে এবং কেবল দূরত্বজন্যই মধ্যস্থ বর্ত্তমানের ন্যায় সেই দুইটী প্রান্ত দেখা যাইতেছে না। এজগতে—

"অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত।
অব্যক্তনিধনান্যেব তত্র কা পরিদেবনা॥"

(গীতা)

যত কিছু স্থাবর-জঙ্গমাত্মক বিশ্বচরাচরের সাংসারিক জ্ঞান, কল্পনা বা সত্তা, সকলেরই আদি এবং অন্ত অব্যক্তাবস্থাপন্ন; কেবল মধ্যমাংশই ব্যক্ত দেখা যায়। জীব-জ্ঞানপ্রবাহ এনিয়মের বহির্ভূত নহে। আদ্যন্তহীন জ্ঞানপ্রবাহের গতিদিক্ পরিবর্ত্তন জন্য তাহার উভয় প্রান্ত সমস্ত দৃষ্টিপথের বাহিরে এবং দূরে পড়ে বলিয়া

তত্তৎপ্রদেশের কোন বিশেষ অবধারণা হয় না; কিন্তু চেষ্টা করিলে, চিত্তবৃত্তির নিরোধ করিয়া যোগাভ্যাস-বলে যত্ন করিলে, জ্ঞান-প্রবাহের—কল্পনা-প্রবাহের সরলাংশের উভয় প্রান্তস্থ লীলাবর্ত্তকে মধ্যস্থানে সংযুক্ত ও নিশ্চল করিতে পারা যায় এবং যাঁহারা তাহা পারেন, তাঁহারা 'জাতিস্মর' হন এবং সুষুপ্তি-মধ্যে চৈতন্যানুভব করা ত' সামান্য কথা, একজন্মের অন্তকালীন মানসিক অবসন্নতার মধ্যেও পরজন্মের আরম্ভের সম্প্রকাশ দেখিতে পান এবং উভয় জন্মকেই একই অবিচ্ছিন্ন জ্ঞান-প্রবাহের ভিন্ন ভিন্ন দিকে গমনশীল অংশরূপে বুঝিয়া থাকেন। স্বরূপতঃ নিদ্রা আমার নিশ্চিন্ততার সময় নহে, পরন্তু চিন্ময় আত্মার নিরপেক্ষ চিন্তারই সময় বটে; প্রভেদ এইটুকু যে, তৎকালে পূর্ব্বাভ্যস্ত চিন্তা ত্যাগ করিয়া আমি অন্যবিধ চিন্তা করি এবং উভয় চিন্তার সংযোগ-সূত্রটী পৃথক্ পৃথক্ স্রোতে ভাসিতে থাকায়, আধ্যাত্মিক অনবধানতা বশতঃ আমি একের সহিত অপরের বিরুদ্ধ সম্বন্ধ কল্পনা করিয়া একটীকে মিথ্যা, অন্যটীকে সত্য বলি! পরমার্থতঃ জন্ম, মৃত্যু, স্বপ্ন, সুষুপ্তি, জাগরণ, সকলই সেই একমাত্র চিন্ময় আত্মার ধারাবাহিক জ্ঞানের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা। আমরা এক অবস্থার সহিত অন্যাবস্থার জ্ঞান-ধারার গতি-বৈষম্য বিচার করিয়া, বোধসৌকর্য্যার্থে এক এক অবস্থার এক এক নাম দিয়া থাকি। মূলে জন্ম ও মৃত্যু, একই ভূমা চৈতন্য-প্রবাহের অন্তর্গত ঐন্দ্রিয়িক ও নিরৈন্দ্রিয়িক জ্ঞান নামে নির্দ্দেশ্য দুইটী ধারা এবং সুষুপ্তি ও জাগরণ, আয়ুষ্কালাবচ্ছিন্ন-জন্মোপলক্ষিত জ্ঞান-প্রবাহের অন্তর্গত ক্ষুদ্র দুইটী আবর্ত্তন, আর স্মৃতি ও বিস্মৃতি প্রভৃতি জাগরণাখ্য খণ্ডপ্রবাহের খণ্ড ভিন্ন অন্য কিছুই নহে।

বিস্মৃতির প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিয়া বুঝিতে পারি যে, জ্ঞানের সুব্যক্ত অবস্থাকেও আমি সময়ে অব্যক্ত বলিয়া ভ্রম করি। এরূপ ভ্রম হইবার কারণ আছে; মন যখন ইন্দ্রিয়ের সাহায্য লইয়া কর্য্য করে, তখন সেই ইন্দ্রিয়াবচ্ছিন্ন কার্য্যগুলির বিসদৃশ সম্বন্ধবশতঃ মানসিক কার্য্যগুলি যেমন সবিশেষে বুঝা যায়, মন যখন ইন্দ্রিয়সঙ্গ ত্যাগ করিয়া স্বরূপে অবস্থান করে,—নিরিন্দ্রিয় হইয়া অবিচ্ছিন্ন ভূমা-বিষয় চিন্তা করে, তখন বিচ্ছিন্নভাব-বিশ্লেষণাভাবে ঐন্দ্রিয়িক কার্য্যাদির নিরোধ দর্শনে মানসিক কার্য্যেরও নিরোধ হয় বলিয়া ভ্রম উপস্থিত হয়। ঠিক্ সেই মত, যেমন—

"ভূতেন্দ্রিয়মনো বুদ্ধ্যাদিষ্বিহ নিদ্রয়া —
লীনেষ্বসতি যস্তত্র বিনিদ্রো নিরহংক্রিয়ঃ।
মন্যমানস্তদাত্মানমনষ্টো নষ্টবন্মৃষা
নষ্টেঽহঙ্করণে দ্রষ্টা নষ্টবিত্ত ইবাতুরঃ॥"

বিত্ত নাশ হইলে লোকে আপনাকে বিনষ্ট মনে করে, তেমনি বিশ্ব-বিকল্পনার বিরামরূপিণী নিদ্রার বশে যখন পরিদৃশ্যমান জগৎ অসতে লীন হয়, তখন সদাজাগরিত আত্মা আপনাকে সেই বিশ্বের বিরচন-বুদ্ধি-বিরহিত দেখিয়া মিছামিছি আপনাকে নষ্ট বলিয়া মনে করেন! ফলতঃ পার্শ্বে নৈমিত্তিক খণ্ড রূপাদি বর্ত্তমান না থাকিলে, নিত্য ভোগ্য ভূমারূপাদির বিশেষত্ব যেমন অনুভবে আসে না, তেমনি নিদ্রেতর অবস্থায় নৈমিত্তিক সংসারাসক্তিজ সুখ দুঃখের ঐন্দ্রিয়িকী কল্পনা ত্যাগ করিয়া, আত্মা যখন আপনার নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধাবস্থায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন, তখন তিনি সেই এক ভূমানন্দ ভোগে থাকেন; তাহার বিশেষক অন্য কোন খণ্ডানুভূতি তৎকালে উপস্থিত না থাকায়, আত্মা তাহাকে জাগরণাবস্থার শতধাবিচ্ছিন্ন জ্ঞানের সাদৃশ্যে বুঝিতে বা বুঝাইতে পারেন না। অধিক

এমনও হইতে পারে যে, আত্মা নিদ্রাকালে অন্যবিধ জ্ঞান-কর্ম্মেন্দ্রিয়ের কল্পনা করিয়া সম্পূর্ণ অন্য প্রকারের কল্পনার কার্য্যে নিবিষ্ট থাকেন কিন্তু উভয়কালীন কল্পনার মধ্যে কোনরূপ সাদৃশ্য না থাকায়, একাবস্থার কার্য্য অন্যাবস্থার চেষ্টায় প্রকাশ করিতে যে অক্ষমতা থাকে, তাহাই সুষুপ্তির রূপ ধারণ করে এবং সেই জন্য সুষুপ্তিকালের সজ্ঞান অবস্থা বুঝিয়াও বুঝিতে পারি না। পুনশ্চ, ঘুমের ঘোরে যে আমি নিষ্ক্রিয় ও অবুদ্ধ থাকি বলিয়া বিবেচনা করি, তাহার সাক্ষীও ত আমিই। আমি নিদ্রাকালেই বুঝিতেছিলাম যে, তৎকালে জাগ্রদনুভূত কিছু অনুভব করিতে ছিলাম না। আমি যদি স্বরূপতঃ নিদ্রাকালে সজ্ঞানে নাই থাকিব, তবে তদবস্থার অজ্ঞানতা কি করিয়া বুঝিব? স্বরূপতঃ আমি কখনই আমার সদা-জাগরিত অবস্থা অস্বীকার করিতে পারি না; তবে যে কখনও আপনাকে নিদ্রিত বলিয়া জ্ঞান করি, তাহা জাগরণেরই রূপান্তর ভিন্ন আর কিছুই নহে। নিদ্রাকালে আমি জাগ্রদধিগম্য ঐন্দ্রিয়িক জ্ঞানে অনাসক্ত থাকি ভিন্ন স্বরূপতঃ আমি নিরৈন্দ্রিয়িক জ্ঞানে অজ্ঞান থাকি না। সেরূপ অজ্ঞানে থাকা সম্ভবপর নহে। স্বরূপতঃ নিদ্রা আত্মারই এমন একটী অবস্থা, যাহার আদ্যন্ত-মধ্য, সর্ব্বত্রই আত্মাই তাহার একমাত্র নিয়ন্তা ও সাক্ষী। সুষুপ্তি আত্মার স্বরূপ অবস্থা। সে সময়ে—

'দ্রষ্টুঃ স্বরূপেঽবস্থানম্'

আত্মা সাক্ষীর ন্যায় উদাসীন হইয়া অবস্থান করেন। ইন্দ্রিয়-সাধ্য ব্যাপার হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া আত্মা আত্মাতেই অবস্থান করেন; ইন্দ্রিয়াধিগম্য সংসারের কোন অনুভূতির সাদৃশ্যেই তাহার অনুভূতি প্রকাশ করা যায় না। জাগরণকালে ও স্বপ্নসময়ে আত্মা আত্মশক্তি হইতে ইন্দ্রিয় এবং ইন্দ্রিয়ের বিষয় কল্পনা করিয়া, সেই কল্পিত কার্য্যের সুখ-দুঃখে হৃষ্ট ও ক্লিষ্ট হন। জাগরণ ও স্বপ্ন দুইই আত্মার বিরূপ অবস্থা এবং এই দুই অবস্থা ঐন্দ্রিয়িক দৃষ্টিতে যতই বিসদৃশ জ্ঞান করা হউক, ইহারা মূলে একই প্রকৃতির। কখনও কখনও মনে করি বটে যে, জাগরণ-অবস্থাটী আসল এবং স্বপ্ন তাহারই নকল; জাগরণকালে যাহা কিছু প্রত্যক্ষ হয়, তাহারই চিহ্ন যাহা মানসপটে অস্ফুটবর্ণে অঙ্কিত থাকে, নিদ্রাকালে তাহাই উজ্জ্বল বর্ণে পুনঃ প্রকাশিত হয় মাত্র, কিন্তু একথা সম্পূর্ণ ঠিক নহে। জাগ্রতে যেমনটী দেখি, স্বপ্নে তেমনটী নাও দেখিতে পারি এবং জগতে যেমনটী দেখি নাই, স্বপ্নে তেমনটীও দেখিতে পারি! ইহা কিছু স্বপ্নরাজ্যের বিরল ঘটনা নহে যে, একদিন ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া এমন একটী জীব দেখিলাম, যাহার মস্তক হস্তীর মস্তকের মত এবং দেহ সিংহের দেহের মত। এখন এই যে নূতন প্রাণী দেখিলাম, ইহা পূর্ব্বে কখনও আমার দেখা না থাকিলেও আজ স্বপ্নে তাহা দেখিলাম—নূতন দেখিলাম। সুতরাং স্বপ্নে যে নূতন কিছু দেখি না, যাহা কিছু দেখি, তাহা জাগ্রতে দৃষ্টেরই নকল, একথা কি করিয়া বলি? সন্দেহ হইতে পারে বটে যে, গজ-সিংহ-মূর্ত্তিটী হয়তো আমার নূতন দেখা হইল না—পূর্ব্বে যাহা পৃথক্ পৃথক্ দেখা ছিল, তাহাই আজ একত্রে দেখা গেল মাত্র; কিন্তু এ সন্দেহ অমূলক। অমূলক এই জন্য বলি যে, পূর্ব্বে হস্তী ও সিংহ পৃথক্ পৃথক্ দেখা থাকিলেও তাহাদের এই অচিন্তিতপূর্ব্ব সংযোগটী তো আর দেখা ছিল না; এখনই কেবল দেখিতে পাইতেছি। পূর্ব্বে যে সংযোগটী আমার দেখা ঘটে নাই এবং ঘটিবার সম্ভাবনাও ছিল না, আজ স্বপ্নের অঘটন-ঘটন-পটীয়সী ঐন্দ্রজালিকী-শক্তির বলে সেই আত্মা

সংযোগটী দর্শন করিলাম। এই অচিন্তিতপূর্ব্ব সংযোগটী কি নূতন হইল না? বস্তুতঃ আমার অসম্ভাবিত যাবতীয় অনুভবই—সর্ব্বপ্রকার জ্ঞানই আপেক্ষিক সম্বন্ধাবদ্ধ এবং সেইজন্য সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য মূলক। যখনই আমার কোন পদার্থের জ্ঞান হয়, তখনই তাহাকে আমার পূর্ব্বানুভূত কোন পদার্থের সদৃশ বা অসদৃশ বলিয়া বুঝি; তদ্ভিন্ন অন্যরূপে বুঝিতে পারি না। সেইজন্য কোন পদার্থকে স্বপ্নেই দেখি বা জাগ্রতেই দেখি, সকলসময়েই তাহাকে আমি দৃষ্টপূর্ব্ব কোন না কোন পদার্থের সহিত কোন অংশে সমান এবং কোন অংশে অসমান না ভাবিয়া থাকিতে পারি না। একটা দৃষ্টান্ত ধরিয়া কথাটা পরিষ্কার করি। আমি জাগ্রদবস্থায় একখান নৌকা দেখিলাম, আর কোন দিন নৌকা দেখি নাই, যেন আজই নূতন দেখিলাম; কিন্তু যে অর্থে স্বপ্নে নূতন কিছুই দেখা যায় না বলি, সেই অর্থে এই জাগ্রতে দৃষ্ট নৌকাই যে নূতন দেখিলাম, তাহা কি করিয়া বলিতে পারি? নৌকা দেখিতে আমি একটা সীমাবদ্ধ বস্তু দেখিলাম, কিন্তু সীমাবদ্ধ রূপ নৌকা দেখার পূর্ব্বেও আমি দেখিয়াছি; নৌকা দেখিতে আমি যে বর্ণ দেখিলাম, তাহাও নৌকা দেখার পূর্ব্বে আমি অনেক বার দেখিয়াছি; তাহার পর সীমাবদ্ধ নৌকার রূপ দেখিতে সীমা নির্দ্দেশক যে সকল সরল ও বক্র রেখা দেখিলাম, তাহাও আমি কতবার কত স্থানে দেখিয়াছি; নৌকার রূপ-নির্দ্দেশক রেখার বিন্যাসের মত বিন্যাসও আমি পূর্ব্বে একত্রে বা পৃথক্‌রূপে ভূয়োভূয়ঃ দর্শন করিয়াছি। নৌকার উপাদানভূত কাষ্ঠ ও লৌহের মত কাষ্ঠ ও লৌহও আমি পূর্ব্বে অনেক দেখিয়াছি; সুতরাং যে নৌকাকে আমি আজ নূতন দেখিতেছি বলিয়া মনে করিতেছি, তাহা প্রকৃতপক্ষে সমষ্টিভাবে নূতন দেখা হইলেও তাহার উপাদানগত ব্যষ্টিভাবে নূতন দেখা হইল না। পূর্ব্বদৃষ্টবৎ কতকগুলি কাষ্ঠ ও লৌহকে পূর্ব্বদৃষ্টবৎ কতকগুলি আকারে বা ক্রমে বিন্যাস করিয়া আমি নৌকা গড়াইয়া দেখিতেছি। পূর্ব্বদৃষ্ট কতকগুলি পৃথক্ পৃথক্ পদার্থকে স্বপ্নে একত্র করিয়া যেমন একটী অভূতপূর্ব্ব পদার্থ সৃষ্টি করি বলিয়া মনে করি, ঠিক্ তেমনি আমার জাগরণকালেও কতকগুলি পূর্ব্বপরিচিত পৃথক্ পৃথক্ বস্তুকে একত্র করিয়া নূতন একটী পদার্থ গড়াইয়া থাকি বলিয়া মনে করা উচিত। ফলতঃ যদি স্বপ্নকালে অননুভূতপূর্ব্ব নূতন রূপাদির অনুভূতি অস্বীকার করা যায়, তাহা হইলে সমান ন্যায়ে জাগ্রতকালেও আমার অননুভূতপূর্ব্ব রূপাদির অনুভূতি অস্বীকার করিতে হয়।

প্রকৃতপক্ষে স্বপ্নেই হউক, আর জাগরণেই হউক, আমরা কখনও সম্পূর্ণরূপে অননুভূতপূর্ব্ব কোন রূপাদি অনুভব করিতে পারি না। প্রত্যেক নূতন অনুভূতিকে যখনই বিশ্লেষণ করিতে যাই, তখনই বুঝিতে পারি যে, তাহা কতকগুলি অনুভূতপূর্ব্ব বিষয়ের সংঘাত-ফল মাত্র। কিন্তু যদিও এইরূপ প্রত্যেক নূতন অনুভূতিকে পূর্ব্বানুভূত বিষয়ের সংঘাত বলিয়া স্মরণ হয়, তথাপি সেই সকল পূর্ব্বানুভূতির পূর্ব্বানুভূতিকে—অতিপূর্ব্ব-পূর্ব্বানুভূতিকে, স্মরণে আনিতে পারি না। "অব্যক্তাদীনি ভূতানি" ভৌতিক পদার্থমাত্রেরই আদি অব্যক্ত এবং সেই সকল বিষয়ের অনুভূতির আদিও অব্যক্ত। ইহজন্মে যে মুহূর্ত্তে জননীর গর্ভগত ক্ষীর-সাগর-শয্যা ত্যাগ করিয়া আমি ধরণীর কঠিন পৃষ্ঠে অবতীর্ণ হইয়াছি, সেই মুহূর্ত্তে জ্ঞানের কি পরিমাণ সম্বল লইয়া আমি আসিয়াছিলাম এবং তাহার

পর কয়েক বৎসর ধরিয়া সেই মূলধনের কিরূপ উপচয়-অপচয়ে বর্ত্তমান জ্ঞানের অধিস্বামী হইয়াছি, তাহা কিছুই বুঝিতে পারি না। নির্দ্দিষ্ট কোন্ সময়ে এই সংসারের সহিত কিরূপে আমার পরিচয়ের সূত্রপাত হইয়াছে, তাহাও বলিতে পারি না; কিন্তু ইহাও অবধারিত কথা যে, এই সংসারের সহিত আমার প্রথম পরিচয় যে কালে যতই অস্পষ্ট ও অব্যক্ত ভাবে উদ্ভূত হইয়া থাকুক, সেই পরিচয় লব্ধ আদি জ্ঞানগুলিকেই ঘষিয়া মাজিয়া লইতে লইতেই আমার জ্ঞানের পরিচয় বর্ত্তমানের বিস্তার প্রাপ্ত হইয়াছে। আবার সকল অনুভূতির মধ্যেই যেমন তাহাদের প্রাচীনত্ব বুঝিতে পারি, তেমনই সকল অনুভূতিই যে পূর্ব্বানুভূতির অবিকৃত প্রতিরূপ, তাহাও বলিতে পারি না। প্রত্যেক অনুভূতি যেমন কিয়দংশে পূর্ব্বানুভূতির প্রতিরূপ, তেমনই কিয়ৎপরিমাণে পূর্ব্বানুভূতি হইতে বিরূপ এবং এই বিভিন্নতা যতই অধিক হয় এবং পূর্ব্বানুভূতি গুলিকে যতই বিস্মৃত হই, ততই বর্ত্তমান অনুভূতিকে নূতন বলিয়া বিবেচনা করিতে পারি। প্রত্যেক অনুভূতিই পুনঃপুন আবর্ত্তিত হইলে, স্মৃতিবিস্মৃতির ন্যূনাধিক্যে কালে তাহা কখনও পরিস্ফুট, কখনও অস্ফুট হইয়া পড়ে এবং একই অনুভূতির মধ্যে বিভিন্নতা বোধ জন্মে। নীল ও লোহিত বর্ণ এত যে বিভিন্ন, তথাপি উভয়ের রূপত্বের একতা আছে। তিক্তাস্বাদ এবং মিষ্টাস্বাদ, উভয়ের মধ্যে বিভিন্নতা থাকিলেও রসত্বমাত্র বিষয়ে উভয়ের একতা বুঝিতে পারি। আবার রূপের ও রসের মধ্যে বিভিন্নতা থাকিলেও উভয়ের একতা বুঝিয়াই উভয়কেই অনুভূতি বলিয়া বুঝি। ফলতঃ আমাদের সাংসারিক জ্ঞানোদয়ের—সংসার-সৃষ্টি-কল্পনার আদি ও অন্তে দুই প্রান্ত অব্যক্তের গাঢ় অন্ধকারে বিলীন, তাহা বাদ দিয়া মধ্যাংশের প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিলে বুঝিতে পারি যে, আমাদের কোন অনুভূতিই একেবারে অননুভূতপূর্ব্ব নহে, অনুভূতপূর্ব্বও নহে, তা সে অনুভূতি স্বপ্নেই হউক, আর জাগরণেই হউক। ফলতঃ তদানীন্তন অনুভূতির প্রাচীনত্ব বা নবীনত্ব দ্বারা স্বপ্নের সহিত জাগরণের প্রকৃতিগত কোন বিভিন্নতা বুঝা যায় না।

পরমার্থতঃ স্বপ্ন ও জাগরণ, উভয়ই এক। চিন্ময় আত্মার সৃষ্টি-শক্তির দুইটী লীলাবর্ত্তনের মধ্যে মায়িক প্রভেদ সামান্য একটু যাহা আছে, তাহা এই যে, জাগৎকালে পূর্ব্বানুভূতি সকলকে একত্র সংযত করিতে রূপ-স্পর্শ-শব্দাস্বাদ-গন্ধযুক্ত একটী বস্তু চিন্তা করিতে পারি; কিন্তু যেমন একটী বাহ্যবস্তু গড়াইয়া, তাহার জীবন্ত রূপ-স্পর্শ-শব্দাস্বাদ-গন্ধ অনুভব করিতে পারি না, স্বপ্নে তাহা পারি। জাগ্রতে অবিদ্যমান গজ-সিংহমূর্ত্তি চিন্তা করিতে পারি, কিন্তু প্রত্যক্ষ করিতে পারি না; পক্ষান্তরে, জাগরণের জ্ঞান-বিশ্বাসমতেই স্বপ্নকালে অবিদ্যমান গজ-সিংহ-মূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করিতে পারি; কিন্তু স্বপ্ন যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণ সেই প্রত্যক্ষীভূত গজসিংহকে অবিদ্যমান বলিয়া জানিতে পারি না। ফলতঃ জাগরণের অনুভূত বিষয় সকলের বাহ্য আধার থাকা যেমন জাগরণকালে বিশ্বাস করি, তেমনই স্বপ্নকালেও স্বপ্নানুভূত বিষয় সকলের বাহ্য আধার থাকা বিশ্বাস করি। কি স্বপ্নে, কি জাগরণে, উভয় অবস্থাতেই আমরা রূপ-রসাদি অনুভব করি; উভয় কালেই অনুভূতির অনুভাবনার সত্যতা সম্বন্ধে কোন সন্দেহ করি না; সন্দেহ করি কেবল অনুভূতির বাহ্য বস্তুনিষ্ঠতায়; অর্থাৎ জাগ্রতকালে রূপ-রসাদি যাহা অনুভব করি, তাহাকে যেমন কোন বাহ্যবস্তুনিষ্ঠগুণ বলিয়া বিশ্বাস করি,

স্বপ্নে রূপ-রসাদি যাহা অনুভব করি, তাহাকে তেমন কোন বাহ্যবস্তুনিষ্ঠ গুণ বলিয়া বিশ্বাস করি না।

এখন বিচার্য্যবিষয় এই যে, জাগ্রতানুভূত রূপ-রসাদির বাস্তবিকতা কেন স্বীকার করিব, আর স্বপ্নানুভূত রূপ-রসাদির বাস্তবিকতাইবা কেন অস্বীকার করিব। মনে রাখা উচিত, জাগ্রৎকালে যেমন জাগ্রদনুভূত রূপাদির বাস্তবিকতা স্বীকার করি, স্বপ্নকালেও স্বপ্নানুভূত রূপাদির বাস্তবিকতা তেমনই স্বীকার করি; জাগ্রতকালে যেমন স্বপ্নদৃষ্ট রূপাদির বাস্তবিকতা অস্বীকার করি, স্বপ্নকালেও তেমনই জাগ্রত-দৃষ্ট রূপাদির বাস্তবিকতা মনে করি না। জাগ্রতের নিকট জাগ্রৎজগৎ যেমন বাস্তবিক সত্য, স্বপ্ন-অবস্থায় অবস্থিতের নিকট স্বপ্নজগৎও তেমনই বাস্তবিক সত্য। জাগ্রতের নিকট স্বপ্নজগৎ মিথ্যা, সুপ্তের নিকটও জাগ্রৎ-জগৎ অননুভূত। এই সকল কথা মনে রাখিয়া, উভয় জগতের বাস্তবিকতা বা অবাস্তবিকতার মীমাংসা করিতে যাইয়া বুঝিতে পারি যে, পরস্পর বিরুদ্ধ বাক্য দুইটার মধ্যে দুইটাই কখনও সত্য হইতে পারে না; হয় দুইয়ের একটা মিথ্যা, না হয় দুইটাই মিথ্যা। একটু চিন্তা করিয়া দেখিলেই বুঝা যায়, অনুভূত বিষয়ের বাস্তবিকতা সম্বন্ধে স্বপ্ন এবং জাগ্রত, উভয়ের সাক্ষ্যই মিথ্যা। আমরা সচরাচর জাগ্রতের সাক্ষ্যকে সত্য বলিয়া ধরিয়া লইয়া, স্বপ্ন-জগতের বাস্তবিকতা অস্বীকার করি; সুতরাং জাগ্রতের সাক্ষ্য বিশ্লেষণ করিয়া দেখা যাউক যে, তাহার সাক্ষ্যকে কতদূর বিশ্বাস করা যাইতে পারে। জাগ্রতাবস্থায় আমরা স্বপ্নজগতের বাস্তবিকতা অস্বীকার করি, কিন্তু অবাস্তবিক স্বপ্নজগৎকে অস্বীকার করি না; অতএব জাগ্রতের সাক্ষ্য-প্রমাণেই বুঝা যাইতেছে যে, স্বপ্নসময়ে আমরা অবিদ্যমান বস্তুতে বস্তু দর্শন করিয়া থাকি। কিন্তু এরূপ কেন হয়? সম্মুখে রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দাদির আধার কোন বাহ্যবস্তু না থাকিলেও স্বপ্নদ্রষ্টা কি করিয়া রূপ-রসাদি অনুভব করিল? অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, স্বপ্নদ্রষ্টার এমন একটা শক্তি আছে, যাহার বলে অবস্তুতে বস্তু দর্শন করিতে পারে; সম্মুখে রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দাদির বিষয়ীভূত কোন বস্তু না থাকিলেও স্বপ্নে আমি আত্মশক্তি-প্রভাবে রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দাদি অনুভব করিতে এবং সম্মুখে তদাধারের বিদ্যমানতা বিশ্বাস করিতে পারি; এক কথায়—অসত্যকে সত্যবৎ প্রত্যক্ষ করিতে পারি। ইহা যদি হইল, স্বপ্নসময়ে আত্মা অসত্যকে সত্যবৎ কল্পনা করিতে পারে, ইহা যদি বুঝিতে পারিলাম, তাহাহইলে স্বপ্নেতর সময়ে আত্মা যে কেন অবস্তুতে বস্তু দর্শন করিতে পারিবে না, ইহা বুঝা যায় না। স্বপ্ন-জগৎ যদি অসৎ হইতে উৎপন্ন হইতে পারে, তবে এই পরিদৃশ্যমান জাগ্রত-জগৎও অসৎ হইতে উৎপন্ন হইতে বাধা কি? কোন বাধাই ত দেখা যায় না। স্বপ্নজগৎ যেমন প্রকৃতপক্ষে অবাস্তবিক হইয়াও স্বপ্নকালে বাস্তবিক বলিয়া প্রতীত হয়, তেমনই জাগ্রত-জগৎও প্রকৃতপক্ষে অবাস্তবিক হইলেও জাগ্রতকালে বাস্তবিক বলিয়া জ্ঞান হয়। ফলে পরমার্থতঃ উভয় জগৎই অবাস্তবিক; কিন্তু লৌকিকতঃ অবিদ্যার দৃষ্টিতে কোন জগৎই একেবারে মিথ্যা নহে। কেননা উভয় কালের বাহ্যজগতের বাস্তবিক অস্তিত্ব না থাকিলেও তাহাদের কাল্পনিক অস্তিত্ব থাকিতেছে। এই কাল্পনিক জগতের কার্য্যও কাল্পনিক নিয়মদ্বারা অনুশাসিত হইতেছে। লৌকিক দৃষ্টিতে যাহা একটী বস্তু, পারমার্থিক দৃষ্টিতে তাহা একটী কল্পনা-স্তবক। যে কল্পনা-

গুলি সংযত করিয়া একটী কল্পনা-স্তবক হইয়াছে, সেই কল্পনাগুলির একটীর সঙ্গে সঙ্গে অপরগুলি আপনিই আসিয়া যুটে। চিনি একটী কল্পনা-স্তবক, জিহ্বা একটী কল্পনা-স্তবক; চিনি জিহ্বায় সংযুক্ত হইল, এই কল্পনার সঙ্গেসঙ্গেই মিষ্ট-রসানুভূতি উৎপন্ন হইল; কেন না—

যস্ত কর্ম্মাণি যস্মিন্ স ন্যযুঙ্ক্ত প্রথমং প্রভুঃ।
তদেব স স্বয়ন্তেজে সৃজ্যমানঃ পুনঃ পুনঃ॥

আদিতে যে কল্পনার পর যে কল্পনার সম্বন্ধ ঘটান হইয়াছে, পর পর কালে, সেই সেই কল্পনার একটীর প্রসঙ্গে পরভাবী কল্পনাটী আপনিই আসিয়া পড়ে। তাহাতেই বলা হইতেছে যে, বাহ্যজগৎ যেমন আমার কল্পনা-প্রসূত, বাহ্যজগতের নিয়ম সমুদায়ও তেমনি আমার কল্পনা।

(ক্রমশঃ)

পঞ্চদশী।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

একমেবা দ্বিতীয়ং সৎ সিদ্ধমত্র তু কেচন।
বিহ্বলা অসদেবেদং পুরাসীদিত্যবর্ণয়ন্ ॥২১॥

পূর্ব্বোক্ত যুক্তিদ্বারা সচ্চিদানন্দস্বরূপ অদ্বিতীয় পুরুষোত্তম পরাৎপর পরমব্রহ্মই এই জগতে বিদ্যমান আছেন, ইহাই প্রতিপন্ন হইল। এইক্ষণ ভ্রম-প্রমাদ দ্বারা বিনষ্ট-বুদ্ধি কোন কোন সাকার ব্রহ্মবাদী বৌদ্ধদিগকে পরাভূত করিতেছেন। বৌদ্ধমতাবলম্বী সাকার ব্রহ্মবাদীরা বলিয়া থাকেন যে, "এই অনন্ত-জগতের উৎপত্তির পূর্ব্বে কেবল অসৎ মাত্র ছিল, তৎকালে কোন সৎপদার্থ বিদ্যমান ছিল না।"

মগ্নস্যাব্ধৌ যথাক্ষাণি বিহ্বলানি তথাস্যধীঃ।
অখণ্ডৈকরসং শ্রুত্বা নিষ্প্রচারা বিভেত্যতঃ ॥২২॥

যেমন কোন ব্যক্তি সমুদ্রজলে নিপতিত হইয়া অভিভূত হইলে, তাহার ইন্দ্রিয় সকল অবশ হইয়া যায়, তখন আর সেই সকল ইন্দ্রিয়ের কোন কার্য্য থাকে না, সেই প্রকার বৌদ্ধমতাবলম্বীদিগের বুদ্ধি সেই অদ্বিতীয় সচ্চিদানন্দময় পরংব্রহ্মের তত্ত্বনিরূপণে স্তব্ধীভূত হইয়া থাকে, তাহাদিগের বুদ্ধিবৃত্তি কোনরূপেও সেই সনাতন সর্ব্বনিয়ন্তা জগৎপাতার স্বরূপ নির্দ্ধারণে প্রবেশ করিতে না পারিয়া সর্ব্বদা ভয়ে বিহ্বল হইয়া থাকে ॥ ২২ ॥

গৌড়াচার্য্যা নির্ব্বিকল্পে সমাধাবন্য যোগিনাম্।
সাকার ধ্যাননিষ্ঠানামত্যন্তং ভয়মূচিরে॥ ২৩॥

পূর্ব্বোক্ত বৌদ্ধদিগের মত খণ্ডনের নিমিত্ত আচার্য্যদিগের অভিপ্রায় প্রকাশ করিতেছেন। গৌড়দেশবাসী ব্রহ্মতত্ত্ববিদ্ আচার্য্যগণ পূর্ব্বোক্ত প্রকারে নির্ব্বিকল্প সমাধিকালে সাকার ব্রহ্ম-চিন্তনতৎপর বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী যোগীগণের সাতিশয় ভয়প্রাপ্তির কারণস্বরূপ রচিত বার্ত্তিক-শ্লোক নিরূপণ করিয়া তাহাদিগকে ভয়প্রদর্শন-পূর্ব্বক নিরস্ত করিয়াছেন ॥ ২৩॥

অস্পর্শ যোগো নামৈষ দুর্দর্শঃ সর্ব্বযোগিভিঃ।
যোগিনো বিভ্যতি হ্যস্মাদভয়ে ভয়দর্শিনঃ ॥২৪॥

যে সকল বৌদ্ধযোগী ব্রহ্মের সাকাররূপ চিন্তা করে, তাহাদিগের অধিকারে নির্ব্বিকল্প সমাধি কখনও ঘটিয়া উঠে না। বৌদ্ধদিগের পক্ষে এই নির্ব্বিকল্প-সমাধির নাম 'অস্পর্শ যোগ'; কারণ তাহারা অভয়স্বরূপ এই যোগে ভয়প্রাপ্ত হইয়া তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না॥ ২৪॥

ভগবৎ পূজ্যপাদাশ্চ শুষ্কতর্ক পটূনমূন্।
আহর্মাধ্যমিকান্ ভ্রান্তানাচিন্ত্যোঽস্মিন্ সদাত্মনি॥ ২৫॥ অনাদৃত্য শ্রুতিং মৌর্খ্যাদিমে বৌদ্ধাস্তপস্বিনঃ। আপেদিরে নিরাত্মত্বমনুমানৈক চক্ষুষঃ॥ ২৬॥

পূর্ব্ব শ্লোকে আচার্য্যপ্রবর বার্ত্তিকের মত প্রদর্শিত করিয়াছেন; এই শ্লোকে আচার্য্যচূড়ামণি ভগবান শ্রীশঙ্করের অভিপ্রায় প্রদর্শন করিতেছেন। সাকারবাদী বৌদ্ধযোগিগণ কেবল অযৌক্তিক নীরস তর্ক করিয়া থাকেন, এই নিমিত্ত পূজ্যপাদ ব্রহ্মবিদগ্রগণ্য তত্ত্বদর্শী ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য বার্ত্তিক-শ্লোকের যুক্তিপ্রদর্শনপূর্ব্বক তাহাদিগকে অচিন্তনীয় সচ্চিদানন্দ পরমাত্মা পরব্রহ্মের নির্ব্বিকল্পসমাধি অচেতন জড়বিষয়ে ভ্রান্ত বলিয়া গণনা করিয়াছেন। সেই সাকারবাদী বৌদ্ধযোগীগণ স্বীয় অনভিজ্ঞতা বশতঃ বেদের যথার্থ মর্ম্মকে অনাদর করিয়া, কেবলমাত্র অলীক অনুমানের বলে নির্ব্বিকার নিরঞ্জন জগৎকর্ত্তা পরমাত্মার অবিদ্যমানতা প্রতিপাদন করিয়া থাকেন॥ ২৫-২৬॥

শূন্যমাসীদিতি ব্রুষে সদ্‌যোগং বা সদাত্মতাম্।
শূন্যস্য ন তু তদ্‌যুক্তমুভয়ং ব্যাহতত্বতঃ॥ ২৭॥

এই শ্লোকে সাকার-নিরীশ্বরবাদী বৌদ্ধতপস্বীগণকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসাপূর্ব্বক নির্ব্বাক্ করিয়া, তাহাদিগের অমূলক মত খণ্ডন করিতেছেন।—হে নিরীশ্বরবাদী বৌদ্ধগণ! তোমরা ইহাই প্রগল্‌ভবচনে বলিয়া থাক যে, এই পরিদৃশ্যমান চরাচর জগৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে আর কিছুই ছিল না; কেবল "শূন্যমাত্র ছিল" তোমাদিগের একথা নিতান্ত অসঙ্গত, যেহেতু "শূন্য" শব্দের অর্থ অভাব এবং "ছিল" এই শব্দের অর্থ ভাব; সুতরাং "শূন্য ছিল" এই বাক্যের অর্থ ভাব ও অভাব, এইরূপ হইল। পরন্তু, উক্ত "শূন্যের" ভাববিশিষ্ট অভাব অথবা ভাব অভাব স্বরূপ, ইহার কোন অর্থই সুসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। কারণ যে অভাব, সে কখনও ভাব হইতে পারে না এবং যে, ভাব, সে কখনও অভাবস্বরূপ হয় না॥ ২৭॥

ন যুক্তস্তমসা সূর্য্যো নাপিচাসৌ তমোময়ঃ।
সচ্ছূন্যয়োর্ব্বিরোধিত্বাৎ শূন্যমাসীৎ কথং বদ॥ ২৮

যেমন জগৎ-প্রকাশক সূর্য্য উদিত হইয়া জগতের তমোরাশি বিনাশ করেন, সুতরাং তাঁহাকে অন্ধকারবিশিষ্ট (ভাব), বলা যায় না এবং সেই দিবাকরকে তমোময় (অভাব) ইহাও বলা যাইতে পারে না; অতএব ভাব ও অভাব, এই দুইই এক পদার্থ হইতে পারে না। এই ভাবাভাবের পরস্পর বিরোধ হেতু "শূন্য ছিল" এই বাক্য কোনরূপেও যুক্তিসঙ্গত বলিয়া স্বীকার করা যায় না; সুতরাং তোমরা নিজের কথাতেই নিরস্ত হইলে॥ ২৮॥

বিয়দাদের্নামরূপে মায়য়া সতি কল্পিতে।
শূন্যস্য নামরূপে চ তথা চেৎ জীব্যতাং চিরম্॥ ২৯

হে শূন্যবাদী বৌদ্ধতপস্বিগণ! তোমরা বিবেচনা করিয়া দেখ, যেমন বেদান্তমতে অবিদ্যা দ্বারা নির্ব্বিকার নিরঞ্জন পরম ব্রহ্মেতে আকাশাদি ভূত সকলের নাম ও রূপ কল্পিত হইয়াছে, সেইপ্রকার অবিদ্যাপ্রভাবেই সৎস্বরূপ পরমব্রহ্মেতে শূন্যের নাম-রূপাদিও কল্পিত হইয়াছে; যদ্যপি তোমরা ইহা স্বীকার করিয়া, অবিদ্যাকে দূরে বিদায় দিয়া, স্বীয় বুদ্ধির পরিপাক সাধন করিতে পার, তাঁহা-হইলে তোমরা চিরজীবী হইয়া থাকিবে, অর্থাৎ তোমরাও সেই অনাদিনিধন জগৎকর্ত্তার অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া, তাঁহার তত্ত্বনির্ণয় পূর্ব্বক মোক্ষপদ লাভ করিয়া, অনন্ত অসীম আনন্দ অনুভব করতঃ অমর হইয়া থাকিতে পারিবে। তোমাদিগের যদ্যপি এইরূপ ব্রহ্মপ্রাপ্তিদ্বারা নিত্য সুখলাভের আশা থাকে, তাহাহইলে কদাপি

জগদুৎপত্তির পূর্ব্বে কেবল "শূন্যমাত্র ছিল" এই কথা বলিও না ॥ ২৯ ॥

সতোঽপি নামরূপে দ্বে কল্পিতে চেৎ তদাবদ।
কুত্রেতি নিরধিষ্ঠানো ন ভ্রমঃ কচিদীক্ষতে ॥৩০॥

হে অনিশ্বরবাদী বৌদ্ধযোগিবৃন্দ! তোমরা যদি বল, অবিদ্যাপ্রভাবেই সৎস্বরূপ ব্রহ্মতে নাম-রূপাদি কল্পিত হইয়াছে, অর্থাৎ যাহারা অজ্ঞানান্ধ, জগতের প্রকৃততত্ত্ব নিরূপণে অসমর্থ, তাহারাই কেবল ঈশ্বরের বিদ্যমানতা স্বীকার পূর্ব্বক নাম ও রূপ কল্পনা করিয়াছে। এইক্ষণ বল দেখি, কোন সদ্বস্তুতে সেই নাম ও রূপ কল্পিত হইল কি না? কল্পনাশব্দের ভাব ভ্রম-রচনা, তাহা কোন না কোন সদ্বস্তুতেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কেহ কখনও কোন স্থানে বা কোন বস্তুতে আধারশূন্য ভ্রম দেখেন নাই। এস্থলে যদি ঈশ্বরের অবিদ্যমানতা সম্ভব হয়, তাহা-হইলে আধারশূন্য স্থানে কি প্রকারে ভ্রম সংস্থাপিত হইতে পারে? যে বস্তুর বিদ্যমানতা নাই, তাহার প্রতি কিছুই আরোপিত হইতে পারে না। তোমরা যদি ঈশ্বরের বিদ্যমানতা স্বীকার না কর, তাহাহইলে অবিদ্যা দ্বারা তাঁহার নামরূপাদি কল্পিত হইয়াছে, এ কথাও বলিতে পার না ॥ ৩০ ॥

উপরোক্ত একবিংশতি শ্লোক হইতে ত্রিংশৎ শ্লোক পর্য্যন্তের সরল তাৎপর্য্য আলোচনা করিব।

গ্রন্থকার যথার্থই বলিয়াছেন যে, যেমন জলমগ্ন ব্যক্তির অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অবশ হইয়া যাওয়ায় ঐ ব্যক্তি বিহ্বল হইয়া পড়ে, সেইরূপ যাঁহারা আদিতে শূন্য ছিল, অর্থাৎ কিছুই ছিল না, এই মত সমর্থন করেন, তাঁহাদের বুদ্ধি অজ্ঞানাচ্ছন্ন (অর্থাৎ বুদ্ধি-ভ্রম) হওয়ায়, তাঁহারা সম্পূর্ণরূপে ভ্রান্ত হন।

১। প্রথমতঃ—আদিতে শূন্য ছিল, এ নিতান্ত যুক্তিবিরুদ্ধ কথা। শূন্য অর্থে কিছুই নহে; যাহা কিছুই নহে, তাহা ছিল, ইহা কিরূপে হইতে পারে? আছে বা ছিল বলিলে অস্তিত্ব বুঝায়; কিন্তু নাস্তিত্ব, ছিল—অর্থাৎ 'ছিলনা' ছিল, ইহ কখনও হইতে পারে না।

২। দ্বিতীয়তঃ—নাস্তিত্ব হইতে অস্তিত্বের উৎপত্তি হইতে পারে না। কিছুই-ছিল-না হইতে বস্তুর উৎপত্তি কি প্রকারে হইবে? বৌদ্ধ ঋষিগণ দৃশ্যজগতের আদি ভূত বায়ু, তেজ, অপ, ক্ষিতি হইতে (এইক্ষণ পাশ্চাত্ত্য বৈজ্ঞানিক-ব্যক্ত হাইড্রজন প্রভৃতি পঞ্চষষ্টি ভূত হইতে) গ্রহ, নক্ষত্র, চন্দ্র, সূর্য্য, পৃথিবী, পার্থিব-জীবজন্তু, উদ্ভিদ, পর্ব্বত, নদ, নদী প্রভৃতি সমস্ত পদার্থ সৃষ্ট হইয়াছে বলেন, কিন্তু প্রথমে সৃষ্টির আদিভূত বায়ু, তেজ, অপ ও ক্ষিতিতত্ত্ব (এইক্ষণকার পঞ্চষষ্টি এলিমেণ্ট্) কোথা হইতে আসিল, তৎসম্বন্ধে তাঁহারা নিস্তব্ধ। নাস্তিত্ব (অর্থাৎ কিছুই-ছিল-না) হইতে অস্তিত্বের—অর্থাৎ ক্ষিতি প্রভৃতি ভূতের উৎপত্তি অসম্ভব।

৩। যদি আদিতে চৈতন্যের অস্তিত্ব না থাকে, তবে তোমার বায়ু, তেজ, অপ, ক্ষিতি, এইসব জড়পদার্থ হইতে চৈতন্যের বা চেতন পদার্থের (যাহার অস্তিত্ব আদৌ ছিল না) উৎপত্তি কিপ্রকারে হইবে? রাসায়নিক ক্রিয়াদ্বারা বস্তুর রূপান্তর হইতে পারে বটে, কিন্তু যাহা মূলে আদৌ নাই, এমত বস্তু কখনই উৎপন্ন হইতে পারে না। রাসায়নিক ক্রিয়াদ্বারা বস্তুর যতই রূপান্তর করনা কেন, ঐ রূপান্তরিত বস্তুর মধ্যে তোমার পাশ্চাত্য পঞ্চষষ্টি মূলউপাদানের অতিরিক্ত নূতন কোন উপাদান উৎপন্ন হইবে না। ঐ রূপান্তরিত বস্তু বিশ্লেষ (decompose) করিলে, তাহাতে মূলে যে সকল উপাদান ছিল, তাহাই পাইবে, তদতিরিক্ত নূতন কোন তত্ত্ব উৎপন্ন হইবে না; অতএব যখন চৈতন্য আদৌ ছিল না, তখন

রাসায়নিক ক্রিয়াদ্বারা তাহার উৎপত্তি হইতে পারে না।

৪। যদি বল যে চৈতন্য বা জ্ঞান বলিয়া কোন পদার্থ ছিল না ও এখনও নাই, জড়পদার্থের পরস্পর সংযোগে চেতনগুণ উৎপন্ন হয় এবং ঐ গুণই 'চৈতন্য'সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়; আবার জড়ের ক্রিয়া হইতে ঐ গুণটী নষ্ট হইলে, জড়-দেহ চৈতন্যশূন্য হয়, ইহাই জন্ম-মৃত্যুর রহস্য; তোমার মতানুসারে যদি জড়-চৈতন্য-গুণ ব্যতীত 'চৈতন্য' বলিয়া স্বতন্ত্র প্রকৃত কোন পদার্থ না থাকে, তবে জড়পদার্থের পরস্পর সংযোগের কর্ত্তা কে? সংযোগ একটী কার্য্য, কিন্তু কর্ত্তা ব্যতিরেকে কার্য্য অসম্ভব। জড়ের কোন কর্ত্তৃত্ব স্বীকার করিতে পারি না, যেহেতু কর্ত্তৃত্ব শব্দটী জ্ঞাতৃত্ব বা দ্রষ্টৃত্বসূচক, অর্থাৎ যে কর্ত্তা, সে যে সংযোগ করিবে, সেই বস্তু ও তাহার সংযোগ-ক্রিয়া-ফল জ্ঞাত না হইলে, যথানিয়মে তাহা সম্পাদন—বিশিষ্টবুদ্ধিমত্তার সহিত বিবিধ জীব-জন্তুসমন্বিত এই বিচিত্রজগৎ—যেখানে যেরূপ আবশ্যক, তদনুরূপ সৃষ্টি করিতে পারে না। মনেকর, একটী ব্যাঘ্র সৃষ্টি করিতে হইবে, সুতরাং তাহার আকার কল্পনা এবং যে যে বস্তুর দ্বারা যে যে কৌশলে সেই আকার নির্ম্মিত হইয়া তাহাতে চেতনগুণ নিহিত হইবে, তাহা অন্তরে আলোচনাপূর্ব্বক স্থিরীকৃত না হইলে, কিপ্রকারে ঐ ব্যাঘ্রমূর্ত্তি নির্ম্মিত ও তাহা চেতনগুণবিশিষ্ট হইবে? তোমার মতে যখন সংযোগের পূর্ব্বে জড়পদার্থের চেতনগুণ উৎপন্ন হয় না, তখন পদার্থের সংযোগক্রিয়ার কর্ত্তৃত্ব কে করে? যদি বল যে, জড়পদার্থের স্বভাবতই ঐ প্রকার স্বতঃ-কর্ত্তৃত্ব-শক্তি আছে, তাহাহইলে তোমার ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, ঐ কর্ত্তৃত্বের মধ্যে যেখানে যদ্রূপ আবশ্যক ও সঙ্গত হয়, সেখানে তদ্রূপ সর্ব্বসামঞ্জস্য-সাধিনী-শক্তি এবং তদঙ্গীভূতা জ্ঞাতৃত্বসূচিকাশক্তিও লুক্কায়িত আছে। যদি জড়ের মধ্যে কর্ত্তৃত্ব ও সামঞ্জস্য এবং জ্ঞাতৃত্ব-সূচিকাশক্তি স্বীকার কর, তাহাহইলে স্বভাবের মধ্যে চৈতন্যের অস্তিত্ব তুমি স্বীকার করিতে বাধ্য।

৫। কারণ হইতে কার্য্যের উৎপত্তি হয়; কারণে যাহা নাই, কার্য্যে তাহার বিকাশ অসম্ভব। দুগ্ধ হইতে ঘৃতের উৎপত্তি ও ইক্ষু হইতে শর্করার উৎপত্তি হয়, কিন্তু জল হইতে ঘৃত বা বাঁশ হইতে শর্করা উৎপন্ন হইতে পারে না; অতএব স্বভাবের মধ্যে চৈতন্য না থাকিলে, চেতনজীবের কখনই উদ্ভব হইত না।

৬। আদিতে যদি চৈতন্য বা জ্ঞানের অস্তিত্ব না থাকে, তবে তোমার বায়ু, তেজ, অপ, ক্ষিতির অস্তিত্ব কাহার নিকট প্রকাশিত বা প্রমাণিত হইবে? জ্ঞান বা চৈতন্য না থাকিলে, বায়ু, তেজ, জল, ক্ষিতি থাকিতে পারে না; যেহেতু ঐ ভূতপদার্থ অনুভূত বিষয়, এমন কি— তোমার শূন্যবাদ বা কিছুই-নাই-মত, ইহাও একটী অনুভব; কিন্তু অনুভূতিকে তাড়াইয়া দিলে, অনুভূত বিষয় বা শূন্য-অনুভূতি কোথা হইতে আসিবে? অতএব জ্ঞানানুভূতির অস্তিত্ব ব্যতীত অনুভূত বিষয়ের অস্তিত্ব অসম্ভব। জ্ঞান বা চৈতন্যে ভূত বা ভৌতিকজগৎ ভাসমান হয় বলিয়াই জগতের অস্তিত্ব প্রমাণিত।

৭। যদি বল যে পদার্থের সংযোগহেতু তাহাতে চৈতন্য-গুণের বিকাশ হইলে, ঐ চেতন জীবের যুক্তিদ্বারা (চৈতন্য বা জ্ঞান বিকাশের) পূর্ব্বেও ভূত বা ভৌতিকজগৎ ছিল, প্রমাণিত হইতে পারে; অপিচ, যখন অন্ন (খাদ্য) হইতে শুক্র ও শোণিত উৎপন্ন হয় ও সেই শুক্র-শোণিতের সংযোগ হইতে গর্ভে চেতনজীবের সঞ্চার হয়, তখন অবশ্যই প্রমাণিত হইতে পারে যে, আদিতে চৈতন্য-বিকাশের পূর্ব্বে পঞ্চভূত ধা

ভৌতিক-জগৎ ছিল এবং ঐ ভূতপদার্থের সংযোগে চৈতন্যের বিকাশ হইয়াছিল। তোমার উপরোক্ত দৃষ্টান্তটী দার্ষ্টান্তিকবিষয়ের সহিত কোন অংশেই সাদৃশ্যসম্পন্ন হইতে পারে না। অন্ন হইতে শুক্র-শোণিত উৎপন্ন হইতে পারে বটে, কিন্তু চেতনপদার্থের অসংশ্রবে অন্ন কখনও শুক্র-শোণিতে পরিণত হইতে পারে না; আবার চেতন স্ত্রী-পুরুষের অসংসৃষ্ট ঐ শুক্র-শোণিতের সংযোগে জীবসঞ্চার বা চেতনপদার্থের বিকাশও হইতে পারে না। অন্ন জীবদেহের উপাদানকারণ বটে, কিন্তু নিমিত্তকারণ বা কর্তৃকারণ নহে। উক্ত অন্নভক্ষণরূপ ক্রিয়ার কর্তা চেতন জীব এবং ঐ অন্ন বীর্য্যে পরিণত হওয়ার ক্রিয়া এবং সংযোগক্রিয়ার কর্ত্তাও চেতন জীব হইতেছে; অতএব যখন চেতনপদার্থের অসংশ্রবে অচেতন জড় হইতে চেতন বস্তুর বিকাশ হইতে পারেনা, তখন আদিতে চৈতন্যের অসংশ্রবে জড়পদার্থের সংযোগ ও তদ্দ্বারা চৈতন্য-গুণের বিকাশ অসম্ভব।

তুমি বলিবে, গোময় হইতে বৃশ্চিক, বিষ্ঠা হইতে কীট ইত্যাদি চেতনজীব চৈতন্যেরা অসংশ্রবে কিপ্রকারে উৎপন্ন হয়? তাহার উত্তর উপরের ৩।৪।৫ দফায় প্রদত্ত হইয়াছে এবং উহাদ্বারা আরও প্রমাণিত হইতেছে যে, চৈতন্য নিরাকার, প্রকৃতিই তাঁহার স্বভাব। সেই ভাব (Idea) হইতে তোমার ভূতপদার্থ বিকাশিত হয়। চেতন-ভাবই কারণ, ভূত বা ভৌতিকজগৎ তাহার কার্য্য; সুতরাং কার্য্যমাত্রেই কারণের আভাস থাকায়, সেই ভূতাচ্ছন্ন শুদ্ধ চিদাভাস হইতে তোমার বৃশ্চিক ও কীটের জীবত্বের বিকাশ হয়। * প্রথমতঃ নিরাকার চৈতন্য সাকার জীবে পরিণত হইতে হইলে তাহার স্বভাবের মধ্য দিয়া বিকাশ আবশ্যক, তদ্ভিন্ন স্বাভাবিক নিয়মের ব্যতিক্রমে একটী জীব আকাশ হইতে লম্ফ দিয়া এই পৃথিবীতে পড়িতে পারে না; * এই জন্য জীবরাজ্যের প্রথমে স্বেদজ কীটাদির উৎপত্তি হয়। বিশেষতঃ উৎকৃষ্ট অণুবীক্ষণ যন্ত্রদ্বারা পর্য্যবেক্ষণ করিলে স্পষ্ট দেখিতে পাইবে যে, স্থূল ক্ষিতি-জল প্রভৃতি ভূতের মধ্যে অসংখ্য জীবাণু আছে। জগৎ জীবাণুময়।

৮। 'স্বভাব' অর্থে আপনার ভাব বুঝায়, সুতরাং ঐ ভাব কাহার? ভাবের আশ্রয় ব্যতীত নিরধিষ্ঠানভাব কখনও সম্ভব হইতে পারে না। তোমার কথিত চৈতন্যগুণ প্রকাশের পূর্ব্বে স্বভাবে ছিল; যদি ঐ স্বভাবকে তুমি শূন্য বল এবং উহা কল্পিতপদার্থমাত্র বল, তবে

* চেতন ভাব (Idea) হইতে কি প্রকারে ভূত ও ভৌতিক জগতের বিকাশ হয় এবং কার্য্যেতে কারণের আভাস কি প্রকারে থাকে, কি প্রকারেইবা নিরাকার চেতন ভাব সাকার জীবে পরিণত হয়, অর্থাৎ ভূতাচ্ছন্ন চিদাভাস হইতে কিপ্রকারে কীটাদিতে জীবত্বের বিকাশ হয়, তাহার বিশদ্ ব্যাখ্যা আমার কৃত 'পুনর্জন্ম-তত্ত্ব' প্রবন্ধে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এই পঞ্চদশীর জীবতত্ত্ব ব্যাখ্যার সময়ে তদপেক্ষা আরও বিশদ্ভাবে ব্যাখ্যাত হইবে।

* কেহ বলিতে পারেন যে, মনুষ্যের ঔরসে মানবীর গর্ভে মানবের উৎপত্তিই প্রাকৃতিক নিয়ম, কিন্তু জগতে যখন মানব আদৌ ছিল না, তখন প্রাকৃতিক নিয়মে প্রথম মানব কি প্রকারে উৎপন্ন হইতে পারে? ইহার উত্তর এই যে, আধ্যাত্মিক মনোময় জীবই মনু; ঐ মনু ব্রহ্মের মানসপুত্র, অর্থাৎ পূর্ব্ববর্ণিতমত মনোময় ভাবের প্রতিমূর্ত্তি (Image of intelectual idea) পার্থিব জীবে ঐ মনোময় ভাব প্রতিবিম্বিত হইলে, মানবদেহে পরিণত হয়; ঐ স্থানে স্বভাবের মধ্যে ব্যতিক্রমীনিয়ম (ইংরাজিতে যাহাকে Missinglink কহে) প্রযোজ্য হয়; নৃসিংহ অবতারই ইহার উৎকৃষ্ট প্রমাণ। উহারই নাম বিবর্ত্তবাদ (ডারউইনের Evolution theory দ্রষ্টব্য)

আমার কোন আপত্তি নাই। অবশ্যই কল্পনা হইতে স্বভাব (আপনার ভাব—self idea) প্রকটিত হয়, তাহাহইলে ঐ কল্পনা-ক্রিয়ার কর্ত্তা কেহ আছেন, তিনিই সদ্ব্রহ্ম নির্ণীত হইতেছেন।

৯। যদি তুমি স্বভাবকেই উভয়তঃ সৎ (চির অস্তিত্ববান) এবং কল্পিতপদার্থ বল, অর্থাৎ স্বভাব অনাদি, চিরকালই আছে, ছিল ও থাকিবে, এই ভাবটী চিরকল্পিত বল, তাহাহইলে তোমার এই দুইটী কথা পরস্পর বিসদৃশ হয়; যেমন সূর্য্যই অন্ধকার বা অন্ধকারই সূর্য্য, এরূপ কথনও হইতে পারে না, সেইরূপ সৎ পদার্থ (যাহার অস্তিত্ব আছে) কথনও কল্পিত হইতে পারে না এবং সৎকে কল্পিত বলিলে, কল্পনা-ক্রিয়ার কর্ত্তার অভাব হয়। নিরধিষ্ঠান-কল্পনা বা ভ্রম কেহ দেখিয়াছেন কি? অর্থাৎ কল্পনার আধার নাই বা কল্পনাকারীর অস্তিত্ব নাই, অথচ কল্পনার অস্তিত্ব অতি অসম্ভব ও হাস্যজনক। শূন্য বা কিছুই নাই, এই কল্পনারও আধার আবশ্যক, তদ্ভিন্ন ঐ প্রকার কল্পনা কোথা হইতে আসিবে?

এই জন্যই ভগবান শঙ্করাচার্য্য গৌড়াচার্য্যের বার্ত্তিক-শ্লোক ও নির্ব্বিকল্প-সমাধির প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া, তদ্দ্বারা বৌদ্ধ ঋষিগণের উপরোক্ত ভ্রান্তমত খণ্ডন করিয়াছিলেন। গ্রন্থকার তাহাই উত্থাপন করিয়া উপরোক্ত অসদ্-বাদীদিগকে নিরস্ত করিয়াছেন। বৌদ্ধমতের 'মাধ্যমিক' বলিয়া এক সম্প্রদায় ছিলেন ও এখনও আছেন, তাঁহারা সাকার-ধ্যাননিষ্ঠ। তাঁহারা বলেন, যে বস্তু অপ্রত্যক্ষ, তাহার ধ্যান বা উপাসনা হইতে পারে না, এই জন্য তাঁহারা নিরাকার ব্রহ্ম স্বীকার করেন না। ঐ সাকার ধ্যাননিষ্ঠদিগকে গৌড়াচার্য্য নামক জনৈক বঙ্গদেশীয় ব্রহ্মবিৎ বার্ত্তিক শ্লোকদ্বারা নির্ব্বিকল্প-সমাধিনিষ্ঠ যোগীদিগের আদর্শযোগ দর্শাইয়া এইরূপে নিরস্ত করিয়াছিলেন যে, তোমার সাকার-ধ্যান তোমার মানস-কল্পনা ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। তুমি মনে ঈশ্বরের একটী কোন আকার স্থাপনা করিয়া, মানসচক্ষে তাহা দর্শন করিয়া, ঐ রূপের প্রতি একাগ্রতার সহিত যে ধ্যান-মগ্ন হও, তাহাই সাকারধ্যান-জাত সবিকল্পসমাধি *; কিন্তু যে সমাধিতে কল্পনা নাই, অর্থাৎ যে সমাধিতে সংকল্পাত্মক মন ও নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধির অস্তিত্ব লোপ ও তৎসহ জগতের অস্তিত্ব-জ্ঞান পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়া যায় এবং আত্মজ্ঞান পরমজ্ঞানে বা অনন্ত চৈতন্যে পরিণত হইয়া, ঐ অনন্ত চৈতন্য সদানন্দস্বরূপ—কেবল সৎস্বরূপ (অর্থাৎ অস্তিত্ব) মাত্রে পর্য্যবসিত হয়, উহারই নাম নির্ব্বিকল্পসমাধি বা অস্পর্শযোগ। ঐ যোগ সাকার-ধ্যাননিষ্ঠ যোগীদিগের দুর্লভ। তাহারা ঐ অস্পর্শযোগ (অর্থাৎ নির্ব্বিকল্প সমাধি) শুনিয়া কম্পিত হয় এবং ঐ নির্ব্বিকল্পসমাধি দ্বারা সদ্ব্রহ্ম প্রত্যক্ষ-প্রমাণীকৃত হওয়ায়, উহারা সম্পূর্ণরূপে নিরস্ত হয়।

এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে যে, ঐরূপ নির্ব্বিকল্পসমাধি প্রকৃত প্রস্তাবে হয় কি না? এই পঞ্চদশী ব্যাখ্যার প্রথমে সুষুপ্তি ও নির্ব্বিকল্প-সমাধির মধ্যে যে পার্থক্য, তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে; যেমন সুষুপ্তিকালে মন-বুদ্ধি প্রভৃতি তমসাচ্ছন্ন (অর্থাৎ প্রকৃতির তমোগুণে আচ্ছন্ন) হওয়ায়, নিজের ও জগতের অস্তিত্ব জ্ঞান বিলুপ্ত

* উক্ত সবিকল্প-সমাধি অবস্থাভেদে ছয় প্রকার—যথা সবিতর্ক, নির্ব্বিতর্ক, সবিচার, নির্ব্বিচার, আনন্দ ও অস্মিত। ঐ সবিকল্প সমাধির বিস্তারিত বিবরণ এই পঞ্চদশীব্যাখ্যায় তত্ত্ব বিবেকের মধ্যে বিশদ্‌ভাবে আছে। (হিন্দুপত্রিকার ১৩০৩ বঙ্গাব্দের ২০৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

হয়, সেইরূপ সমাধিকালে মন-বুদ্ধি প্রকৃতির বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণে বিলীন হয়; জীববুদ্ধি মলিন সত্ত্বগুণ হইতে উৎপন্ন, এই জন্য মলিন (ভ্রান্ত) অর্থাৎ শুক্তিতে রজত-ভ্রান্তির ন্যায় ভ্রান্তস্বভাব, তদ্ধেতু ঈশ্বরের কল্পিত জগৎ মানববুদ্ধিতে সত্যের ন্যায় প্রতিভাত হয়; ঐ বুদ্ধি বিশুদ্ধ-সত্ত্বে বিলীন হইলে, জগৎ ভ্রান্ত এবং উহা ঈশ্বরের কল্পনা মাত্র প্রতিপন্ন হয়। ঐ বিশুদ্ধসত্ত্বগুণ নির্ম্মল-প্রকাশ-স্বভাব; ঐ সত্ত্বগুণে পরম জ্ঞান-জ্যোতির বিকাশ হয় এবং ঐ জ্ঞান জ্যোতিতে সত্ত্বগুণের প্রকাশ-স্বভাবও বিলীন হইয়া যায়, যেমন অন্ধকারে কোন বস্তু দর্শনের জন্য প্রদীপের আলোক আবশ্যক হয়, কিন্তু সূর্য্য উদিত হইলে, প্রদীপের আলোক সূর্য্যের প্রচণ্ড কিরণে অভিভূত হয়, সেইরূপ স্বয়ংপ্রকাশ পরম জ্ঞান-সূর্য্য উদিত হইলে, সত্ত্বগুণের প্রকাশস্বভাব ঐ সূর্য্যে বিলীন হইয়া যায়। ঐ প্রকৃত জ্ঞানের বিকাশ হইলে, ঐ ভ্রান্তি বা অভ্রান্তি—জগতের অস্তিত্ব-নাস্তিত্ব কিছুই থাকে না। * কেবল পূর্ব্ববর্ণিতমত সদানন্দ মাত্র অবশিষ্ট থাকে; অতএব সুষুপ্তি-কালে দৃশ্য জগৎ অজ্ঞানে বিলুপ্ত হয়, সমাধি-কালে পরম জ্ঞান-জ্যোতিতে বিলুপ্ত হয়, উভয়ের মধ্যে এই প্রভেদ। তুমি সাকার বস্তুতে মনঃ-সংযোগ দ্বারা অন্তঃকরণ তন্ময় করিয়া, তাহাতে আনন্দ অনুভব করিতে পার, তবে বিনাবলম্বনে অন্তঃকরণ সদানন্দে পর্য্যবসিত হইতে না পারিবে কেন? যদি কোন বিষয়াবলম্বনে আনন্দের বিকাশ হইতে পারে, তবে আনন্দের অস্তিত্ব তুমি অস্বীকার করিতে পারনা। অতএব নির্ব্বিকল্পসমাধি অসম্ভব নহে; তবে যাহারা ক-খ না জানে, তাহাদের পক্ষে বিজ্ঞান যেরূপ, আমাদের পক্ষে সমাধি-তত্ত্ব সেইরূপ! যাহাহউক, নির্ব্বিকল্পসমাধি দ্বারা সদ্ব্রহ্ম যে প্রত্যক্ষ-প্রমাণীকৃত, তৎপক্ষে সন্দেহ নাই। উপরোক্ত যুক্তি ও প্রমাণদ্বারা সাব্যস্ত হইল যে, অসৎ বা শূন্য আদি নহে, সদ্ব্রহ্মই অনাদি, অনন্ত ও অদ্বিতীয়।

* জগতের অস্তিত্বজ্ঞান না থাকিলে, নাস্তিত্বজ্ঞানও অসম্ভব; যেমন শীতের অস্তিত্ব যদি না থাকে, তবে গ্রীষ্ম-অনুভূতি অসম্ভব; সেইরূপ জগতের অস্তিত্বাভাবে নাস্তিত্ব বুদ্ধিও অসম্ভব।

পুনর্জন্ম-তত্ত্ব।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, পুনর্জন্ম হয় কাহার? বেদান্তদর্শনে দেখিতে পাই, আত্মা অক্ষর, নিত্য, অনন্ত, অপরিবর্ত্তনীয় ও জন্ম-রহিত ইত্যাদি; জীবাত্মাও স্বতন্ত্র কোন তত্ত্ব নহে। বুদ্ধি-তত্ত্বে সেই অনাদি নিত্য অপরিবর্ত্তনশীল জন্ম-মৃত্যু-রহিত আত্মার প্রতিবিম্ব পতিত হইলে, সেই বুদ্ধিতত্ত্বস্থ প্রতিবিম্বকে জীব বা জীবাত্মা কহে। ইহাই বেদান্তের মায়াবাদ বা প্রতিবিম্ব-বাদ। শ্রীমান্ শঙ্করানন্দ স্বামী ও তাঁহার শিষ্যবর্গ নানা গ্রন্থে বিশদ্ভাবে এই মায়াবাদের যে ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন, তাহার দুই এক স্থান নিম্নে উদ্ধৃত করা যাইতেছে। পাঠক দেখিবেন যে, জীবাত্মা কি পদার্থ, অর্থাৎ জীব বাস্তবিক পৃথক্ কোন পদার্থ নহে; কেবল সেই অপরি-

বর্ত্তনশীল জন্মরহিত আত্মার প্রতিবিম্ব মাত্র; যথা—

মুখাভাসকো দর্পণে দৃশ্যমানো
মুখত্বাৎ পৃথক্ত্বেন নৈবাস্তি বস্তু।
চিদাভাসকোধীষু জীবেঽপি তদ্বৎ
সনিত্যোপলব্ধি স্বরূপোঽহমাত্মা।
যথা দর্পণাভাব আভাসহানৌ
মুখং বিদ্যতে কল্পনাহীনমেকং
তথা ধী-বিয়োগে নিরাভাসকোঽয়ঃ
সনিত্যোপলব্ধি-স্বরূপোঽহমাত্মা।

বঙ্গানুবাদ। যেমন দর্পণপ্রভৃতি স্বচ্ছপদার্থে মুখের প্রতিবিম্ব দৃষ্ট হয়, কিন্তু সেই প্রতিবিম্ব মুখ হইতে পৃথক্ নয়, সেইরূপ জীবাত্মা. বুদ্ধিতে (অন্তঃকরণে) প্রতিফলিত চৈতন্যের আভাস (প্রতিবিম্ব) মাত্র, পৃথক্ বস্তু নহে, আমি সেই নিত্যজ্ঞানময় আত্মা। যথন দর্পণের অভাবে প্রতিবিম্বের অভাব হয়, তথন কেবল প্রতিবিম্বশূন্য মুখ থাকে। সেইরূপ অন্তঃকরণের বিয়োগে আত্মা প্রতিবিম্ব-শূন্য (জীবোপাধিশূন্য) হন। আমি সেই নিত্য-জ্ঞানময় আত্মা।

য একো বিভাতি স্বতঃ শুদ্ধচেতাঃ
প্রকাশো স্বরূপোঽপি নানেবধীষু।
শরাবোদকস্থো যথা ভানুরেকঃ
সনিত্যোপলব্ধি-স্বরূপোঽহমাত্মা।
যথানেক চক্ষুঃ প্রকাশোরবির্ণ
ক্রমেণ প্রকাশীকরোতি প্রকাশ্যম্
অনেক ধিয়ো যস্তথৈকঃ প্রবোধঃ
সনিত্যোপলব্ধি-স্বরূপোঽহমাত্মা।

পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে, আত্মা জন্মরহিত, অপরিবর্ত্তনশীল এবং উপরোক্ত বর্ণানুসারেও দেখা যাইতেছে যে, সেই 'একমেবাদ্বিতীয়ং' নিত্যজ্ঞানময়-অনন্ত-চৈতন্যই আত্মা বা পরমাত্মা, সুতরাং আত্মা ব্যষ্টি জীব নহে এবং তাঁহার জন্ম, মৃত্যু, বন্ধ, মুক্তি, উন্নতি, অবনতি ইত্যাদিও সম্ভব নহে। আবার যথন বুদ্ধিস্থ চৈতন্যের প্রতিবিম্বই জীবাত্মা, ঐ প্রতিবিম্ব পৃথক্ কোন পদার্থ নহে, তথন ঐ প্রতিবিম্বেরই বা বন্ধ, মুক্তি, জন্ম, উন্নতি, অবনতি কিপ্রকারে সম্ভব হইতে পারে?

এথন বড় কঠিন সমস্যা, জন্ম-জন্মান্তর কাহার? উপনিষৎ এবং বেদান্তোক্ত এক বৃক্ষে দুইটী পক্ষীর বিষয় এই পত্রিকায় অনেকবার আলোচিত হইয়াছে; উহার একটী পক্ষী ফলভোগ করেন, আর একটী পক্ষী সাক্ষী-স্বরূপ কেবল দর্শনমাত্র করেন; কিছুতেই লিপ্ত হন না। বৃক্ষটী দেহ, পক্ষী দুইটীর মধ্যে ফলভোগকারী পক্ষী জীবাত্মা এবং দ্রষ্টা বা সাক্ষী পরমাত্মা। বেদেও পরমাত্মা নির্লিপ্ত-সাক্ষী-চৈতন্য বলিয়া উক্ত আছে; সুতরাং অনন্তচৈতন্য নির্লিপ্ত-জ্ঞানময় সর্ব্বদ্রষ্টা বা সাক্ষী ব্যতীত আর কি হইতে পারে? ঐ দুইটী পক্ষীর আভাস ভগবৎগীতায়ও পাওয়া যায়। তাহার ভাবার্থ পর্য্যালোচনা করিতে হইলে, উহার মীমাংসা দূরে থাকুক্, আরও ভয়ানক সংশয়ের মধ্যে পড়িতে হয় এবং রহস্যটী অতীব আশ্চর্য্যজনক হইয়া দাঁড়ায়। গীতাকার স্পষ্টাক্ষরে বলিছেন যে, আত্মার কথনও জন্ম হয় না; তিনি মরেন না; কথনও তিনি উৎপন্ন হন নাই বা হইবেনও না; তিনি অনাদি-অক্ষর-অজ, অর্থাৎ জন্মরহিত, নিত্য, শাশ্বত, অপরিবর্ত্তনশীল ইত্যাদি। যেমন লোকে পুরাতন বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া নূতনবস্ত্র পরিধান করে, সেইরূপ আত্মা এক দেহ পরিত্যাগ করিয়া দেহান্তর আশ্রয় করেন। যথন আত্মা নিত্য-জ্ঞানময়-সর্ব্বদ্রষ্টা ও অনন্ত-চৈতন্য হইলেন, তথন নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তির—অর্থাৎ গীতোক্ত ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, দুর্য্যোধন প্রভৃতির নির্দ্দিষ্ট আত্মা কে?

অর্থাৎ ভীষ্মাদিরূপে আমি কে?" ঐ গীতায় শ্রীকৃষ্ণ আত্মাকে নিত্য-শাশ্বত-অপরিবর্তনশীল বলিয়া আবার পরক্ষণেই বলিলেন—নিজের ও অর্জ্জুনের বহুজন্ম গত হইয়াছে; তাহাতে তাঁহার নিজের পূর্ব্ব-পূর্ব্ব জন্মবৃত্তান্ত সমস্তই স্মরণ আছে, কিন্তু অর্জ্জুনের পূর্ব্বজন্মবৃত্তান্ত স্মরণ নাই; অর্থাৎ তিনি জাতিস্মর, অর্জ্জুন জাতিস্মর নহে। এই জাতিস্মর কে? অবশ্যই দেহ নহে। যদি শ্রীকৃষ্ণের আত্মা জাতিস্মর হন এবং অর্জ্জুনের আত্মা জাতিস্মর না হন, তবে একের আত্মা উন্নত ও অন্যের আত্মা অনুন্নত সাব্যস্ত হইতেছে; অর্থাৎ আত্মার ও গুণের ন্যূনাতিরেক দৃষ্ট হইতেছে। এইরূপ শত শত শাস্ত্রে "আত্মা বদ্ধ-মুক্ত কিছুই নহে; আত্মা সৎ, নিত্য, কর্ম্মফল তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না, তিনি সর্ব্বজ্ঞানময় ও নির্লিপ্ত" ইত্যাদি; পক্ষান্তরে—শত শত শাস্ত্রে "আত্মা প্রকৃতিজাত-মন-বুদ্ধি ইত্যাদি-সংযুক্ত হইয়া সংসারে বদ্ধ হন,—কর্ম্মফল ভোগ করেন এবং সৎকর্ম্ম পরিপাকাদিদ্বারা মুক্তিলাভও করেন" ব্যাঘাত আছে। উপরোক্ত বিষয় পর্য্যালোচনা করিলে এই উপলব্ধি হয় যে, পরমাত্মা বদ্ধ, মুক্ত বা ফলভোগী নহেন; জীবাত্মাই বদ্ধ এবং কর্ম্মফলভোগী; ঐ জীবাত্মাই কর্ম্ম-পরিপাকদ্বারা মুক্ত হন। পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে, জীবাত্মা পৃথক্ বস্তু নহে, পরমাত্মারই (বুদ্ধিস্থ) প্রতিবিম্ব মাত্র। এক্ষণে বিপক্ষবাদীরা এই তর্ক উত্থাপন করিতে পারেন যে; ঐ প্রতিবিম্ব বস্তু নহে, সুতরাং প্রতিবিম্বের উন্নতি-অবনতি, বন্ধ-মুক্তি এবং পুরাতন বস্ত্র ত্যাগ করিয়া নূতন বস্ত্র পরিধানের ন্যায় দেহান্তর-প্রাপ্তি কখনই সম্ভব হইতে পারে না। গীতাকার, যে আত্মা অজ, নিত্য, শাশ্বত, তাঁহারই নূতন বস্ত্র পরিধানরূপ দেহান্তর-প্রাপ্তির কথা বলিয়াছেন। (গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের ২০।২১। ২২ শ্লোক দ্রষ্টব্য) গীতাকার আত্মাসম্বন্ধে উপরোক্ত বর্ণনার পর স্পষ্ট বলিয়াছেন,—

"আশ্চর্য্যবৎ পশ্যতি কশ্চিদেনমাশ্চর্য্যবদ্বদতি তথৈব চান্যঃ। আশ্চর্য্যবচ্চৈনমন্যঃ শৃণোতি শ্রুত্বাপ্যেনং বেদ ন চৈব কশ্চিৎ॥"

বঙ্গানুবাদ। আত্মাকে কেহ আশ্চর্য্যবৎ দৃষ্ট করে এবং অন্যে আত্মাসম্বন্ধে যাহা বলে, তাহাও আশ্চর্য্যবৎ বলে; যে শুনে, সেও আশ্চর্য্যবৎ শুনে,—শুনিয়াও কেহ বুঝিতে পারে না।

গীতাকার ঠিক কথাই বলিয়াছেন যে, আত্মার প্রকৃততত্ত্ব কেহই ধারণা করিতে পারে না, এইজন্যই আত্মা আশ্চর্য্যবৎ। বৈদান্তিকেরা ব্রহ্মচৈতন্য সম্বন্ধে আর একটী চমৎকার দৃষ্টান্ত দিয়াছেন; অনন্ত ব্রহ্ম-চৈতন্য মহাকাশ-স্বরূপ এবং কূটস্থ চৈতন্য (অর্থাৎ নির্লিপ্ত সাক্ষী-চৈতন্য,—যাহার প্রতিবিম্ব জীব) ঘটাকাশস্বরূপ এবং ঐ ঘটস্থ জলে যে আকাশ প্রতিবিম্বিত হয়, তাহাই বুদ্ধিস্থ জীব-চৈতন্য-স্বরূপ হইতেছে; সুতরাং ঘটস্থ আকাশ মহাকাশ হইতে পৃথক্ নহে. এস্থলেও বিপক্ষবাদীরা তর্ক করিবেন যে, ঘট ভগ্ন হইলে, ঘটস্থ আকাশ মহাকাশেই লীন হয় এবং ঘটস্থ জল মৃত্তিকায় মিশিয়াযায়; সুতরাং ঘট ভগ্ন এবং ঘটস্থ আকাশ মহাকাশে বিলীন হওয়ায়, ঘটস্থ জলে আকাশের যে প্রতিবিম্ব ছিল, তাহা অবশ্যই বিলুপ্ত হয়। এতাবতা দেহনাশে জীবের অস্তিত্ব ও জন্মান্তর অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইল। এই গুরুতর কঠিন আপত্তির মীমাংসার পূর্ব্বে অন্যান্য দর্শনশাস্ত্রের মত কি, জানা আবশ্যক। এক্ষণে সাংখ্য, পাতঞ্জল, ন্যায়, বৈশেষিক প্রভৃতি দর্শনশাস্ত্রে আত্মা বা পুরুষ পৃথক্ পৃথক্ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। উহা পরমাত্মার প্রতিবিম্ব বা স্বয়ং পরমাত্মা

বলিয়া উক্ত হয় নাই; সাংখ্যদর্শনে প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক চতুর্বিংশতি তত্ত্বের অতিরিক্ত পুরুষ কল্পিত হইয়াছে।* কিন্তু সাংখ্যের পুরুষ স্বাধীন নহে এবং তাঁহার কর্তৃত্ব বা ক্রিয়া-শক্তি নাই,—প্রকৃতিই কার্য্যের মুখ্যকর্ত্রী, পুরুষ তাহার চৈতন্যাধার মাত্র; কিন্তু পুরুষ-সংযোগ ব্যতীত প্রকৃতি জড়বৎ থাকেন, তাঁহার কোন কার্য্য করিবার (জগৎপ্রসব করিবার) শক্তি থাকে না। সাংখ্যকার ইহার একটী দৃষ্টান্ত এই ভাবে দেন যে—প্রকৃতি অন্ধ এবং পুরুষ খঞ্জস্বরূপ। অন্ধের দৃষ্টিশক্তির অভাব এবং খঞ্জের গতি-শক্তির অভাব; কিন্তু উভয়ে একত্রিত হইলে, উভয়ের অভাব পূরণ হয়; যেমন অন্ধের স্কন্ধে খঞ্জ উঠিলে, খঞ্জের ইঙ্গিতে অন্ধ গন্তব্যপথে চলিতে পারে, অর্থাৎ খঞ্জ অন্ধের পথ-প্রদর্শক হয় এবং অন্ধও খঞ্জের বাহক হয়, সেইরূপ অন্ধ-প্রকৃতি খঞ্জপুরুষের ইঙ্গিতে সৃষ্টিকার্য্য সমাধা করেন। সাংখ্যকার ব্যষ্টি—অর্থাৎ পৃথক্ পুরুষ ব্যতীত সমষ্টি-ঈশ্বর বা 'একমেবাদ্বিতীয়ং' ব্রহ্মচৈতন্য স্বীকার করেন না। পাতঞ্জল এবং ন্যায়দর্শনকার সাংখ্যের ন্যায় ব্যষ্টি—অর্থাৎ পৃথক্ পৃথক্ পুরুষের (যাহাকে আত্মা বলিয়াছেন) অতিরিক্ত এক অদ্বিতীয় মহাপুরুষ বা পরমাত্মা স্বীকার করেন। উপরোক্ত কয়েকটী দর্শনশাস্ত্রে আত্মার জন্মজন্মান্তর, উন্নতি-অবনতি ও বন্ধ মুক্তি সমস্তই স্বীকৃত হইয়াছে। সাংখ্যমতে জ্ঞান ও সদসদ্বস্তুবিবেকদ্বারা এবং ন্যায়শাস্ত্রমতে সদসদ্-বিচার ও চতুর্ব্বিধ প্রমাণ দ্বারা স্বরূপজ্ঞানোদয় ও মুক্তি হয়। পাতঞ্জলমতে যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণা ও সমাধিদ্বারা আত্মার পরমাত্মার সহিত মিলন ও মুক্তি হয় বলিয়া বর্ণিত আছে।

প্রথমতঃ সাংখ্যের পুরুষ জ্ঞানী, দ্রষ্টা ও প্রকৃতির পথ-প্রদর্শক। যদিও সাংখ্যকার পুরুষের সাক্ষাৎ কর্তৃত্ব স্বীকার করেন না, প্রকৃতিকেই কার্য্যের মুখ্যকর্ত্রী বলেন, কিন্তু তাঁহার বর্ণনা মতে প্রকৃতিকেও সম্পূর্ণ স্বাধীনা বলা যাইতে পারে না; যেহেতু চেতন পুরুষের সাহায্য ব্যতীত জড়প্রকৃতির কখনও জ্ঞান ও বিচারপূর্ব্বক অপূর্ব্ব সৃষ্টি-কর্তৃত্ব সম্ভবে না, সুতরাং তাঁহার বর্ণনা মতেও সৃষ্টিকর্তৃত্বের গৌণকারণই পুরুষ সাব্যস্ত হইতেছেন। এস্থলে পুরুষকে পূর্ণজ্ঞানী না বলিলে, এই বিচিত্র অনন্ত সৃষ্টির কৌশল অজ্ঞানী বা অসম্পূর্ণ জ্ঞানীর পক্ষে সম্ভব হইতে পারে না। এতাবতা পূর্ণজ্ঞানী পুরুষ বা আত্মা জড়প্রকৃতির উপদেষ্টা, অনুমন্তা এবং পথ-প্রদর্শক হইয়া, আবার ঐ প্রকৃতির আবরণে অজ্ঞানীর ন্যায় প্রতীয়মান হইয়া সুখ দুঃখ ভোগ করা,—তদনন্তর বহুসাধনার পর পুনঃ বিবেকের উদয় হওয়া এবং তদ্দ্বারা মুক্তিলাভ করা সঙ্গত হয় কি? এবং উহার উদ্দেশ্যই বা কি হইতে পারে? যদি পুরুষ জড়-প্রকৃতির আবরণে অজ্ঞানী হন, তবে অজ্ঞানী পুরুষের ইঙ্গিতে জড়-প্রকৃতির এই জ্ঞানময় সুকৌশল-পূর্ণ বিচিত্র সৃষ্টির সম্ভাবনা কোথায়? আবার জড়প্রকৃতি কর্তৃক পুরুষ অজ্ঞানাবরণে আবরিত থাকিলে, ঐ অজ্ঞানাবরণ-মুক্তি এবং বিবেক ও স্বরূপজ্ঞানের বিকাশ কি শক্তিদ্বারা হইবে? যেহেতু প্রকৃতি জড়, পুরুষও তদাবরণে আবরিত, এস্থলে পুরুষের সাধনাদ্বারা ক্রমিক জ্ঞান, বিচারশক্তি ও সদসদ্বস্তুবিবেকের বিকাশ কাহার শক্তিদ্বারা হইবে? এতদ্ভিন্ন সাংখ্য মতের আর একটি গুরুতর আপত্তি এই যে, এই চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র, পৃথিবী এবং পার্থিব

---

* সাংখ্যের চতুর্বিংশতিতত্ত্ব, যথা—[illegible], অহংতত্ত্ব, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয় এবং একাদশ ইন্দ্রিয় মন, পঞ্চতন্মাত্র, রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ—পঞ্চ মহাভূত—ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম। [illegible]

জড়, উদ্ভিদ, নানাপ্রকার জীবজন্তু সমন্বিত বিচিত্র জগৎ-সৃষ্টি অসংখ্য পৃথক্ পৃথক্ পুরুষ-সংযোগে জড়প্রকৃতি কর্তৃক কি প্রকারে সম্ভব হয়? যদি মানিয়া লওয়া যায় যে, ভিন্ন ভিন্ন মানবাত্মা সাংখ্যের এক একটি পুরুষ হইতেছে, তাহাহইলে পৃথক্ পৃথক্ উদ্ভিদ্, বৃক্ষ, লতা, কীট, পতঙ্গ, পশু ও পক্ষীর আত্মা কি? উহা কি সাংখ্যের এক একটী পুরুষ? যেহেতু ঐ পুরুষ লইয়াই সাংখ্যের পঞ্চবিংশতিতত্ত্ব। পুরুষ বাদ দিলে চতুর্বিংশতি তত্ত্ব থাকে। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, এক একটী তৃণে যে সাংখ্যের চতুর্বিংশতিতত্ত্ব আছে, (অবশ্যই ঐ চতুর্বিংশতি তত্ত্বের সম্পূর্ণ বিকাশ উদ্ভিদ্ জগতে হয় নাই) তদতিরিক্ত এক একটী পুরুষও কি গুহ্যভাবে আছে? সেই সেই পুরুষ কি চিরকাল তদবস্থায় থাকিবে? অথবা ক্রমোন্নতির প্রণালী অনুসারে কোটী কোটী জন্মের পর উদ্ভিদ কীট-পতঙ্গে, কীট-পতঙ্গ পশু-পক্ষীতে পরিণত ও পশু-পক্ষী মানবযোনি প্রাপ্ত হইয়া সাধনা দ্বারা কি মুক্ত হইবে? যদি তাহাই হয়, তবে প্রকৃতির নিয়মানুসারে সেই তৃণ বা উদ্ভিদের স্থানে যে নূতন তৃণ বা উদ্ভিদ উৎপন্ন হইবে, তাহাতেও নূতন পুরুষের আবির্ভাব আবশ্যক। অতএব অসংখ্য পৃথক্ পৃথক্ চেতন জ্ঞানময় পুরুষের জড়ত্বে ও উদ্ভিদে পরিণতি— তদনন্তর কীট-পতঙ্গ হইতে সমস্ত জীব-রাজ্য ভ্রমণপূর্ব্বক মানবযোনি প্রাপ্তি এবং তৎপরে বহুসাধনা দ্বারা পুনর্ব্বার স্বপদপ্রাপ্তি (অর্থাৎ যাহা ছিলেন, পুনর্ব্বার তাহাই হওয়া) রহস্যের বিষয় ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে? ফলতঃ বেদান্তোক্ত সমষ্টি ব্রহ্মচৈতন্য স্বীকার না করিলে, সৃষ্টিব্যাপার কখনই সংরক্ষিত হইতে পারে না। এক্ষণে পাতঞ্জলযোগদর্শন সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ সমালোচনা আবশ্যক। ঐ দর্শনে যদিও ঈশ্বর স্বীকৃত হইয়াছেন বটে, তথাচ অসংখ্য ব্যষ্টি আত্মার পৃথক্ পৃথক্ অস্তিত্ব স্বীকৃত হওয়ায়, অনেকগুলি আপত্তি উঠিতে পারে। যদি ঈশ্বর পূর্ব্বোক্তমত উদ্ভিদ্-কীট-পতঙ্গ, নানাজাতীয় পশুপক্ষী ও মানবসমূহের অসংখ্য পৃথক্ পৃথক্ আত্মার সৃষ্টি করিয়া থাকেন, তাহাহইলে আত্মা সৃষ্টপদার্থ হইল; সৃষ্টবস্তুমাত্রেই অসৎ—অর্থাৎ ধ্বংসশীল; যাহা ধ্বংসশীল, তাহার মুক্তি বা চির-অনবস্থ কখনই হইতে পারে না; যথা—"নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ" অর্থাৎ যাহা চিরকাল আছে, তাহার কখনও ধ্বংস হয় না ও যাহা পূর্ব্বে ছিল না, তাহার কখনও চির-অস্তিত্ব থাকিতে পারে না। উৎপন্ন বস্তু মাত্রেই ধ্বংসশীল, এস্থলে আত্মা নিত্যজাত ও নিত্যধ্বংসশীল সাব্যস্ত হওয়ায় আত্মার মুক্তি অসম্ভব হয়। সুতরাং পাতঞ্জলোক্ত সমাধিদ্বারা আত্মার পরমাত্মার সহিত চিরমিলনের সার্থকতা থাকে না। যদি অসংখ্য আত্মা ঈশ্বরের অসংখ্য সৃষ্টবস্তু না হইয়া— অর্থাৎ নিত্যজাত না হইয়া, অনাদিকাল হইতেই উঁহাদের পৃথক্ অস্তিত্ব স্বীকৃত হয়, তাহাহইলে সাংখ্যের পুরুষের যে দশা, ইহাদেরও তাহাই হয়,—অর্থাৎ পূর্ব্বনির্দ্দিষ্টমত নিত্য বস্তুর বন্ধ, মুক্তি, উন্নতি, অবনতি অসম্ভব হইয়া পড়ে। ইহা ব্যতীত আর একটী মত আছে, ঐ মতকে 'বিশিষ্ট অদ্বৈতবাদ' কহে। বিশিষ্ট-অদ্বৈতবাদীরা নিরাকার-নির্গুণ ঈশ্বর স্বীকার করেন না বা স্বতন্ত্র প্রকৃতির কর্তৃত্ব মানেন না; তাঁহারা বেদান্তের মতানুযায়ী (কিঞ্চিৎ রূপান্তরভাবে) ঈশ্বরের শক্তিকেই প্রকৃতি বলেন। তাঁহারা যদিও ঈশ্বর ও জীবাত্মা এক বলিয়া স্বীকার করেন না, তথাচ উহা ঈশ্বর হইতে পৃথক্ কোন পদার্থও বলেন না; তাঁহারা বলেন যে, ঈশ্বর সমষ্টি-চিদ্ঘন-

বিগ্রহ ভগবান। জীব তাঁহারই চিদংশ বা চিদণুস্বরূপ এবং সমগ্র জগৎ তাঁহারই বিভূতি বা ঐশ্বর্য্যস্বরূপ। তাঁহারা বেদান্তবাদী হইলেও বেদান্তের মায়াবাদ বা প্রতিবিম্ববাদ স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে জীব ঈশ্বরের অংশ বা অণুস্বরূপ হইলেও, যেমন সমুদ্রস্থ এক বিন্দু বারি কখনও স্বয়ং সমুদ্র হইতে পারে না, সেইরূপ, জীব কখনও ঈশ্বর হইতে পারে না। তাঁহার চিৎসমুদ্রের নির্ম্মল বারিবিন্দু জড়দেহরূপ কর্দ্দম মিশ্রিত হওয়ায়, তাহার নির্ম্মলত্ব থাকে না এবং কর্দ্দমরূপ দেহ নষ্ট হইলেও ঐ কর্দ্দমের অণুসকল ঐ বারিবিন্দুর সহিত সংমিশ্রিত থাকায়, ঐ বারিবিন্দু চিৎসমুদ্রের নির্ম্মল বারি হইতে পৃথক্ থাকিয়া (চিদণুরূপ জীব) ইহ-পরলোকে যাতায়াত করে; ক্রমে ভক্তি-প্রেমরূপ সাধন-ভজনদ্বারা কর্দ্দমাণু হইতে বারি বিমুক্ত হইলে পুনর্ব্বার চিৎসমুদ্রে পৌঁছে; কিন্তু সমুদ্রের সহিত মিশিয়া যায় না,—পৃথক্ পৃথক্ অস্তিত্ব চিরকাল থাকে। যাহাহউক, পূর্ব্বোক্ত কর্দ্দমরূপ জড়জগৎ যে তাঁহারই ঐশ্বর্য্য স্বরূপ, তাহা বলা বাহুল্য। এই বিশিষ্ট-অদ্বৈতবাদ হইতে ভক্তিবাদ বা বৈষ্ণবধর্ম্মপ্রচার হয়। এই মতটী সহজেই মনোরম বোধ হয়; প্রকৃত-পক্ষেও বৈষ্ণবধর্ম্ম অতি মধুর এবং প্রেম ও ভক্তির উৎসস্বরূপ। এই মতটীর উপর যাঁহাদের নিসন্দিগ্ধরূপে বিশ্বাস হয়, তাঁহাদের ভগবানের উপর নির্ভর ও তাঁহার প্রতি ঐকান্তিক প্রেম ও ভক্তির উদয় হয় এবং ঐ প্রেম ও ভক্তি হইতে মন নির্ম্মল ও পবিত্র হইয়া জীবের পার্থিব-বন্ধন যে শিথিল হয়, তাহার আর সন্দেহ নাই। প্রবন্ধলেখক বেদান্তের মায়াবাদের পক্ষপাতী হইলেও এবং বেদান্তের মায়াবাদের সহিত এই মতের আপাত-দৃষ্টিচিরবিরোধ থাকিলেও—উভয় মতের সামঞ্জস্যের নিতান্ত প্রয়াসী। প্রকৃতপক্ষে বেদান্তের কেবলাদ্বৈতবাদ বা মায়াবাদের সহিত বিশিষ্ট অদ্বৈতবাদের সামঞ্জস্য ব্যতীত উপস্থিত কঠিন প্রশ্নের কখনই সুমীমাংসা হইবে না সত্য, তৎসত্ত্বেও এই মতটীর প্রতি যে আপত্তি উত্থিত হইতে পারে, তাহা না দর্শাইলে, উভয় মতের সামঞ্জস্য প্রতিপাদন হইতে পারে না; যাহাহউক জীবাত্মা যদি পরমাত্মার অংশ বা অণুস্বরূপ হয়েন, তাহাহইলে জীবাত্মা নিত্য-শাশ্বত-অপরি-বর্ত্তনশীল ও ক্ষয়বৃদ্ধিরহিত হইতেছেন, সুতরাং ঐ নিত্য বস্তুর বন্ধ-মুক্তি এবং উন্নতি অসম্ভব। বিশেষতঃ চিদণুস্বরূপ আত্মা পার্থিব দেহধারণের পূর্ব্বে যাহা ছিলেন, মুক্ত হইয়াও যদি তাহাই থাকিলেন, তবে সাংখ্যের পুরুষের ও পতঞ্জলির আত্মার যে দশা, এই আত্মারও সেই দশা হইল; ফলতঃ ঐ অবস্থায় বন্ধ মুক্তির কোন অর্থ থাকে না। বিশেষতঃ পরমাত্মা পূর্ণ-অনাদি অনন্ত-জ্ঞান-ময় বিধায় অনন্তের পৃথক্ পৃথক্ অংশ বলা নিতান্ত অদার্শনিক ও অযৌক্তিক হয়; যেহেতু অনন্তের অর্থ সর্ব্বব্যাপী, অসীম, তাহার পৃথক্ পৃথক্ অংশ বাহির করিয়া লইতে হইলে, মধ্যে একটী সীমা বা রেখা আবশ্যক হয়, কিন্তু সর্ব্ব-ব্যাপীর মধ্যে সীমা বা রেখার স্থান কোথায়? যে স্থানে সীমা বা রেখা পড়িবে, সে স্থানেও সর্ব্ববাপীর অস্তিত্ব থাকায় সীমা বা রেখা অসম্ভব; বিশেষতঃ অনন্ত কখনও সাকার হইতে পারে না; আকৃতি থাকিলেই সীমাবদ্ধ হইল। যদি বলা হয় যে, চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র, আকাশ, বায়ু, তেজ, জল, মৃত্তিকা এবং জীবজন্তু-সমন্বিত অনন্ত বিশ্বই তাঁহার স্থূলদেহ, তাহা হইলে বেদান্তোক্ত অদ্বৈদবাদের সহিত অসামঞ্জস্য হয় না; বস্তুতঃ বিষ্ণু-পুরাণোক্ত প্রহ্লাদকৃত ভগবানের স্তোত্রটী পাঠ করিলে এই মতটী সমর্থিত হয়। ঐ বিষ্ণুপুরাণ বিশিষ্ট-অদ্বৈতবাদের একখানি উৎকৃষ্ট

পৌরাণিকগ্রন্থ।

যথা—

"রূপং মহত্তে স্থিতমত্র বিশ্বং ততশ্চ সূক্ষ্মং জগতেদদীশ। রূপাণি সর্ব্বাণি চ ভূত ভেদা তেষ্বান্তরাত্মাখ্যমতীব সূক্ষ্মং॥ তস্মাচ্চ সূক্ষ্মাদি বিশেষণানামগোচরং যৎ পরমাত্মরূপং। কিমপ্যচিন্ত্যং তব রূপমস্তি তস্মৈ নমস্তে পুরুষোত্তমায়।"

বঙ্গার্থ। বিশ্বই তোমার মহৎরূপ, এই জগৎ তদপেক্ষা ক্ষুদ্র। সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন ভূত তোমারই এক একটী রূপ (অর্থাৎ স্থূলরূপ) তাহাদিগের অন্তঃকরণ তোমার সূক্ষ্মরূপ; ঐ সূক্ষ্মাদিরূপের অবিষয়ীভূত যে পরমাত্মরূপ আছে, তাহা অচিন্তনীয়; অতএব হে পুরুষোত্তম! তোমাকে নমস্কার করি।

অতএব সূক্ষ্মাদি বিষয়ের অবিষয়ীভূত অচিন্ত্য পরমাত্মরূপের বিষয় যে কথিত হইয়াছে, ঐ চিন্তার অতীত রূপকে প্রকৃতপক্ষে রূপ বা বিশেষ আকৃতি বলা যায় না। এই ভাবে সর্ব্বব্যাপীর চৈতন্য-ঘনবিগ্রহ বা চতুর্ভুজ কি দ্বিভুজ মূর্ত্তি অসম্ভব।* ব্রহ্ম নিরাকার—অনন্ত, অতএব সমস্তই তিনি, সুতরাং তাঁহার স্বরূপ অবস্থায় এক অণু হইতে অন্য অণুর মধ্যে অবকাশ বা ছেদের উপায় নাই। দুইটী অণুর মধ্যে সামান্য অবকাশ ব্যতীত পৃথক্ দুইটী অণুর অস্তিত্ব অসম্ভব, কিন্তু তিনি পূর্ণ ও সর্ব্বব্যাপী হওয়ায় তাঁহার মধ্যে কোন অবকাশ (ফাক্) নাই; অতএব পৃথক্ পৃথক্ অণু-পরমাণুরও অস্তিত্ব অসম্ভব। তিনি নিত্য অনন্ত জ্ঞানময়; ঐ নিত্য জ্ঞানের বিভাগ হইতে পারে না। যখন সমস্তই জ্ঞানময়, তখন অনন্ত নিত্য-জ্ঞানের অংশ বা অণুস্বরূপ জীবের পৃথক্ অস্তিত্ব এবং তাহার বন্ধ, মুক্তি, উন্নতি, অবনতি এবং পুনর্জ্জন্ম ইত্যাদি অসম্ভব হয়। এই স্থানে পুনর্ব্বার ভগবদ্গীতার সেই শ্লোকটী স্মরণ করাইয়া দিই—

আশ্চর্য্যবৎ পশ্যতি কশ্চিদেন-
মাশ্চর্য্যবদ্বদতি তথৈব চান্যঃ।
আশ্চর্য্যবচ্চৈনমন্যঃ শৃণোতি
শ্রুত্বাপ্যেনং বেদ নচৈব কশ্চিৎ॥

বাস্তবিকই আত্মা আশ্চর্য্যবৎ। এতদ্ব্যতীত আরও কতকগুলি মত আছে, তাহাতে উহার পরিষ্কার মীমাংসা দূরে থাকুক্, বরং ঐ সকল মত অধিকতর জটিল বোধ হয়। এমন কি, গৌতম বুদ্ধ জন্মান্তর স্বীকার করিলেও, কর্ম্ম এবং পঞ্চস্কন্ধ (যথা রূপস্কন্ধ, বিজ্ঞানস্কন্ধ, বেদনাস্কন্ধ, সংজ্ঞাস্কন্ধ, সংস্কারস্কন্ধ) ব্যতীত আত্মার পৃথক্ অস্তিত্ব স্বীকার করিতে পারেন নাই। বুদ্ধদেবের মতানুসারে যদি আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার না করা যায়, তবে কর্ম্মফল ভোগ কে করিবে? তাঁহার পঞ্চস্কন্ধ পঞ্চভূতের বিকার বা পঞ্চভূতের রাসায়নিক সংশ্লিষ্টগুণ ব্যতীত অন্য কিছুই নহে; অতএব জড়ের কর্ম্মফল ভোগ অসম্ভব। আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার না করায়, অথচ কর্ম্মফল ভোগ এবং পঞ্চস্কন্ধ স্বীকার করায়, তাঁহার মতটী যে সম্পূর্ণ সদোষ, তাহা বেদান্ত দর্শনে শাঙ্কর ভাষ্যে স্পষ্টরূপে প্রদর্শিত আছে।* (বেদান্তদর্শন শাঙ্কর

---

* সাধকের সাধনার নিমিত্ত ঐ প্রকার জ্যোতির্ম্ময় দ্বিভুজ বা চতুর্ভুজ মূর্ত্তি কল্পনা হইয়াছে; তদ্ভিন্ন নিরাকার উপাসনা অতীব কঠিন, (গীতার ১২শ অঃ, ৩—৫ শ্লোকে দ্রষ্টব্য) এইজন্য ভক্তের নিকট সর্ব্বব্যাপীর সাকারত্ব নিতান্ত প্রয়োজন। স্বরূপলক্ষণে অনন্ত দ্বিভুজ বা চতুর্ভুজ নহেন, অথচ তটস্থভাবে ভক্তের মনোময়রূপে তিনি দ্বিভুজ বা চতুর্ভুজ ইত্যাদি মূর্ত্তিতে ধ্যানাধিগম্য ও সাধকাভীষ্টফলদাতা। সাকারোপসনায় কৃতার্থতা এই জন্য সুলভ, স্বাভাবিক ও সুপরীক্ষিত।

* লৌকিক বৌদ্ধধর্ম্মে শূন্যবাদ, ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদ, সর্ব্বাস্তিত্ববাদ প্রভৃতি মত আছে। ঐ সকল মত

ভাষ্য ২য় পাদ ২১৬ পৃষ্ঠা হইতে ২৬৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।) এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, আত্মা যে কি পদার্থ, ইহা দর্শন বা তত্ত্বশাস্ত্রে নিঃসংশয়িতরূপে স্থিরীকৃত বা মীমাংসিত কি হয় নাই? ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, উহার প্রকৃত মীমাংসা দর্শনশাস্ত্রের অন্তরতম স্তরে অতি গূঢ়ভাবে নিহিত আছে; সাধনা ব্যতীত কেহ বুঝিতে পারে, এমনভাবে উহার ব্যাখ্যা নাই বা হইতেও পারে না; তাহার কারণ এই যে, একপক্ষে জগতে এরূপ ভাষা নাই, যাহা দ্বারা ঐ গূঢ়তমতত্ত্ব সাধারণ জনগণকে নখদর্পণের ন্যায় বুঝাইয়া দেওয়া যাইতে পারে; পক্ষান্তরে কোন মহাত্মা বুঝাইতে চেষ্টা করিলেও আমাদের এরূপ আধ্যাত্মিক নির্ম্মল জ্ঞান বা বুদ্ধি নাই, যদ্দ্বারা আমরা অন্তর্জগৎ পরিদর্শন ও ভেদপূর্ব্বক আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া ঐ গূঢ়তত্ত্ব বুঝিতে সক্ষম হইতে পারি। আসল কথা বলিতে হইলে, আমাদের ন্যায় বিষয়ীব্যক্তি মাত্রেই বেদান্তের প্রকৃতমর্ম্ম বুঝিতে সম্পূর্ণ অক্ষম। এই জন্যই বেদান্তদর্শনের প্রথম সূত্রে ও তাহার ভাষ্যে স্পষ্টরূপ কথিত হইয়াছে যে, শম, দম, তিতিক্ষা, উপরতি, সমাধান, শ্রদ্ধা, বিবেক ও বৈরাগ্য-সাধন সম্পন্ন ব্যক্তি ব্যতীত বেদান্তশ্রবণের অধিকারী অপরে হয় না। ঐ নিষেধের প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝিতে হইলে এইরূপ দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে যে, এক জন মূর্খ চাষা যদি কোন তড়িৎ-তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করে যে "মহাশয়! এই যে তারে সংবাদ আসে, উহা কি প্রকারে, তাহা বুঝাইয়া দিতে পারেন?" ঐ প্রশ্নের উত্তরে ঐ তারের সংবাদের মর্ম্ম—অর্থাৎ তাহার বৈজ্ঞানিক রহস্য যদি কোন তত্ত্বজ্ঞ বিশদভাবে বুঝাইয়া দেন, তাহাহইলে ঐ চাষা তাহা কখনই সম্যক্ বুঝিতে সক্ষম হয় না। পরন্তু যদি ঐ প্রশ্নকারিক নিতান্ত 'চাষা' না হইয়া বিজ্ঞান-অনভিজ্ঞ আমাদের দেশের কিতাবতী বিষয়ী কূটতার্কিক হন, তাহা হইলে ভয়ঙ্কর বিভ্রাট উপস্থিত হয়। অর্থাৎ ঐ অনভিজ্ঞ জ্ঞানাভিমানী প্রকৃতপ্রস্তাবে তড়িৎতত্ত্বের ও তাহার পরিচালক যন্ত্রের প্রকৃতমর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া এমনভাবে অন্যায় কূটতর্ক করিতে থাকে যে, সেই অজ্ঞব্যক্তির অন্যায় তর্ক খণ্ডন করিয়া উহার প্রকৃত মর্ম্ম তাহাকে বুঝাইতে পারে, এমন তত্ত্বজ্ঞ জগতে নাই। * আমাদের পক্ষে বেদান্তের মায়াবাদ বা প্রতিবিম্ববাদের উপর পূর্ব্ববর্ণিত আপত্তি বা তর্ক সেই প্রকার। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, বাহ্য-জগতে এমত ভাষা নাই, যদ্দ্বারা অন্তর্জগতের ঐ গুরুতর ব্যাপার স্পষ্টরূপে ব্যক্ত করা যাইতে পারে। 'প্রতিবিম্ব' শব্দ বাহ্যজগতের ভাষা; অন্তর্জগতের ঐ ভাবের ভাষার অভাবে কতকাংশে সাদৃশ্যযুক্ত বলিয়া 'প্রতিবিম্ব' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। ঐরূপ মহাকাশ, ঘটাকাশ, ঘটস্থজলাকাশ প্রভৃতি দৃষ্টান্ত প্রকৃত ব্যাপারের একদেশ-সাদৃশ্য মাত্র; ব্রহ্ম বা আত্মার সর্ব্বাংশে সাদৃশ্য—ঐ ব্রহ্ম বা আত্মা ব্যতীত জগতে অন্য কিছুতেই নাই, সুতরাং ঐ একদেশ-সাদৃশ্য-

[illegible] [illegible] [illegible]

সম্বোধ ও বেদান্তদর্শনে ঐ সমস্ত মত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু বুদ্ধের আধ্যাত্মিক তত্ত্বে সপ্তকোষিক আত্মা স্বীকৃত আছে। মিঃ সিনেট কৃত "Esoteric Buddhism" দ্রষ্টব্য।

* একদিন ইংরাজি-অনভিজ্ঞ, একটী প্রাচীন নায়েব পৃথিবী গোলাকার এবং আমেরিকা বিপরীত গোলার্দ্ধে অবস্থিত শুনিয়া হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন যে "তবে তাহাদের মস্তক নিম্নদিকে থাকে, তাহাহইলে আকাশের দিকে পড়িয়া যায় না, কেন?" তাঁহার এই প্রশ্নে "উপর নীচ কিছুই নহে এবং পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ" ইত্যাদি তাঁহাকে বিশদরূপে বুঝাইয়া দেওয়া সত্ত্বেও তাঁহার ঐ ভ্রম-সংস্কার কিছুতেই গেল না।

হেতু তত্ত্বজ্ঞ মহাত্মাগণ শিষ্যবর্গকে কেবল মাত্র গন্তব্যপথ ধরাইবার জন্য অন্তর্জগতের কেবল বর্ণ-পরিচয়ের ন্যায় ঐ সকল একদেশ-ব্যাপী দৃষ্টান্ত দিতে বাধ্য হইয়াছেন।

আমিত্বের প্রসার।

গৃহস্থাশ্রম।

নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন না করিলে, ব্রহ্মচর্য্যান্তে আর্য্যদিগের গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করাই শাস্ত্রের বিধি। ব্রহ্মচারী কঠোর জ্ঞান-তপস্যান্তে গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিয়া কঠোরতর কর্ম্ম-তপস্যায় ব্রতী হয়েন। গুরুগৃহই বা বিদ্যা-মন্দিরই ব্রহ্মচারীর পক্ষে বিশ্বসংসার। এই সময়ে জগতের সহিত তাঁহার সম্পর্ক অতীব সসীম। যোদ্ধারপক্ষে মল্লভূমি যেরূপ শিক্ষা স্থল, গৃহস্থের পক্ষে ব্রহ্মচারী-আশ্রম তদ্রূপ শিক্ষার স্থল। কিন্তু কেবল সমরক্ষেত্রেই যেরূপ যোদ্ধার শৌর্য্য-বীর্য্য ও নৈপুণ্যের পূর্ণবিকাশ হয়, তদ্রূপ গৃহস্থাশ্রমেই মানবের অন্তর্নিহিত তাবৎ শিক্ষার বিকাশ হয়। রসায়নাদি শিক্ষার জন্য যেরূপ উপদেশ-গৃহে (lecture room) উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াও উপদেশ সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্য পরীক্ষা-গৃহ (laboratory) যন্ত্রাদি সাহায্যে ক্রিয়ার আবশ্যক, তদ্রূপ ব্রহ্মচর্য্যকালে মানবজীবনের তাবৎ কর্ত্তব্য বিষয়ক উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াও ঐ সমুদায় উপদেশের দার্ঢ্য ও পরিণতি সম্পাদন জন্য গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করা প্রয়োজন। কর্ম্মের দ্বারাই জ্ঞানের পরিপাক হয়। ক্রিয়ার সাহায্য ভিন্ন মস্তিকে জ্ঞানের লাইন সুস্পষ্টরূপে পতিত হয় না। এই জন্য মানবজীবনে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম অতীব প্রয়োজনীয় হইলেও এবং শাস্ত্রে উহার ভূয়সী প্রশংসা থাকিলেও, গৃহস্থাশ্রম ততোধিক প্রয়োজনীয় এবং তজ্জন্য শাস্ত্রেও অধিকতর রূপে প্রশংসিত হইয়াছে। গৃহস্থাশ্রম ব্যতীত ব্রহ্মচারী-আশ্রম নিরর্থক হইয়া যায়। যে জ্ঞান কার্য্যে পরিণত না হয়, সে জ্ঞান নিষ্প্রয়োজন। বিদ্যার্জ্জন করিয়া যে সেই বিদ্যাদ্বারা জগতের ও নিজের উপকার সাধন না করে, তাহার সে বিদ্যা বৃথা। বলবান্ হইয়া যে দুর্ব্বলের সাহায্য না করে, তাহার বল নিরর্থক। সংক্ষেপে—যাহার যাহা আছে, তাহার সদ্ব্যবহার না হইলে, তাহা থাকা না থাকা সমান। ব্রহ্মচর্য্য-লব্ধ-শিক্ষা যদি কোনও কার্য্যে না আসিল, তাহা-হইলে সে শিক্ষা বিড়ম্বনামাত্র। গৃহস্থাশ্রমই সেই শিক্ষা কার্য্যে পরিণত করিবার স্বাভাবিক ও সুপ্রাপ্য স্থল। এই জন্যই সাধারণ অধিকারী-দিগের পক্ষে ব্রহ্মচর্য্যান্তে গৃহস্থাশ্রমের বিধান। গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিয়াই সাংসারিক বহুবিধ ব্যাপারে ব্যাপৃত হইয়া মানব ব্রহ্মচর্য্য-লব্ধ-জ্ঞানের সারবত্তা ক্রমে উপলব্ধি করিয়া থাকে।

সংসারে প্রবেশ করিলে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের নানাবিধ জটিল সমস্যা মানবের সম্মুখে উপস্থিত হয়; তখন যদি মানব "আমিত্বের প্রসার"কে ইষ্টদেবদত্ত মূলমন্ত্রস্বরূপ জ্ঞান করিয়া, তাহা-দ্বারা সর্ব্ববিষয়ে পরিচালিত হয়, তাহাহইলে তাহার কখনও পদস্খলনের সম্ভাবনা নাই। কি পারিবারিক, কি সামাজিক, কি রাজনৈতিক, সর্ব্ববিধ ব্যাপারেই যদি আমিত্বের প্রসার করিয়া দেওয়া যায়, অর্থাৎ সর্ব্বকার্য্যেই যদি "আমাকে" "পরের" স্থানে স্থাপিত করিতে পারা যায়, তাহা-

হইলে কর্ত্তব্য-মীমাংসা তত সুকঠিন হয় না। পিতা যখন পুত্রের প্রতি কোন ব্যবহার করিবেন, তখন আপনাকে পুত্র কল্পনা করিয়া তাহার প্রতি কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিবেন। ঐরূপ পুত্র যখন পিতার প্রতি কোন ব্যবহার করিবেন, তখন আপনাকে পিতা কল্পনা করিয়া তাঁহার প্রতি ব্যবহার করিবেন। এইরূপ স্ত্রী, ভ্রাতা, ভগিনী, কুটুম্ব, আত্মীয়, বন্ধু, স্বদেশ ও বিদেশবাসী, সকলেরই স্থানেই "আমাকে" কল্পনা করিয়া তাহাদের প্রতি আমার কর্ত্তব্যাবধারণ করিতে হইবে। রাজা-প্রজা, ধনী-দরিদ্র, উত্তমর্ণ-অধমর্ণ, যজমান-পুরোহিত, প্রভু-ভৃত্য, রোগী-চিকিৎসক ইত্যাদি সকলেই পরস্পরের প্রতি কর্ত্তব্যাবধারণের সময়ে কর্ত্তব্যবিষয়ীভূত পাত্রের স্থানে আপনাকে কল্পনা করিলে জগতে কোন অশান্তি থাকিতে পারে না। মানব পরস্পরের সহিত ব্যবহারের সময়ে আপনাকে আপনার স্থানে ফেলিতে পারে না বলিয়াই যত গণ্ডগোল উপস্থিত হয়। গৃহস্থের তাবৎ কর্ত্তব্য "আমিত্বের প্রসার"রূপ ভিত্তির উপর স্থাপিত হইলেই উহা সুকর ও সুখদ হয় এবং যখনই অন্য কোন ভিত্তির উপর স্থাপিত হয়, তখনই মানব মানবের প্রতিকূল হইয়া পরস্পরের অশান্তি উৎপাদন করে।

ব্রহ্মচর্য্যান্তে গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিলে, "আমিত্বের প্রসার" তত দুঃসাধ্য হয় না; কিন্তু কালবশে সেই ব্রহ্মচর্য্যের লোপ হওয়ায়, গৃহস্থাশ্রমে "আমিত্বের প্রসার"রূপ মূলমন্ত্রদ্বারা প্রণোদিত হওয়া একণে বড় সহজ নহে। তথাপি আমিত্বের প্রসারই মানবজীবনে সাধনার মূলতত্ত্ব হওয়ায়, মানব যতই বিকৃত হউক না কেন, ঐ মূলতত্ত্ব একেবারে বিস্মৃত হইতে পারে না এবং তজ্জন্য মানব তাহার নানাবিধ কার্য্যে অজ্ঞাতসারেই যেন আমিত্বের প্রসার অধিকার করে। ইন্দ্রিয়পরিতৃপ্তির জন্যই সাধারণ গৃহস্থ দারপরিগ্রহ করে, কিন্তু দারপরিগ্রহ করিবামাত্র অজ্ঞাতসারে তাহার "আমিত্বের প্রসার" হইতে থাকে। পুত্র-কন্যাদি হইলে, তাহার "আমিত্বের প্রসার" আরও পরিবর্দ্ধিত হয়। স্বপরিবারের প্রতি আমিত্বের প্রসার হেতু, ক্রমে অন্য পরিবারের প্রতিও সহানুভূতির স্বাভাবিকতায় "আমিত্বের প্রসার" জন্মে। ঐরূপে উহা বর্দ্ধিত হইয়া মানবমাত্রেতেই স্পৃষ্ট হয়। কার্য্যক্ষেত্র যতই পরিবর্দ্ধিত হয়, মানব যতই ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভ্রমণ করে, ভিন্ন ভিন্ন ভাষা শিক্ষা করে, ভিন্ন ভিন্ন দেশের অধিবাসীদের সংস্রবে আসে, ততই সে আপনাকে তাহাদের স্থানে স্থাপন করিতে শিক্ষা করে। আমি যদি বিদেশে ভ্রমণ করি, তাহাহইলেই বিদেশে ভ্রমণ করিবার কষ্ট অনুভব করিতে পারি এবং তাহাহইলেই কোন বিদেশীয় ব্যক্তি আমার দেশে আসিলে, তাহার প্রতি সৌজন্য ও সদয় ব্যবহার করিতে ব্যাকুল হই। তীর্থভ্রমণের ইহা এক সুমহৎ ফল।

এই জন্যই গৃহস্থাশ্রমে বহুবিধ কর্ত্তব্যের ব্যবস্থা। বহুবিধ কর্ত্তব্য সম্পাদনে বহুবিধ বিষয়ে আমিত্বের প্রসার স্বতঃই উৎপন্ন হয়। ধর্ম্ম কি? চিন্তা করিয়া দেখ, কতকগুলি কর্ত্তব্য ভিন্ন আর কিছুই নহে। পিতা-মাতাকে ভক্তি করিবে, স্ত্রী-পুত্র-আত্মীয়-স্বজনকে প্রতিপালন করিবে, অতিথিসেবা করিবে, দীন-দুঃখীকে দান করিবে, অজ্ঞানীকে জ্ঞান-উপদেশ দিবে, সাধুর সম্মান করিবে, অসাধুকে যথাযোগ্যভাবে দণ্ড বা উপদেশদ্বারা সৎপথে আনিবে, ঈশ্বরে ভক্তিমান হইবে, ইত্যাদি যাহা কিছু কর্ত্তব্য, তাহারই শিক্ষা-সমষ্টিকে ধর্ম্ম বলা যায় এবং ব্যষ্টিভাবে উহারা প্রত্যেকেই ধর্ম্মও বটে কর্ম্মও বটে। যাহা কিছু কর্ত্তব্য, তাহাই ধর্ম্ম, যাহাতে

আমিত্বের প্রসার, তাহাই কর্ত্তব্য, অন্য পক্ষে যাহা কিছু অকর্ত্তব্য, তাহাই অধর্ম্ম এবং যাহাতে আমিত্বের সঙ্কোচ, তাহাই অকর্ত্তব্য। আমিত্বের প্রসারই নীতি ও ধর্ম্মের ভিত্তি। কেবল ঈশ্বরোপাসনাকেই যদি ধর্ম্ম বল, তাহাহইলেও দেখিতে পাইবে যে, ঈশ্বর-উপাসনার মধ্যেই তোমার তাবৎ কর্ত্তব্য নিহিত ঈশ্বরোপাসনা করিতে গেলেই ঈশ্বরকে আদর্শ-পুরুষ জ্ঞান করিয়া উপাসনা করিতে হয় এবং ঐ আদর্শ-পুরুষে সম্পূর্ণ আমিত্বের প্রসার সাধন বা আত্মসমর্পণ করিতেহয় এবং তদ্রূপ পুরুষের উপাসনা করিতে গেলেই, তাঁহার আদর্শ হৃদয়ে অঙ্কিত করিয়া, কার্য্যক্ষেত্রে ঐ আদর্শের অনুগামী হইতে হয়। বিচক্ষণ পাঠক জীবনের প্রত্যেক কর্ত্তব্য পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন যে, যাহা কর্ত্তব্য, তাহাই আমিত্বের প্রসারের উপরে স্থাপিত এবং ঐ ভিত্তি অপসৃত করিলেই উহা অকর্ত্তব্যে পরিণত হইবে।

কর্ত্তব্য ও অকর্ত্তব্য, ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম, কর্ম্ম ও অকর্ম্ম লইয়া মানবের চিত্ত সর্ব্বদা দোলায়মান। ভগবান শ্রীকৃষ্ণও বলিয়াছেন "কিং কর্ম্ম কিমকর্ম্মেতি কবয়োহপ্যত্র মোহিতাঃ"অর্থাৎ কোন্‌টী কর্ম্ম বা কর্ত্তব্যবিষয় এবং কোন্‌টী অকর্ম্ম বা অকর্ত্তব্যবিষয়, ইহা নির্দ্ধারণে পণ্ডিতগণও সন্দিগ্ধচিত্ত বা 'কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়' হইয়া থাকেন; সুতরাং জীবনের প্রত্যেক ব্যাপারে কর্ত্তব্য-নির্দ্ধারণ নিতান্ত সহজ নহে। জীবনের বহুবিধ গুরুতর ব্যাপারের বিষয় পরিত্যাগ করিয়া, আমরা দিন দিন সামান্য সামান্য ব্যাপারেও কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য-বিষয় আলোচনায় বিষম সমস্যায় পতিত হই। অনেক সময় দিশাহারা হইয়া ব্যাকুলভাবে যখন পণ্ডিতগণের উপদেশ অনুসরণ করিতে প্রবৃত্ত হই, তখন আবার ভিন্ন ভিন্ন পণ্ডিতের ভিন্ন ভিন্ন মত আসিয়া আমাদিগকে আরও ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলে। যাগ, যজ্ঞ, পূজা, হোমাদি সকলই করিতেছি, কিন্তু চিত্তের সংশয় যায় না। মন্ত্রজপ, সন্ধ্যা, বন্দনা, প্রাণায়ামাদি করিতেছি, কিন্তু নিবিষ্টচিত্তে আমাকে আমি জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিলে উত্তর পাইব—আমার চিত্তের সংশয় বিনষ্ট হয় নাই। দিগ্নির্ণয়-যন্ত্র না থাকায়, ভবার্ণবে আমাদের জীবনতরীকে এদিক—ওদিক—চারিদিক পরিচালিত করিয়া বেড়াইতেছি, কিন্তু গন্তব্যস্থানের দিকে অগ্রসর হইতে পারিতেছি না। এইরূপে পুনঃ পুনঃ বিড়ম্বিত হইয়া মানব কোন একদিক লক্ষ্য করিয়া জীবনতরী সেই দিকেই লইতে থাকে এবং ভাগ্যবশে হয়ত গন্তব্যস্থানে পৌঁছে বা না পৌঁছে। কিন্তু দিগ্নির্ণয়-যন্ত্র থাকিলে তাহার এরূপ দুর্দ্দশাপ্রাপ্ত হইতে হয় না। মানব যখন স্বর্ণাদি মূল্যবান্ ধাতু ক্রয় করে, তখন যেমন নিকষ-পাষাণের দ্বারা উহা পরীক্ষা করিয়া লয়, তেমনই মানব-জীবনের কর্ত্তব্য-সিদ্ধান্ত পরীক্ষার জন্য এরূপ কোন নিকষ-পাষাণ কি নাই? এই ভবার্ণবে আমাদের জীবনতরী পরিচালন করিবার কোন দিগ্নির্ণয়-যন্ত্র কি নাই? সুবিজ্ঞ পাঠক! চিন্তা করিয়া দেখুন, আমাদের কর্ত্তব্য-পরীক্ষার নিকষ-পাষাণ কি? জীবনতরী পরিচালনের জন্য দিগ্নির্ণয়-যন্ত্র কি?

কতকগুলি কর্ত্তব্যের বর্ণনা করিয়া, তদ্বিষয়ক উপদেশ দিলে, সাধারণ কর্ত্তব্যাবধারণ হয় না, কারণ দেশ-কাল-পাত্রভেদে সাধারণ কর্ত্তব্যের অনেক ইতরবিশেষ হইয়া থাকে। একটী শিশুকে দুইটী দ্রব্য দুইভাগ করিতে বলিলে, উহা সে অনায়াসে দুইভাগ করিয়া দিবে, কিন্তু ভাগের মূলতত্ত্ব অবগত না থাকায়, বহুসংখ্যক দ্রব্যকে দুইভাগ করিতে বলিলে, সে উহা

পারিবে না। যদি কোন শিক্ষক ভাগের মূলতত্ত্ব বালককে শিক্ষা না দিয়া, ভিন্ন ভিন্ন সংখ্যাকে ভিন্ন ভিন্ন সংখ্যাদ্বারা বিভাগ করিলে যাহা যাহা হয়, তাহাই তাহার দ্বারা কণ্ঠস্থ করান, তাহাহইলে সে উপদেশ অনর্থক হইবে। যে নীতিশাস্ত্রে ঐরূপ মনুষ্যের কর্ত্তব্যের মূলমন্ত্র ব্যাখ্যা না করিয়া, মনুষ্যের ভিন্ন ভিন্ন কর্ত্তব্যের বর্ণনা মাত্র করেন, সে নীতিশাস্ত্রও বিশেষ ফলপ্রদ হয় না।

আর্য্য-ঋষিরা কেবল মানবের কতকগুলি কর্ত্তব্য বর্ণনা করিয়াই নিরস্ত হন নাই, তাঁহারা মানবজীবনের কর্ত্তব্যের মূলমন্ত্র ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন। আমিত্বের প্রসারই সর্ব্বকর্ত্তব্যাবধারণে সেই ঋষিহৃদয়-প্রসূত মূলমন্ত্র। যখন আমিত্বের সম্পূর্ণ প্রসার হয়, তখন আত্মায় সর্ব্বভূত-দর্শন এবং সর্ব্বভূতে আত্মদর্শন হয় এবং তখনই মানব ব্রহ্মত্বপ্রাপ্ত হয়। নিকৃষ্ট চণ্ডাল হইতে প্রকৃষ্ট ব্রাহ্মণপর্য্যন্ত, নবীন ব্রহ্মচারী হইতে স্থবির ভিক্ষুপর্য্যন্ত, সকলের জীবনের সকল অবস্থাতেই কর্ত্তব্যের মূলতত্ত্ব আমিত্বের প্রসার। ভাগের সাধারণ নিয়ম যেরূপ সর্ব্বপ্রকার ভাগেই প্রযোজ্য, কর্ত্তব্যের এই মূলতত্ত্বও সর্ব্ববিধ কর্ত্তব্যেই প্রযোজ্য। পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিকাদি ভিন্ন ভিন্ন ব্যাপারে এই মূলতত্ত্বের দ্বারা কর্ত্তব্যাবধারণ করিলে, কাহারও জীবন দুঃখময় হইবেনা, কর্ত্তব্যাবধারণে কাহারও সংশয়চিত্ত হইতে হইবে না। এ তত্ত্ব অতি সহজ ও সুগম। এ নিকষ-পাষাণে কর্ত্তব্যের রেখা অতি সুস্পষ্ট প্রতিভাত হইবে। এ দিগ্বিনির্ণয়-যন্ত্র কখনও তোমাকে বিদিকে লইয়া যাইবে না। তোমার জ্ঞানানুসারে সকল কার্য্যেই তোমাকে কর্ত্তব্যের বিষয়ীভূত কর, তোমার আমিত্ব তোমার কর্ত্তব্যের বিষয়ীভূত আমিত্ব পর্য্যন্ত প্রসারিত কর, তাহাহইলেই তোমার কর্ত্তব্য কি, তাহা বুঝিতে পারিবে। তুমি তোমার সর্ব্ব-অবস্থাতেই নিজের "আমির" প্রতি সত্য সত্য যেরূপ ব্যবহার করিতে ইচ্ছা কর, তদ্রূপ ব্যবহার অপরের "আমির" প্রতিও কর, তাহাহইলেই তোমার কোন গণ্ডগোলে পতিত হইতে হইবে না।

জ্ঞানী-অজ্ঞানী-নির্ব্বিশেষে জীবনের প্রত্যেক কর্ত্তব্য অবধারণের পথে আমিত্বের প্রসারই সাধারণ আলোক-বর্ত্তিকা; কিন্তু এই আমিত্বের প্রসারজনিত কর্ত্তব্য-সিদ্ধান্ত অবশ্য কর্ত্তার জ্ঞানাধিকারের অনুপাত-ভেদে উৎকৃষ্ট-অপকৃষ্ট হইবে, সন্দেহ নাই; তবে কি না, সাধনার একজাতীয়তায় স্বার্থ-ত্যাগ ও পরার্থ-অনুরাগ দ্বারা আত্মপ্রসার বা আত্মোন্নতির অবশ্য-অবলম্বনীয় পথ সকলেরই ন্যূনাধিকরূপে পরিস্কৃত হইবে। অধিকার-ভেদে কর্ত্তব্য-সিদ্ধান্তের বিশুদ্ধতা পক্ষে আকাশ-পাতাল ভেদ হইলেও একমাত্র আমিত্বের প্রসারই সর্ব্বাধিকারীর ধর্ম্মলাভের সাধারণ সাধন বটে।

এইরূপ সর্ব্ববিষয়েই আপনাকে কর্ত্তব্যের বিষয়ীভূত পাত্রের স্থানে স্থাপিত করিয়া কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। গৃহস্থাশ্রমেই সর্ব্বপ্রকার কর্ত্তব্য-সম্পাদনের সুবিস্তৃত সুযোগ-পাওয়া যায়, এইজন্যই ঋষিগণ মানবজীবনের বিকাশের জন্য ব্রহ্মচর্য্যান্তে গৃহস্থাশ্রমের ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই আশ্রমেই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, সকলপ্রকার অধিকারী ব্যক্তিই স্বীয় স্বীয় কর্ত্তব্য-সম্পাদনদ্বারা আমিত্বের প্রসার করিতে পারে। এই আশ্রমেই নিম্ন-অধিকারীরা উচ্চ-অধিকারীদিগের সংস্রবে আসিয়া, আপনাদের "আমিত্বের প্রসারের" সহিত তাহাদের "আমিত্বের প্রসার" তুলনা করিয়া, আপনাদিগকে উর্দ্ধদিকে লইতে সমর্থ হয়। এই

স্থানেই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, পিতা-পুত্র, পতি-পত্নী, ভ্রাতা-ভগ্নী, প্রভু-ভৃত্য, মিত্র-মিত্র প্রভৃতি পরস্পরের সংস্রবে আসিয়া সর্ব্ববিষয়ে আপনাদিগের আমিত্বের প্রসার করিতে সক্ষম হয়। অতএব হে মানব! তুমি যদি তোমার নিজের ও জগতের মঙ্গলকামনা কর, তাহাহইলে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে আমিত্বেরপ্রসার-শিক্ষায় জ্ঞান-তপস্যা সাধন করিয়া, গৃহস্থাশ্রমেও আমিত্বের প্রসাররূপ মূলমন্ত্র দ্বারা পরিচালিত হইয়া, কর্ম্ম-তপস্যা দ্বারা ঐ জ্ঞানের পরিপাক বা পরিণতি-লাভে জীবন কৃতার্থ কর।

(কস্যচিদ্‌পরিব্রাজকস্য)

চিত্তানুশাসনম্।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

কৌমারাদাচরেৎ প্রাজ্ঞো ধর্ম্মান্ ভাগবতানিহ।
দুর্ল্লভং মানুষং জন্ম তদপ্যধ্রুবমর্থদং॥ ১॥

(প্রহ্লাদ দৈত্যবালকগণকে উপদেশ দিয়াছিলেন, হে দৈত্যবালকগণ!) প্রাজ্ঞ ব্যক্তি কুমার-অবস্থাতেই ভাগবতধর্ম্ম আচরণ করিবে,

"কৌমার" অর্থাৎ কুমারাবস্থা, কারণ কুমারাবস্থাতেই যদি মৃত্যু হয়, কে বলিতে পারে? তজ্জন্যই কহিয়াছেন যে—

"যুবৈব ধর্ম্মশীলঃ স্যাৎ সত্যধর্ম্মপরায়ণঃ।
কো হি জানাতি কস্যাদ্য মৃত্যুরেব ভবিষ্যতি॥"

মনুষ্যের দৈহিক অসারতা চিরপ্রসিদ্ধ—

"মানুষ্যে কদলীস্তম্ভে নিঃসারে সারমার্গণং।
যঃ করোতি স সম্মূঢ়ো জলবুদ্বুদসন্নিভে॥"

মহামহোপাধ্যায় রঘুনন্দনপ্রণীত স্মৃতৌ শুদ্ধিতত্ত্বে শোকাপনোদনাদি প্রকরণে যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতিধৃতবচনং

এইরূপ কদলীস্তম্ভের ন্যায় অসার দেহের পরিণাম দর্শন করিয়া যদি মনুষ্য কুমারাবস্থায়ই ধর্ম্ম আচরণ করেন, তাহাহইলে তিনি প্রাজ্ঞ; সুতরাং "প্রাজ্ঞ"শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে।

"ভাগবত ধর্ম্ম" অর্থাৎ শ্রবণ কীর্ত্তনাদি,—যথা—

"শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনং।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনং॥
ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা।"

(শ্রীমদ্ভাগবতে ৭ স্কন্ধে ৫ অ, ১৯)

প্রহ্লাদ কহিয়াছিলেন, পিতঃ! বিষ্ণুর বিষয় শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পাদসেবা, অর্চ্চনা, বন্দনা, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন, এই নববিধ ভক্তি যদি বিষ্ণুতে অর্পিত হয়, (তাহাহইলে তাহাই উত্তম পাঠ)।

এই নববিধ ভক্তিতে কে কোন্ বিষয়ে অনুরক্ত, তাহাই উক্ত হইতেছে।—

শ্রীবিষ্ণোঃ শ্রবণে পরীক্ষিদভবদ্বৈয়াসকিঃ কীর্ত্তনে
প্রহ্লাদঃ স্মরণে তদঙ্ঘ্রিভজনে লক্ষ্মীঃ পৃথুঃ পূজনে।
অক্রূরস্ত্বভিবন্দনে কপিপতির্দাস্যেঽথ সখ্যেঽর্জ্জুনঃ
সর্ব্বস্বাত্মনিবেদনে বলিরভূৎ কৃষ্ণাপ্তিরেষাং পরং॥

শ্রীরূপগোস্বামি-সংগৃহীত পদ্যাবল্যাং।

শ্রীবিষ্ণুর লীলাশ্রবণে পরীক্ষিৎ, কীর্ত্তনে শুকদেব, স্মরণে প্রহ্লাদ, পদ ভজনায় লক্ষ্মী, পূজায় পৃথু, বন্দনায় অক্রূর, দাস্যে হনুমান্, সখ্যে অর্জ্জুন ও সর্ব্বস্ব-নিবেদনে বলি (সিদ্ধ) হইয়াছিলেন। এই নববিধ ভক্তির একমাত্রেই শ্রীকৃষ্ণ-প্রাপ্তি হইয়া থাকে।

"দুর্লভ" কারণ চতুরশীতিলক্ষ জন্মলাভের পর মনুষ্য-জন্মলাভ হইয়া থাকে, যথা—

"প্রাপ্যাপি দুর্লভতরং মানুষ্যং বিবুধেপ্সিতং।
যৈরাশ্রিতো ন গোবিন্দস্তৈরাত্মা বঞ্চিতশ্চিরং॥
অশীতিং চতুরশ্চৈব লক্ষাংস্তান্ জীবজাতিষু।
ভ্রমদ্ভিঃ পুরুষৈঃ প্রাপ্যং মানুষ্যং জন্মপর্য্যয়াৎ॥
তদপ্যফলতাং জাতং তেষামাত্মাভিমানিনাং।
বরাকাণামনাশ্রিত্য গোবিন্দচরণদ্বয়ং॥"

ক্রমসন্দর্ভধৃত ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণবচনং॥

যেহেতু মনুষ্যজন্ম দুর্লভ, উহা অর্থদ, কিন্তু অনিশ্চিত ॥ ১ ॥

যথা হি পুরুষস্যেহ বিষ্ণোঃ পাদোপসর্পণং।
যদেষ সর্ব্বভূতানাং প্রিয় আত্মেশ্বরঃ সুহৃৎ ॥ ২ ॥

এই জন্যে পুরুষের বিষ্ণুর পাদসেবাই কর্ত্তব্য, যেহেতু তিনি সর্ব্বজীবের প্রিয়, আত্মা, ঈশ্বর ও সুহৃৎ ॥ ২ ॥

"বিবুধেপ্সিত" দুর্লভতর মনুষ্য দেহ লাভ করিয়া যে ব্যক্তি গোবিন্দ আশ্রয় না করে, সে আত্মাকে বঞ্চিত করে। জীবজাতিতে ৮৪ লক্ষবার ভ্রমণ করিয়া জন্ম-পর্য্যায় ক্রমে মনুষ্যদেহ প্রাপ্ত হয়। যে মূর্খ আত্মাভিমানী হইয়া গোবিন্দ-পদদ্বয় আশ্রয় না করে, তাহার সেই দুর্লভ জন্ম বিফলে যায়।

দুর্লভের আরও কারণ—

লব্ধা সুদুর্লভমিদং বহুসম্ভবান্তে
মানুষ্যমর্থদমনিত্যমপীহধীরঃ।
তূর্ণং যতেতনপতেদনুমৃত্যু যাব-
ন্নিঃশ্রেয়সায় বিষয়ঃ খলু সর্ব্বতঃ স্যাৎ ॥
১১ স্কন্ধে ৯ অ, ২৯।

[ইহার বঙ্গানুবাদ হিন্দুপত্রিকা তৃতীয়বর্ষের শেষ-সংখ্যার ১৯৮ পৃষ্ঠার প্রথম স্তম্ভে, আরও শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কন্ধে ৫১ অধ্যায়ে ২৮ শ্লোকে]

লব্ধা জনোদুর্লভমত্র মানুষং
কথঞ্চিদব্যঙ্গমযত্নতোঽনঘ।
পাদারবিন্দং ন ভজত্যসন্মতি
র্গৃহান্ধকূপে পতিতো যথা পশুঃ ॥

মুচুকুন্দ শ্রীকৃষ্ণকে কহিয়াছিলেন হে অনঘ! মনুষ্য বিনাযত্নে অবিকলাঙ্গ দুর্লভ মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়াও অসন্মতি (অসৎ—অর্থাৎ বিষয়-সুখে মতি) হইয়া যদি তোমার পদারবিন্দ না ভজনা করে, তাহাহইলে সে পশুর ন্যায় গৃহান্ধকূপে পতিত থাকে।

"অধ্রুবং" কারণ অদ্য বর্ত্তমানত্বেঽপি তস্য শ্বঃ স্থিতৌ নিশ্চয়াভাবাৎ—অদ্য বর্ত্তমান থাকিলেও কল্য থাকিবার নিশ্চয়তা নাই।

"অর্থদ" কারণ ভক্তিমান ব্যক্তি মুহূর্ত্তমাত্রও শ্রীকৃষ্ণের চিন্তা করিলে অভীষ্টসিদ্ধি লাভ করিয়া থাকেন।

তজ্জন্যই কহিয়াছেন যে—

সাহানিস্তন্মহচ্ছিদ্রং সাচান্ধ্যজড়মূকতা।
যন্মুহূর্ত্তঃ ক্ষণং বাপি বাসুদেবো ন চিন্ত্যতে।

গরুড়পুরাণে পূর্ব্বার্দ্ধে ২৩৪ অধ্যায়ে ও স্কন্দ পুরাণীয় কার্ত্তিকমাহাত্ম্যধৃতবচনং।

হে মুহূর্ত্তে বা যে ক্ষণে শ্রীকৃষ্ণ চিন্তা না করা যায়, তাহা হানি, তাহা মহচ্ছিদ্র, তাহা অন্ধতা, তাহা জড়তা, তাহা মূকতা।

"পাদোপসর্পণং"—পাদয়োরুপসমীপে সর্পণং প্রাপ্তিঃ—পদের নিকট গমন—অর্থাৎ পাদসেবা। শ্রীকৃষ্ণের পদ-সেবা কর্ত্তব্য। নন্দাদি গোপগণ উদ্ধব-সন্নিধানে শ্রীকৃষ্ণ-উদ্দেশে কহিয়াছিলেন,—

মনসো বৃত্তয়ো নঃ স্যুঃ কৃষ্ণপাদাম্বুজাশ্রয়াঃ।
বাচোঽভিধায়িনীর্নাম্নাং কায়স্তৎ প্রহ্বণাদিষু ॥
শ্রীভাগবতে ১০ম স্কন্ধে ৪৭ অঃ ৫৮।

আমাদের মনের বৃত্তি সকল যেন কৃষ্ণপাদাম্বুজাশ্রিত হয়; আমাদের বাক্য যেন তাঁহার নাম কীর্ত্তন ও আমাদের শরীর যেন তাঁহার প্রণামাদিতে রত হয়।

এ বিষয়ে পূজ্যপাদ শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাশয়ও শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে মধ্যলীলার ২য় পরিচ্ছেদে কহিয়াছেন যে—

কৃষ্ণের মধুর বাণী, অমৃতের তরঙ্গিনী,
তার প্রবেশ নাহি যে শ্রবণে।
কাণাকড়ি-ছিদ্র সম জানিহ সেই শ্রবণ,
তার জন্ম হৈল অকারণে।
মৃগমদনীলোৎপল মিলনে যে পরিমল
যেই হরে তার গর্ব্ব মান।
হেন কৃষ্ণ-অঙ্গগন্ধ যার নাহি সে সম্বন্ধ,
সেই নাসা ভস্ত্রের সমান।
কৃষ্ণের অধরামৃত কৃষ্ণগুণ সুচরিত
সুধাসার স্বাদুবিনিন্দন।
তার স্বাদু যে না জানে, জন্মিয়া না মৈল কেনে,
সে রসনা ভেকজিহ্বা সম।
কৃষ্ণ-কর্ম-পদতল কোটিচন্দ্র-সুশীতল,
তার স্পর্শ যেন স্পর্শমণি।
তার স্পর্শ নাহি যার, যাউ সেই ছারখার,
সেই বপু লৌহসম জানি।

"প্রিয় আত্মেশ্বরঃ সুহৃৎ" অর্থাৎ কান্তভাব, শান্তি-রতিভাব, বাৎসল্যভাব, সখ্যভাব প্রভৃতি যে ভাবে

পাইতে ইচ্ছা করে, তিনি তার সেই ভাবেই প্রাপ্য; এ বিষয়ে গীতাতেও বলিয়াছেন—

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।

৪ অধ্যায়ে ১১ ॥

যে যেরূপে আমাকে ভজনা করে, আমি তাহাকে সেইরূপেই অনুগ্রহ করি। এ বিষয়ে শ্রীভাগবতে ৭ম স্কন্ধে ১অ ২৯ শ্লোকে—

গোপ্যঃ কামাৎ ভয়াৎ কংসো দ্বেষাচ্চৈদ্যাদয়োনৃপাঃ।
সম্বন্ধাদ্বৃষ্ণয়ঃ স্নেহাদ্ যূয়ং ভক্ত্যা বয়ং বিভো ॥

শ্রীনারদ যুধিষ্ঠিরকে কহিয়াছিলেন—হে বিভো! কাম হইতে গোপাঙ্গনাগণ, ভয় হইতে কংস, বিদ্বেষ হইতে শিশুপালাদি নৃপগণ, সম্বন্ধবশতঃ বৃষ্ণিগণ, স্নেহবশতঃ তোমরা ও ভক্তিবশতঃ আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। এইক্ষণ জিজ্ঞাস্য এই হইতে পারে যে, কৃষ্ণ স্ত্রীলোকের সহিত এ লীলা কেন করিয়াছিলেন? এ লীলা সমীচীন নহে। তাঁহাদিগের সন্দেহ জন্য কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

আমরা কৃষ্ণলীলাকে গল্প বিবেচনা করিনা, কেবল তজ্জন্য আধ্যাত্মিক ক্লিষ্টার্থে বুঝাইতে চেষ্টা করিব না। আমরা মানি শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণঅবতার ছিলেন। কংসাদি পীড়িত-ভূভার-হরণে দেবতাদিগের প্রার্থনায় বসুদেব-গৃহে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন—

বসুদেবগৃহে সাক্ষাৎ ভগবান্ পুরুষঃ পরঃ।
জনিষ্যতে তৎ প্রিয়ার্থং সম্ভবন্ত্বমরস্ত্রিয়ঃ ॥

শ্রীভাগবতে ৭ম স্কন্ধ, ১ অ, ১৭।

ব্রহ্মা দেবতাগণকে কহিয়াছিলেন—হে অমরগণ! বসুদেবগৃহে পরমপুরুষ সাক্ষাৎ ভগবান্ জন্মগ্রহণ করিবেন এবং তাঁহার প্রিয়ার্থে অমরস্ত্রীগণ জন্মগ্রহণ করিবেন। এই অমরস্ত্রীগণ ব্রজের গোপিনী যথা—

নিত্যপ্রিয়াণামংশাস্তু যা জাতা দেবযোনয়ঃ।
তাভিং নলীনামেবাসাং প্রিয়সখ্যোঽভবন্ ব্রজে ॥

উজ্জ্বল নীলমণেঃ কৃষ্ণবল্লভ প্রকরণে।

নিত্য প্রিয়জনের অংশ—যাঁহারা দেবযোনি হইয়াছিলেন, তাঁহাদের অংশ সকল ব্রজে প্রিয়সখীরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; কারণ নিত্য-সিদ্ধপুরুষ ও স্ত্রী কখনও শ্রীকৃষ্ণকে ত্যাগ করিয়া থাকিতে পারেন না; সুতরাং ঐরূপ লীলাকে রূপক বলিলে আমরা মর্মাহত হই। তাহাহইলে যেন পৃথিবীর সমুদয় সুখ-হারা হই, এরূপ বিবেচনা হইয়া থাকে। সুতরাং আমাদিগের যেরূপ বিশ্বাস, বর্ণনা করিব। ভগবান্ ব্যাসদেবের বাক্য বিশ্বাস না করা আয়ত্তাধীন বটে।

"অলৌকিক লীলা এই পরম নিগূঢ়।
বিশ্বাসে পাইয়ে তর্কে হয় অতি দূর ॥"

ব্রজলীলার তুল্য উৎকৃষ্ট লীলা আর নাই। ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট রস আর নাই।

ব্রজলীলায়——

"পঞ্চবিধ রস শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য।
মধুররস শৃঙ্গার নাম সবাতে প্রাবল্য ॥"

ঐ ২৩ পরিচ্ছেদ।

শ্রীকৃষ্ণ লীলাবশতঃ মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার দেহ ত্বগসৃক্‌মাংসমেদাস্থিমজ্জা-শুক্র-নির্ম্মিত সপ্তধাতুময় নহে; উহা চিন্ময়!

ভগবানপি বিশ্বাত্মা ভক্তানামভয়প্রদঃ।
আবিবেশাংশভাগেন মন আনকদুন্দুভেঃ ॥

শ্রীভাগবতে ১০ স্কন্ধে ২ অঃ ১১।

ইহার শ্রীধরস্বামী এইরূপ টীকা করেন—

"মন আবিবেশ মনস্যাবির্বভূব জীবানামিব ন তস্য ধাতুসম্বন্ধঃ।"

বিশ্বাত্মা ভক্তদিগের অভয়প্রদ ভগবান্ অংশের সহিত—অর্থাৎ পুরুষাদি অবতারবৃন্দের সহিত ও ভাগের সহিত—অর্থাৎ ষড়ৈশ্বর্য্যের সহিত বসুদেবের মনে আবির্ভূত হইলেন; জীবগণের ন্যায় তাঁহার ধাতুসম্বন্ধ ছিল না।

এই দেহ যে কি, যখন আমরা ধারণা করিতে পারি না, তখন তাঁহার লীলার বিষয়ে বৃথা তর্ক করা কি আমাদের মূর্খতা নহে?

মহর্ষি দ্বৈপায়ন—যিনি বেদবিভাগ, বেদান্তদর্শন, মহাভারত, অষ্টাদশপুরাণপ্রভৃতি রচনা করিলেন, যিনি সপ্তদশ অবতার বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন, যিনি ভবিষ্যপুরাণের প্রতিসর্গ-পর্ব্বে—৪ খণ্ডে শ্রীকৃষ্ণ, চৈতন্যাবতার, শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি মহাত্মাদিগের বিষয় ও অন্যান্য ভবিষ্যৎবর্ণনা করিয়াছেন, যিনি কলিকালে কিরূপ প্রকৃতির লোক হইবে, বর্ণন করিলেন—

ততশ্চানুদিনং ধর্ম্মঃ সত্যং শৌচং ক্ষমাদয়া।
কালেন বলিনা রাজন্নঙ্ক্ষ্যত্যায়ুর্বলং স্মৃতিঃ ॥

বিত্তমেব কলৌ নৃণাং জন্মাচার গুণোদয়ঃ।
ধর্ম্মন্যায়ব্যবস্থায়াং কারণং বলমেবহি॥

+ × × ×

শ্রীভাগবতে ১২ স্কন্ধে ২ অ,

শুকদেব কহিলেন হে রাজন্! অনন্তর বলবান্ কালদ্বারা প্রতিদিন ধর্ম্ম, সত্য, শৌচ, ক্ষমা, দয়া, আয়ু, বল ও স্মৃতি হ্রাস হইবে।

কলিকালে মনুষ্যদিগের জন্ম, আচার, গুণাদি সমস্তই কেবল ধনের উপর নির্ভর করিবে ও ধর্ম্ম ও ন্যায়ের ব্যবস্থাতে কেবল বলমাত্র কারণ হইবে; ইত্যাদি।

অন্যত্র—

অনাবৃষ্টি ভয়প্রায়াঃ প্রজাঃ ক্ষুদ্ভয়কাতরাঃ।
ভবিষ্যন্তি তদা সর্ব্বা গগণাশক্তদৃষ্টয়ঃ॥ ২০॥

× + +

বেদমার্গে প্রলীনে চ পাষণ্ডাঢ্যে ততো জনে।
অধর্ম্ম বৃদ্ধ্যা লোকানাং স্বল্পমায়ুর্ভবিষ্যতি॥ ৩৯॥

× + +

বিষ্ণুপুরাণে ৬ অংশে ১ অ,

পরাশর মৈত্রেয়কে কহিলেন—কলিকালে প্রজা সকল অনাবৃষ্টি-ভয়যুক্ত ও ক্ষুধার ভয়ে কাতর হইবে ও সেই সময়ে গগণের প্রতি আসক্ত-দৃষ্টি হইবে।

বেদমার্গ লোপ হইলে, লোক সকল পাষণ্ড হইবে ও লোকের অধর্ম্ম বৃদ্ধি হইবে ও স্বল্পআয়ু হইবে।

অন্যত্র,—

একাদশী বিহীনাশ্চ সর্ব্বে ধর্ম্ম-বিবর্জ্জিতাঃ।
হরিপ্রসঙ্গবিমুখাঃ ভবিষ্যন্তি ততঃপরং॥ ১৭॥

+ + +

ম্লেচ্ছশাস্ত্রং পঠিষ্যন্তি স্বশাস্ত্রাণিবিহায় চ॥

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে প্রকৃতি খণ্ডে।

সর্ব্বৈঃ সার্দ্ধং সর্ব্বেষাং ভোজনং নিয়মচ্যুতং।
অভক্ষ্য ভক্ষ্যা লোকাশ্চ চতুর্ব্বর্ণাশ্চ লম্পটাঃ॥
সর্ব্বে স্বচ্ছন্দনিরতাঃ শিশ্নোদরপরায়ণাঃ।
দেবাবতার হীনঞ্চ জগৎ সর্ব্বং ভয়াকুলং॥

ঐ শ্রীকৃষ্ণ জন্মখণ্ডে।

সকলে একাদশী বিহীন ও সর্ব্বধর্ম্মবিবর্জ্জিত হইবে ও হরিপ্রসঙ্গ-বিমুখ হইবে।

নিজ শাস্ত্র ত্যাগ করিয়া ম্লেচ্ছশাস্ত্র পাঠ করিবে। সকলের সঙ্গে নিয়মচ্যুত-ভোজন হইবে। সমুদায় লোক অভক্ষ্য-ভক্ষক হইবে ও চতুর্ব্বর্ণ লম্পট হইবে। সকলে স্বেচ্ছাচারী ও শিশ্নোদরপরায়ণ হইবে সমুদায় জগৎ ভয়াকুল ও দেবাবতারহীন হইবে ইত্যাদি কলিকালের অনেক ভবিষ্যৎ বার্ত্তা কহিয়াছিলেন, তাঁহার সামান্য বুদ্ধিতে কি এভাব প্রবেশ করে নাই যে, এরূপ বর্ণনা করিলে, লোকে শ্রীকৃষ্ণচরিত্রে অশ্রদ্ধা করিবে? তিনি জানিতেন, তজ্জন্য পরীক্ষিতের মুখে কহিয়াছেন যে,—

সংস্থাপনায় ধর্ম্মস্য প্রশমায়েতরস্য চ।
অবতীর্ণো হি ভগবানংশেন জগদীশ্বরঃ॥
সকথং ধর্ম্মসেতূনাং বক্তা কর্ত্তাভিরক্ষিতা।
প্রতীপমাচরদ্ ব্রহ্মন্ পরদারাভিমর্ষণং॥ ২৭॥
আপ্তকামো যদুপতিঃ কৃতবান্ বৈ জুগুপ্সিতং।
কিমভিপ্রায় এতন্নঃ সংশয়ং ছিন্ধি সুব্রত॥ ২৮॥

শ্রীভাগবতে ১০ম স্কন্ধ, ৩৩ অঃ।

হে ব্রহ্মন্! ধর্ম্মসংস্থাপন ও অধর্ম্ম-শান্তির জন্য ভগবান্ জগদীশ্বর অংশ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি ধর্ম্মমর্য্যাদার বক্তা, কর্ত্তা ও রক্ষয়িতা হইয়া, কি প্রকারে পরদারাভিমর্ষণরূপ বিপরীত কার্য্য করিলেন? যদুপতি আপ্তকামী হইয়া কিপ্রকারে এরূপ নিন্দনীয় কার্য্য করিলেন? ইহার অভিপ্রায় কি? হে সুব্রত! আমাদিগের এই সংশয় ছেদন করুন। তদুত্তরে শ্রীশুকদেব উত্তর দিয়াছিলেন,—

তিনি আপ্তকাম ছিলেন, গোপাঙ্গনাগণের সহিত লীলাতে তাঁহার কোন কামের লেশ ছিল না, কারণ—

"সিষেব আত্মন্যবরুদ্ধসৌরতঃ।"

১০ম স্কন্ধ, ৩৩ অধ্যায়, ২৬।

ইহাতে শ্রীধরস্বামী কহেন—

"এবমপ্যাত্মন্যেব অবরুদ্ধঃ সৌরতঃ চরমধাতুঃ ন তু স্খলিতো যস্যেতি কামজয়োক্তিঃ"।

আত্মাতে অবরুদ্ধ সৌরত—অর্থাৎ চরম ধাতু স্খলিত না হইয়া গোপাঙ্গনাদিগের সহিত রমণ করিতেন, ইহাতে কামজয়োক্তি হইল। বৃন্দাবন কৃষ্ণময় ছিল। বৎস, গাভী, গোপ ইত্যাদি যাহা ছিল, সমুদায়ই কৃষ্ণময়, কারণ যখন ব্রহ্মা গোবৎস হরণ করিয়াছিলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ—

যাবদ্বৎসপবৎসকাল্পকবপুর্যাবৎ করাঙ্ঘ্র্যাদিকং
যাবদ্ যষ্টিবিষাণবেণুদলশিগ্ যাবদ্বিভূষাম্বরং।

যাবচ্ছীলগুণাভিধাকৃতিবয়ো যাবদ্বিহারাদিকং
সর্ব্বং বিষ্ণুময়ং গিরোঙ্গবদজঃ সর্ব্বস্বরূপো বভৌ ॥১৯॥
১০ম স্কন্ধ, ১৩ অধ্যায়।

বৎস পালক ও বৎসগণের যেরূপ ক্ষুদ্র প্রমাণ শরীর, যেরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হস্তপদাদি, যেরূপ যষ্টি, যেরূপ শৃঙ্গ (শিঙ্গা বাদ্য) বেণুদল-শিক্য, যেরূপ ভূষণ ও বস্ত্র, যেরূপ স্বভাব, গুণ, নাম, আকৃতি, বয়স, যেরূপ বিহারাদি, তদ্রূপ হইয়া, সমুদয় জগৎ বিষ্ণুময়, এইযে প্রসিদ্ধ বাক্য, তাহার প্রত্যক্ষ প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

আরও আশ্চর্য্যের বিষয় যে, শ্রীকৃষ্ণ যৎকালে বৎস ও বৎসপালক হইয়াছিলেন, সে সময়ে উঁহাদের মাতৃগণের নিজ পুত্রাপেক্ষা কৃত্রিম পুত্রে অধিক স্নেহ হইয়াছিল।

গো-গোপীনাং মাতৃতাস্মিন্নাসীৎ স্নেহার্দ্ধিকাং বিনা।
পুরোবদাস্বপি হরে স্তোকতা মায়য়া বিনা ॥
ঐ ঐ ২২।

গো-গোপীদিগের শ্রীকৃষ্ণপ্রতি মাতৃভাব পূর্ব্বের ন্যায় ছিল, কিন্তু এক্ষণ স্নেহাধিক্য হইয়াছিল ও গো-গোপীতে শ্রীকৃষ্ণের পূর্ববৎ বাল্যভাব ছিল. কিন্তু মায়া ব্যতিরেকে ছিল "অর্থাৎ আমার এই মাতা" "আমি ইহার পুত্র" এক্ষণে এইরূপ অধিক মায়া হইল।০

যদি শ্রীকৃষ্ণ এরূপ বৎস ও বৎসপালক হইয়াছিলেন, তাহাহইলে তিনি কি গোপ ও গোপাঙ্গনা হইতে পারিতেন না? এই কল্পিত গোপাঙ্গনাকে গোপগণ নিজস্ত্রী মনে করিতেন। গোপগণ গোপাঙ্গনাগণের সহিত বিহার বিরত হইয়া সেই আপনাপন স্ত্রীগণকে নিজপার্শ্বস্থাই দৃষ্টি করিতেন, তজ্জন্য তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণে বিদ্বেষ করেন নাই, কারণ তাঁহারা মায়ায় মুগ্ধ হইয়া ছিলেন—

নাসূয়ন্ খলু কৃষ্ণায় মোহিতাস্তস্য মায়য়া।
মন্যমানাঃ স্বপার্শ্বস্থান্ স্বান্ স্বান্ দারান্ ব্রজৌকসঃ ॥৩৭॥
ঐ ঐ ৩৩ অ,

যোগমায়া নিজমায়া বিস্তার করিয়া গোপাঙ্গনাদিগকে গোপগণের নিকট থাকিতে দিতেন না; তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়কার্য্য জন্য যে ব্রজাঙ্গনারূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাই করিয়াছিলেন; তজ্জন্যই উক্ত হইয়াছে যে—

"ন যাতু ব্রজদেবীনাং পতিভিঃ সহ সঙ্গমঃ"
উজ্জ্বল নীলমণৌ-কৃষ্ণবল্লভা প্রকরণে।

ব্রজদেবীদিগের পতির সাহত সঙ্গম হয় নাই ইহাই মূল উদ্দেশ্য, তবে বাহ্যিক যে পরপুরুষ ও পরস্ত্রী বলিয়া বিবেচিত হইত, ইহাতে এইমাত্র বক্তব্য যে, যিনি ত্রিলোককে মায়ারূপ ইন্দ্রজাল বিস্তার করিয়া মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন, তাঁহার অকার্য্য কি কিছু আছে? যাহাকে আমি আমার স্ত্রী বলিতেছি, সে স্ত্রীর সহিত কি তিনি রমণ করেন না? তিনিত আত্মারাম, তিনি কোন্ জীবে বর্ত্তমান নাই, বুঝিতে পারি না। সেই মায়াময় হরির কার্য্য কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিলে, মন যে কি অসীম বিস্ময়-নীরে নিমগ্ন হয়, তাহা স্থির করা দুর্ঘট! সে সময় যেন আমরা সৃষ্টির বহির্ভূত জীব—সে সময় আমরা যেন আমাদের আমিত্ব-হারা হই!

গোপাঙ্গনাদিগের পরাভক্তি ছিল, তজ্জন্য তাঁহারা সাক্ষাৎ চিন্ময়দেহকে কান্ত বলিয়া আলিঙ্গন করিত। যাঁহাকে ব্রহ্মাদি দেবতাগণও ধ্যানে অনুধাবন করিতে পারেন না. সেই দেবদেবকে যদি ব্রজাঙ্গনাগণ সাক্ষাৎ আলিঙ্গন করেন, তাহাহইলে তাহা অপেক্ষা আর জীবনের সার্থকতা সাধনের অবশিষ্ট কি থাকিল? বরং রুক্মিণ্যাদি অপেক্ষা গোপাঙ্গনাদিগের ভক্তি অধিক, কারণ রুক্মিণী প্রভৃতির অন্যান্য স্থানে বিবাহ-প্রস্তাব হইয়াছিল, কিন্তু গোপাঙ্গনাগণ কুমারী অবস্থা হইতেই কেবল কৃষ্ণকে পাইবার জন্য বিশেষ তপস্যা করিয়াছিলেন।

কাত্যায়নি মহামায়ে মহাযোগিন্যধীশ্বরি।
নন্দগোপসুতং দেবি পতিং মে কুরু তে নমঃ ॥
১০ স্কন্ধ ২২ অধ্যায়।

যখন শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইবে, তখন লজ্জাদি পরিত্যাগ না করিতে পারিলে, তাঁহাকে কখনই পাওয়া যাইবে না;—কারণ,—

ঘৃণা লজ্জা ভয়ং মানং জুগুপ্সা চেতি পঞ্চমং।
কুলং শীলং তথা জাতিরষ্টৌপাশাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥

তজ্জন্য তাঁহাদিগের ভক্তি জানিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে বিবস্ত্রা হইতে কহিয়াছিলেন। অন্য কামোদ্দেশ্যে নহে, কারণ তিনি কহিয়া ছিলেন,—

নময্যাবেশিতধিয়াং কামঃ কামায় কল্পতে।
ভর্জ্জিতাঃ ক্বথিতাধানাঃ প্রায়ো বীজায় নেশতে ॥২৬॥
১০ স্ক, ২২ অ,

হে সুন্দরীগণ! যে ব্যক্তি আমাতে চিত্ত অর্পণ করে, তাহার কামনা বিষয়ভোগ জন্য কল্পিত হয় না, কারণ ধান্য ভর্জ্জিত ও কথিত হইলে, তাহাহইতে আর অঙ্কুরোৎপত্তি হয় না; সুতরাং যিনি অখিল সত্ত্বের অধীশ্বর, তাঁহার অকার্য্য কি হইল?

কুশলাচরিতেনৈষামিহ স্বার্থো ন বিদ্যতে।
বিপর্য্যয়েণবানর্থো নিরহঙ্কারিণাং প্রভো ॥ ৩২ ॥
কিমুতাখিলসত্ত্বানাং তির্য্যঙ্‌মর্ত্ত্য দিবৌকসাং।
ঈশিতুশ্চেশিতব্যানাং কুশলাকুশলান্বয়ঃ ॥ ৩৩ ॥
১০ স্ক, ৩৩ অ,

শুকদেব পরীক্ষিৎকে কহিলেন, হে প্রভো! নিরহঙ্কারী ব্যক্তির সৎকার্য্যদ্বারা কোন অর্থ হয় না ও অসৎ কর্ম্মদ্বারাও কোন অনর্থ সম্ভাবনা নাই।

যদি তাহা হইল, তবে যিনি অখিল জীবের ও তির্য্যক্ মনুষ্য-দেবতাদিগের ও অন্যান্য ঈশিতব্যের ঈশ্বর, তাঁহার আর কুশল-অকুশল সম্ভব কোথায়?

তিনি গোপীদিগের ও তৎপতিদিগের ও সকল দেহীর অন্তরে বিচরণ করেন; তিনি বুদ্ধ্যাদির সাক্ষী তিনি আমাদের ন্যায় শরীরধারী নহেন,—তিনি লীলার জন্য শরীর ধারণ করিয়াছিলেন।

গোপীনাং তৎপতীনাঞ্চ সর্ব্বেষামেব দেহিনাং।
যোঽন্তশ্চরতি সোঽধ্যক্ষ এব ক্রীড়ন দেহভাক্ ॥
১০ স্ক, ৩৩ অ,

ইহাতেও যদি দোষানুসন্ধান করি, তাহাহইলে আমরা পাপভাক্,—তজ্জন্য নিষেধও করিয়াছেন—

নৈতৎ সমাচরেজ্জাতু মনসাপিহ্যনীশ্বরঃ।
বিনশ্যত্যাচরন্ মৌঢ্যাৎ যথা রুদ্রোঽব্ধিজং বিষং।
১০ স্ক, ৩৩ অ,

অনীশ্বর—অর্থাৎ দেহাদিপরতন্ত্র মনেও একপ আচরণ করিবেন না। যদি মূঢ়তাবশতঃ আচরণ করে, তাহাহইলে নাশপ্রাপ্ত হয়, কারণ মহাদেব বিষ পান করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার মৃত্যু হয় নাই।

ব্রজাঙ্গনাদিগের মহাভাব দর্শন করিয়া উদ্ধবও আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া তাঁহাদিগের চরণরেণু-সেবী গুল্মলতা জন্ম প্রার্থনা করিয়াছিলেন—

আসামহো চরণরেণু জুষামহংস্যাং
বৃন্দাবনে কিমপি গুল্মলতৌষধীনাং।
যা দুস্ত্যজং স্বজনমার্য্যপথঞ্চ হিত্বা
ভেজুর্মুকুন্দপদবীং শ্রুতিভির্বিমৃগ্যাং ॥
১০ স্ক, ৪৭ অ, ৬১।

এই ব্রজাঙ্গনাগণের চরণরেণুসেবী বৃন্দাবনের কোন গুল্ম লতা-ওষধির মধ্যে হই, যেহেতু ইঁহারা দুস্ত্যজ স্বজন ও আর্য্যপথ পরিত্যাগ করিয়া শ্রুতির অন্বেষণীয় শ্রীকৃষ্ণের পদবী ভজনা করেন।

তজ্জন্য গোপীদিগের জীবনকে ধন্যবাদ দিয়াছিলেন—

এতাঃ পরং তনুভৃতো ভুবি গোপবধ্বো
গোবিন্দ এবমখিলাত্মনি রূঢ়ভাবাঃ।
বাঞ্ছন্তি যদ্ভবভিয়ো মুনয়ো বয়ঞ্চ
কিং ব্রহ্মজন্মভিরনন্তকথা-রসস্য ॥
১০ স্ক, ৪৭ অ, ৫৮।

এই গোপবধূদিগের জন্মই সফল, যেহেতু ইঁহারা অখিলাত্মা গোবিন্দে পরমপ্রেমবতী হইয়াছেন; যে প্রেমকে সংসার ভীরু মুনিগণ মুক্ত হইয়াও বাঞ্ছা করেন ও আমরাও ভক্ত হইয়াও বাঞ্ছা করি। যে ব্যক্তির শ্রীকৃষ্ণ কথারসে অনুরাগ আছে, তাঁহার ব্রাহ্মণকুলে জন্মের আবশ্যক কি?

ব্রজাঙ্গনাগণের শ্রীকৃষ্ণে রতির লাভ এই যে, তাঁহাদের অশেষ কর্ম্মক্ষয় হইয়া, তাঁহারা পাপপুণ্যরহিতা হইয়াছিলেন—

দুঃসহ প্রেষ্ঠবিরহতীব্রতাপধুতাশুভাঃ।
ধ্যানপ্রাপ্তাচ্যুতাশ্লেষ নির্বৃত্যা ক্ষীণমঙ্গলাঃ।
তমেব পরমাত্মানং জারবুদ্ধ্যাপি সঙ্গতাঃ।
জহুর্গুণময়ং দেহং সদ্যঃ প্রক্ষীণবন্ধনাঃ ॥
১০ স্ক ২৯ অ,

শুকদেব পরীক্ষিৎকে কহিলেন—হে রাজন্! দুঃসহ প্রিয় বিরহজন্য তীব্রতাপে গোপাঙ্গনাগণের সমুদায় অশুভ বিগত হইয়া গেল এবং ধ্যানযোগে শ্রীকৃষ্ণের আলিঙ্গনে সমুদায় পুণ্যও ক্ষয় হইয়া গেল। শ্রীকৃষ্ণকে যদিও গোপললনাকুল উপপতি ভাবিতেন, তথাপি ধ্যানযোগে পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হইয়া, তৎকালের সুখদুঃখের দ্বারা সমুদায় কর্ম্মক্ষয় হওয়াতে, কৃষ্ণগতচিত্ত হইয়া গুণময়—অর্থাৎ পাঞ্চভৌতিক দেহ পরিত্যাগ করিলেন। (কিন্তু চিন্ময়দেহে বর্ত্তমান থাকিলেন)।

ইহাতে পরীক্ষিৎ প্রশ্ন করিয়াছেন,—

কৃষ্ণং বিদুঃ পরং কান্তং ন তু ব্রহ্মতয়ামুনে।
গুণপ্রবাহো পরমস্তাসাং গুণধিয়াং কথং ॥

মুনে! গোপাঙ্গনাগণ শ্রীকৃষ্ণকে পরপুরুষ কান্ত বলিয়া জানিত,—ব্রহ্মজ্ঞান করিত না। গুণের প্রতি

তাঁহাদের চিত্ত আসক্ত ছিল, তাহাহইলে কি প্রকারে তাঁহাদের গুণ-প্রবাহের উপরতি হইয়া, কিরূপে ব্রহ্মপ্রাপ্তি হইল?

ইহাতে শুকদেব উত্তর দেন—

উক্তং পুরস্তাদেতত্তে চৈদ্যঃ সিদ্ধিং যথাগতঃ।
দ্বিষন্নপি হৃষীকেশং কিমুতাধোক্ষজপ্রিয়াঃ॥
কামং ক্রোধং ভয়ং স্নেহমৈক্যং সৌহৃদমেব চ।
নিত্যং হরৌ বিদধতো যান্তি তন্ময়তাং হিতে॥
ন চৈবং বিস্ময়ঃ কার্য্যো ভবতা ভগবত্যজে।
যোগেশ্বরেশ্বরে কৃষ্ণে যত এতদ্বিমুচ্যতে॥

ঐ ২৯ অধ্যায়ে।

হৃষীকেশকে বিদ্বেষ করিয়াও শিশুপাল যেরূপে মুক্ত হইয়াছিল, তাহার বিষয় পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে। যদি শত্রুরাও মুক্তিলাভ করে, তাহাহইলে যে তাঁহার প্রিয়জনও মুক্তিলাভ করিবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

শ্রীকৃষ্ণে কাম, ক্রোধ, ভয়, স্নেহ, সম্বন্ধ কিম্বা ভক্তি, যে কোন ভাবের আবেশেই তন্ময়তাপ্রাপ্তি হয়। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে ইহা বিস্ময় জ্ঞান করিবেন না,—কারণ তিনি যোগেশ্বরদিগেরও ঈশ্বর। সেই শ্রীকৃষ্ণ হইতে স্থাবরাদিও মুক্তিলাভ করে।

বিদ্বেষ করিয়াও শিশুপাল মুক্তিলাভ করিল।
বিদ্বেষাদপি গোবিন্দং দমঘোষাত্মজঃ স্মরন্।
শিশুপালো গতস্তত্ত্বং কিংপুনস্তৎপরায়ণঃ।

গরুড়পুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে ২৩৫ অধ্যায় ১৯।

তাহাহইলে গোপাঙ্গনাগণ কামাসক্তা হইয়া কেন মুক্তিলাভ করিবেন না?

এই লীলা ভক্তদিগের প্রতি অনুগ্রহজন্য মাত্র।

অনুগ্রহায় ভক্তানাং মানুষং দেহমাশ্রিতঃ।
ভজতে তাদৃশী ক্রীড়া যাং শ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ।"

শ্রীভাগবতে ১০ স্কন্ধ ৩৩ অ,

ভক্তের প্রতি অনুগ্রহজন্য মনুষ্যদেহ আশ্রয় করিয়া থাকেন ও তাদৃশী ক্রীড়া করিয়া থাকেন, যাহা শ্রবণ করিয়া মনুষ্য তৎপর হইবে।

শ্রীকৃষ্ণের তিনশক্তি—হ্লাদিনী, সন্ধিনী ও সম্বিৎ—।
হ্লাদিনী সন্ধিনী সম্বিৎ ত্বয্যেকা সর্ব্বসংশ্রয়ে।

বিষ্ণুপুরাণে ১ অংশে ১২ অধ্যায়ে

ধ্রুব কহিয়াছিলেন, হে ভগবন্! তুমি সকলের আধার; তোমাতে হ্লাদিনী, সন্ধিনী ও সম্বিৎ, এই তিন প্রকার শক্তি আছে।

হ্লাদিনী অর্থ আহ্লাদকরী, সন্ধিনী অর্থ উপকরী ও সম্বিৎ অর্থে বিদ্যাশক্তি। অর্থাৎ হ্লাদিনী অর্থে আনন্দ, সন্ধিনী অর্থে সৎ ও সম্বিৎ অর্থে চিৎ—সচ্চিদানন্দ।

এই হ্লাদিনীশক্তিই রাধা। ব্রজলীলায় এই হ্লাদিনীশক্তিই কার্য্যকর্ত্রী। ইহার ভাব অতি গূঢ়। ভক্ত ব্যতিরেকে অন্যে ইহার ভাব গ্রহণ করিতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলা নিত্য— অনুদিন ঐ লীলা হইয়া থাকে—

যথা প্রকটলীলায়াং পুরাণেষু প্রকীর্ত্তিতাঃ।
তথা তে নিত্যলীলায়াং সন্তি বৃন্দাবনে ভুবি॥ ৪॥
গমনাগমনে নিত্যং করোতি বনগোষ্ঠয়োঃ।
গোচারণং বয়স্যৈশ্চ বিনা সুরবিঘাতনং॥ ৫॥
পরকীয়াভিমানিন্যস্তথা তস্য প্রিয়াজনাঃ।
প্রচ্ছন্নেনৈব ভাবেন রময়ন্তি নিজপ্রিয়ম্॥ ৬॥

\+ \+ \+ \+ \+

পদ্মপুরাণে পাতালখণ্ডে—৮৩ অধ্যায়ে।

ভক্ত হইলেই এই লীলা প্রত্যক্ষ দেখিয়া কৃতার্থ হওয়া যায়, ইহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

(ক্রমশঃ)

শ্রীবিধুভূষণ দেব।

পদ্যানুবাদ-মালা।

(মহানির্ব্বাণতন্ত্রোক্ত গার্হস্থ্য ধর্ম্মনীতি। *

ব্রহ্মনিষ্ঠ-গৃহী হবে ব্রহ্মজ্ঞান-পরায়ণ।
করিবে স্বকৃতকর্ম্ম সব ব্রহ্মে সমর্পণ ॥ ১ ॥
না কহিবে মিথ্যা কথা, না লইবে শঠ-ব্রত।
দেবাতিথি-সেবাদিতে সদা গৃহী হবে রত ॥ ২ ॥
পিতা-মাতা সাক্ষাৎ ও প্রত্যক্ষ-দেবতা জেনে,
সেবিবে সর্ব্বতোভাবে সদা গৃহী সযতনে ॥ ৩ ॥
হে শিবে! পার্ব্বতি! যদি পিতা-মাতা প্রীত রন,
তুমি তাহে প্রীতা দেবি! প্রীত ব্রহ্মসনাতন ॥৪॥
তুমি আদ্যে! জগন্মাতা, পিতা পরব্রহ্ম হন,
গৃহীর তপস্যা মাত্র তোমাদের সন্তোষণ ॥ ৫ ॥
আসন-শয়ন-বস্ত্র, ভোজ্য ও পানীয় আর,
যোগাবে সময়মত সেবার্থ পিতা-মাতার ॥ ৬ ॥
মৃদুবাক্য কবে সদা, করিবে প্রিয় সাধন,
পিতৃ-আজ্ঞাকারী হবে সৎপুত্র কুলপাবন ॥ ৭ ॥
ঔদ্ধত্য ও পরিহাস, তর্জ্জন, পরিভাষণ,
না করিবে পিতৃঅগ্রে আত্মহিতকামীজন ॥ ৮ ॥
মাতা-পিতা দেখি, নমি, সসম্ভ্রমে দাঁড়াইবে;
পিতৃশাসনেতে থেকে আজ্ঞা বিনা না বসিবে ॥৯॥
বিদ্যা-ধন-মদে মাতি পিতৃ হেলা যেবা করে,
সর্ব্বধর্ম্ম-বহিষ্কৃত সে যায় নরক-ঘোরে ॥ ১০ ॥

ত্যজি পিতা-মাতা-ভ্রাতা-স্ত্রী-পুত্র-অতিথি আদি,
না ভুঞ্জিবে গৃহী কভু, কণ্ঠাগত-প্রাণ যদি ॥ ১১ ॥
গুরু-বন্ধু বঞ্চি যেবা স্বোদর-পূরণকামী,
ইহলোকে নিন্দিত সে, পরত্রে নরকগামী ॥১২॥
ভার্য্যাকে রক্ষিবে গৃহী, পুত্রে দিবে বিদ্যাধন,
পালিবে আত্মীয়-বন্ধু, এই ধর্ম্ম সনাতন ॥ ১৩ ॥

উৎপত্তি পিতায়, বিবৃদ্ধি মাতায়,
স্বজনে শিখায় স্নেহে;
এ সবে যে জন না পালে, সে জন
নরাধম নরদেহে ॥ ১৪ ॥

ওহে মহেশ্বরি! শত কষ্ট করি,
এঁদের তরে গ্রহণ,
যথাশক্তিমত তোষিবে সতত,
এই ধর্ম্ম সনাতন ॥ ১৫ ॥

সত্যপরায়ণ ব্রহ্মনিষ্ঠ জন
হন এ জগতে যিনি,
তিনি ধন্য অতি, তিনি লোকে কৃতী,
পরমার্থবিৎ তিনি ॥ ১৬ ॥

ভার্য্যাকে তাড়না, কভু করিবেনা,
মাতৃবৎ (১) পালিবে সদা;
ঘোর কষ্টেতেও ত্যাগ নহে শ্রেয়;
যদি সাধ্বী পতিব্রতা ॥ ১৭ ॥

স্বদার-নিরত হবে বিদ্যাব্রত;
বিকার-চঞ্চল-চিতে—
কভু পরাঙ্গনা স্পর্শ করিবে না,
নারকী হইবে তাতে ॥ ১৮ ॥

বাস-শয়নাদি না করিবে সুধী
বিরলে পরস্ত্রী সনে।

* মহাদেব পার্ব্বতীকে এই সংক্ষিপ্ত, সুন্দর ও সুসম্পন্ন অপূর্ব্ব গৃহ-ধর্ম্ম-নীতি শুনাইয়াছেন। গৃহস্থের গৃহাশ্রমের অবশ্য-প্রয়োজনীয় কোন শিক্ষারই ইহাতে অভাব নাই। গৃহী মাত্রেরই ইহা স্মৃতিস্থ ও ধৃতিস্থ থাকা বাঞ্ছনীয়। ইতঃপূর্ব্বে হিন্দুপত্রিকায় মহানির্ব্বাণতন্ত্রের এই অত্যুপকারী অংশটি মূল ও বঙ্গব্যাখ্যা সহ প্রকাশিত হইয়াছিল; এবার কণ্ঠস্থ রাখার সুবিধা লক্ষ্য করিয়া, পদ্যানুবাদ মালায় সেই মূলেরই যথাসাধ্য-কৃত অবিকল বঙ্গ-পদ্যানুবাদ গ্রথিত হইল। বঙ্গীয় গৃহীপাঠক দেবদেবের এই প্রসাদ গ্রহণে উপকৃত হউন, দেবদেব-চরণে ইহাই প্রার্থনা।

(১) "মাতৃবৎ পালয়েৎ সদা" (মূল) হিঃ সঃ

অযুক্ত ভাষণ, শৌর্য্য-প্রদর্শন,
না করিবে নারীজনে ॥ ১৯ ॥
শ্রদ্ধা-প্রেম-প্রিয়বাক্য-ধন-বস্ত্র অলঙ্কারে,
তোষিবে ভার্য্যাকে গৃহী সদা প্রিয় ব্যবহারে ॥২
উৎসবে, লোকযাত্রায়, তীর্থে, পর-নিকেতনে
পত্নী না পাঠাবে প্রাজ্ঞ পুত্রামাত্য-সঙ্গী বিনে ॥২১
যে মানবে মহেশানি! পতিব্রতা প্রীতা রয়,
সর্ব্বধর্ম্ম সিদ্ধ তার, নিশ্চিত সে প্রিয় হয় ॥ ২২ ॥
পিতা চারিবর্ষ পুত্রে লালিবে পালিবে;
ষোড়শ পর্য্যন্ত গুণ-বিদ্যা শিখাইবে ॥ ২৩ ॥
বিংশবর্ষ-প্রাপ্ত-পুত্রে গৃহকর্ম্মে নিয়োজিবে।
পরে তারে সমযোগ্য জেনে স্নেহ প্রদর্শিবে ॥২৪॥
কন্যাও সুপালনীয়া—শিক্ষণীয়া সুযতনে,
অর্পণীয়া সুবিধানে ধনরত্ন আদি সনে ॥ ২৫ ॥
এইরূপে গৃহী ভ্রাতা-ভগ্নী-ভ্রাতৃসন্ততিরে,
পালিবে তোষিবে তথা জ্ঞাতি-মিত্র-ভৃত্যাদিরে ॥২৬
অপিচ—স্বধর্ম্মী আর স্বদেশ-নিবাসী জনে,
পালিবে গৃহস্থ তথা অভ্যাগতে—উদাসীনে ॥ ২৭॥
বিভব সত্ত্বেও গৃহী হেন না আচরে যদি,
হে দেবি! সে পশুগণ্য, পাপিষ্ঠ, নিন্দিত অতি ॥২৮
নিদ্রালস্য, দেহ-যত্ন, কেশের বিন্যাস আদি,
অশন-বসনে তথা না হবে আসক্ত অতি ॥২৯॥
মিতাহার-নিদ্র হবে, মিতবাক্- মিতমৈথুন,
স্বচ্ছ-নম্র-শুচি-দক্ষ-সর্ব্বকর্ম্মসুনিপুণ ॥ ৩০ ॥
শত্রুতে হইবে শূর, নম্র বন্ধু- গুরুজনে,
না দিবে ঘৃণিতে মান, অপমান মানীগণে ॥ ৩১ ॥
নরের প্রকৃতি, রীতি, প্রবৃত্তি ও ব্যবহারে,
সঙ্গে-তর্কে জেনে, পরে বিশ্বাস করিবে তারে ॥৩২
বুদ্ধিমান্ যথাকালে ক্ষুদ্র অরিকেও ডরি,
দেখাইবে স্বপ্রভাব, ধর্ম্মে না লঙ্ঘন করি ॥ ৩৩ ॥
ধর্ম্মজ্ঞ না প্রকাশিবে স্ববল-পৌরুষ, আর—
জ্ঞাত-পর গুপ্তকথা, কৃত পর-উপকার ॥ ৩৪ ॥
যশস্বী কুবুদ্ধি-বশে ধ্রুবপরাজয় জেনে,
না করিবে তর্ক-বাদ লঘু কিম্বা গুরু সনে ॥ ৩৫ ॥

বিদ্যা, ধন, যশ, ধর্ম্ম, সযতনে উপার্জ্জিবে,
ব্যসন, অসাধু-সঙ্গ, মিথ্যা-দ্রোহ বিবর্জ্জিবে ॥৩৬
অবস্থা-অধীন চেষ্টা, কালাধীন ক্রিয়া যত,
কাল ও অবস্থা বুঝে, তাই কর্ম্মে হবে রত ॥৩৭॥
হবে যোগ-ক্ষেম-রত, প্রিয়বন্ধু-ধর্ম্মব্রত;
মিতবাক্য-হাস্য হবে—মান্যজনে বিশেষতঃ ॥৩৮॥
বিজিত-ইন্দ্রিয়গ্রাম, সুপ্রসন্ন-আত্মবান্,
সুচিন্ত ও দৃঢ়ব্রত হবে;
দূরদর্শী-অপ্রমত্ত হইয়া, বিষয়-তত্ত্ব
ইন্দ্রিয়-সম্বন্ধ বিচারিবে ॥ ৩৯ ॥
সত্য-মৃদু-প্রিয়-ধীর-হিতকর বাক্য কবে।
আপন প্রশংসা আর পরনিন্দা তেয়াগিবে ॥৪০॥
জলাশয়, বৃক্ষ, পথ, সেতু ও বিশ্রামাগার।
যেবা করে প্রতিষ্ঠিত, লোকত্রয় জিত তার ॥৪১॥
পিতা-মাতা প্রীত—আর বন্ধু বশীভূত যার,
লোকে যার যশ গায়, লোকত্রয় জিত তার ॥৪২॥
সত্যই যাহার ব্রত, দীনে যেবা দয়াধার,
কাম-ক্রোধ বশে যার, লোকত্রয় জিত তার ॥৪৩
পরস্ত্রী-বিরাগ—পরবস্তুতে নিস্পৃহা যার,
দম্ভ-হিংসাহীন যেবা, লোকত্রয় জিত তার ॥৪৪॥
না ডরে সমরে—রণ-বিমুখতা নাহি যার,
ধর্ম্ম-যুদ্ধে হত যেবা, লোকত্রয় জিত তার ॥ ৪৫ ॥
অসন্দিগ্ধ-শ্রদ্ধাবান্ যেবা শাস্ত্র-সদাচার,
যে মম শাসনে স্থিত, লোকত্রয় জিত তার ॥৪৬॥
যে জ্ঞানী সর্ব্বত্র রাখি সমদৃষ্টি আপনার,
লোকযাত্রা-কর্ম্ম করে, লোকত্রয় জিত তার ॥৪৭
বাহ্যান্তর-ভেদে দেবি! দ্বিবিধ শৌচ-সাধন,
আন্তরিক শৌচ হয় ব্রহ্মে আত্মসমর্পণ ॥ ৪৮ ॥
জলাদি-ভস্মাদি দ্বারা মলাদি করিয়া ক্ষয়,
দেহের যে শুদ্ধি হয়, বহিঃশৌচ তারে কয় ॥৪৯॥
গঙ্গা-নদী-হ্রদ-বাপী-কূপ-ক্ষুদ্রজলাশয়,
গঙ্গাদি-ক্রমেতে প্রিয়ে! শুদ্ধিকর সমুদয় ॥ ৫০ ॥
হে সুব্রতে! যজ্ঞ-ভস্ম, নির্ম্মলমৃত্তিকা, আর—
বাসাজিন, তৃণ যেন শুদ্ধিকর সে প্রকার ॥ ৫১ ॥

কিম্বা শৌচাশৌচ-বিধি বেশি বলা বৃথা শিষে!
মনঃপূত যাতে হয়, তাই গৃহী আচরিবে ॥ ৫২ ॥
নিদ্রান্তে ও মৈথুনান্তে—আর মল-মূত্র ত্যজি,
ভোজনান্তে, মল-স্পর্শে, বহিঃশৌচে হবে শুচি ॥৫৩
ত্রিকালিক সন্ধ্যাহ্নিক বৈদিক-তান্ত্রিকমত,
উপাসনা-ভেদে পূজা করিবেক যথাযথ ॥ ৫৪ ॥

শ্রীশরদিন্দু মিত্র।

মণিরত্নমালা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

মূল—১৬

সর্ব্বাস্ববস্থাস্বপি কিং ন কার্য্যং কিং বা বিধেয়ং বিদুষাং প্রযত্নাৎ। স্নেহশ্চ পাপং পঠনঞ্চ ধর্ম্মঃ সংসারমূলং হি কিমস্তি চিন্তা ॥

শিষ্যের প্রশ্ন (৪৬)—সর্ব্বাবস্থাতেই জ্ঞানবান্ ব্যক্তিগণের কি অকর্ত্তব্য? এবং (৪৭)—কি কর্ত্তব্য?

গুরুর উত্তর—স্নেহ এবং পাপ অকর্ত্তব্য। পাঠ ও ধর্ম্ম কর্ত্তব্য।

অকর্ত্তব্য—স্নেহ।

"সান্দ্রশ্চিত্তদ্রবং কুর্ব্বন্ প্রেমাস্নেহ ইতীর্য্যতে। ক্ষণিকস্যাপি নেহ স্যাৎ বিশ্লেষস্য সহিষ্ণুতা" ॥

প্রেম (ভালবাসা) গাঢ় হইয়া চিত্তকে দ্রবীভূত করিলে, তাহাকে স্নেহ বলে। এই স্নেহে ক্ষণকাল বিচ্ছেদও সহ্য হয় না। অতএব—

যত্র স্নেহো ভয়ং তত্র স্নেহো দুঃখস্য ভাজনং।
স্নেহমূলানি দুঃখানি তস্মিংস্ত্যক্তে মহৎ সুখং ॥
(গরুড়পুরাণ)

যেখানে স্নেহ (প্রগাঢ় ভালবাসা) সেইখানে ভয়, স্নেহ দুঃখের আধার এবং স্নেহ সমস্ত ক্লেশের কারণ। মনুষ্য স্নেহ পরিত্যাগ করিতে পারিলে মহৎ সুখ লাভ করিতে পারে। অতএব স্নেহ অকর্ত্তব্য।

স্নেহের মোক্ষ-প্রতিবন্ধকতা।

স্নেহেন যুক্তস্য নচাস্তি মুক্তিরিতি স্বয়ম্ভূর্ভগবানুবাচ। (যুধিষ্ঠির বাক্য)

ভগবান্ ব্রহ্মা কহিয়াছেন, স্নেহযুক্ত ব্যক্তি—অর্থাৎ যাহার চিত্ত দারা পুত্রাদি বিষয়ে স্নেহপ্রবণ, সেই ব্যক্তি কদাপি মোক্ষলাভে সমর্থ হয় না।

"অনিত্যেষু পদার্থেষু যস্য রাগী চরেন্নরঃ।
তস্য সংসার বুচ্ছিত্তিঃ কদাচিন্নৈব জায়তে" ॥
(নারদীয় পুরাণ)

"জীবন্মুক্তো গতস্নেহঃ সস্নেহো বদ্ধউচ্যতে" ॥

যে ব্যক্তি অনিত্যবস্তুতে অনুরক্ত হইয়া—অর্থাৎ অনিত্যবস্তু সকলকে ভালবাসিয়া সংসারে বিচরণ করে, কোনকালে তাহার ভববন্ধন মোচন হয় না। একারণ যিনি স্নেহ পরিত্যাগ করিতে পারেন, তিনিই জীবন্মুক্ত পুরুষ; আর যিনি স্নেহযুক্ত, তিনিই বদ্ধ—অর্থাৎ তিনি মুক্তিলাভ করিতে পারেন না। শ্রীমদ্ভাগবতের ৫ম স্কন্ধের ৭ম ও ৮ম অধ্যায় পাঠে অবগত হওয়া যায় যে—রাজর্ষি ভরত ভগবান্ হরির আরাধনার (১) নিমিত্ত অঙ্কগত সুহৃ-

(১) "গতির্ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ।
প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ং ॥"
(গীতা, শ্রীকৃষ্ণ-বাক্য)
"ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্ব্বলোক মহেশ্বরং।
সুহৃদং সর্ব্বভূতানং জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমৃচ্ছতি।" (গীতা)
"অসারভূতে সংসারে সারমেকং বিনির্দ্দিশেৎ
অসারাশেষ লোকস্য সারমারাধনং হরেঃ।"
(গরুড় পুরাণ)

ত্যাজ্য সুরেপ্সিত রাজ্যলক্ষ্মীকে উপেক্ষা কর য় এবং আপনার পুত্র-কলত্রাদি প্রিয়পরিজন-বর্গকে পরিত্যাগ করিয়া, সকল কল্যাণের নিকেতন নিজ ভবন হইতে বহির্গমনপূর্ব্বক পুলহাশ্রমে (হরিক্ষেত্রে) গমনকরতঃ প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিয়াছিলেন এবং অনন্যচিত্তে ভক্ত-বৎসল ভগবানের অরুণ চরণারবিন্দ ধ্যান করিয়া উত্তমা ভক্তি এবং তদনুগত পরমানন্দ লাভ করিতে পারিয়াছিলেন ; আবার সেই মহাত্মাকেই একটী মৃতমাতৃক মৃগশিশুর প্রতি স্নেহাতিশয্যনিবন্ধন সাধনভ্রষ্ট হইয়া মরণোত্তর হরিণত্ব (১) প্রাপ্ত হইতে হইয়াছিল।

শ্রীকৃষ্ণ ভক্ত উদ্ধবকে স্নেহের অনিষ্টকারিতা সম্বন্ধে একটী কপোতের বিষয় উল্লেখ করিয়া বলিয়াছিলেন :—

নাতিস্নেহঃ প্রসঙ্গো বা কর্ত্তব্যঃ কাপি কেনচিৎ ।
কুর্ব্বন্ বিন্দেত সন্তাপং কপোত ইব দীনধীঃ ॥
(ভাগবত ১১ স্কন্ধ ৭ অধ্যায়)

কোথাও কাহারও সহিত অতিশয় স্নেহ (প্রীতি) বা প্রসঙ্গ (অতি প্রসক্তি) করিবে না। যদি কেহ করে, তবে সেই ব্যক্তিকে মূঢ়চিত্ত কপোতের ন্যায় সন্তাপিত হইতে হয়। স্নেহবদ্ধ-হৃদয় কপোত কিরূপে বিনাশপ্রাপ্ত হইয়াছিল, অতঃপর তাহা বর্ণিত হইয়াছে। অনিত্য বিষয়ের প্রতি এই স্নেহই নিত্যবস্তু ভগবানে প্রযুক্ত হইলে, উহা "পরানুরাগ" বা ভক্তিতে পরিণত হইয়া জীবের সংসারপাশ ছেদনের কারণ হয়। রামপ্রসাদ বলিয়াছেন,—"মনরে ভালবাস তাঁরে, যে জন নেবায় ভব-সিন্ধু পারে"।

"পুণ্যকর্ম্মণি বৈ স্বর্গো নরকং পাপকর্ম্মণি।

(১) "যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরং।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ।"
(গীতা)

পুণ্যানুষ্ঠান করিলে স্বর্গভোগ এবং পাপাচরণদ্বারা নরকভোগ হইয়া থাকে।

পুণ্য—

হরিপ্রীতিকরং যচ্চ সদ্ভিশ্চ পরিরঞ্জিতং।
আত্মনঃ প্রীতিজনকং তৎ পুণ্যং পরিকীর্ত্তিতং ॥
(নারদীয় পুরাণ)

যে কর্ম্ম ভগবান্ হরির প্রীতিকর, সাধুগণ যাহার সেবা করিয়া থাকেন এবং যাহা আত্ম-প্রসাদজনক, তাহাই পুণ্য; সুতরাং তদ্বিপরীত—অর্থাৎ যাহা ভগবানের প্রীতিকর নহে, সাধু-গণের নিকট যাহা হেয় এবং যাহা আত্মগ্লানি উৎপন্ন করে, সেই কর্ম্মই পাপ।

"পুণ্যমেকং পরং ত্রাণং পুণ্যমেকা পরা গতিঃ।
স্বর্গঃ পুণ্যবতাং নূনং ক্ষমা পুণ্যং তপস্বিনাং ॥
তদ্বিসৃজ্য পরো যত্নঃ যেষাং পাপমহানসে।
পতিত্বা নরকে ঘোরে দহ্যন্তে তে দিবানিশং" ॥
(সংসারচক্র)

"পাপানাং ব্যাধিভিঃ সার্দ্ধং মিত্রতা সন্ততং ধ্রুবং।
পাপং ব্যাধি জরাবীজং বিঘ্নবীজঞ্চ নিশ্চিতং" ॥
পাপেন জায়তে ব্যাধিঃ পাপেন জায়তে জরা।
পাপেন জায়তে দৈন্যং দুঃখং শোকো ভয়ঙ্করঃ ॥
তস্মাৎ পাপং মহাবৈরং দোষবীজমমঙ্গলং।
ভারতে সন্ততং সন্তো নাচরন্তি ভয়াতুরাঃ" ॥
(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ)

পুণ্যই একমাত্র পরিত্রাণ ও উৎকৃষ্ট গতি, পুণ্যবান্ ব্যক্তিরাই স্বর্গে গমন করেন, পুণ্যই তপস্বিগণের ক্ষমা। যাহারা ঈদৃশ সুখাবহ পুণ্যকে পরিত্যাগ করিয়া পাপানুষ্ঠানে রত হয়, তাহারা ঘোর নরকে পতিত হইয়া দিবা-নিশি দগ্ধ হইতে থাকে। ব্যাধির সহিত পাপের অবিচ্ছিন্ন সখ্যতা। পাপ সকল বিঘ্নেরই মূল এবং পাপ হইতে ব্যাধি, জরা, দরিদ্রতা, দুঃখ ও ভয়ঙ্কর শোক উৎপন্ন হয়। এ নিমিত্ত ভারতে ভবভয়ার্ত্ত সাধুগণ সর্ব্বদোষবীজ, অমঙ্গলস্বরূপ

মহাশক্র পাপের অনুষ্ঠান হইতে সর্ব্বদা বিরত থাকেন।

"নিষিদ্ধকর্ম্মকরণে পাপং ভবতি নিশ্চিতং"।

"নিষিদ্ধানি—নরকাদ্যনিষ্টসাধনানি, ব্রহ্মহননাদীনি"।

নিষিদ্ধ কর্ম্ম করিলে পাপ জন্মে, ব্রহ্মহননাদি (১) যে সমস্ত কর্ম্মদ্বারা নরকাদি অনিষ্ট সাধিত হয়, সেই সকল কর্ম্ম নিষিদ্ধকর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত।

মনসা চিন্তয়ন্ পাপং কর্ম্মণা নাভিরোচয়েৎ।
তৎপ্রাপ্নোতি ফলং তস্যেত্যেবং ধর্ম্মবিদো বিদুঃ॥
হিংসাস্তেয়ান্যথা কাম পৈশুন্যং পরুষানৃতং।
সংভিন্নালাপব্যাপাদমমিথ্যা দৃগ্বিপর্য্যয়ং॥
পাপকর্ম্মেতি দশধা কায়বাঙ্মানসৈস্ত্যজেৎ॥

(শুক্রনীতি)

মনে মনে পাপ চিন্তা করিয়া, তাহা কার্য্যে পরিণত না করিলেও মনুষ্য তৎপাপের ফল প্রাপ্ত হয়। অতএব হিংসা (জীব হনন বা বা প্রাণীগণের ক্লেশজনক কার্য্য) স্তেয় (পরস্বাপহরণ), অন্যথাকাম (অবৈধরতি) পৈশুন্য (খলতা), পরুষ (নিষ্ঠুরতা), অনৃত (অসত্যকথন বা মিথ্যা ব্যবহার), সংভিন্নালাপব্যাপ (অযুক্ত আলাপের দ্বারা মনোভঙ্গ), অদম (অবিনয়) মিথ্যাদৃক্ (নাস্তিকতা), এবং বিপর্য্যয় (অবৈধ আচরণ) এই দশবিধ পাপকর্ম্ম কায়মনোবাক্যে পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য (২)

(১) * "ব্রহ্মহত্যা সুরাপানং স্তেয়ং গুর্ব্বঙ্গনাগমঃ।
তৎসংসর্গে চ নিষ্ঠাবৈ মহাপাতক পঞ্চকং॥"

ব্রহ্মহত্যা, সুরাপান, পরধনহরণ, গুরুপত্নীগমন এবং এইসকল পাপানুষ্ঠানকারীগণের সহবাস 'পঞ্চমহাপাতক' বলিয়া অভিহিত হয়।

(২) কৃত্বা পাপংহি সন্তপ্য তস্মাৎ পাপাৎ প্রমুচ্যতে।
নৈবং কুর্য্যাং পুনরিতি নিবৃত্ত্যা পূয়তে হিসঃ॥ (মনু)
পাপ করিয়া অনুতাপ করিলে এবং ভবিষ্যতে আর কখনই পাপ করিব না, এইরূপ দৃঢ়সংকল্প করিয়া নিবৃত্ত হইলে, মনুষ্য স্বকৃত পাপ হইতে মুক্ত হয়।

"যে পাপানি ন কুর্ব্বন্তি মনোবাক্ কর্ম্মবুদ্ধিভিঃ।
তে তপন্তি মহাত্মানো ন শরীরস্য শোষণং॥"
"যদা ন কুরুতে পাপং সর্ব্বভূতেষু কর্হিচিৎ।
কর্ম্মণা মনসা বাচা ব্রহ্মসম্পদ্যতে তদা॥"
"পাপকর্ম্মবশাৎ দুঃখং পুণ্যকর্ম্মবশাৎ সুখং।
তস্মাৎ সুখার্থীবিবিধং পুণ্যং প্রকুরুতে ভৃশং॥"

মন-বুদ্ধি-বাক্য এবং কর্ম্মদ্বারা যাঁহারা পাপ কার্য্য না করেন, সেই মহাত্মাগণই প্রকৃতরূপে তপস্যা করিয়া থাকেন, কেবল মাত্র শরীর শোষণ করিলেই তপস্যা করা হয় না। যিনি দেহ, মন এবং বাক্যদ্বারা সর্ব্বপ্রাণীতে পাপাচরণ পরিত্যাগ করেন, তিনিই ব্রহ্মকে লাভ করিতে পারেন। পাপকর্ম্মের ফলে দুঃখভোগ অবশ্যম্ভাবী এবং পুণ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠানে সুখভোগ সুনিশ্চিত। অতএব সুখেচ্ছু মানব সর্ব্ববিধ পাপকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া, সর্ব্বদা ভূরি পরিমাণে নানারূপ পুণ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন।

কর্ত্তব্য—পাঠ (সচ্ছাস্ত্রের (১) অধ্যয়ন ও আলোচনা) "পঠতো নাস্তি মূর্খত্বং"—যে ব্যক্তি পাঠ করে, তাহার মূর্খতা (২) থাকে না—অর্থাৎ সে ব্যক্তি পণ্ডিত হয়।

শ্রুতি স্মৃতি পুরাণানাং অভ্যাসঃ সর্ব্বদা হিতঃ।
স্বাদ্বহ্বাগমসন্দর্শী ব্যবহারীমহানতঃ।

(১) অনেক সংশয়োচ্ছেদি পরোক্ষার্থস্য দর্শকং।
সর্ব্বস্য লোচনং শাস্ত্রং যস্য নাস্ত্যন্ধ এব সঃ॥

(হিতোপদেশ)

(২) পঠপুত্র কিমালস্যং অপঠো ভারবাহকঃ।
পঠন্ সংপূজ্যতে রাজ্ঞা পঠপুত্র দিনে দিনে॥

(বোধিচাণক্য)

শল্যাং পরং কিং—নিজমূর্খতৈব। শল্যের ন্যায় যন্ত্রণাদায়ক বস্তু কি? নিজের মূর্খতা।

বুদ্ধিমানভ্যাসেন্নিত্যং বহুশাস্ত্রাণ্যতন্দ্রিতঃ ॥
(শুক্রনীতি)

ঋচাঞ্চ যজুষাং সাম্নাং অথর্ব্বাঙ্গিরসামপি।
ইতিহাস-পুরাণানাং বেদোপনিষদাং দ্বিজঃ ॥
শক্ত্যাসম্যক্ পঠেন্নিত্যং অল্পমপ্যাসমাপনাৎ ;
স যজ্ঞদান-তপসামখিলং ফলমাপ্নুয়াৎ ॥
(ব্যাস-সংহিতা)

সর্ব্বদা বেদ-বেদান্ত, মন্বাদি-ধর্ম্মশাস্ত্র এবং পুরাণাদি শাস্ত্র সকলের অভ্যাস হিতজনক। নানাপ্রকার শাস্ত্র সন্দর্শন করিলে মনুষ্য যথার্থ তত্ত্বদর্শী হইতে পারে, অতএব বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি আলস্য পরিত্যাগ করিয়া বহুবিধ শাস্ত্রের অনুশীলন করিবেন। গ্রন্থ-সমাপ্তি পর্য্যন্ত প্রতিদিন বেদ, ধর্ম্ম ও নীতিশাস্ত্র, উপনিষদ্, ইতিহাস ও পুরাণ—সমর্থ হইলে, সম্যক্‌রূপে এবং অসমর্থ হইলে, অল্প অল্প পাঠ করা ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য। যে ব্রাহ্মণ নিত্য নিয়মিতরূপে এইরূপ কার্য্য করেন, তিনি যজ্ঞ, দান এবং তপস্যার ফল প্রাপ্ত হন।

বিচারয়ন্তি যে শাস্ত্রং বেদাভ্যাসরতাশ্চ যে।
পুরাণসংহিতাং যে চ শ্রাবয়ন্তি পঠন্তি চ ॥
ব্যাকুর্ব্বন্তি স্মৃতিং যে চ যে ধর্ম্মপ্রতিবোধকাঃ।
বেদান্তেষু নিবষ্ণা যে তৈরিয়ং জগতী ধৃতাঃ ॥
তত্তদভ্যাসমাহাত্ম্যাঃ সর্ব্বে তে হতকিল্বিষাঃ।
গচ্ছন্তি ব্রহ্মণো লোকং যত্র মোহো ন বিদ্যতে ॥
(পদ্মপুরাণ)

যাঁহারা বেদাভ্যাসে রত এবং শাস্ত্রার্থবিচার করেন, যাঁহারা পুরাণ-সংহিতাদি পাঠ করেন এবং শ্রবণ করান, যাঁহারা স্মৃতিশাস্ত্র ব্যাখ্যা করেন এবং ধর্ম্মোপদেশ দেন এবং যাঁহারা বেদান্তশাস্ত্রে বিচক্ষণ, তাঁহারাই এই জগৎকে ধারণ করেন এবং শাস্ত্রাভ্যাস-মাহাত্ম্যে নিষ্পাপ হইয়া মোহপরিশূন্য ব্রহ্মলোকে গমন করেন।

শাস্ত্র অধ্যয়ন ও অনুশীলন করিলে, বুদ্ধি পরিমার্জ্জিত হয়, কার্য্যকুশলতা জন্মে ; আপনার অজ্ঞানজনিত বৈষম্য নিরাকৃত হইয়া সর্ব্বত্র সমভাব দর্শনহেতু অপরিসীম আনন্দলাভ হয় এবং হিতাহিত জ্ঞানলাভ করতঃ সন্মার্গাবলম্বী ও সৎক্রিয়াবান্ (১) হইয়া মনুষ্য পুরুষার্থলাভের অধিকারী হইয়া থাকে।

কোন্ শাস্ত্র পাঠ করা উচিত নহে, শাস্ত্রকারেরা তাহা বলিয়াছেন :—

"যস্মিন্ শাস্ত্রে পুরাণে বা হরিভক্তির্ন দৃশ্যতে।
ন শ্রোতব্যং ন মন্তব্যং যদি ব্রহ্মা স্বয়ং বদেৎ ॥" (২

আত্মজ্ঞান লাভ বা ভজনীয়রূপে ভগবানের অনুসন্ধান করাই শাস্ত্র পাঠের মুখ্য উদ্দেশ্য সুতরাং যে শাস্ত্রে বা পুরাণে হরিভক্তি দৃষ্ট হয় না, তাহা স্বয়ং ব্রহ্মা বলিলেও শ্রবণ করা বা চিন্তা করা কর্ত্তব্য নহে। কারণ হরিভক্তিশূন্য শাস্ত্রাদির শ্রবণ ও আলোচনাদি দ্বারা হৃদয় কুসন্দেহ-জালে সমাচ্ছন্ন হয় এবং শুভদায়িনী শ্রদ্ধা তিরোহিত হয় ; সুতরাং তাহা হইতে অধঃপতন ঘটে।

কর্ত্তব্য—ধর্ম্ম।

"ধর্ম্মো বিশ্বস্য জগতঃ প্রতিষ্ঠা, লোকে ধর্ম্মিষ্ঠং প্রজা উপসর্পন্তি, ধর্ম্মেণ পাপমপনুদতি, ধর্ম্মে সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতং তস্মাদ্ধর্ম্মং পরমং বদন্তীতি। (শ্রুতিঃ)

ধর্ম্মই জগতের প্রতিষ্ঠা, জগতে প্রজাসকল ধার্ম্মিকেরই অনুসরণ করে, ধর্ম্মদ্বারা পাপ দূরীভূত হয়, ধর্ম্মে সকলই প্রতিষ্ঠিত, এ নিমিত্ত ধর্ম্মকেই পরম (শ্রেষ্ঠপদার্থ) বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

(১) "ক্রিয়াযুক্তঃ সসিদ্ধঃ স্যাৎ অক্রিয়ো যঃ কথং ভবেৎ।
শাস্ত্রস্য পাঠমাত্রেণ কথং সিদ্ধিঃ প্রজায়তে ॥"

(২) "বেদে রামায়ণে পুণ্যে পুরাণে ভারতে তথা।
আদাবন্তে চ মধ্যে চ হরিঃ সর্ব্বত্র গীয়তে ॥"

"অনিত্যানি শরীরাণি বিভবো নৈব শাশ্বতঃ।
নিত্যং সন্নিহিতো মৃত্যুঃ কর্ত্তব্যো ধর্ম্মসংগ্রহঃ ॥"
(নারদীয়পুরাণ)

"একএব সুহৃদ্ধর্ম্মো নিধনেঽপ্যনুযাতি যঃ।
শরীরেণ সমং নাশং সর্ব্বমন্যদ্ধি গচ্ছতি ॥
ধর্ম্মং শনৈঃ সঞ্চিনুয়াৎ বল্মীকমিব পুত্তিকাঃ।
পরলোকসহায়ার্থং সর্ব্বভূতান্যপীড়য়ন্ ॥
নামুত্র হি সহায়ার্থং পিতা মাতা চ তিষ্ঠতঃ।
ন পুত্র দারং ন জ্ঞাতির্দ্ধর্ম্মস্তিষ্ঠতি কেবলং ॥
একঃ প্রজায়তে জন্তুরেকএব প্রলীয়তে।
একোঽনুভুংক্তে সুকৃতং একএব চ দুষ্কৃতং ॥
মৃতং শরীরমুৎসৃজ্য কাষ্ঠলোষ্ট্রসমং ক্ষিতৌ।
বিমুখা বান্ধবা যান্তি ধর্ম্মস্তমনুগচ্ছতি।
তস্মাদ্ধর্ম্মং সহায়ার্থং নিত্যং সঞ্চিনুয়াচ্ছনৈঃ।
ধর্ম্মেণ হি সহায়েন তমস্তরতি দুস্তরং ॥" (মনু)

দেহ অনিত্য ও ক্ষণভঙ্গুর, ঐশ্বর্য্যও চিরস্থায়ী নহে এবং মৃত্যু নিত্য সন্নিহিত, অতএব ধর্ম্মসংগ্রহ করা সর্ব্বথা কর্ত্তব্য। ধর্ম্মই কেবল মানবের একমাত্র সুহৃৎ, কেননা ধর্ম্ম মৃতব্যক্তির অনুগমন করে, আর অন্য সমুদয় বস্তুই শরীরের সহিত বিনাশ প্রাপ্ত হয়। পুত্তিকা (উই) যেরূপ বল্মীক (মৃত্তিকাস্তূপ) সঞ্চয় করে, সেইরূপ কোন প্রাণীকে পীড়া না দিয়া পরলোকের সাহায্যার্থে অল্পে অল্পে ধর্ম্ম সঞ্চয় করা মনুষ্যের কর্ত্তব্য। পিতা, মাতা, স্ত্রী, পুত্র, জ্ঞাতি, ইহারা কেহই পরলোকের সাহায্যার্থে অগ্রসর হইবে না। তথন ধর্ম্মই একমাত্র সহায় হইবেন। প্রাণীমাত্রেই একাকী জন্মগ্রহণ করে, একাকী লয় প্রাপ্ত হয়, একাকী স্বকৃত পাপপুণ্যের ফলভোগ করে। প্রাণসম বান্ধবেরা কাষ্ঠ-লোষ্ট্রের ন্যায় মৃতদেহ ভূমিতলে পরিত্যাগ পূর্ব্বক মুখ ফিরাইয়া গৃহাভিমুখে গমন করে, কিন্তু তখন ধর্ম্মই কেবল মৃতব্যক্তির অনুগমন করিয়া থাকে। ধর্ম্মের সাহায্যেই মানব দুস্তর তম—অর্থাৎ নরকাদি দুঃখ হইতে পরিত্রাণ পায়; অতএব প্রতিদিন অল্পে অল্পে পরলোকের সহায় স্বরূপ ধর্ম্মের সংগ্রহ সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

"ধারণাদ্ধর্ম্মমিত্যাহুর্দ্ধর্ম্মেণ বিধৃতাঃ প্রজাঃ।
যস্মাদ্ধারয়তে সর্ব্বং ত্রৈলোক্যং স চরাচরং ॥
(স্মৃতি)

"বিহিতক্রিয়য়া সাধ্যো ধর্ম্মঃ পুংসাং গুণোমতঃ।
প্রতিষিদ্ধক্রিয়া সাধ্যঃ সগুণোঽধর্ম্মউচ্যতে ॥
"শ্রুতিস্মৃত্যুদিতং (১) ধর্ম্মমনুতিষ্ঠন্ হি মানবঃ।
ইহ কীর্ত্তিমবাপ্নোতি প্রেত্য চানুত্তমং সুখং ॥"

বেদাদিশাস্ত্রে যে সকল কর্ম্ম জীবের ইহপারলৌকিক মঙ্গলের হেতুভূত বলিয়া অবশ্যকর্ত্তব্যরূপে বিহিত হইয়াছে, সেই সমস্ত ক্রিয়ার অনুষ্ঠান জন্য পুরুষের যে গুণ (সংস্কারবিশেষ) জন্মে, তাহাই ধর্ম্ম এবং হিংসাপ্রভৃতি নিষিদ্ধ কর্ম্মের অনুষ্ঠানে যে গুণ—অর্থাৎ দোষ জন্মে, তাহা অধর্ম্ম। "ধারণ করেন" এই অর্থে ধর্ম্ম নাম হইয়াছে, ধর্ম্মের দ্বারা নিখিল প্রজা বিধৃত হইয়া থাকে, কারণ ধর্ম্মই এই স্থাবর-জঙ্গমাত্মক ত্রিলোককে ধারণ করিয়া থাকেন। যে মানব বেদোক্ত ও স্মৃত্যুক্ত ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, তিনিই ইহজগতে সাধুরূপে অক্ষয় যশঃ এবং পরলোকে পরম সুখলাভ করেন।

বৃষো হি ভগবান্ ধর্ম্মস্তস্য যঃ কুরুতেঽহ্যলং।
বৃষলং তং বিদুর্দ্দেবা স্তস্মার্দ্ধর্ম্মং ন লোপয়েৎ ॥
(মনু) (ক্রমশঃ)

শ্রীপাঁচকড়ি চট্টোপাধ্যায়।

(১) "অপ্রমাণ্যক বেদানামার্ধাণাঞ্চৈব দর্শনং।
অব্যবস্থা চ সর্ব্বত্র এতন্নাশনমাত্মনঃ ॥"
(বশিষ্ঠ সংহিতা)